সারাণ্ডায় শয়তান

জোনাথনের বাড়ির ভূত

কেরালায় কিস্তিমাত

সর্প-রহস্য সুন্দরবনে

ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য

ছকটা সুডোকুর

১

মিতিনমাসি সমগ্র • সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

মিতিনমাসি

সমগ্র

কিশোর কাহিনী সিরিজ

সারান্ডায় শয়তান

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

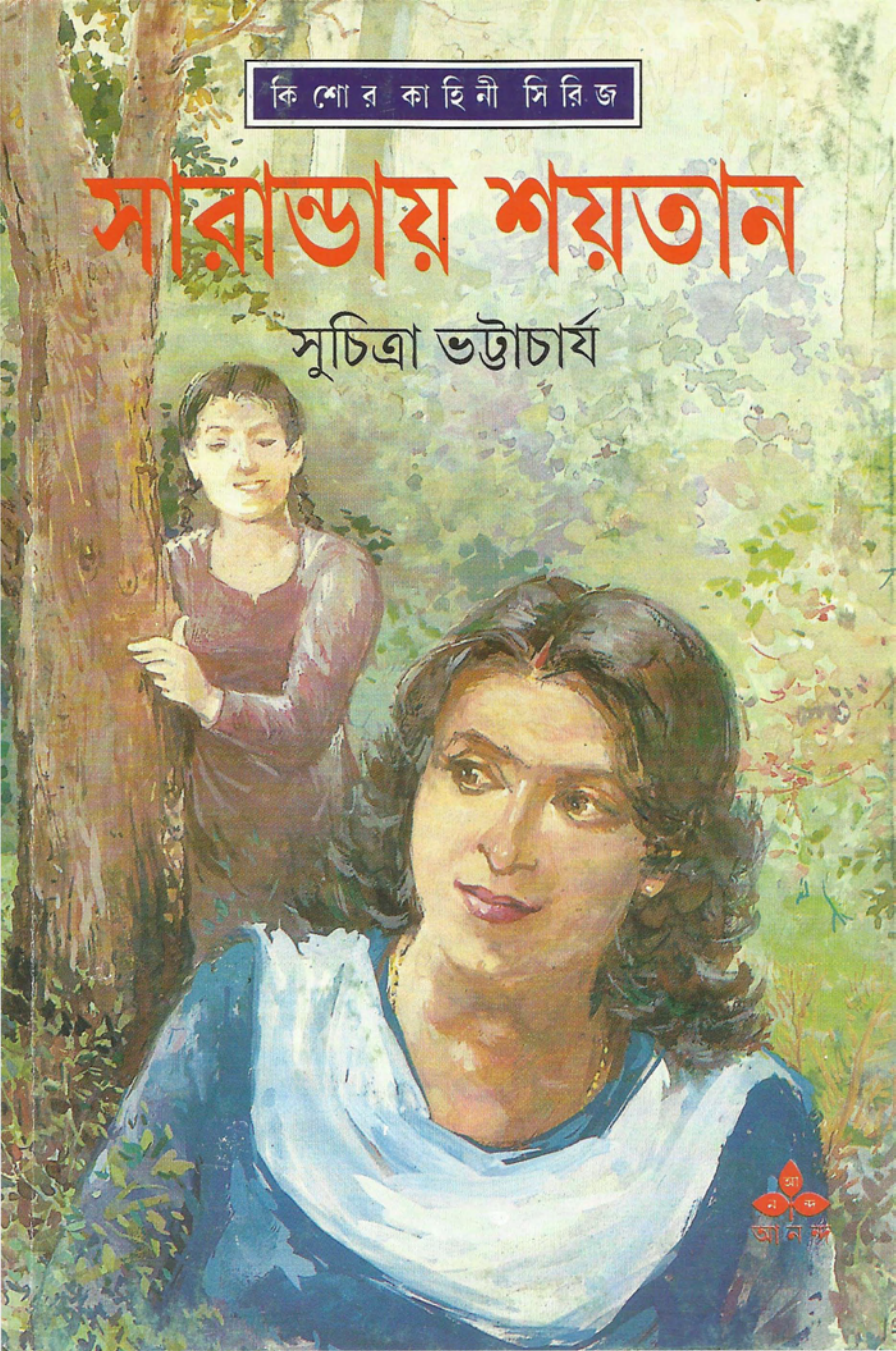

আনন্দ

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

সারান্ডায় শয়তান

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

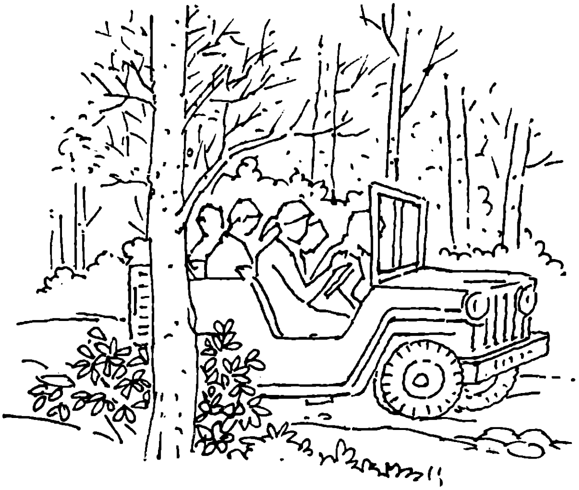

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : নির্মলেন্দু মণ্ডল

আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-306-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

SARANDAY SHAITAN
[Adventure]
by
Suchitra Bhattacharya
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১০০.০০

অনেক আদরের অর্চিষ্মান
ওরফে ছুট্‌কুকে

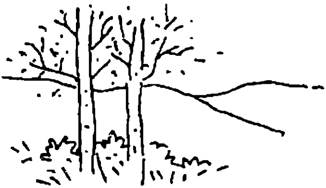

ইস্পাত এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন ছাড়ার পর থেকেই লোকটাকে লক্ষ করছিল টুপুর। দেখার মতোই চেহারা বটে। বিশাল মাথায় চকচকে টাক, তামাটে রং, পুরু ঠোঁট, নাক চ্যাপটা, ফোলা ফোলা গাল। গালে বীভৎস একটা কাটা দাগ। গোটা মুখে কেমন যেন নিষ্ঠুরতার আভাস। দৃষ্টি বোঝার জো নেই, ঘন সবুজ সানগ্লাস সাঁটা আছে চোখে। খড়্গপুর প্রায় এসে গেল, এখনও একবারও চোখ থেকে রোদচশমা নামাল না লোকটা। চৈত্রের গরমেও গলাবন্ধ ফুলশার্ট পরে আছে। শার্টের রং কুচকুচে কালো। পায়ে দুধসাদা শু। দেখেই কেমন হিন্দি ফিল্মের ভিলেন মনে হয়।

লোকটার হাবভাবও রীতিমতো সন্দেহজনক। মাঝে-মাঝেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে জরিপ করছে কামরাটাকে। কোলে রাখা বাদামি ব্রিফকেস খোলা-বন্ধ করছে ঘন ঘন। মাথা ঝুঁকিয়ে খুদে খুদে চিরকুটে কী যেন লিখছে। কাটছে। আবার লিখছে। কাটাকুটি করা কাগজের টুকরোগুলোর কিছু পুরে রাখল ব্রিফকেসে, কিছু উড়িয়ে দিল জানলার বাইরে। একখানা মোটা লালচে ইংরেজি খবরের কাগজ বার করল ব্রিফকেস থেকে, আশপাশের যাত্রীদের আড়াল করে বহুক্ষণ ধরে পেনসিলে কীসব দাগ টানল। তারপর হঠাৎই ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে কাগজটা। উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়ল আপন মনে। থেকে থেকে কোমরে হাত দিচ্ছে। কী যেন অনুভব করছে টিপে টিপে। টানটান হচ্ছে। ঝুঁকছে।

রিভলভার আছে নাকি?

টুপুরের বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। যাত্রার শুরু থেকেই আজ চোরা উত্তেজনায় ফুটছে টুপুর। এবার তো শুধু বাবা-মা'র সঙ্গে বেড়ানো নয়, মিতিনমাসি আছে সঙ্গে। আর মিতিনমাসি থাকা মানেই নির্ঘাত কিছু-না-কিছু ঘটবে। গোয়েন্দাদের ভ্রমণ কি কখনও পুরোপুরি নিরামিষ হয়?

হ্যাঁ, মিতিন এখন পুরোদস্তুর পেশাদার গোয়েন্দা। মাত্র বত্রিশ বছর বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে মিতিনের খুব নামডাক। মিতিন ওরফে প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির গোয়েন্দা সংস্থা থার্ড আইকে লালবাজারের তাবড়-তাবড় পুলিশ অফিসাররা রীতিমতো সমীহ করে। বেশ কয়েকটা জব্বর কেস সল্‌ভ করেছে মিতিন। বিশেষ করে আলিপুর হত্যারহস্য। কেসটা ছিল এয়ার এম্‌বলিজমের। ছেলের কষ্ট আর সহ্য হচ্ছিল না বলে ফাঁকা সিরিঞ্জ দিয়ে বাতাস ইনজেকশন করে ছেলেকে মেরে ফেলেছিলেন মা, আর দোষ পড়েছিল ছেলের বউয়ের ঘাড়ে। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে মিতিন দারুন হইচই ফেলে দিয়েছিল শহরে। তারপর বিদিশা রুদ্র ব্ল্যাকমেলিং কেস। ধনী গৃহবধূ বিদিশাকে ভয় দেখিয়ে টাকা শোষণ করছিলেন তার শ্বশুরমশাই স্বয়ং। মাঝখান থেকে একটা খুনও হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আসল অপরাধী মিতিনের চোখকে ধুলো দিতে পারেনি। ব্যাঙ্ক প্রতারণার আসামি হরিশঙ্কর চাকলাদারকে পাকড়াও করাটাও কম রোমহর্ষক ছিল না।

এহেন মিতিনমাসির সঙ্গলাভ কি বৃথা যাবে টুপুরের? হয়তো ওই টাক-মাথাকে দিয়েই ঘটনার ঘনঘটা শুরু হতে চলেছে!

টুপুরের পাশে টুপুরের মা সহেলি। তার ওপাশে মিতিন। বারবার মিতিনমাসির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল টুপুর। চোখ ঘুরিয়ে। ভুরু নাচিয়ে। আঙুল নেড়ে নেড়ে। তুৎ, মিতিনমাসি তাকাচ্ছেই না। সেই যে ট্রেনে উঠে, সিটে গ্যাঁট হয়ে বসে মা'র সঙ্গে গল্প জুড়েছে,

হাত মুখ নেড়ে দিদি আর বোনের কথা চলছে তো চলছেই। জামশেদপুর কেন, সারান্ডার জঙ্গলে পৌঁছেও বুঝি দু'জনের কথা ফুরোবে না। ইস্, মিতিনমাসি কেন যে একটুও দেখছে না লোকটাকে!

শুধু মিতিন নয়, কেউই লোকটাকে সেভাবে নজর করছে না। কামরাভর্তি প্যাসেঞ্জার, সবাই যে যার মতো ব্যস্ত। কোথাও দল বেঁধে আড্ডা চলছে, কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ-বা কাগজ ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছে অলসভাবে। হকাররা পসরা নিয়ে যাতায়াত করছে প্যাসেজ দিয়ে। একটা রোগামতন কফিঅলা টাক-মাথাকেই জিজ্ঞেস করল চা কফি চাই কি না। তর্জনীর ইশারায় কফিঅলাকে ভাগিয়ে দিল লোকটা।

আশ্চর্য, একজনেরও মনে খটকা লাগল না? এতেই বুঝি রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। সত্যিকারের অপরাধীদেরই তো চেনা কঠিন, সহজে কেউ তাদের সন্দেহ করে না, এটাই তো তাদের বিশেষত্ব।

টুপুরের সামনের সিটে টুপুরের বাবা আর মিতিনের বর পার্থ। পার্থ আর মিতিনের চার বছরের ছেলে বুমবুম বসেছে জানলার ধারটিতে। তারাও নিজের নিজের কাজে মগ্ন।

টুপুরের বাবা অবনী চৌধুরীর হাতে ইয়া গাবদা এক ইংরেজি বই। তিনি বই ছাড়া থাকতেই পারেন না। বই পড়া, কলেজের ক্লাস নেওয়া, আর পরীক্ষার খাতা দেখার বাইরে তাঁর আর একটিই কাজ আছে। ঘুম। বইটি এখন হাত থেকে সরিয়ে নিলেই তিনি চোখ বুজে ফেলবেন। অবশ্য যেমন-তেমন বই পড়েন না অবনীবাবু। তাঁর চাই একেবারে নীরস প্রবন্ধ। গল্প, উপন্যাস, কবিতা অবনীর দু' চক্ষের বিষ। উঁহুঁ, চার চক্ষুর। পুরু লেন্সের চশমা আছে অবনীর। পাওয়ার মাইনাস আট। অবনী এখন পড়ছেন 'ইন্‌সেক্টস ইন অ্যামাজনিয়ান ফরেস্ট'। আমাজন নদীকে ঘিরে থাকা জঙ্গলের পোকামাকড়।

পার্থ ডুবে আছে শব্দজব্দে। হাওড়া স্টেশনে একগাদা বাংলা কাগজ কিনেছিল পার্থ, এখনও সে ডটপেন চিবোতে চিবোতে ছক পূরণ করছে। নেশা। অবনীর চেয়ে পার্থ অনেকটাই ছোট, অবনীর সঙ্গে তার বহু বিষয়েই ঘোরতর অমিল। যেমন, পার্থ খেতে ভীষণ ভালবাসে, অবনী নিতান্তই মিতাহারী। তেল-মশলাদার খাবার তো অবনী ছুঁয়েও দেখেন না। কথা বলতে শুরু করলে পার্থকে থামানো কঠিন। অবনী দায়ে না পড়লে বেশি বাক্য উচ্চারণই করেন না।

শুধু একটা ব্যাপারে দুই ভায়রাভাইয়ে মেলে খুব। দু'জনেই নিদ্রাবিলাসী। ঘুমোতে পেলে কে যে বেশি খুশি হয়, বলা কঠিন।

দু'জনকেই অধৈর্য চোখে দেখে নিল টুপুর। নাহ্, কারও চোখের পাতা ওঠার লক্ষণ নেই। এমনকী বুমবুম যে বুমবুম, সর্বক্ষণ যার চোখ ঘোরে, তারও দৃষ্টি অবনমিত। কচর কচর চিপ্‌স চিবোচ্ছে, আর গভীর মনোযোগে কমিক্‌স গিলছে। বুমবুমের চালচলন, কথাবার্তা সবই একেবারে বড়দের মতো। এমন ফিচেল শিশু টুপুর আর দুটো দেখেনি।

টুপুর তাকিয়ে ছিল বলেই হোক, কি চিপ্‌সের প্যাকেট ফুরিয়ে আসছে বলেই হোক, বুমবুম হঠাৎ মুখ তুলল। টুপুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার ভুরুতে ভাঁজ, "কিছু বলছ?"

"একা-একাই শেষ করছিস?" টুপুর হাত বাড়াল, "আমায় ক'টা দে।"

টকঝাল কাঁচকলা ভাজার প্যাকেটখানা ঝপ করে সরিয়ে ফেলল বুমবুম। গম্ভীর গলায় বলল, "তোমায় চিপ্‌স খেতে হবে না। তোমার ফ্যাট বেড়ে যাবে।"

পাক্কা দশ বছরের ছোট ডেঁপো মাসতুতো ভাইকে একটি গাঁট্টা কষাতে যাচ্ছিল টুপুর, আচমকাই হাত থেমে গেল। কী কাণ্ড, টাকমাথা যে উঠে দাঁড়িয়েছে। নড়বড় করছে কেমন যেন। মাথার

ওপরের বাঙ্কটাকে ধরে টাল সামলালো। হাতে ঝুলিয়ে নিল ব্রিফকেসখানা। টলমল পায়ে এগোচ্ছে দরজার দিকে।

এমন বেসামাল ভাবে হাঁটে কেন? ভোরবেলাতেই নেশা করে ট্রেনে উঠেছিল? নাহ, এ গুণ্ডা বদমাইশ না হয়ে যায় না।

টুপুর আর চুপ থাকতে পারল না। প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে, "ও মিতিনমাসি, লোকটা চলল যে!"

মিতিন এদিক-ওদিক তাকাল, "কোন লোকটা?"

"এই যে, উঠে গেল এক্ষুনি! টাকমাথা! কালো শার্ট!"

"ওহ, ওই ভদ্রলোক?" মিতিন নির্বিকার। সালোয়ার-কামিজের ওড়না কাঁধে গোছাতে গোছাতে বলল, "উনি সামনেই নামবেন। খড়্গপুরে।'

"লোকটা কিন্তু ডেঞ্জারাস!"

"কেন?"

"সেই থেকে ওয়াচ করছি। কুচি কুচি কাগজে কীসব প্ল্যান ছকছিল!"

"ভদ্রলোক একজন স্টক ব্রোকার। শেয়ার কেনা-বেচার মিড্‌লম্যান। নাম, পি কে জি কুরুপ। কেরালাইট। উনি এতক্ষণ বসে শেয়ারের ক্যালকুলেশান করছিলেন।"

"তু-তু-তু- তুমি জানলে কী করে?"

"নামটা পেয়েছি গেটে ঝোলানো রিজার্ভেশান চার্ট থেকে। কুরুপ টাইটেলটা কেরলের লোকদেরই হয়।" মিতিন একগাল হাসল, "আর শেয়ারের ব্যাপারটা বুঝলাম ভদ্রলোকের ব্রিফকেস থেকে। ভেতরটা শেয়ারের পেপারে ঠাসা, আমি দেখে নিয়েছি। প্লাস, খবরের কাগজ খুলে উনি শেয়ারের পেজেই মার্কিং করছিলেন।"

টুপুর থতমত মুখে বলল, "কিন্তু চেহারাটা তো..."

"দর্শনধারী না হলেই বুঝি খারাপ লোক হতে হবে? ওরে বোকা, ভদ্রলোক মোটেই মন্দ মানুষ নন। বলতে পারিস, দুর্ভাগা।"

"কেন?"

"ভদ্রলোকের শরীরটা পুরো ঝাঁঝরা। একটা পা নেই। আর্টিফিশিয়াল লিম্ব লাগিয়ে চলাফেরা করেন। হাঁটতে গিয়ে ব্যালান্স পাচ্ছিলেন না। সম্ভবত বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। গালের ওই কাটা দাগটা সেই দুর্ঘটনারই স্মৃতিচিহ্ন। গায়েও নিশ্চয়ই ওরকম আরও অনেক দাগ আছে। সেগুলোকে ঢাকতেই গলাবন্ধ ফুলশার্ট। অ্যাক্সিডেন্টে ভদ্রলোকের একটা চোখও গেছে। রাইট আই। এক চোখে দেখেন বলেই ঘাড়টাকে অনেকটা ঘোরাতে হয়। কোমরেও চোট আছে, এখনও বেল্ট ব্যবহার করেন। বেল্ট বাঁধা আছে বলেই স্বস্তিতে বসতে পারছিলেন না ভদ্রলোক।" মিতিনের হাসি চওড়া হল, "বুঝলি কিছু, হাঁদাগঙ্গারাম?"

টুপুর পুরো মিইয়ে গেল। রহস্যটায় জল পড়ে গেল এভাবে?

মিতিন হাত বাড়িয়ে টুপুরের চুল ঘেঁটে দিল। "কী রে, তোর না খুব আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার শখ? অবজার্ভেশান পাওয়ার এত পুওর হলে চলবে?"

টুপুর আর মিতিনের মাঝখানে বসে সহেলি এতক্ষণ সব শুনছিলেন। পুট করে বলে উঠলেন, "আর হাসাস না। ও হবে কিনা তোর মিসেস ওয়াটসন?"

"মিসেস নয় বড়দি। শার্লক হোম্‌সের সহকারী ছিল মিস্টার ওয়াটসন। তুমি টুপুরকে বড়জোর মিস ওয়াটসন বলতে পারো।"

"ওই হল। যে মেয়ে এখনও নিজের পেন হারালে খুঁজে বের করতে পারে না, সে কিনা করবে গোয়েন্দাগিরি?"

টুপুর আহত মুখে বলল, "সে তো আমি ভাল করে খুঁজি না বলে পাই না।"

"ওটাই তো তোর ত্রুটি।" মিতিন বলল, "অ্যাটেনশানটা বাড়া। শুধু ক্যারাটে শিখলেই হবে না, মস্তিষ্কেরও ব্যায়াম চাই। দৃষ্টিশক্তিকেও অনেক তীক্ষ্ণ করতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না দেখলে সিদ্ধান্তে ভুল হয়ে যাবে যে।"

আলগাভাবে ঘাড় নাড়ল টুপুর। মিতিনমাসি তাকে পুরোপুরি বাতিল করেনি দেখে মনে মনে খুশিও হল বেশ।

আটটা বাজে। খড়্গপুর স্টেশনে ঢুকে পড়ল ট্রেন।

এতক্ষণে ধ্যান ভেঙেছে পার্থর। খবরের কাগজ মুড়ে রেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, "চটপট বলো, চটপট বলো কে কী খাবে?"

সঙ্গে খাবারদাবার কিছুই তেমন আনা হয়নি। ট্রেনে ওঠার পর থেকে শুধু বিস্কুট আর চিপ্‌স চলছিল, সকলেরই খিদে পেয়েছে জব্বর। এই ট্রেনে প্যান্ট্রি-কার আছে বটে, কিন্তু সেখানকার খাবার মিতিনদের কারও তেমন মুখে রোচে না। টুপুর তো ভেজিটেবল কাটলেটগুলো দেখলেই নাক সিঁটকোয়। কী এক কাগজের মতো ওমলেট বেচে এরা, সেটাও ভারী অখাদ্য।

টুপুর বলল, "সলিড কিছু আনো। যাতে অনেকক্ষণ পেটে থাকে।

মিতিন বলল, "দ্যাখো না পুরি তরকারি পাও কি না। পার হেড চারটে করে পুরি নিতে পারো। হাতের কাছে কলা-আঙুর পেলেও নিয়ে নিয়ো।"

সহেলি বললেন, "সঙ্গে লাড্ডুও এনো। মিষ্টি ছাড়া ব্রেকফাস্ট জমে না।"

অবনী বই থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, "আমি কিন্তু শুধু ফ্রুট্‌স নেব।"

"উঁহ্‌হ্‌, বসে বসে হুকুম ছোড়া হচ্ছে!" সহেলি ঝামটে উঠলেন, "তুমি যাও না সঙ্গে। ও বেচারা একা একা এত আনবে কী করে!"

অবনী যেন শুনতেই পেলেন না। আবার ঢুকে পড়েছেন আমাজনের জঙ্গলে।

অগত্যা কী আর করা, পার্থকেই পড়িমরি ছুটতে হল গেটে। ট্রেন থামতে-না-থামতেই হুড়মুড়িয়ে ওঠানামা করছে লোকজন। যত না নামল, উঠল তার চেয়ে ঢের বেশি। মাত্র কয়েকটা সিট ফাঁকা ছিল ট্রেনের, খড়্গপুরে কামরা একেবারে টইটম্বুর।

প্ল্যাটফর্মেও রীতিমত হইচই চলছে। চাঅলা, খাবারঅলা, ম্যাগাজিনঅলাদের হাঁকডাকে দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম সরগরম। পার্থ একবার এদিকে ছুটছে, একবার ওদিকে।

পার্থর দশা দেখে মিতিন বলে উঠল, "যাই, আমিও নামি।"

সহেলি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "খবরদার। ট্রেন মাত্র পাঁচ মিনিট থামবে।"

"তো?"

"উঠতে পারবি না তুই। ট্রেন ছেড়ে দেবে যে!

"পার্থ পারলে আমিও পারব। মেয়ে বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকব, আর ছেলেরা ছুটে ছুটে খাবার জোগাড় করবে, ওসব দিন আর নেই রে বড়দি। ...টুপুর, জানলা দিয়ে খাবারগুলো পাস করে দেব, ধরে নিস।"

মিতিনকে অবশ্য নামতে হল না, তার আগে পার্থই উঠে পড়েছে ট্রেনে। হাতে খানচারেক প্লাস্টিকের প্যাকেট, মুখে একগাল হাসি, "একটু বেশি করেই সব নিয়ে নিলাম, বুঝলে। এখন আপ্ টু টাটা যত খুশি খেয়ে যাও।"

ছোট ছোট ঝোলা থেকে একের পর এক খাদ্যসামগ্রী বেরোচ্ছে। এক ডজন কলা, চার-পাঁচ থোকা আঙুর, গোটাদশেক লাড্ডু, পাহাড়ের মতো পুরি তরকারি, দু' প্যাকেট ক্রিম বিস্কুট (যার ক্রিমগুলো বুমবুম খাবে, বিস্কুট বাকিরা), ঠোঙাভর্তি বাদামভাজা।

এবং শেষ হইয়াও হইল না শেষ, আঠারোখানা ডিমসেদ্ধ।

টুপুরের চোখ কপালে, "এত খাবার কে খাবে পার্থমেসো?"

পার্থ সগর্বে বলল, "তোরাই খাবি। প্রথমে পুরি, তারপর চা, তারপর বাদাম, তারপর লাড্ডু, তারপর কফি, তারপর ডিমসেদ্ধ..."

টুপুর বলল, "আমি ডিমসেদ্ধ খাব না।"

"কেন? কেন? কেন?"

"সাদা সাদা কুসুমঅলা পোলট্রির ডিম আমার একটুও ভাল লাগে না।"

"কিন্তু এই ডিমে যা প্রোটিন ভিটামিন, দিশি হাঁস মুরগির ডিমেও তো ততটাই রে। নুন মাখিয়ে খেয়ে দ্যাখ, খারাপ লাগবে না।"

"ওই ভিটামিন তুমিই খাও।" মিতিনও সাফ সাফ জানিয়ে দিল, "আমরা বড়জোর ওই একটা করে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন। এক ডজন ডিম নয় আমি একাই মেরে দেব।"

ট্রেন ছাড়ল।

কোলে খবরের কাগজ পেতে শুরু হল আহারপর্ব।

অবনীর প্রাতঃরাশ দুটি কলা এবং গুনে গুনে সাতখানি আঙুর। অষ্টম আঙুরটি খেলে তিনি নাকি হাঁসফাঁস করবেন। বুমবুম দেড়খানা পুরিতেই ক্লান্ত, তার হাতে ফের চিপ্‌সের প্যাকেট।

খেতে খেতে আসন্ন ভ্রমণ নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিল। সারান্ডার জঙ্গলে গিয়ে টুপুররা কী করবে, সেখান থেকে আর কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, চাইবাসায় একদিন বেশি থাকা যায় কি না...।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "সারান্ডার জঙ্গলটা খুব গভীর, তাই না মিতিনমাসি?"

মিতিন বলল, "একসময়ে তো বেশ গভীর ছিল বলেই শুনেছি। এখন নাকি গাছ কেটে কেটে জঙ্গলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

জন্তুজানোয়াররাও নাকি কমে গেছে অনেক।”

সহেলি বললেন, “এ মা, আমরা তা হলে কিছু দেখতে পাব না?”

“হরিণ টরিন পাবেন।” পার্থ বলে উঠল, “আর বুনো শুয়োর। কপাল ভাল থাকলে এক-আধটা হাতি কিংবা ভালুক।”

বুমবুম গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল, “বাঘ দেখা যাবে না?”

“থাক। বাঘ দেখে কাজ নেই। বাঘ সিংহ চিড়িয়াখানাতেই দেখা ভাল।” টুপুর ফিক করে হাসল, “কিংবা অনেক দূর থেকে। বাইনোকুলার দিয়ে।”

বুমবুম ঠিক সন্তুষ্ট হল না। ঠোঁট ওলটাচ্ছে।

ঠিক তখনই পাশ থেকে একটা ভারী স্বর, “সারান্ডায় আপনাদের ক'দিনের প্রোগ্রাম?”

একসঙ্গে সবক'টা চোখ ঘুরে গেল। সামনেই প্যাসেজে এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক। এত লম্বা যে, কেমন কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলাব্যাগ। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। খড়্গপুর থেকে শেষ মুহূর্তে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, দেখেছিল টুপুর। বসার জায়গা পাননি।

ভদ্রলোক ফের বললেন, “অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের কথা শুনছি। থাকতে না পেরে নাক গলিয়ে ফেললাম।... ক'দিন থাকছেন সারান্ডায়?”

উত্তরটা পার্থ দিল, “পাঁচ-ছ'দিনের প্ল্যান আছে। দেখি চাইবাসায় গিয়ে ক'দিনের বুকিং পাই।”

“উঠছেন কোথায়?”

“এখনও ঠিক করিনি। ভাবছি থলকোবাদ কুমডি আর শশাংকবুরুতে পালা করে থাকব।”

“শশাংকবুরু নয়, শাশাংবুরু।” মিতিন পার্থকে সংশোধন করে দিল।

ভদ্রলোক বললেন, “শাশাংবুরুতে তো আপনারা থাকতে

পারবেন না। ওখানকার রেস্টহাউসটা নষ্ট হয়ে গেছে। ফরেস্ট অফিস এখন আর ওটার বুকিং দেয় না।”

“তা হলে আর কী।” পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, “থলকোবাদ আর কুমডি।”

“যদি আমার পরামর্শ নেন তো বলি, ওই থলকোবাদ কুমডি সব বাদ দিন। সোজা মেঘাতুবুরু চলে যান। চমৎকার পাহাড়ি জায়গা। থাকারও কোনও অসুবিধে নেই, ইদানীং ওখানে একটা ভাল হোটেলও হয়েছে। তোফা আরামে থাকবেন আর ওখান থেকে জিপ ভাড়া করে সকালের দিকে জঙ্গল ঘুরে আসবেন।”

পার্থ সামান্য ইতস্তত করে বলল, “কিন্তু ওখানে থাকলে তো জঙ্গলে থাকার চার্মটা পাব না। তা ছাড়া থলকোবাদের এত নাম শুনেছি, বিভূতিভূষণ কতবার থলকোবাদ গিয়েছিলেন...”

“আরে মশাই, বিভূতিভূষণের থলকোবাদ কি আর আছে! গেলে দেখবেন কত জায়গায় জঙ্গল এক্কেবারে ন্যাড়া হয়ে গেছে।”

মিতিন ভুরু কুঁচকে শুনছিল। বলল, “আপনার ওদিকটা খুব চেনা মনে হচ্ছে?”

“আমি তো প্রায় সারান্ডারই লোক।”

“তাই নাকি? তা এ-কথা তো আগে বলতে হয়।” পার্থ দারুণ উৎফুল্ল। সরে বসে জায়গা করে দিল ভদ্রলোককে, “বসুন, বসুন।”

সহেলিও চোখ বড় বড় করে ভদ্রলোককে দেখছিলেন। বললেন, “আপনি জঙ্গলে থাকেন?”

ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন, “আমি এখন থাকি খড়্গপুরে। তবে আমার ওরিজিনাল বাড়ি জামদায়। সারান্ডার জঙ্গল থেকে জামদা খুব দূরে নয়। এই ধরুন অ্যারাউন্ড তিরিশ কিলোমিটার।” আয়েশ করে সিটে হেলান দিলেন ভদ্রলোক, “একসময়ে অবশ্য জঙ্গল অনেক কাছে ছিল। ছোটবেলায় দেখেছি ভালুক টালুক এসে যেত

জামদায়। এক-দু'বার বাঘও এসেছে।"

"বলেন কী?" পার্থ টান হল, "সেই জঙ্গল গেল কোথায়?"

"বেশিরভাগ তো ব্রিটিশ আমলেই সাফ হয়ে গেছে। জামদা থেকে ন' কিলোমিটার দূরে গুয়া, সেখানে স্যার বীরেন মুখার্জির মাইন ছিল। বার্নপুরের ইস্পাত কারখানার জন্য লোহাপাথর চালান যেত গুয়ার খনি থেকে। তখনই রাস্তাঘাট তৈরির জন্য প্রচুর গাছপালা কাটা পড়েছে। আমরা যখন ছোট, জামদা তখনও ফ্রিঞ্জ এরিয়া। জঙ্গলের লাগোয়া জায়গা বলে জন্তুরা এক-আধবার দর্শন দিয়ে যেত আর কী। কত শিকারিও দেখেছি তখন। বাঘটাঘ মারতে হলে তারা আমাদের জামদাতে এসেই ঘাঁটি গাড়ত। ইন্ ফ্যাক্ট আমার বাবাও একজন দক্ষ শিকারি ছিলেন।"

ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। গল্পে গল্পে জানা গেল ভদ্রলোকের নাম মুকুল সিংহ। চাকরি করেন খড়্গপুর আই আই টি-র এক ছাত্র হস্টেলে। বিয়ে থা করেননি, ঘর ভাড়া নিয়ে একাই থাকেন খড়্গপুর টাউনে, ছুটিছাটা পড়লে জামদা চলে যান। জামদার বাড়িতে বাস করেন বাবা, ভাই, ভাইয়ের বউ আর খুদে এক ভাইপো। মুকুলবাবুর বাবা পুরুষোত্তম সিংহ বহুকাল ধরে ব্যবসা করছেন জামদায়। প্রধানত টিম্বার মার্চেন্ট, তবে কাঠ ছাড়াও আরও কিছু কারবার আছে পুরুষোত্তমবাবুর। ঠিকাদারি, ট্রান্সপোর্ট, অর্ডার সাপ্লাই ইত্যাদি। পুরুষোত্তমবাবুর ব্যবসাপত্র এখন দেখাশোনা করছেন মুকুলবাবুর ছোট ভাই বিকাশ।

আরও জানা গেল, মুকুলবাবু সাধারণত জামদা যান একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়ে। ট্রেনটা খড়্গপুর থেকে ছেড়ে টাটানগর হয়ে গুয়া যায়, ভায়া জামদা। আজ ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছিল বলে ট্রেনটা অল্পের জন্য মিস করেছেন মুকুলবাবু।

গুয়া প্যাসেঞ্জারের বিচিত্র কাহিনী শোনাচ্ছিলেন মুকুলবাবু।

একবার নাকি একপাল হাতি এসে গিয়েছিল ট্রেন লাইনে। ঝিনিকপানিতে। হইহই রইরই ব্যাপার হয়েছিল সেবার। পুলিশ এসে গেছে, শ'য়ে শ'য়ে লোকের ভিড়, ট্রেন প্যাঁ পোঁ হুইস্‌ল বাজাচ্ছে, কোনও কিছুতেই হাতিদের ভ্রূক্ষেপ নেই। টানা চার ঘণ্টা নাকি লাইন অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রইল গোটা ষোলো হাতি, তারপর কী মরজি হল, নিজেরাই হুঙ্কারটুঙ্কার ছেড়ে চলে গেল লাইন ছেড়ে।

শুনতে শুনতে টুপুরের চোখ গোল গোল, "মানুষ ট্রেন অবরোধ করে শুনেছি। হাতিও করে?"

বুমবুম খুশি খুশি মুখে বলল, "ইস্‌, আমাদের ট্রেনটাও যদি এখন হাতিরা অবরোধ করে তো খুব মজা হয়।"

অবনী নিঃশব্দে বই পড়ে চলেছেন। মুখ না তুলে মন্তব্য করলেন, "এলিফ্যান্টস আর ডেডলিয়ার দ্যান টাইগার্স।"

পার্থ টিপ্পনি কাটল, "বটেই তো, বটেই তো! বাঘকে বাগ মানানো যায়, কিন্তু হাতির সঙ্গে হাতাহাতি অসম্ভব।"

হাসি ঠাট্টা আর গল্পের মাঝে কেটে গেল বেশ খানিকটা সময়। ঝাড়গ্রাম পেরিয়ে গেছে ট্রেন, এখন মাঠঘাটের চেহারা অন্যরকম। যেদিকে তাকাও এখন শুধু এবড়োখেবড়ো রুক্ষ প্রান্তর আর লালরঙা মাটি। বেঁটে বেঁটে টিলাও দেখা যাচ্ছে ঘন ঘন, কখনও কাছে, কখনও দূরে। সরু সরু নদীনালা আসছে হঠাৎ-হঠাৎ, ঝমরঝম শব্দ তুলে তাদের টপকে টপকে যাচ্ছে ট্রেন।

দেখতে দেখতে ঘাটশিলা এসে গেল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরেই চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুকুলবাবুর, "ওই তো আমার গাড়ি, ওই তো আমার গাড়ি।"

সত্যি-সত্যিই একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ওদিকের প্ল্যাটফর্মে। লাল রং, ধ্যাড়ধ্যাড়ে চেহারা।

মুকুলবাবু ঝোলা কাঁধে উঠে দাঁড়ালেন, "তা হলে আপনারা মেঘাতুবুরুতেই উঠছেন তো?"

পার্থ গা মোচড়াল, "দেখি কী করা যায়।"

"পরামর্শটা নিলে ঠকবেন না। বেড়ানোটা অনেক আরামের হবে। থলকোবাদে তো শুনলাম ইদানীং খুব ম্যালেরিয়াও হচ্ছে। ফরেস্ট ম্যালেরিয়া একবার হানা দিলে বুঝছেনই তো..."

মুকুলবাবু ট্রেন থেকে নেমে যেতেই পার্থ মুখ বেঁকাল, "অ্যাঁহ্, ওঁর কথা শুনে আমরা জঙ্গলে থাকা ক্যানসেল করব? অত খায় না।"

মিতিন ঝুঁকে ওপাশের ট্রেনটাকে দেখছিল। বিড়বিড় করে বলল, "ভদ্রলোক কিন্তু বেশ অদ্ভুত আছেন।"

টুপুর মাথা দুলিয়ে বলল, "যা বলেছ। বড্ড বেশি গায়ে-পড়া টাইপ।"

"শুধু ওইটুকু?"

"আর কী?"

"ভদ্রলোক যদি গুলবাজ না হন তো ওঁর বাবা একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। রীতিমতো বড়লোক। অথচ বাবার ব্যবসায় না থেকে বড় ছেলে খড়্গপুরে সামান্য একটা চাকরি করেন কেন? উঁহুঁ, এটা আমার খুব স্বাভাবিক ঠেকল না।"

টুপুর টান টান হল। মিতিনমাসি কি মুকুল সিংহর মধ্যে কোনও রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেল?

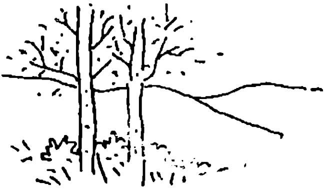

"আপনারা কি কালই ভোরে রওনা দিচ্ছেন?"

"ইচ্ছে তো সেরকমই ছিল। কিন্তু বুকিং পেলাম না যে। কাল পরশু দু'দিনই থলকোবাদ ফুল। একটাও রুম খালি নেই।"

"হুম। এই সময়টায় জঙ্গলে একটু ভিড় থাকে বটে। শীতকালেও লোকজন হয়, তবে এতটা নয়। এখন তো ছেলেমেয়েদের সব পরীক্ষা শেষ, তাই খুব টুরিস্ট আসছে।"

"আপনার হোটেলও তো ভর্তি?"

"পুরা ভর্তি। আপনারা আর একটু লেট করে এলে জায়গা দিতে পারতাম না।"

শ্রীকৃষ্ণ হোটেলের দোতলার বারান্দায় বসে হোটেল-মালিকের সঙ্গে কথা বলছিল পার্থ। এখন বসে বসে গল্প করা ছাড়া উপায়ও নেই। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বাজ পড়ছে কড়াত কড়াত, বিদ্যুতের চমকে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে আকাশ। হাওয়াও বইছে জোর, অনেকটা ঝড়ের মতো। ভাগ্যিস বারান্দাটা ঢাকা, নইলে এখানে বসা যেত না।

টুপুরেরও ঘরে মন টিকছিল না। সেও এসে বসেছে বারান্দায়। মেজাজটা তার টকে গেছে। ভেবেছিল আজ বিকেল সন্ধেটা চাইবাসার রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে মিতিনমাসির সঙ্গে। বৃষ্টি সব মাটি করে দিল!

হোটেল-মালিকটা বাঙালি। নাম অনন্ত চ্যাটার্জি। বাঙালি বোর্ডার দেখে নিজে থেকেই আলাপ জমাতে এসেছেন, খোঁজখবর

নিচ্ছেন পার্থদের। অনন্তর কথায় সামান্য পশ্চিমি টান আছে। সম্ভবত দীর্ঘকাল চাইবাসায় থাকার কারণেই।

টুপুররা চাইবাসা পৌঁছেছে বিকেলবেলায়। জামশেদপুর থেকে সাড়ে বারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে রওনা দিয়েছিল। মাত্র পঁয়ষট্টি কিলোমিটার রাস্তা, ভেবেছিল গাড়িতে ঘণ্টা দেড়-দুই লাগবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়ল প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশি। গোটা পথটাই বেজায় খারাপ, খানাখন্দে ভরা। সামলেসুমলে চলেও একবার টায়ার পাংচার হল। গোদের ওপর বিষফোড়া, বুমবুম বারতিনেক বমি করল গাড়িতে। সকাল থেকে চিপ্স চিবিয়েছে, জামশেদপুরে নেমে একটা কোল্ডড্রিংকসও খেয়েছিল, জোর করে তাকে খানিকটা ভাতও গেলানো হয়েছিল হোটেলে। দফায় দফায় সব উগরে দিল বুমবুম। গোটা পথ নেতিয়ে পড়ে রইল মা মাসির কোলে। একে গাড়ির ঝাঁকুনিতে সকলেরই কোমরের বল-বেয়ারিং খুলে যাওয়ার দশা, তার সঙ্গে অসুস্থ বাচ্চা, চাইবাসায় এসে হোটেল খোঁজাখুঁজির ঝকমারিতে আর যায়নি কেউ। বড় রাস্তার ওপর শ্রীকৃষ্ণ হোটেলের হোর্ডিং দেখেই ঢুকে পড়েছে তৎক্ষণাৎ।

এখন অবশ্য দেখছে হোটেলটা মন্দ নয়। অনন্তবাবুর হোটেলে দিব্যি একটা ঘরোয়া পরিবেশ আছে। রুমগুলোও বেশ পরিচ্ছন্ন। জনা তিন-চার কর্মচারী সর্বক্ষণ ছোটাছুটি করছে ঘরে ঘরে। শুধু এই বৃষ্টিটুকু না এলে টুপুরের আর কোনও আফসোস ছিল না। সারাটা পথ ঝকঝক করছিল রোদ্দুর, রাস্তায় চাকা বদলানোর সময়ে গা হাত পা তো ঝলসে যাচ্ছিল, হঠাৎ চাইবাসাতেই যে কোত্থেকে অনাসৃষ্টি মেঘটা এল?

পাহাড়ি জায়গায় অবশ্য এরকম হয়, টুপুর জানে। গত বছর ক্লাস সেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর এই সময়টাতেই গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিল তারা। সেখানেও এরকম হঠাৎ বৃষ্টি, হঠাৎ

রোদ্দুর। তবে চাইবাসার পাহাড় আর হিমালয় কি এক? না কি সব পাহাড়েরই এক নিয়ম? সে কী বা ছোট, কী বা বড়!

পার্থ সিগারেট আনতে ঘরে উঠে গিয়েছিল। ফিরে এসে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল অনন্তবাবুকে। অনন্ত হাতজোড় করে বললেন, "ধন্যবাদ। আমার চলে না।"

"খুব ভাল করেছেন, বাজে নেশাটা করেননি।" বলতে বলতে পার্থ ধরিয়েছে সিগারেট। বারান্দায় খানচারেক বেতের সোফা, মধ্যিখানে কাচের টেবিল। টিউবের আলোয় ঝলমল করছে জায়গাটা। যেন মিনি লাউঞ্জ। কয়েকটা বাঁধানো ছবিও ঝুলছে দেওয়ালে। পাহাড় জঙ্গল জলপ্রপাত...।"

একটা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে পার্থ বলল, "ওটা কোন ফল্‌স?"

"হুড্রু।"

"রাঁচির?"

"হ্যাঁ। বর্ষাকালে তোলা তো, জল উপচে পড়ছে।"

"এদিকে কাছেপিঠে কোনও ফল্‌স নেই?"

"হুড্রুর মতো নেই। তবে আছে। হিরনি ফল্‌স। কাল পরশু তো ফ্রি আছেন আপনারা, ওখান থেকে ঘুরে আসুন না।"

টুপুরের মনটা নেচে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "হিরনি ফল্‌স এখান থেকে কদ্দূর।"

"কত আর, চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার হবে। বাস যায়, গাড়ি ভি যায়।"

মিতিন বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "রুটটা আমি জানি। হেসাডি বলে একটা আদিবাসীদের গ্রাম আছে, সেখানে নেমে দু'-তিন কিলোমিটার হাঁটতে হয়।"

"বিলকুল ঠিক। কাল সারাদিন ওখানেই তবে আউটিং করে

আসুন। যদি বলেন তো লাঞ্চও প্যাক করে দিতে পারি।”

“এখানে কী কী দেখার আছে?”

“চাইবাসা ছোট টাউন, এখানে আর কী দেখবেন।” অনন্ত মৃদু হাসলেন, “কয়েকটা বড় বড় তালাও আছে...এখানে তালাওকে বলে বাঁধ। রানিবাঁধ, শিববাঁধ, মধুবাঁধ...। আপার চাইবাসাও সুন্দর। মাঠ বাগান গভর্নমেন্ট বাংলো...। হ্যাঁ, মুংগালাল রুংটা গার্ডেন কিন্তু জরুর দেখবেন।”

“কাল হিরনি ফল্‌স ঘুরে এসে এত সব দেখা যাবে?”

“জলদি জলদি ফিরলে দেখতে পাবেন।” অনন্ত ফের হাসলেন, “তাড়াহুড়োর কী দরকার, আপনারা তো পরশু দিনটাও আছেন।”

মিতিন ঠোঁট টিপে বলল, “আমার একটু অন্যরকম প্ল্যান ছিল। চাইবাসা থেকে সারান্ডা তো প্রায় সওয়াশো কিলোমিটার পথ, আপনাদের এখানে রাস্তার হালও তো খুব সুবিধের নয়, তাই ভাবছিলাম জার্নির গোটা ধকলটা এক দিনে না নিয়ে যদি পরশু সকালে বেরিয়ে পড়ি, এবং রাতে মেঘাতুবুরুতে থেকে যাই...”

পার্থ ভুরু কুঁচকোল, “হঠাৎ মেঘাতুবুরুতে হল্ট করার শখ জাগল যে? মুকুলবাবুর ভূত ঘাড়ে চাপল নাকি?”

“মোটেই না। আমি কলকাতা থেকেই ভেবে রেখেছিলাম চান্স পেলে একটা রাত অন্তত মেঘাতুবুরুতে থাকব। ওখানে চমৎকার একটা সানসেট পয়েন্ট আছে। তা ছাড়া মেঘাতুবুরু থেকে গোটা সারান্ডা রেঞ্জটাকেই নাকি ছবির মতো দেখা যায়।”

“আপনার আইডিয়াটা খারাপ নয় ম্যাডাম।” অনন্ত সমর্থন জানালেন মিতিনকে, “মেঘাতুবুরু থেকে বরং পরদিন সকালে টুক করে জঙ্গলে ঢুকে পড়বেন।”

পার্থ আর গাঁইগুই করল না। উঠে পড়েছে কাঁধ ঝাঁকিয়ে। অলস পায়ে চলে গেল সহেলিদের ঘরে। অ্যাম্বাসাডরের ঝাঁকুনিতে

সহেলির কোমরে একটা খটকা লেগেছে, তিনি এখন পেনকিলার খেয়ে শায়িত। অবনী ঘোরাঘুরি করছেন আমাজনের পাড়ে।

বৃষ্টি এখনও থামেনি। বজ্র-বিদ্যুতের প্রকোপ কমেছে, তবে ধারাবর্ষণ চলছে একই দাপটে। টুপুর ছোট্ট একটা হাই তুলে বলল, "তুৎ, কিচ্ছু করার নেই এখন। যাই, আমিও শুয়ে পড়ি গিয়ে।"

অনন্ত হা হা হেসে উঠলেন, "মনখারাপ করছ কেন? দ্যাখো না, বৃষ্টি ধরল বলে। তারপরই আকাশ একদম ঝকঝক করবে।"

"অসম্ভব। এই বৃষ্টি সারারাতেও থামার নয়।"

"আর আধা ঘণ্টা দ্যাখো। এখানকার বৃষ্টির নেচারটাই আলাদা। চৈত্র মাসটায় প্রায়ই এরকম হয়। বিশেষ করে দিনের বেলা যদি বেশি গরম থাকে।"

মিতিন টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে ওলটাচ্ছিল। রেখে দিয়ে বলল, "আপনি এখানে কতদিন আছেন অনন্তবাবু?"

"জন্ম থেকে।"

"আপনাদের বরাবরই হোটেলের ব্যবসা?"

"না। আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস আলাদা। বাপ-ঠাকুরদাদার ফার্নিচারের বিজনেস ছিল, আমিই বিপথে এসেছি।"

"কেন?"

"রাঁচি থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করেছিলাম। বিদ্যেটা কাজে লাগানোর সাধ হল, বাবাও কিছু টাকা দিলেন, আমিও নেমে গেলাম নতুন ধান্দায়। ফার্নিচারের দোকান অবশ্য আছে এখনও। ফরেস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে যেখানে বড় রাস্তায় পড়লেন, ওই চকটায়।"

"তার মানে আপনারা এখানে কয়েক পুরুষের বাসিন্দা?"

"তিন পুরুষের। আমার ঠাকুরদাদা চলে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। নোকরি করতেন গুয়ায়। আয়রন মাইনে। একবার এক

লালমুখো সাহেবের সঙ্গে কী ঝগড়া হয়েছিল, নোকরি ছেড়ে দিয়ে সোজা এসে উঠলেন চাইবাসায়। লেখাপড়ায় খুব ইন্টারেস্ট ছিল ঠাকুরদাদার, এখানে একটা স্কুল বানিয়েছিলেন। চাইবাসায় তো বহুৎ বাঙালি আছে, তাদের জন্য বাংলা মিডিয়াম স্কুল। এখন অবশ্য স্কুলটা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে।"

মিতিন শেষ কথাগুলো যেন শুনল না। বলল, "আপনি যখন জন্ম থেকেই এখানে, তখন নিশ্চয়ই এদিককার পুরনো লোকজনদের সব চেনেন?"

"জরুর।"

"পুরুষোত্তম সিংহকে চেনেন?"

"জামদার সিংহ? ভালই চিনি।" বছর চল্লিশের গাঁট্টাগোট্টা চেহারার অনন্তর চোখে কৌতূহল, "আপনি পুরুষোত্তম সিংহকে চিনলেন কী করে?"

"ট্রেনে আসতে আসতে ওঁর এক ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। মুকুল সিংহ।"

"ও। এই মুকুলের কথাই বলছিলেন আপনার হাজব্যান্ড?"

"হ্যাঁ। মুকুলবাবুর মুখে শুনছিলাম ওঁর বাবা নাকি এখানকার খুব নামী ব্যবসায়ী।"

"শুধু ব্যবসায়ী? পুরুষোত্তম সিংহ একটি ক্যারেক্টার ম্যাডাম। নামেও সিংহ, কাজেও সিংহ। এখন বয়স হয়ে জোশ কমেছে, কিন্তু এককালে কত যে খুন-জখম করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। যার সঙ্গে বনল না তাকেই ফটাস। লাশ ভি হাপিস। আস্ত মানুষটাই নাকি বেমালুম ভ্যানিশ করে যেত, বাবা ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি।"

"তাই বুঝি? তা মুকুলবাবুকে তো মোটামুটি নিরীহই মনে হল।"

"মুকুল সিংহ তো রাবণের বেটা রামচরণ।"

"মানে?"

"বাপের একেবারে উলটো। অযোগ্য। অপদার্থ। না-লায়েক। ছোটবেলায় একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলেন মুকুলবাবু, পুরুষোত্তম সিংহ তাঁকে পাটনা থেকে ধরে আনেন। লেখাপড়াতেও তেমন মাথা ছিল না। বাপ হয়রান হয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দেন খড়্গপুরে, এক বোনের বাড়িতে। সেখানেই মানুষ হয়েছেন মুকুলবাবু। তবে ওঁর ছোট ভাইটা বহুত সেয়ানা। বিলকুল বাপ কা বেটা। চাইবাসাতেই হস্টেলে থেকে পড়ত বিকাশ, আমার থেকে এক ক্লাস জুনিয়ার ছিল। তখন থেকেই তো দেখেছি, মাথা খুব সাফ। বহুত সাহস ভি আছে বিকাশের। এখন দশ হাতে বাপের বিজনেস বাড়াচ্ছে।"

"তা দাদা বিজনেস নেই কেন? ছোট ভাই কি দাদাকে আউট করেছে?"

"না ম্যাডাম। মুকুলবাবুর বিজনেস করার ক্ষমতাই নেই। খুন এক হলেও সব ভাই কি এক টাইপের হয়? যে বেশি কাবিল, সেই ব্যবসা সামলাবে, এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম। তা ছাড়া মুকুলবাবুর আরও কিছু প্রবলেম আছে।"

"কী প্রবলেম?"

অনন্ত কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন, "আরে ছাড়ুন ম্যাডাম। সবাই আমরা এক মুলুকের লোক, কী হবে মিছিমিছি নিন্দে করে। কোথায় কী উড়ো কথা শুনলাম তাই দিয়ে একজনের বদনাম করা ঠিক হবে না।"

"কেন, কী শুনেছেন?"

"বললাম তো, ছাড়ুন।" অনন্ত উঠতে উঠতে টুপুরকে বললেন, "এই যে মেয়ে, দ্যাখো বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে কি না।"

বারান্দার ঘেরাটোপ তুলে দিয়ে টুপুর হাঁ। কোথায় বৃষ্টি, আকাশে দিব্যি তারা ফুটে গেছে। উত্তরে একটু একটু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বটে,

তবে তা অনেক দূরে, আকাশের একেবারে শেষ প্রান্তে।

টুপুর প্রায় নেচে উঠল, "মিতিনমাসি, এখন বেরোবে?"

অনন্ত বললেন, "যান না, ঘুরে আসুন। চাইবাসা বহুৎ পিসফুল জায়গা। সবে সাড়ে সাতটা বাজে, আরামসে ন'টা-দশটা অবধি বেড়াতে পারবেন।"

অনন্ত চলে যাওয়ার পরও মিতিন বসে আছে চুপটি করে। টুপুর ঠেলল তাকে, "কী গো, চলো।"

মিতিন অন্যমনস্কভাবে বলল, "হুঁ, যাই। ঘরে গিয়ে দ্যাখ তোর বাবা-মা বেরোবে কি না।"

নগর পরিক্রমার নাম শুনেই সহেলির কোমরের ব্যথা উধাও। অবনী বেরোলেন না, বুমবুম ঘুমোচ্ছে অকাতরে, পার্থ তার কাছে একা থাকে কেন! বরং টুপুররা ঘুরতে গেলে দুই ভায়রাভাই মনের সুখে দাবা খেলতে পারবে।

বাইরেটা এখন ভারী মনোরম। ঝড়-বৃষ্টি এসে দিনের উত্তাপটাকে যেন শুষে নিয়ে গেছে। স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। বসন্তের হাওয়া, কিন্তু ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। শরীর জুড়িয়ে যায়। আকাশে চাঁদও উঠেছে। আধখানা চাঁদ। আর দিনসাতেক পরেই পূর্ণিমা।

বড় রাস্তা ধরে হাঁটছিল টুপুররা। খানিক উত্তরে যেতেই এক জমজমাট জায়গা। সার সার অ্যাম্বাসাডর আর জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ভাড়ার গাড়ি। কালকের হিরনি যাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকজন জিপের ড্রাইভারের সঙ্গে দরকষাকষি করল মিতিন। শেষমেশ বয়স্ক একজনকে পছন্দ হল, তাকেই গাড়ি নিয়ে সকাল ন'টা নাগাদ চলে আসতে বলল শ্রীকৃষ্ণ হোটেলে। তারপর সোজা বাজার। কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার সময় তাড়াহুড়োতে অনেক কিছু নেওয়া হয়নি, মনে করে করে জিনিসগুলো কিনল মিতিন। মোমবাতি, দেশলাই, দড়ি, ব্লেড, ব্যাটারি, মশা তাড়ানোর ধূপ, ডেটল, ব্যান্ড-এড আর

কয়েকটা ওষুধ। বুমবুমের জন্য কালার বুকও নিল একটা, সঙ্গে এক বাক্স রংপেনসিল। পাহাড় জঙ্গল দেখে যদি বুমবুমের ছবি আঁকার সাধ জাগে। ক্যামেরার ফিল্‌ম কিনল তিন রোল। পার্থ ভরবে ক্যামেরায়।

সহেলি বললেন, "চল, এবার একটু শাড়ি-জামার দোকানে যাই।"

মিতিন আকাশ থেকে পড়ল, "কেন? শাড়ি জামা শর্ট আছে?"

"আহা, চাইবাসার কিছু স্মৃতি নিয়ে যেতে হবে না?"

টুপুর হাসতে হাসতে বলল, "মা যেখানেই বেড়াতে যায়, সেখানকার শাড়ি কেনে। কটকে গেলে কট্‌কি, বাঙ্গালোর গেলে বাঙ্গালোর সিল্ক, তামিলনাড়ুতে কাঞ্জিভরম..."

মিতিন হেসে কুটিপাটি, "এখানে তুই চাইবাসার সিল্ক খুঁজবি নাকি বড়দি? ওরকম কিছু কিন্তু পাওয়া যায় না।"

বোন আর মেয়ের হাসিও পুরোপুরি নিরস্ত করতে পারল না সহেলিকে। তিনি ঘুরে ঘুরে স্থানীয় হাতের কাজ কিনলেন কিছু। আদিবাসীদের হাতে তৈরি কাঠের পুতুল, ছোট ছোট মুখোশ...। কলকাতা গিয়ে একে-তাকে উপহার দিতে হবে তো! প্রায় প্রতিটি বস্তুই কলকাতায় পাওয়া যায়, চাইবাসার থেকে শস্তাও, তবুও।

ফেরার পথে একটা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেল টুপুররা। কলকাতার মতো স্বাদ নয়, তবু মন্দ কী।

হোটেলে এসে টুপুররা দেখল পার্থ আর অবনী তখনও দাবাযুদ্ধে মত্ত। বুমবুম উঠে পড়েছে, সে এখন লাউঞ্জের মতো জায়গাটায় বসে গল্প করছে হোটেলের এক কর্মচারীর সঙ্গে। লোকটা আদিবাসী, বছর আটাশ-তিরিশ বয়স। গোল মুখ, গায়ের রং চকচকে কালো, চোখের মণি দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল। টুপুররা হোটেলে পা রাখার পর থেকেই লোকটা সর্বক্ষণ হাসিমুখে ফাইফরমাশ খাটছিল টুপুরদের।

নামটাও বেশ মিষ্টি। ধানুয়া। সে কথা বলে ভাঙা ভাঙা বাংলায়। তবে বুমবুমের সঙ্গে গল্প করতে তার খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। কারণ সে শুধু শুনে যাচ্ছে, বুমবুমই বকছে একতরফা।

টুপুরদের দেখেই বুমবুম বলে উঠল, "জানো, ধানুয়াটা কী বোকা! কীসব বলছিল!"

মিতিন কড়া গলায় ধমক দিল, "ও কী ভাষা বুমবুম? ধানুয়া তোমার থেকে বড় না? ধানুয়াদাদা বলো। আর বোকা বলছ কেন? কত করে না শিখিয়েছি, বড়দের বোকা বলতে নেই!"

বুমবুম কাঁচুমাচু মুখে বলল, "সরি মা। আর বলব না।"

মিতিন সামান্য প্রীত হল। জিজ্ঞেস করল, "কী বলছিল ধানুয়াদাদা?"

"ওদের গ্রামে নাকি একটা সাধু এসেছে। সাধুবাবা নাকি যাতেই হাত দেয় সেটাই মিষ্টি হয়ে যায়।"

টুপুর বলল, "ওমা, সে আবার কী?"

রুপোর মতো সাদা দাঁত বার করে হাসল ধানুয়া, "হাঁ দিদি। মধুবাবা যাতে হাত দিবেন, সেইটাই মিঠা বনে যাবেন।"

"মানে?"

"ধরো পানিতে হাত দিল, পানি মিঠা। তিতা ধরল, তো তিতা মিঠা বনে গেল।"

"বুঝলাম না।"

"আমি বুঝেছি।" মিতিন বলল, "ওদের গ্রামে একজন সাধুবাবা এসেছেন, তিনি যাতেই হাত ছোঁয়াচ্ছেন সেটাই মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। কী ধানুয়া, ঠিক বলেছি?"

ধানুয়া মাথা দুলিয়ে বলল, "সাধুবাবা না দিদি, মধুবাবা।"

"বেশ। নয় মধুবাবাই হল। তা এই মধুবাবা এসেছেন কোত্থেকে?"

"জানি না দিদি। কেউ বলে হিমালয় থেকে, কেউ বলে সাগর থেকে। মধুবাবার ছুঁয়ে দেওয়া মিঠা পানিতে সবার সব বিমারি সেরে যাচ্ছে।"

টুপুর অবিশ্বাসের সুরে বলল, "তুৎ, যতসব গাঁজাখুরি গল্প।"

"ওভাবে বলতে নেই টুপুর। সহেলি চোখ পাকালেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের কতরকম অলৌকিক শক্তি থাকে তুমি জানো? ওই শক্তি তাঁরা পান যোগবলে। কঠোর তপস্যা করে।"

"যোগবলটা কী মা?" টুপুর ফিক করে হাসল, "ফুটবলের মতো কিছু?"

"ফাজলামি কোরো না। সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে ঠাট্টা করলে পাপ হয়।"

টুপুর ফের কিছু বলতে যাচ্ছিল, মিতিন হাত তুলে থামাল তাকে। ধানুয়াকে প্রশ্ন করল, "তোমার গ্রামটা কোথায়?"

"করমপদা।"

"সেটা কোথায়?"

"মেঘাতুবুরুর পরে। জঙ্গলে। আপনারা তো থলকোবাদ যাচ্ছেন, ওই পথেই পড়বে।"

"তাই নাকি? থলকোবাদ থেকে করমপদা কত দূর?"

"বেশি নয় দিদি, মাত্র আট মাইল। রোজ কত দূর দূর থেকে লোক আসছে সেখানে। মধুবাবাকে দেখতে।"

সহেলি বললেন, "আমরাও তো তা হলে একবার করমপদা ঘুরে যেতে পারি। কত অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি করলাম, হাঁটুর ব্যথা তো পুরোপুরি সারছে না। যদি মধুবাবার কৃপায়..."

মিতিন বলল, "যাওয়াই যায়।"

টুপুর অবাক চোখে তাকাল, "মিতিনমাসি, তুমিও এসব বিশ্বাস করো?"

হালকা হাসল মিতিন, "আহা, একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো হবে।"

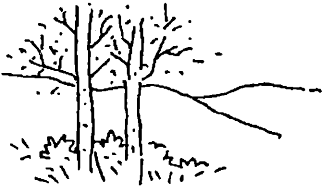

চাইবাসা থেকে মেঘাতুবুরু যাওয়ার রাস্তাটাও মোটেই ভাল নয়। টাউনের সীমানা ছাড়ানোর পর প্রথম তিন-চার মাইল তাও চলনসই ছিল, কিন্তু এখন যা শুরু হয়েছে তাকে এককথায় বলে অকহতব্য। একে মালভূমি অঞ্চলের ঢেউ-তোলা পথ, তায় রাস্তা জুড়ে ইয়া ইয়া গর্ত। উঁহুঁ, গর্ত নয়, গহ্বর। কোথাও কোথাও তো পিচের চিহ্নমাত্র নেই, খোয়া আর স্টোনচিপ্স ছড়িয়ে রয়েছে রাস্তাময়। আর ধুলো কী, বাপ্স! জিপের জানলার কাচ একটু সরল কি সরল না, অমনই লাল লাল গুঁড়ো ঝাপটে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। কাল হিরনি যাওয়ার রাস্তা এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

সালোয়ার-কামিজের ওড়না নাকে চেপে আছে মিতিন। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা এখানে গাড়ি চালান কী করে? শক অ্যাবজর্বার বসে যায় না?"

জিপ-চালকের নাম নজরুল হোসেন। বছর ষাটেক বয়স। চাইবাসাতেই বাড়ি, একসময়ে দীর্ঘকাল ঝাড়গ্রামে ছিলেন, কথা বলেন ঝরঝরে বাংলায়। নজরুলের জিপেই কাল হিরনি ফল্স গিয়েছিল টুপুররা, তখনই নজরুলের সঙ্গে বেশ ভাব জমে গেছে টুপুরদের। ধারা সরু হলেও জঙ্গল জঙ্গল পরিবেশে হিরনি জলপ্রপাত টুপুরদের মন্দ লাগেনি। কাছে হেসাডি গ্রামটিও পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর। তবে সবথেকে বেশি ভাল লেগেছে নজরুলকে। মানুষটি ভারী রগুড়ে, মজার মজার কথা বলেন। তাঁর ভাষাতে সর্বক্ষণই গাড়ি আর গাড়ির কলকব্জার উপমা।

প্রকাণ্ড এক গাড্ডা দক্ষ হাতে কাটিয়ে নিতে নিতে নজরুল বললেন, "শুধু গাড়ি কেন দিদি, আমাদের বডির শক অ্যাবজর্বারগুলোর কথাও ভাবুন। পাঁজরার স্প্রিং পাত্তিগুলো তো কবেই বসে গেছে। এখন নাটবল্টু খুলে খুলে পড়ার দশা। এই রাস্তায় আর এক-দু'বছর টানতে হলে আমার ইঞ্জিনই পুরো বসে যাবে।"

পার্থ সামনের সিটে, নজরুলের পাশে। সে টিপ্পনি কাটল, "মেঘাতুবুরু অবধি আমাদের ইঞ্জিনও ঠিকঠাক থাকবে তো?"

সহেলি তেতো মুখে বললেন, "এসব রাস্তাঘাট সারানো হয় না কেন? গাড়িঘোড়া তো দেখছি এদিকে কম চলে না!"

"আবেদন-নিবেদন তো চলছে দিদি। গভর্নমেন্টও ভাবনাচিন্তা করছে।" নজরুলের ফের সরস উক্তি, "তবে নতুন স্টেট, নতুন সরকার... এখনও ভাল করে পিকআপ নেয়নি।"

টুপুর বলে উঠল, "এটা তো এখন আর বিহার নয়, ঝাড়খণ্ড। তাই না?"

"হুঁ।" মিতিন বলল, "ঝাড়খণ্ড মানে কী বল তো?"

"কী?"

"ঝাড় মানে জঙ্গল, বা ঝোপ। ঝাড়খণ্ড মানে জঙ্গলময় স্থান। এদিকে সর্বত্রই একসময়ে জঙ্গল ছিল। গ্রাম শহর যা গড়ে উঠেছে, সব কিন্তু এই জঙ্গল কেটে কেটে। এখানকার নামগুলোতেও তাই দেখবি জঙ্গলের ছাপ।"

পার্থ বলল, "যেমন শালবনি, মহুলবনি, কেঁদবনি, কুরচিবনি..."

মিতিন বলল, "ডালকাটি, হাতিয়াশোল, বাঘুয়াশোল, শিয়ালা..."

পার্থ বলল, "ভালুকনাচা, ভালুকবিঁধা, বাঘমারি, বাঘমুণ্ডি..."

"থাক, থাক, হয়েছে।" অবনী থামালেন দু'জনকে, "খুব তো নাম আওড়াচ্ছ, ঝাড়খণ্ডের টোপোগ্রাফি জানো? ইতিহাস?"

পার্থ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "পড়েছি একটু-আধটু। মানভূম ধলভূম সিংভূম বীরভূম ভঞ্জভূম আর রাঁচির খানিকটা পার্ট— এই অঞ্চলটাকে এককালে ঝাড়খণ্ড বলা হত। ভঞ্জভূম চলে গেছে ওড়িশায়। ধলভূমের মেজর পার্ট, মানভূমের কিছুটা, সিংভূম আর রাঁচি ছিল বিহারে, এখন সেটাই ঝাড়খণ্ড স্টেট। বাকিটা আছে আমাদের বেঙ্গলে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া তো মানভূমেরই অংশ। বাই দা বাই, বীরভূম মানে কিন্তু বীরপুরুষদের ভূমি নয়, বীর মানে অরণ্য। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই এদের ভেঙে ভেঙে এক-একটা স্টেটে গুঁজে দিয়েছিল।

"অনেকটাই ঠিক বলেছে, তবে পুরোটা নয়।" অবনী মাথা দোলালেন, "ঝাড়খণ্ডের অতীত কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। ওই ভাগগুলো হয়েছিল ব্রিটিশরা এখানে পুরোপুরি রাজত্ব কায়েম করার আগেই। সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। পলাশির যুদ্ধের পরে, সেভেনটিন সিক্সটিফাইভে। বাংলা বিহার ওড়িশার নবাব নাজম্-উদ্-দৌল্লা পুরো ঝাড়খণ্ড অঞ্চলটাকেই তুলে দিয়েছিলেন কোম্পানির হাতে। ইচ্ছেমতো খাজনা তোলো, আর ভোগ করো। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের মানুষ দারুণ স্বাধীনচেতা। তারা বাইরের মানুষদের বলত দিকু। হাজার হাজার বছর ধরে তারা এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করছে, খেতে না পেয়ে মরে যাবে, তবু তারা দিকুদের শাসন মানবে না। আদিকাল থেকে তারা এখানকার বাসিন্দা বলেই তো তাদের আমরা বলি আদিবাসী। তা তখন ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের ছিল অনেক রাজা। ওই ভূমগুলো বলছিলে, ওইসব ভূমেই তখন কোনও-না-কোনও রাজার অখণ্ড প্রতাপ। তাঁরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ট্যাক্স তো দিলেনই না, উলটে শুরু হয়ে গেল কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ। সাহেবদের কামান বন্দুকের সামনে সোজাসুজি লড়তে পারবেন না বলে গেরিলা ফাইট করতেন

রাজারা। এই রাজাদের সঙ্গে কোম্পানির মোট কত বছর যুদ্ধ চলেছিল, জানো? সতেরোশো সাতষট্টি থেকে আঠারোশো পঞ্চান্ন, মানে প্রায় নব্বই বছর। ধলভূমগড়ের এক রাজা জগন্নাথ ধল তো টানা আট বছর লড়াই চালিয়েছিলেন, নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিলেন কোম্পানির। শেষপর্যন্ত অবশ্য জগন্নাথ ধলকে সারেন্ডার করতে হয়। কোম্পানিকে বার্ষিক চার হাজার দুশো সাতষট্টি টাকা খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। সালটা ছিল সতেরোশো চুয়াত্তর। এবং তখন থেকেই ঝাড়খণ্ড রিজিয়ানে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা শুরু...”

অবনীর কথায় ছেদ পড়ল। টুপুর আচমকা চেঁচিয়ে উঠেছে, “দ্যাখো, দ্যাখো, ওই মোটরসাইকেলটা কীভাবে আসছে!”

একসঙ্গে সব চোখ ঘুরে গেল পিছনে। সত্যিই একটা মোটরসাইকেল তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে। খানাখন্দর পরোয়া নেই, লাফিয়ে লাফিয়ে গর্ত পার হচ্ছে। কিছু বোঝার আগেই বিশ্রী ধুলো উড়িয়ে টুপুরদের জিপকে অতিক্রম করে চলে গেল। পিঠে দুই আরোহী, দু’জনেরই মাথা-মুখ হেলমেটে ঢাকা।

সহেলি শিউরে উঠে বললেন, “এভাবে কেউ চালায়! এক্ষুনি অ্যাক্সিডেন্ট করবে।”

টুপুর বলল, “এই মোটরসাইকেলটাকে একটু আগে চাইবাসায় দেখলাম না? সিনেমা হলের সামনে?”

পার্থ বলল, “তুই বুঝলি কী করে সেইটাই এটা?”

“ওটাও টুকটুকে লাল ছিল, গায়ে একটা ব্লু বর্ডার।”

পার্থ হেসে ফেলল, “ওই রঙের একটাই মোটরসাইকেল আছে বুঝি?”

“না গো, ওটাতেও দু’জন লোক ছিল। একজন বসে ছিল মোটরসাইকেলে, আর একজন এস-টি-ডি বুথে ঢুকল। তুমি যখন

সিগারেট কিনতে নামলে, তখন।”

পার্থ জোরে হেসে উঠল, “তাতেও কিস্‌সু প্রমাণ হয় না। এবং তুমি তোমার মাসির যতই চেলি বনার চেষ্টা করো, তোমার হবে না।”

বুমবুম পার্থর পাশ থেকে দু’ হাত উঁচু করে কাঁচকলা দেখাল টুপুরকে।

অবনী ছটফট করছিলেন। জিপে বসে বই পড়ার উপায় নেই, ঝাঁকুনির ঠেলায় ঘুমিয়ে পড়াও অসম্ভব, তাই এখন তাঁকে বক্তৃতায় পেয়েছে। অবনীর এমনটাও হয় মাঝে মাঝে, তখন তাঁকে থামিয়ে রাখা দুষ্কর। কলেজের অভ্যেসের মতো টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ননস্টপ বকে যাবেন, বাধা পড়লেই মুখ হাঁড়ি।

অসহিষ্ণু স্বরে অবনী বললেন, “ছাড়ো তো ওই মোটরসাইকেল। যা বলছি শোনো। তা সেই ঝাড়খণ্ড...”

টুপুর কাতর মুখে বলল, “বাবা প্লিজ, বইয়ে পড়ে নেব।”

“বইয়ে কী আছে? কিচ্ছু নেই। আছে অচল সিংহের নায়েক বিদ্রোহের কথা? কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির কাহিনী পাবি তোর বইয়ে? কিংবা মাধব সিংহের বীরত্বের গল্প? জমিদার দুর্জন সিংহ কীভাবে অম্বিকানগর আর সুপুরে কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তার কথা তোর কোন ইতিহাস বইয়ে আছে? এই সিংভূমে একটা কোল-বিদ্রোহ হয়েছিল সে-খবরই বা ক’জন জানে?”

পার্থর স্বরও করুণ, “এই সবক’টা গল্পই এখন শুনতে হবে অবনীদা? আমরা কি এখন একটু প্রকৃতি দেখতে পারি না?”

সহেলি বললেন, “হ্যাঁ, সেই ভাল। তুমি একটু ক্ষ্যামা দাও।”

অবনীর মুখ পলকে গম্ভীর।

বাইরে এখন নিসর্গ বলতে তেমন কিছু নেই, তবু তাকিয়ে থাকতে

বেশ লাগে। রাস্তার দু'পাশেই এবড়োখেবড়ো মাঠ, গাছপালা খুবই কম। কিন্তু এই রুক্ষতারও যেন একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। অনেক দূরে মেঘের মতো পাহাড় দেখা যায়, সম্ভবত ওদিকটাই সারাণ্ডা। মাঝে-সাঝে পথের ধারে গাছের সংখ্যা বাড়ছে একটু, কমেও যাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট বসতি আসছে, শুকনো চেহারার গ্রামগুলোকে পেরিয়ে গেলেই আবার রুখসুখু প্রান্তর।

হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ছে শিমুল পলাশ। পাতা দেখা যায় না, ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে গাছগুলো। এত ঘন লাল যে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

পার্থ উল্লসিত হয়ে বলল, "এই গাছগুলোকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তোর কি একটা গান মনে পড়ছে টুপুর?"

"কী গান বলো তো?"

মিতিন বলল, "আমি বলব?"

"বলো।"

"লাল পাহাড়ির দেশে যা,
রাঙামাটির দেশে যা,
হিথায় তোরে মানাইছে না রে,
ইক্কেবারে মানাইছে না রে।"

"ঠিক। ইক্কেবারে ঠিক। গানের কথাগুলো ফ্যান্টাস্‌টিক। এমন টকটকে লাল ফুল কি যেখান-সেখানে মানায়? এই লাল মাটির দেশ ছাড়া?"

মিতিন গুনগুন করে গেয়ে উঠল গানটা। টুপুর সহেলি গলা মিলিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পার্থও। বুমবুম হাততালি সহকারে যোগ দিল কোরাসে। প্রবীণ নজরুল হোসেনের মুখও খুশিতে ভরপুর। তিনিও স্টিয়ারিং হাতে মাথা দোলাচ্ছেন গানের তালে তালে। অনেক চেষ্টা করেও অবনী আর গোমড়া থাকতে পারলেন না, আস্তে আস্তে

চোয়ালটা তাঁর আলগা হয়ে গেল। ঠোঁট নড়ছে মৃদু মৃদু, গানের কলিগুলোই আওড়াচ্ছেন তিনি। হাঁটু দুটো নেচে উঠল। দুলছেন অল্প অল্প।

গান চলতে চলতেই একটা ছোট্ট জনপদ। সামান্য ক'টা দোকানপাট, কুঁড়েঘর, টিনের চালা, একটা-দুটো পাকাবাড়ি।

একটা দোকানের সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে জায়গাটার নাম দেখে টুপুর গান থামিয়ে হই হই করে উঠল, "মিতিনমাসি, ঝিনিকপানি ঝিনিকপানি! এইখানেই মুকুলবাবুর সেই হাতির পাল... !"

একটু আগেই একটা ট্রেনলাইন পার হয়েছে গাড়িটা। ওখানেই বুঝি গজ-সম্মেলন হয়েছিল!

পার্থ বলল, "ঝিনিকপানি নামটা কিন্তু বড় সুন্দর। নামটাকে সম্মান জানাতেই এখানে নেমে অন্তত এক কাপ চা খাওয়া উচিত।"

সহেলি বললেন, "কায়দা করছ কেন ভাই? সত্যি কথা বলো না, চা তেষ্টা পেয়েছে।"

যাত্রীদের বাসনা টের পেয়ে নজরুল বললেন, "ব্রেক কষি তা হলে? আপনারা তেল মোবিল নিয়ে নিন।"

ঝিনিকপানির একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট চা মিষ্টির দোকানের সামনে জিপ থামালেন নজরুল। নেমেই টুপুরের চক্ষুস্থির। দোকানের পরেই একটা ঝাঁকড়া গাছ, তার তলায় দাঁড়িয়ে সেই মোটরসাইকেলটা! আরোহীরা নেই, সিটের ওপর শোভা পাচ্ছে জোড়া হেলমেট!

টুপুর টানল মিতিনকে, "দেখেছ? দেখেছ?"

"হুম।"

"লোক দুটো কোথায় গেল বলো তো?"

"আছে কোথাও এদিক-ওদিক।"

সহেলি পাশে দাঁড়িয়ে কোমর ছাড়াচ্ছিলেন। লম্বা নিশ্বাস ফেলে

বললেন, "ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছে। যা মিসাইলের মতো ছুটছিল!"

পার্থ বুমবুমকে নিয়ে দোকানে ঢুকেছে। হাঁক ছাড়ল, "কে কী খাবে? কে কী খাবে?"

অবনী বাইরের সরু বেঞ্চিতে বসেছেন। বললেন, "আমি শুধু এক কাপ চা। লিকার হলে ভাল হয়।"

"নিমকি খেতে পারেন। গরম গরম ভাজা হচ্ছে।"

"মাথা খারাপ! নিমকি খেয়ে মরি আর কী।" অবনী দু'হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন, "নজরুলভাই, আমরা জামদা পৌঁছচ্ছি কখন?"

নজরুল ঘড়ি দেখলেন, "এখন বাজে ন'টা, জামদা ধরুন আরও দেড় ঘণ্টা।"

"গোটাটাই এরকম ভাঙাচোরা রাস্তা?"

"না, না। জগন্নাথপুরের পর থেকে অনেকটা ভাল হবে।"

"তা হলে জগন্নাথপুর পার হয়ে একটা কলা খাব।"

পার্থ চ্যাঙারিতে গোটাদশেক নিমকি নিয়েছে। সঙ্গে এক ডজন রসাল জিলিপি। সকলের সামনে গিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে চ্যাঙারি। নজরুল একটা করে নিমকি জিলিপি নিলেন, টুপুর মিতিন দুটো করে। বুমবুমও একটা নিমকি তুলে নিল দেখে পার্থ রীতিমতো হতাশ, বেজার মুখে কামড় বসাল জিলিপিতে।

টুপুর নিমকি খেতে খেতে জায়গাটা দেখছিল। স্থানীয় মানুষদেরও। সবাই প্রায় আদিবাসী। মোটা নাক, পুরু ঠোঁট, কৃষ্ণবর্ণ, স্বাস্থ্যবান। পোশাক খেটো ধুতি, দু'-একজন ছাড়া বেশিরভাগেরই খালি গা। তবে মহিলাদের শাড়িগুলো দিব্যি রংচঙে। বাচ্চা কোলে একটা বউ হাঁ করে এদিকেই তাকিয়ে। কানে মোটা দুল, বাদামি চুলে টেরচা খোঁপা।

চাপা গলায় টুপুর জিজ্ঞেস করল, "মিতিনমাসি, এরা কি সাঁওতাল?"

মিতিন দু'দিকে ঘাড় নাড়ল। বলল, "মুণ্ডা, কিংবা ওঁরাও। এদিকে হো উপজাতির লোকও আছে অনেক। তবে এরা বোধহয় হো নয়। আর এই অঞ্চলে সাঁওতাল তো প্রায় নেইই।"

"কিন্তু সব চেহারাই তো মোটামুটি এক!"

"না রে, খুঁটিয়ে দেখলে তফাত বোঝা যায়। সকলেই অস্ট্রিক অরিজিন, তবে কিছু ডিফারেন্স আছে। চুলের কালারে, মুখের শেপে...। আমরা আলাদা করতে পারি না, সেটা আমাদের চোখের দোষ।"

চা এসে গেছে। অবনীর লিকার-চা হয়নি, সবই দুধ মেশানো। এবং ভয়ঙ্কর গরম।

রয়েসয়ে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে টুপুর, তখনই মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর উদয় হল। ঝাঁকড়া গাছটার গা দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ নেমে গেছে গ্রামের দিকে, সেই পথ বেয়েই হঠাৎ উঠে এসেছে লোক দুটো। একজন শিস দিতে দিতে আঙুলে চাবির রিং ঘোরাচ্ছে, অন্যজনের দু'হাতে ঝুলছে দু'খানা জ্যান্ত মুরগি।

দুটো লোকেরই পরনে জিন্‌স আর টি-শার্ট। চোখে সানগ্লাস। শ্যামবর্ণ, তবে স্পষ্ট বোঝা যায় এরা আদিবাসী নয়। শহুরে কায়দায় কাটা চুল উড়ছে হাওয়ায়। মোটরসাইকেল স্টার্ট দিতে গিয়েও প্রথমজন দাঁড়িয়ে গেল। হিপ-পকেট থেকে মোটা পার্স বার করছে। এগিয়ে এসে দোকান থেকে সিগারেট কিনল চার প্যাকেট। হাতের থাবায় প্যাকেটগুলো ধরে সরু চোখে টুপুরদের জরিপ করল ঝলক। তারপর ফিরে গিয়ে মাথায় হেলমেট চড়াচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটা মোটরসাইকেলের সাইডবক্স থেকে একটা নারকেল দড়ি বার

করেছে ইতিমধ্যে। মুরগি **দুটোর** পা কষে বাঁধল, ঝুলিয়ে দিল মোটরসাইকেলের ব্যাকরেস্টে। প্রাণভয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে মুরগিগুলো, ভয়ানক ঝটাপটি করছে।

তখনই প্রথম লোকটা এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাল। খপ করে চেপে ধরেছে মুরগি দুটোকে। মট মট করে মুচড়ে দিল মুরগি দুটোর গলা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দেখল আর ওরা নড়াচড়া করে কি না। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে লাথি কষাল মোটরসাইকেলে, দুই নিথর মুরগি আর নির্বিকার সঙ্গীকে পিছনে নিয়ে গর্জন তুলে বেরিয়ে গেল।

বুমবুম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "মরে গেল মুরগি দুটো?"

টুপুর অস্ফুটে বলল, "কী নিষ্ঠুর!"

মিতিন দোকানদারকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "কারা এরা? আপনি চেনেন?"

দোকানদারও দেখছিল লোক দুটোকে। বলল, "মালুম নেহি। হোগা কোই বাবুলোগ। সায়েদ জঙ্গলমে ঘুমনে আয়া।"

"আগে দেখেছেন?"

"দো-তিনবার দেখেছি। কাল ভি এসেছিল, মোরগা নিয়ে চলে গেল।"

টুপুর থমথমে মুখে বলল, "পেছনের লোকটাকে আমি চাইবাসায় মোটরসাইকেলে বসে থাকতে দেখেছিলাম।"

বুমবুম গাল ফুলিয়ে বলল, "ওরা পাজি লোক।"

মুরগি দুটোর আর্তনাদ টুপুরের কানে লেগে আছে এখনও। মনটা খারাপ হয়ে গেল টুপুরের।

জিপ চলছে আবার। একটা বড়সড় কারখানা পেরোল। সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। জগন্নাথপুরের পর সত্যিই খানিকটা উন্নতি হল রাস্তার,

স্পিড বাড়ালেন নজরুল। সঙ্গে সঙ্গে অবনীর চোখ বন্ধ। সহেলি টুকটাক কথা বলছেন মিতিন পার্থর সঙ্গে, বুমবুম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মাইলস্টোন গুনছে।

একটা বাঁকের মুখে বিশাল এক গর্ত। নজরুল প্রথমটা খেয়াল করেননি, শেষ মুহূর্তে ক্লাচ ব্রেক চাপলেন প্রাণপণে। প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে থরথর কেঁপে উঠল গাড়ি।

ব্যস, তারপর থেকে জিপ আর গতি তুলতে পারে না। গিয়ার বদল করে, অ্যাক্সিলারেটার চেপে চেষ্টা চালাচ্ছেন নজরুল, জিপ তবু হেঁচকি তুলেই চলেছে।

পার্থ উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রবলেম হল নজরুলভাই?"

"মনে হচ্ছে লাং ইনফেকশান। গাড়ির ফুসফুসটাই গেছে। জামদা পৌঁছে গিয়ারবক্সটা একবার দেখাতে হবে।"

"ক্লাচপ্লেটের গণ্ডগোল নয় তো?"

"তাও হতে পারে। প্লেটও ক্ষয়ে যেতে পারে। অবশ্য যদি বলেন মেঘাতুবুরু অব্দি এভাবেই টেনে দিতে পারি। গাড়ি একটু ধুঁকতে ধুঁকতে যাবে, এই যা।"

মিতিন বলল, "না না, সেটা কিন্তু রিস্‌ক হয়ে যাবে। মেঘাতুবুরু যেতে প্রায় তিন হাজার ফিট উঠতে হবে। চড়াইয়ের সময়ে গাড়ি যদি সেন্সলেস হয়ে যায়...!"

"তা হলে জামদাতেই চেক-আপটা করিয়ে নিই, কী বলেন?"

সত্যি সত্যি জ্বোরো রুগির মতো ধুঁকতে ধুঁকতে জিপ জামদা পৌঁছল প্রায় মিনিট কুড়ি পর। বেশ বড় টাউনশিপ। রীতিমতো ঘিঞ্জি। দোকানপাট আছে অজস্র, গাড়ি সারানোর গ্যারাজও রয়েছে বেশ কয়েকটা। বাঁয়ে এক সরু গলিতে ঢুকে জয় হনুমান মোটর ওয়ার্কসে জিপ নিয়ে গেলেন নজরুল। এই গ্যারাজের মালিক নাকি

তাঁর খুব চেনা। মেকানিক গাড়ি পরীক্ষা করে রায় দিল ক্লাচপ্লেট ঠিক আছে, গিয়ারবক্সেরই অবস্থা খারাপ, ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে সারাতে।

পার্থ বলল, "চলো, তা হলে আমরা এখানেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিই।"

অবনী চিন্তিত মুখে বললেন, "এখানকার হোটেলে কি ডাল আলুসেদ্ধ পাওয়া যাবে?"

সহেলি বললেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমি কিন্তু এখানকার মার্কেটটা ঘুরব।"

টুপুর অন্য কথা ভাবছিল। গাড়ি সারাতে বেশি দেরি হলে মেঘাতুবুরুর সূর্যাস্তটা মিস হয়ে যাবে না তো?

মিতিন ফস করে বলল, "একবার ওই পুরুষোত্তম সিংহর বাড়িটা ঘুরে এলে হয় না?"

পার্থ বলল, "যাহ্, আলাপ পরিচয় নেই..."

"আহা, মুকুলবাবুকে তো চিনি। আর তিনি তো এখন জামদাতেই আছেন।"

"মাত্র এক দেড় ঘণ্টার আলাপ, তাও ট্রেনে... ওকে কি পরিচয় বলে? তা ছাড়া বাড়িটা ঠিক কোথায় তাও তো জানো না।"

"জামদায় এসে জামদার সিংহকে খুঁজে বার করতে পারব না? চাইবাসার অনন্তবাবু বলছিলেন পুরুষোত্তম নাকি একটা ক্যারেক্টার। এখানে এসেও তাঁকে একবার চোখে দেখব না? এই ফাঁকে মুকুলবাবুর সঙ্গেও নয় আর একবার দেখা হয়ে যাবে।"

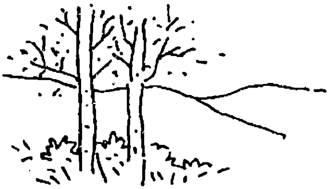

পুরুষোত্তম সিংহর বাড়ি খুঁজতে একটুও কষ্ট করতে হল না। তাঁকে চেনে না এমন মানুষ বোধহয় জামদায় একজনও নেই। জামদার সবচেয়ে বড় বাড়িটাই সিংহসদন।

জয় হনুমান গ্যারাজ থেকে সিংহসদন খুব একটা দূরেও নয়। হাঁটাপথে মিনিট সাতেক। বাজারের পরেই মোরাম বিছানো রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণে, রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে সিংহমশাইয়ের ডেরা। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, চারদিকে প্রচুর গাছপালা। শাল, সেগুন, শিমুল, মহুয়া, ইউক্যালিপ্‌টাসের বাহিনী পাঁচিলের ওপারে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে। জাল জাল গেটের পাশে শ্বেতপাথরের ফলকে হিন্দি ইংরেজি বাংলা তিনটে ভাষায় জ্বলজ্বল করছে পুরুষোত্তমের নাম।

গেট বন্ধ। টুপুররা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। কীভাবে ডাকবে, কাকে ডাকবে ভেবে পাচ্ছে না।

পার্থই গলা ওঠাল, "কোই হ্যায়?"

তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হয়েছে এক আদিবাসী যুবক। পরনে খাকি প্যান্ট, সাদা শার্ট, হাতে লাঠি। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "কিস্‌কো চাহিয়ে?"

পার্থ হিন্দিতেই বলল, "মুকুল সিংহর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দারোয়ান যেন একটু অবাক। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল সবাইকে। জিজ্ঞেস করল, "কোত্থেকে আসছেন?"

"কলকাতা থেকে।" পার্থর গলায় ভারিক্কি ভাব, "আমরা মুকুলবাবুর বন্ধু।"

"উনি তো নেই। সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন। সন্ধের আগে ফিরবেন না।"

শুনেই অবনী মহাখুশি। কোনও এক অর্ধপরিচিতের বাড়িতে এরকম উৎপটাং চলে আসায় তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। হোটেলে খেতে-খেতেও তিনি সারাক্ষণ গাঁইগুঁই করছিলেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "বাঁচা গেল।... চলো, এবার গ্যারাজে ফিরি।"

অবনী প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছেন, মিতিন খপ করে চেপে ধরল তাঁর হাত, "একবার পুরুষোত্তমবাবুর দর্শন নেবেন না, অবনীদা?"

"আমার দরকার নেই। তোমরাই টিকটিকিগিরি করো গিয়ে।"

"আহা, মানুষকে দেখা মানেই কি টিকটিকিগিরি করা?"

অবনী উত্তরে কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অন্দর থেকে বাজখাঁই কণ্ঠস্বর, "কৌন হ্যায় রে অভিরাম?"

"কোই বাবুলোগ বড়াভাইসে মিলনে আয়া।"

"খোল্ দো।"

গেট খুলে গেল। এক দীর্ঘদেহী পুরুষ লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এলেন গেটে। পরনে ধুতি আর ফতুয়া।

মিতিন হাতজোড় করে নমস্কার করল, "আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। আপনি নিশ্চয়ই পুরুষোত্তমবাবু?"

টকটকে গৌরবর্ণ পুরুষোত্তম ঘাড় নাড়লেন। ঈষৎ বিস্মিত স্বরে বললেন, "আপনারা মুকুলের কাছে...?"

"আমরা সারান্ডায় যাচ্ছি। পরশু ট্রেনে মুকুলবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আজ জামদায় হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়ে গেল তাই ভাবলাম...।" মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "আমরা আপনার সঙ্গেও

দেখা করতে এসেছি। মুকুলবাবু আপনার কথা খুব বলছিলেন।”

“তাই বুঝি?” পুরুষোত্তমবাবুর মুখে চিলতে হাসি ফুটল, “আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।”

বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কম্পাউন্ডের ভেতরটা আরও সুসজ্জিত। যত্ন করে বানানো বাগানে ফুটে আছে রং-বেরং-এর গোলাপ। মূল বাড়ির সামনে গোল বাঁধানো চাতাল, সেখানে ডানা মেলে আছে শ্বেতপাথরের পরি। সবুজ লনে রঙিন ছাতার নীচে বেতের চেয়ার টেবিল। লনের ঘাস নিখুঁত মাপে ছাঁটা। দেখে বোঝা যায় শুধু টাকা নয়, গৃহস্বামীর রুচিও আছে।

গাড়িবারান্দা থেকে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে গোল গোল থামঅলা দালানে। উঁচু সিলিং-এ ঝুলছে ঝাড়বাতি। মৃদু বাতাসের দোলায় ঝাড়লণ্ঠনে টুং টুং শব্দ।

দালান পেরিয়ে বৈঠকখানা-ঘরে এনে সকলকে বসালেন পুরুষোত্তম। পাখা চালিয়ে দিয়ে বললেন, “বসুন, আরাম করে বসুন।”

পুরনো আমলের ভারী ভারী সোফা, কিন্তু এখনও কী নরম। টুপুর যেন ডুবে যাচ্ছিল। আড়ষ্ট চোখে দেখছিল ঘরখানাকে। এ ঘরেও একখানা ঝাড়লণ্ঠন আর দেওয়ালে বেশ কয়েকখানা বাঁধানো ছবি। সবক'টা ফোটোতেই পুরুষোত্তম উপস্থিত। কোনওটায় তিনি কোনও সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করছেন, কোনওটায় দাঁড়িয়ে আছেন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝে। ছবিতে বয়স কম হলেও মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হয় না। বিশেষ করে পুরু গোঁফখানা দেখে।

পুরুষোত্তমের সেই পুরু গোঁফ এখন পুরোপুরি সাদা। মাথার চুলও। তা সত্ত্বেও মানুষটাকে তত বুড়ো বলে মনে হচ্ছিল না টুপুরের। কিছু না হোক সত্তর-পঁচাত্তর তো বয়স হবেই, অথচ

এখনও চেহারাটা কী সুন্দর রেখেছেন ভদ্রলোক। টানটান চামড়া, কপালে বলিরেখা নেই, শরীরও ঝোঁকেনি এতটুকু। নির্ঘাত ব্যায়াম করেন নিয়মিত।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলের সঙ্গে পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হল। অবনী কলেজে পড়ান শুনে পুরুষোত্তম রীতিমত শ্রদ্ধান্বিত। পার্থও প্রেসের ব্যবসা করে শুনে তারিফ করলেন খুব। বুমবুমকে হাত নেড়ে ডাকলেন কাছে, তবে বুমবুম এগোল না, বসে আছে মায়ের কোল ঘেঁষে।

মিতিনের পেশার খবর জেনে পুরুষোত্তম যেন খানিকটা থতমত। ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনি ডিটেকটিভ?"

মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "হ্যাঁ, দুষ্টু লোকদের পেছনে ছুটে বেড়াই আর কী।"

"বাহ্, বাহ্, মেয়েরা দেখছি আজকাল অনেক এগিয়ে গেছে! তা আপনি পুলিশের চাকরিতে ঢোকেননি কেন?"

"পুলিশের কাজ তো অনেকটাই রুটিন জব, ভাল লাগে না। তুলনায় আমার কাজে স্বাধীনতা অনেক বেশি। নিজের পছন্দমতো কেস নিতে পারি। অবশ্য পুলিশের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ রাখতেই হয়। তাদের সাহায্য ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এগনো মুশকিল।"

"হুম। তা আর্মস হ্যান্ডেল করার অভ্যেস আছে?"

"রিভলভারটা পারি মোটামুটি। লাইসেন্সও আছে।"

"রাইফেল?"

'আজ্ঞে না। কখনও চেষ্টা করার সুযোগ হয়নি।"

"রিভলভার তো খেলনা। আসল অস্ত্র হল রাইফেল।" বলতে বলতে কী যেন খেয়াল হল পুরুষোত্তমের, লজ্জিত স্বরে বললেন, "ছি ছি, তখন থেকে শুধু কথাই বলে যাচ্ছি... আপনাদের নিশ্চয়ই এখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি?"

অবনী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা লাঞ্চ সেরেই এসেছি।"

"তবু একটু শরবত-টরবত তো চলতে পারে?"

পার্থ বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। গরমের দিন..."

"কী নেবেন? লস্যি? আমপোড়ার শরবত?"

"লস্যিই ভাল।" পার্থ বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নয়, "আমপোড়াও মন্দ কী!"

পুরুষোত্তম দ্রুত পায়ে অন্দরে চলে গেলেন। খানিক পরে ফিরে এসে থিতু হয়ে বসলেন সোফায়। বললেন, "আজ আমার আপ্যায়নের আসল লোক নেই। বউমা নাতিকে নিয়ে টাটানগর গেছে। বাপের বাড়ি।"

সহেলি প্রশ্ন করলেন, "বউমা মানে আপনার ছোট ছেলের বউ?"

"বড়টির আর বিয়ে দিতে পারলাম কোথায়! সে তো ভ্যাগাবণ্ডই রয়ে গেল।"

"উনি তো আপনার ব্যবসাতেও নেই?"

"যার মতিস্থির নেই তাকে দিয়ে কি ব্যবসা হয়? তা ছাড়া ও একটু আয়েসী ধরনের, ব্যবসার খাটাখাটনি ওর পোষাবে না। অগত্যা আমার ছোট ছেলেই ভরসা।"

"তিনি বুঝি খুব পরিশ্রমী?"

"হ্যাঁ। খানিকটা আমার ধাতের। ছোটাছুটি করতে পারে খুব। এই তো কালই গেল সারান্ডায়। ডিভিশান অফিসে। আজ ফেরার কথা। ফিরেই কাল আবার মনোহরপুর ছুটবে। আমি এখানকার অফিসটা সামলাই, সকাল-বিকেল বসি। দৌড়োদৌড়িটা এখন ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি। বয়স হচ্ছে তো।"

সহেলি বললেন, "আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না বয়স হয়েছে।"

পুরুষোত্তম গর্বিত মুখে বললেন, "তার কারণ আছে। এখনও নিয়মিত কাজকর্ম করি। রোজ অন্তত পাঁচ কিলোমিটার হাঁটি। দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই। খাওয়াদাওয়াও করি মেপেজুপে। স্ত্রী বিয়োগের পর গত দশ বছর ধরে মাছ মাংস ছেড়ে নিরামিষ খাচ্ছি।"

টুপুর ফিক করে হেসে ফেলল। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীদের নাকি মাছ মাংস খেতে নেই! যথেষ্ট খারাপ নিয়ম, তবু এখনও নাকি অনেকে মানেন। স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামীও যে আমিষ খাওয়া ছেড়ে দেন, জীবনে এই প্রথম শুনল টুপুর।

পুরুষোত্তম টুপুরের হাসিটুকু লক্ষ করেননি। বললেন, "এককালে শরীরের ওপর প্রচুর অত্যাচার করেছি তো, তাই এখন বেশি করে নিয়ম মানি।"

মিতিন হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি আপনি এককালে খুব ডাকাবুকো ছিলেন।"

"কে বলল? আমার বড় পুত্তুর?"

"শুধু মুকুলবাবু কেন, আরও অনেকের মুখে শুনলাম। আপনি তো এ অঞ্চলের স্বনামধন্য মানুষ।"

পুরুষোত্তম হা হা হেসে উঠলেন, "আরে ছাড়ুন। আমার সম্পর্কে কেউ ভাল কথা বলতেই পারে না। তাতে অবশ্য আমার কাঁচকলা। আমি চিরকাল আমার মতো থেকেছি। কোনও সুনাম বদনামের পরোয়া করিনি।"

মিতিন তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার মেন বিজনেস তো ছিল জঙ্গলের ঠিকাদারি, তাই না?"

"ছিল কেন, এখনও আছে। সেই ফরটিনাইন থেকে করছি। তখন আমার বয়স মাত্র তেইশ।"

"তার মানে আপনি খুব অল্প বয়সে কলকাতা ছেড়েছেন?"

"কলকাতা নয়, আমার নিবাস ছিল হাওড়ায়। সাঁতরাগাছি। বাবা-

মা সাতদিনের তফাতে কলেরায় মারা গেলেন, কাকার সংসারে মন টিকছিল না, পড়াশুনোও ভাল লাগত না, তাই বেরিয়ে পড়লাম ভাগ্যান্বেষণে। ইন দা ইয়ার নাইন্টিন ফরটিফাইভ। বেরিয়েছিলাম বম্বে যাব বলে। ট্রেনে যেতে যেতে মনোহরপুর নামটা পছন্দ হয়ে গেল। ব্যস, নেমে পড়লাম।”

“বাহ্, এ তো বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!”

“বলতে পারেন।” পুরুষোত্তম মাথা নাড়লেন, “মনোহরপুরের কাছেই তখন ইস্কোর দু'-দুটো আয়রন মাইন ছিল। চিড়িয়া আর দুইয়া। ফরটিফোরে দুটো মাইনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন সবে চিড়িয়া মাইনটা খুলেছে। সেখানে কাজ জুটিয়ে ফেললাম একটা। ঠিকাদারের আন্ডারে। নিজের হাতে গাঁইতি মেরে মেরে পাহাড় কাটতাম। তখনই তো স্বাস্থ্যটা পোক্ত হল। এক-দু' বছর পরেই আবার বন্ধ হয়ে গেল মাইন। আর ওই সময়েই এক সাহেব, মিস্টার উইলিয়ামস, তিনি ছিলেন ইস্কোর ডি-জি-এম... কী জানি কেন, সাহেব আমায় খুব নেকনজরে দেখতেন... তিনিই তদ্বির তদারক করে আমায় ওই ঠিকাদারির লাইনে ঢুকিয়ে দেন।”

অবনী বললেন, “তার মানে তখন থেকেই জঙ্গলের গাছ কাটছেন?”

“না প্রোফেসরসাহেব। আমার তখন কাজটা ছিল অন্যরকম। গাছের লাইনেই যাইনি। সারাভার জঙ্গলে একধরনের ঘাস হয়। সাবুই ঘাস। কাগজ তৈরিতে ওই ঘাসের খুব চাহিদা ছিল। জঙ্গলের ইজারা নিয়ে ওই সাবুই ঘাস আর বাঁশ কেটে কেটে চালান দিতাম রানিগঞ্জের পেপার মিলে। সেই সময়েই মনোহরপুর ছেড়ে চলে যাই গুয়ায়। সেখানে একখানা বাড়িও বানিয়েছিলাম ছোটখাটো।”

“গুয়াতেও তখন স্যার বীরেনের আয়রন মাইন ছিল, তাই না?”

“হুম। গুয়ার লোহাখনির তখন গোল্ডেন পিরিয়ড। এখন অবশ্য

সেই খনিও আর নেই। তবে গুয়া জায়গাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। জানেন তো, ওখানে একসময়ে সোনার খনিও ছিল। খঞ্জর-দিরি-বুরুতে।"

"তাই নাকি?" অবনী নড়ে বসলেন, "এটা তো একটা নতুন ইনফরমেশান!"

"আরে প্রোফেসরসাহেব, এই ঝাড়খণ্ডে কী না ছিল! সোনা, রুপো, লোহা, মাইকা, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, এমনকী কয়লা খনিতে হিরে পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আমাদের সারাভার সম্পদই কী কম! এখানে তো সব পাহাড়ই লোহাপাহাড়। মেঘাতুবুরু কিরিবুরুর কাজ শেষ হলেই ফের একটা বুরু কাটা শুরু হয়ে যাবে।"

প্রশ্নটা ক'দিন ধরেই টুপুরের মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে ফেলল, "আচ্ছা, এখানে সব নামের পেছনেই একটা করে বুরু লাগানো কেন?"

অবনী শিক্ষকের সুরে বললেন, "এটা তোমার জানা উচিত ছিল টুপুর। বুরু মানে পাহাড়।"

"আর বুরু জুড়ে জুড়ে এরা পাহাড়ের নাম দেয়।" পুরুষোত্তম বললেন, "যেমন কিরি মানে পোকা, কিরিবুরু মানে পোকার পাহাড়। মেঘাতুবুরুর অর্থ মেঘ ছোঁয়া পাহাড়। গুয়া মাইন্সের ওখানে ছিল বনম্-উলি-বুরু, ছাতমবুরু, ঝিলিবুরু, ঝাণ্ডিবুরু...। প্রতিটি পাহাড়ই এক-একটি মাইন। বনম্ মানে এখানকার হো ভাষায় উইঢিবি আর উলি মানে আম। যে পাহাড়ে উইঢিবি আর আমগাছ আছে তার নাম বনম্-উলি-বুরু। ছাতার মতো দেখতে যে পাহাড়, সেটা ছাতমবুরু। কিংবা পতাকার মতো চেহারা বলে ঝাণ্ডিবুরু।"

বড় পাথরের রেকাবিতে ছ' গ্লাস লস্যি এসে গেছে। সঙ্গে আর-একটা মিনে-করা রেকাবিতে রসগোল্লা আর ল্যাংচা।

এক চুমুকে পার্থর লস্যি শেষ। গোঁফ মুছে মিষ্টির প্লেটের দিকে হাত বাড়াল। অন্যরা গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে ধীরেসুস্থে। লস্যি মিষ্টি

কোনওটাতেই বুমবুমের আগ্রহ নেই, সে হাই তুলছে ঘন ঘন।

পুরুষোত্তম বুমবুমকে দেখে বললেন, "আহা, আমার নাতিটা থাকলে ওর ভাল লাগত। বেচারা বড্ড বোর হচ্ছে।"

বুমবুম গম্ভীর মুখে বলল, "আমি ঠিক আছি।"

"যাও না, বাইরে ঘুরে এসো। পেছনের বাগানে দোলনা আছে।"

"আমি দোলনায় চড়ি না। আমার মাথা ঘোরে।"

"তা হলে লখিয়াকে বলি, তোমায় একটা বল এনে দিক?"

"আমি এখন খেলব না। আমি তোমাদের কথা শুনব।"

পুরুষোত্তম হা হা হেসে উঠলেন, "বেশ। তাই শোনো তবে।"

মিতিন গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখল। ফিরেছে পুরনো প্রসঙ্গে, "তা আপনি এই জামদায় এলেন কবে?"

"উনিশশো ছাপ্পান্নয়।"

"গুয়ার বাড়ি বেচে দিলেন?"

"কী আর করব, আমার স্ত্রীর আর জঙ্গল ভাল লাগছিল না যে। জামদায় তখন নতুন বসতি গড়ে উঠছে, বাঙালিও ছিল অনেক... তা ছাড়া এখান থেকে টাটা চাইবাসা সর্বত্রই যোগাযোগের সুবিধে বেশি। এখানে এসে ব্যবসাও বাড়ালাম, একখানা শ' মিল খুললাম, ট্রাক কিনলাম, গভর্নমেন্ট মাইনগুলোতে এখন অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজও ধরেছি..."

"জঙ্গলে আপনার বিশাল দাপট ছিল, তাই না?"

"লোকে আমায় মানত খুব। বিশেষ করে আদিবাসীরা। আমি তাদের ওপর কখনও জোরজুলুম করিনি। আবার অন্য কেউ ওদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করলে বরদাস্তও করিনি।"

"যদি কিছু না মনে করেন, একটা প্রশ্ন করব?"

"ডিটেকটিভের প্রশ্ন?"

"না। একজন সফল ব্যবসায়ীকে জানার কৌতূহল।" মিতিন গলা

নামাল, "এই যে আপনি এত ধনসম্পদ করেছেন, এতে আপনার শত্রু বাড়েনি?"

পুরুষোত্তম মুচকি হাসলেন, "দেখুন, আমি নিজেকে সাধুপুরুষ বলে দাবি করি না। বিজনেস করতে গেলে শত্রু হয়ই। তাদের ছলে বলে কৌশলে হটিয়েও দিতে হয়। আমি শত্রু কোনওদিন বাড়তেই দিইনি। আমি যেভাবে বাঁচতে চাই, সেভাবেই থেকেছি।"

বাইরে একটা গাড়ির হর্ন। টুপুর দৌড়ে বারান্দায় গেল। নজরুলসাহেব কি জিপ নিয়ে এসে গেলেন?

অভিরাম গেট খুলেছে। উহুঁ, এ তো টুপুরদের জিপ নয়। একজন ভদ্রলোক নামলেন জিপ থেকে। পার্থরই সমবয়সি, লম্বা ঝকঝকে চেহারা, পরনে জিন্স, টি-শার্ট। মুখখানা যেন পুরুষোত্তম বসানো।

পুরুষোত্তমও বেরিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়। জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, তোর কাজ মিটল?"

উত্তর না দিয়ে বিকাশ ঝলক দেখল টুপুরকে। চোখে প্রশ্ন।

পুরুষোত্তম বললেন, "এরা ক'জন সারান্ডা যাওয়ার পথে আমাদের বাড়ি এসেছে। তোর দাদার সঙ্গে ট্রেনে বন্ধুত্ব হয়েছিল।"

বিকাশের ভুরুর ভাঁজ বাড়ল, তবে মন্তব্য করল না কিছু। ঘরে ঢুকে আলাপ-পরিচয় করল সবার সঙ্গে। অবনীকেই দলের পাণ্ডা ঠাউরে প্রশ্ন করল, "এখানে হঠাৎ হল্ট করলেন যে? জঙ্গলে পৌঁছতে তো রাত হয়ে যাবে।"

অবনী বললেন, "আমাদের থলকোবাদে কাল থেকে বুকিং। আজ মেঘাতুবুরু যাচ্ছি। রাস্তায় জিপটা খারাপ হলে বলে..."

"অর্থাৎ জিপ সারানোর ফাঁকে আলাপ ঝালাতে এলেন?"

"হ্যাঁ মানে..."

"দাদার সঙ্গে কি ট্রেনেই আলাপ? না আগে থেকে পরিচয় ছিল?"

বিকাশের স্বরে কেমন যেন জেরা করার সুর। টুপুর মিতিনের দিকে তাকাল।

বিকাশের জেরা মিতিনেরও ভাল লাগেনি। গলা একটু ভারী করেই উত্তর দিল, "কেন, শুধুমাত্র ট্রেনের পরিচয়ে বুঝি বাড়িতে আসা যায় না?"

বিকাশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

পুরুষোত্তম বলে উঠলেন, "কোত্থেকে হবে? তোর দাদা তো সেই সকালবেলা বেরিয়ে গেছে।"

"কোথায় গেল?"

"কী জানি! বললাম অ্যাম্বাসাডারটা নিয়ে যা, ড্রাইভারও আছে... কিছু না বলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। কোনও বন্ধুটন্ধুর বাড়ি গেছে বোধহয়।"

বিকাশ আবার কাঁধ ঝাঁকাল। চলেই যাচ্ছিল ভেতরে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "বেড়াতে যাচ্ছেন যান, তবে রেস্টহাউস ছেড়ে জঙ্গলে বেশি ঘোরাঘুরি করবেন না।"

"কেন?"

"সিমলিপাল থেকে একটা হাতির পাল এসে ঢুকেছে সারান্ডায়। প্রত্যেক বছরই এ সময়ে হাতিরা আসে, সেটা বড় কথা নয়। ভয়ের কারণ হল, ওই দলের মধ্যে থেকে একটি হাতিকে রোগ্ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে।"

"রোগ্ মানে পাগলা হাতি?"

"ইয়েস। হাতির পাল সারান্ডায় ঢোকার পর কেউ বোধহয় ওই হাতিটাকে গুলি করেছিল। মরেনি হাতিটা, কিন্তু খেপে গিয়ে দলছাড়া হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।"

পুরুষোত্তম উত্তেজিত স্বরে বললেন, "আমাদের জঙ্গলে হাতিকে গুলি করল? কার এত সাহস?"

বিকাশ নিরুত্তাপ গলায় বলল, "তুমি এমনভাবে বলছ, যেন জঙ্গলে হাতিকে শুট করার ঘটনা পৃথিবীতে এই প্রথম ঘটল?"

"যেখানে যা খুশি হোক, সারান্ডায় কেন হবে?"

"দ্যাখো বাবা, পুরুষ হাতি বুড়ো হলে অনেক সময়েই তাকে দল থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়। সে তখন রোগ্ বনে যায়। এই বুড়ো হাতিটা আগেই দলছুট হয়ে পাগলা বনে যাওয়ার পর গুলি খেয়েছে, না কি গুলি খাওয়ার পর পাগল হয়েছে, এটা সঠিকভাবে বলা কঠিন। রেঞ্জারসাহেবও ঠিক ঠিক বলতে পারলেন না। যদি আগেই পাগলা বনে গিয়ে থাকে, তো সেই হাতিকে নিকেশ করে দেওয়াই তো ভাল। না হলে তো গ্রাম-কে-গ্রাম ছারখার করে দেবে।"

"কিন্তু গুলিটা করল কে? কোনও চোরাশিকারির দল ঢোকেনি তো জঙ্গলে? হাতির দাঁতের লোভে?"

"হতেও পারে। নাও হতে পারে। চোরাগোপ্তা শৌখিন শিকারিও তো থাকে। এখন শিকার নিষিদ্ধ বটে, তা বলে দু'-চারটে মানুষের কি আর বাঘ হাতি সিংহ হরিণ মারতে সাধ যায় না? তুমিই তো গল্প করেছ একসময় কত সাহেবসুবো জঙ্গলে জন্তু মারতে আসত। তোমার নিজেরও তো এককালে শিকারের নেশা ছিল।"

পুরুষোত্তম গর্জে উঠলেন, "আমার সঙ্গে তুমি অন্যদের তুলনা করবে না। আমি কখনও বিনা কারণে কোনও পশুকে হত্যা করিনি। আমি শুধু বাঘ মেরেছি। তাও সেই বাঘ কোনও মানুষকে মারার পর।"

কে জানে কেন বিকাশ আর তর্কে গেল না। পরদা সরিয়ে চলে গেছে অন্দরে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই চুপ। একটু আগের গল্প আড্ডার পরিবেশ যেন ছানা কেটে গেছে। অবনী বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। পার্থও।

খানিক পরে নজরুলের জিপ এসে যেতে বিদায় নিল সকলে।

মোরামের রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়ি মেন রোডে পড়তেই সহেলি বলে উঠলেন, "শোনো বাপু, সাফ কথা বলি। সারাণ্ডা মারাণ্ডায় আর গিয়ে কাজ নেই। মুকুলবাবুর পরামর্শটাই ভাল। মেঘাতুবুরুতে এক-দু'দিন কাটাব, ওখান থেকেই একটু জঙ্গল দেখে আসব, তারপর সোজা চলে যাব গালুডি।"

পার্থ হেসে বলল, "কিন্তু বড়দি, আমার যে পাগলা হাতি দেখার ভীষণ শখ।"

বুমবুম হাততালি দিয়ে উঠল, "আমিও পাগলা হাতি দেখব।"

"তোমরা দ্যাখোগে যাও। আমায় একটা বাসে তুলে দিয়ো, আমি চাইবাসা ফিরে যাব।"

টুপুর টিপ্পনি জুড়ল, "ভয় পাচ্ছ কেন মা? তুমি নয় সারাণ্ডা গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থেকো।"

অবনী অনেকক্ষণ পর কথা বললেন, "আমি কিন্তু তাই থাকব।"

বাইরে মায়াবী বিকেল। কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর। পাহাড় জঙ্গল কাছে এসে গেছে, দু' ধারে এখন শালগাছের মিছিল।

একটা তেমাথার মোড়ে এসে থামল জিপ। সামনে বাঁশ নামিয়ে রাস্তা আটকে রেখেছে বনবিভাগ। গাড়ির নম্বর নেবে। আইন। পাশেই বনবিভাগের ছোট্ট অফিস, গুমটির মতো। এখান থেকেই দুটো পথ চলে গেছে দু'দিকে। একদিকে মনোহরপুর, অন্যদিকে মেঘাতুবুরু।

রাস্তার মাথায় সবুজ তোরণ। সেখানে বড় বড় করে লেখা, 'ওয়েলকাম টু সারাণ্ডা'।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে মিতিন হঠাৎ বলে উঠল, "মনে হচ্ছে সারাণ্ডা টুরটা এবার একেবারে নিরামিষ হবে না। বুঝলি টুপুর!"

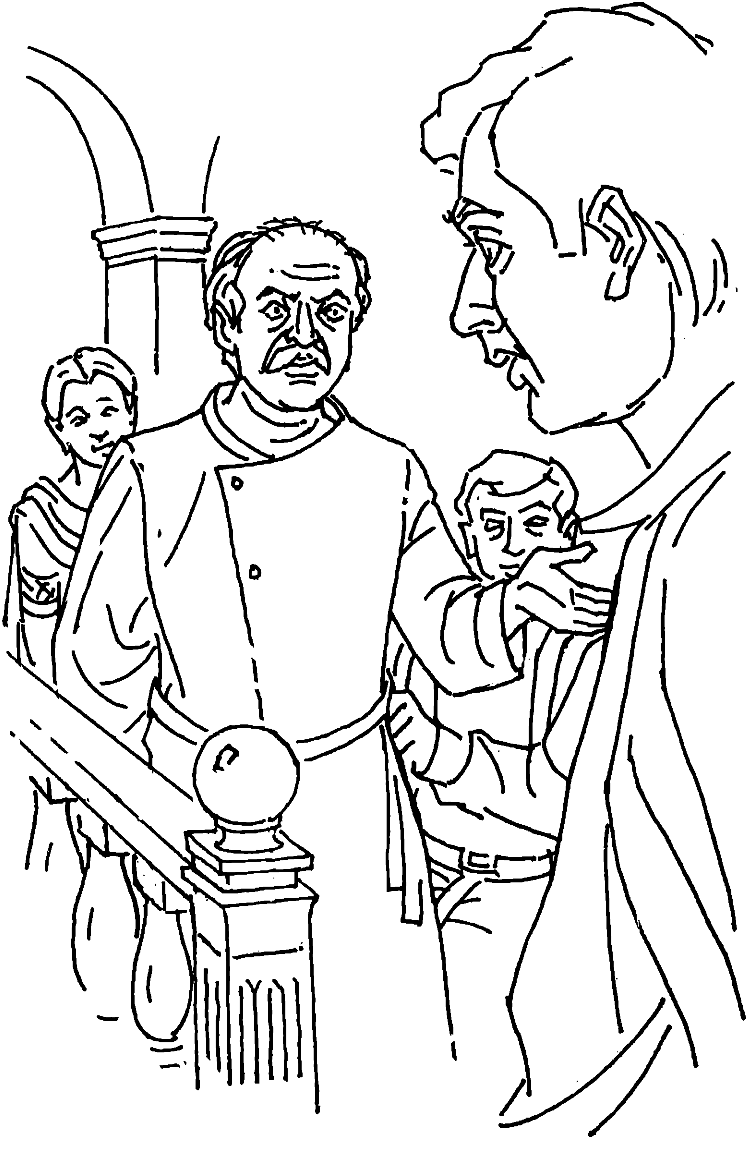

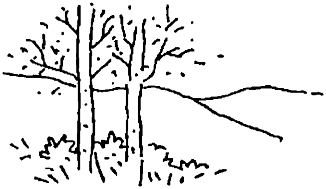

কিরিবুরু মেঘাতুবুরু একদম গায়ে গায়ে লাগানো। কোথায় মেঘাতুবুরুর শেষ, কোথায় বা কিরিবুরুর শুরু, বোঝা মুশকিল। দুই লোহাখনির গেটও প্রায় মুখোমুখি, মাঝে বড়জোর দু'-তিনশো মিটারের ব্যবধান।

রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে মিতিনের সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিল টুপুর। মেঘাতুবুরুতে জায়গা পাওয়া যায়নি, তারা উঠেছে কিরিবুরুতে। স্টিল অথরিটির গেস্টহাউসে। মেঘাতুবুরুর চেয়ে কিরিবুরুতেই অবশ্য জনবসতি বেশি। দিব্যি সাজানোগোছানো টাউনশিপ। বাজারহাট, দোকানপাট, সিনেমা হল, কী নেই। চওড়া-চওড়া মসৃণ পাহাড়ি রাস্তায় এই চড়াই তো এই উতরাই। পথের দু' ধারে ইউক্যালিপটাসের সারি। অজস্র খুদে খুদে টিলা চারদিকে, তাদের মাথায় গায়ে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর। এমন একটা মনোরম পাহাড়কে কেন যে পোকার পাহাড় বলা হয়?

পাহাড়ের মাথায় বলে কিরিবুরুতে ঠাণ্ডা আছে যথেষ্ট। সালোয়ার-কামিজের ওপর সহেলির একটা শাল জড়িয়ে নিয়েছে টুপুর। মিতিনের গায়েও গুজরাটি চাদর। এতাল বেতাল হাওয়ায় মাঝে মাঝেই তবু কেঁপে উঠছে মাসি বোনঝি।

হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলছিল দু'জনে। মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কী রে, এখনও অব্দি কেমন লাগছে টুরটা?"

টুপুর বলল, "দারুণ।"

"টেনশন হচ্ছে না?"

"কীসের টেনশন?"

"কাল আমরা সত্যিকারের জঙ্গলে ঢুকব। যদি থলকোবাদে গিয়ে পাগলা হাতিটার সামনাসামনি পড়ে যাস?"

"হাতিকে সামনে আসতে দেব কেন? হুড়মুড় করে জঙ্গল ভাঙছে টের পেলেই কোথাও একটা শেল্টার নিয়ে নেব।"

"তুই একটা হাঁদি। হাতি মোটেই জঙ্গল ভেঙে ভেঙে হাঁটাচলা করে না। সত্যি বলতে কী, হাতির চলাফেরা টেরই পাওয়া যায় না।"

"পাগলা হাতিরও না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। হাতি এমনিতেই খুব চালাক। অসম্ভব বুদ্ধিমান প্রাণী। পাগলা হওয়ার পর সে আরও ধূর্ত হয়ে ওঠে। যদি ইচ্ছে করে দাপাদাপি না করে, তা হলে পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালেও তুই টের পাবি না। প্লাস, গায়ের রং গাছের গুঁড়ির সঙ্গে একেবারে মিশে থাকে। ওই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে একদম নিঃসাড়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। আচমকাই।"

টুপুর একটু ঘাবড়েই গেল, "তুমি ভয় দেখাচ্ছ কেন মিতিনমাসি?"

"ভয় পাচ্ছিস বা কেন? সাবধানে হাঁটাচলা করবি। হুটহাট একা-একা কোথাও চলে যাস না, ব্যস, তা হলেই হল।" মিতিন টুপুরের কাঁধে হাত রাখল, "তবে কী জানিস, ওই হাতির চেয়েও সাঙ্ঘাতিক ওই লোকটা। বা লোকগুলো। যারা হাতি মারতে জঙ্গলে ঢুকেছে।"

"জঙ্গলে তো পাহারাদার থাকে। তারা কালপ্রিট ধরতে পারছে না?"

"এ কি তোর বেথুয়াডহরির পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট ফরেস্ট? ভেতরে ঢুকলে বুঝবি কাকে বলে অরণ্য। দশ-বিশটা লোকও যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, তাদের ঢুঁড়ে বার করা শার্লক হোম্‌সেরও অসাধ্য।"

"তুমিও পারবে না?"

"আমি খুঁজব কেন? যাদের কাজ তারাই করুক।" মিতিন আলগা টোকা দিল টুপুরের মাথায়, "তোকে যা বলেছিলাম করছিস?"

"কী গো? ডে-টু-ডে ডায়েরি লেখা?"

"ইয়েস। যেখানে যা ঘটছে সব নোট করে রাখ।"

"আজকেরটা এখনও হয়নি। শোওয়ার আগে লিখব।"

"শর্টে বল তো কী কী নোট করবি আজ?"

মিতিনমাসির কাছে টুপুর শিখেছে কোনও ঘটনাই উপেক্ষণীয় নয়। বহু তুচ্ছ ব্যাপারও বড় কিছু ঘটার ইঙ্গিত দেয়। অনেকটা পাহাড়ি এলাকার মেঘের মতো। এককুচি কালো মেঘ যে কতটা বৃষ্টি ঢালতে পারে সে তো টুপুর চাইবাসাতেই দেখেছে।

টুপুর সংক্ষেপে তার বিবরণী পেশ করল। ভেবে ভেবে। মনে করে করে। চাইবাসার হোটেলে ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে মেঘাতুবুরুর সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

বিনা মন্তব্যে শুনছিল মিতিন। মাঝে-মাঝে ঘাড় তুলে আকাশটাকে দেখছিল। গাঢ় নীল রাতের আকাশ চাঁদোয়ার মতো ছেয়ে আছে মাথার ওপর। ঝিকঝিক করছে অজস্র তারা। পশ্চিম আকাশ থেকে চাঁদ অনেকটা হেলেছে পুবে। জ্বলজ্বল করছে। ঠিক যেন কানাভাঙা সোনার পিরিচ।

টুপুর আড়চোখে দেখল মিতিনকে, "কী গো, কিছু বাদ পড়ল?"

"মোটরসাইকেলের লোক দুটোর টি-শার্টের কালার বললি না তো!"

"যে লোকটা মুরগি মারল, সে পরে ছিল মেটে রং। আর অন্যজনের যেন কী রং?"

"মনে নেই তো? সবুজ। বুকে সরু সাদা বর্ডার।" মিতিন ফের প্রশ্ন করল, "আর পুরুষোত্তম সিংহ সম্পর্কে তোর কী কমেন্ট?"

"বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ। নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসেন। নিজের কথা বলতেও। তবে...।" টুপুর একটু থেমে থেকে বলল, "শিকারি, অথচ অকারণে প্রাণীহত্যা করেননি, এটা কেমন অদ্ভুত নয়?"

"জিম করবেটের নাম শুনেছিস?"

"যিনি 'ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন' লিখেছিলেন? বইটা পড়েছি। কী সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক বাঘ শিকার করেছিলেন জিম করবেট! রুদ্রপ্রয়াগে... রানিখেতে..."

"তা হলে তো জানিসই জিম করবেট কোন দরের শিকারি ছিলেন। কিন্তু জঙ্গল বা পশুপাখিকে তিনি কম ভালবাসতেন না। বাঘকেও ভালবাসতেন তিনি। শুধু বাঘ মানুষখেকো হয়ে গেলেই...।" মিতিন দু'-এক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল, "পুরুষোত্তম যে সত্যিই পশুপ্রেমিক তা তাঁর ঘরদোর দেখেই অনুমান করা যায়।"

"কীভাবে?"

"ঘরে কোথাও নিজের শিকারের নিদর্শন ছড়িয়ে রাখেননি। এখানে বাঘের চামড়া, ওখানে মোষের শিং, দেওয়ালে হরিণের মুণ্ডু... বীরত্বের কোনও ফাঁপা আড়ম্বর নেই।"

"কিন্তু ভদ্রলোকের ছোট ছেলেটা যেন কেমন কেমন!" টুপুর ফস করে বলে উঠল, "মনে হচ্ছিল আমাদের দেখে একটুও খুশি হননি।"

"হুম। মনে হয় দুই ভাইয়ের সম্পর্ক ভাল নয়। দাদার পরিচিতদের ভাই পছন্দ করে না।"

"তা বলে অভদ্র ব্যবহার করবে?"

"ওটাই হয়তো ওর কথা বলার স্টাইল। ক্ষমতা, টাকাপয়সা, এসব হাতের মুঠোয় থাকলে ওরকম বহু লোকই ধরাকে সরা জ্ঞান করে।"

"হাতিটাকে নিয়েও কেমন কমেন্ট করছিল দেখলে? যেন হাতি

মারা কোনও অন্যায় কাজই নয়!”

“হুম।”

কথায় কথায় টুপুররা বাজারের দিকটায় চলে এসেছে। রাত ন’টা বাজে, অধিকাংশ দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ। শুধু একটা দুটো পান সিগারেটের স্টল খোলা আছে এখনও।

ডানপাশে এক মস্ত দিঘি। স্থানীয় মানুষের স্নানটানের জন্য বোধহয় কাটানো হয়েছিল কোনও সময়ে। মিতিন আর টুপুর দাঁড়িয়ে পড়ল দিঘির পাড়ে। জলে চাঁদের ছায়া। টুপুরের বিকেলটার কথা মনে পড়ছিল। আজ সানসেট যেন তেমন উপভোগ করা গেল না। জঙ্গলে ছাওয়া ধোঁয়া ধোঁয়া নীলচে পাহাড়ের পেছনে কখন যেন ঝুপ করে হারিয়ে গেল সূর্যটা। তবে হ্যাঁ, কিরিবুরুর লোহাখনিটা ভারী বিচিত্র। আস্ত পাহাড়খানাকে কেটে কেটে কী অতিকায় এক খাদান বানিয়ে ফেলেছে! ওটাকে নাকি বলে ওপেন-কাস্ট মাইন। কয়লাখনির মতো গর্ত খুঁড়ে পৃথিবীর ভেতরে ঢুকতে হয় না, ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙো, আর লোহাভরা পাথরের চাঙড় তুলে দাও টিপলারে। লোহাখনির খাদানটাও কী টকটকে লাল। লোহার জন্যেই কি? খাদানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ। ট্রলি বুলডোজার কাটার ক্রেন চলছে-ফিরছে এদিক-ওদিক। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পিঁপড়ের জগৎ।

টুপুরের ভাবনার মাঝেই হঠাৎ দিঘির পাড়ে পার্থর আবির্ভাব। হাঁফাচ্ছে পার্থ। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, “তোমরা এখানে? আমি তোমাদের সানসেট পয়েন্টে খুঁজতে গিয়েছিলাম।”

মিতিন বলল, “এই অন্ধকারে সানসেট পয়েন্টে?”

“ভাবলাম যদি গিয়ে থাকো।... বলে যাবে তো কোথায় যাচ্ছ! অন্যদের চিন্তা হয় না? একে একটা পাগলা হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে...”

“সে তো সারান্ডায়।”

"এটাও তো সারান্ডারই পার্ট। যদি ব্যাটা গুট গুট করে পাহাড়ে উঠে আসে?"

"পিচরাস্তা ধরে? লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে? মিতিন খিলখিল হেসে উঠল।"

"কেন? হাতির বুঝি পিচরাস্তায় হাঁটতে মানা? না কি হাতি লোকালয়ে ঢোকে না?" পার্থ প্রতিবাদ জুড়ল, "তা ছাড়া বেচারার এখন মাথা খারাপ। এখন কি আর ওর স্থানকালপাত্রজ্ঞান আছে?"

"উফ, তোমরা না ভয়েই গেলে।" মিতিন হাসি থামাল, "বুমবুম ঘুমিয়েছে?"

"শুয়েছে। বড়দির কাছে। বড়দি একটার পর একটা গল্প শোনাচ্ছে আর বুমবুম গুনছে, সেভেন হল, এইট হল... টোয়েন্টিফাইভ স্টোরি না শুনে সে আজ চোখ বুজবেই না।"

টুপুর হি হি হাসল, "মা তা হলে খুব টাইট খাচ্ছে?"

"আর তোমার বাবা টাইট দিচ্ছেন। একখানা মাংকিক্যাপ চড়িয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন গেস্টহাউসের রিসেপশনে। ম্যানেজারবাবুর এখন যাকে বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দশা।"

"ওমা, সে কী! কেন?"

"অবনীদা নাকি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছেন। কম্বলে নাকি শীত কাটবে না, তাঁর এখনই লেপ চাই। ম্যানেজার অতিষ্ঠ হয়ে একজোড়া রেজাই আনার জন্য কোথায় যেন লোক পাঠালেন।" পার্থ দাঁত ছড়িয়ে হাসল, "আরও স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার কী জানো? অবনীদা রিসেপশনে বসে ঢুলছেন, কিন্তু কিছুতেই রুমে গিয়ে শোবেন না।"

টুপুর লজ্জিত মুখে বলল, "সত্যি, বাবাটা না বড্ড শীতকাতুরে। গত পুজোয় গ্যাংটকে স্লিপিংব্যাগ নিয়ে গিয়েছিল। হোটেলের বিছানায় স্লিপিংব্যাগে ঢুকে ঘুমোত।"

পার্থ হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতেই ফিরতে শুরু করেছে তিনজনে।

পার্থ টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তোর মাসি কী বলছে? তোকে দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ চলবে?"

মিতিন ফুট কাটল, "তুমি চালাতে পারলে টুপুরও পারবে।"

"আমি শুধু চালাই? আমিই তো রান করাই। আমি না থাকলে তোমার থার্ড-আই-এর তৃতীয় নয়নটি কানা।"

"তাই বুঝি? পরীক্ষা নেব?"

"নাও।"

"বলো তো পুরুষোত্তম সিংহ মানুষটি কেমন?"

"টিপিকাল জঙ্গলের ঠিকাদার। দু'নম্বরি করে প্রচুর কামিয়েছেন।"

"মাইনাস ফাইভ। বুমবুমও এগুলো বলতে পারে।"

"ছেলে দুটোকেও মানুষ করতে পারেননি। একটা পাগল, একটা গোঁয়ার।"

"আর?"

"তারপর ধরো ভদ্রলোকের বাংলা বলা। পঞ্চাশ বছরেরও ওপর ভদ্রলোক দেশছাড়া, কিন্তু এখনও বাংলা উচ্চারণ কী পরিষ্কার!"

"হুম। এটা অবশ্য একটা গুড অবজারভেশন। তবে কী জানো, মাতৃভাষা ভুলতে চাইলে ছ' মাসেই ভোলা যায়। আর না চাইলে মৃত্যু অব্দি ভুলবে না। যেমন ধরো তোমার মাসতুতো ভাই রজত। মাত্র দেড় বছর রজত আমেরিকায় আছে, এখনই কেমন বিকৃত অ্যাকসেন্টে বাংলা বলে শুনেছ তো? অথচ তোমার রঘুজ্যাঠা চুয়াল্লিশ বছর কানাডায় থেকেও এখনও দিব্যি ঢাকাই ডায়লেক্টে গড়গড় করে কথা বলে যান।"

"তা ঠিক।" পার্থ স্বীকার করল, "এটা ম্যান টু ম্যান ডিফার করে।"

"যাকগে, পুরুষোত্তমকে ছেড়ে কাজের কথা শোনো। দুটো জব্বর ইনফরমেশন জোগাড় করেছি।"

"কী?"

"পাগলা হাতিটাকে নিয়ে এখানেও জোর চর্চা চলছে। হাতিটাকে নাকি শেষ দেখা গেছে তিরিলপোসিতে। এবং তিরিলপোসি থলকোবাদ থেকে খুব দূরে নয়।"

"বাহ্, সুখবর। বড়দি অবনীদার ঘরে আটকে থাকাটা পাকা হয়ে গেল।" মিতিন হাসল, "যাকগে, করমপদার খবরটা নিয়েছ? এখান থেকে কদ্দূর করমপদা?"

"ম্যানেজারবাবু তো বললেন কাছেই। থলকোবাদের রুটেই পড়ে। তবে রেঞ্জ আলাদা। করমপদা গুয়া রেঞ্জে। থলকোবাদ পড়ে সামটায়। এখান থেকে করমপদা মিনিট চল্লিশ।"

মিতিন বলল, "তো কাল সকালেই দিদিকে মধুবাবার দর্শন করিয়ে দেবে নাকি?"

"সেইজন্যই তো বলছি। গেস্টহাউসের ম্যানেজারও দেখলাম মধুবাবার গল্প জানেন। কিরিবুরু টাউনেও মধুবাবা নাকি এখন একটা ইভেন্ট। এখান থেকেও অনেকে গিয়ে মধুবাবাকে দর্শন করে এসেছে। এবং তারাও নাকি ভক্তিতে সব গদগদ।"

মিতিন বলল, "ভালই হল। আমরাও কাল যাওয়ার পথে একবার ঢুঁ মেরে নিচ্ছি।"

পার্থ বলল, "বড়দি তো শুনেই লাফাচ্ছেন। মধুবাবার নামে পাগলা হাতির ভয়টয় সব হাপিস।"

টুপুরের মধুবাবাতে আগ্রহ নেই। বলল, "আর তোমার সেকেন্ড ইনফরমেশনটা কী?"

"মেঘাতুবুরুতে ছুটে ছুটে সানসেট দেখতে যাওয়াটা নাকি আমাদের গোখ্‌খুরি হয়ে গেছে। ম্যানেজার বলছিলেন। আমাদের

দেখা উচিত সানরাইজ। কপাল ভাল থাকলে, মানে মেঘ না থাকলে, সূর্যোদয় নাকি অনির্বচনীয়। পুব দিকটা পুরো খোলা তো। নীচে রুপোলি সুতোর মতো বয়ে যাচ্ছে কারো নদী, জলে সোনালি আলো ঠিকরোচ্ছে...”

পার্থর রীতিমতো ভাব এসে গেছে। টুপুর মনে করার চেষ্টা করছিল মেঘাতুবুরুর পথে কারো নামে কোনও নদী সে পার হয়েছে কি না। মনে পড়ছে না। ছিঃ টুপুর, এটাও তোমার অবজারভেশনের ডিফেক্ট...

নির্জন পথঘাট। একটা চাপা গুমগুম শব্দ ভেসে আসছে। ডিনমাইট ফাটছে কি?

উঁহুঁ, আওয়াজ স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। নিস্তব্ধতা চিরে ছুটে আসছে এক মোটরসাইকেল। কিরিবুরু পেরিয়ে যেদিকে জঙ্গল, সেই দিক থেকে। ঘ্যাঁচ করে সামনেই এক পান সিগারেটের দোকানে এসে দাঁড়াল।

আরে, ঝিনিকপানির সেই মোটরসাইকেলটা না? কিন্তু এখন আরোহী মাত্র একজন!

দোকানদার ঝাঁপ নামাচ্ছিল।

লোকটা মোটরসাইকেলে বসেই হেলমেট খুলে হেঁকে উঠল, “অ্যাই, রুক রুক।”

দোকানদার বলল, “কেয়া লেংগে সাব?”

“সিগারেট লা। দো পাকিট। ফরেন। বড়িয়াওয়ালা।”

ছুটে এসে লোকটাকে সিগারেট দিয়ে গেল দোকানদার। বলল, “আউর কুছ চাহিয়ে?”

“সোডা লা। তিন বোতল।”

বোতল তিনটে সাইড-কেরিয়ারে ভরছে লোকটা। সেই সময়েই মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল টুপুর। ফিসফিস করে বলল,

"মিতিনমাসি... যে লোকটা পেছনে বসে ছিল!"

লোকটারও চোখ পড়েছে মিতিনদের ওপর। ঝটপট হেলমেট পরে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে। চামড়ার জ্যাকেট থেকে পার্স বার করে টাকা দিল দোকানদারকে। তারপর সোঁও করে বেরিয়ে গেল, মেঘাতুবুরুর দিকে।

টুপুর মোটরসাইকেলটার মিলিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে বলল, "তার মানে লোকটা মেঘাতুবুরুতে থাকে?"

মিতিন উত্তর দিল না। পার্থ বলল, "সম্ভবত।"

"কিন্তু লোকটা একা কেন? অন্যজন গেল কোথায়?"

পার্থ খ্যাক খ্যাক করে হাসল, "ওরা কি সারাক্ষণ নিতাই গৌর হয়ে ঘুরবে নাকি?"

"তবু...।" টুপুর ঢোক গিলল, "আচ্ছা, ওরা যদি এদিকেই থাকে, তা হলে ঝিনিকপানি থেকে মুরগি কিনছিল কেন? কম নয়, এখান থেকে ঝিনিকপানি তো ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূর।"

"তুই তো বললি ওদের চাইবাসায় দেখেছিস! ফিরছিল, তখন কিনে নিয়েছে।"

"তাই বলে অদ্দূর থেকে? কাছেপিঠে জামদাই তো ছিল।"

"ঝিনিকপানির মুরগির হয়তো কোনও স্পেশ্যালিটি আছে। হয়তো ছিবড়ে কম হয়, স্বাদটা মিষ্টি মিষ্টি..."

টুপুর তেমন সন্তুষ্ট হল না জবাবটায়। মিতিনকে ঠেলল, "ও মিতিনমাসি, বলো না, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না? ওরা চারদিকে ঘুরে-ঘুরেই বা বেড়াচ্ছে কেন?"

মিতিনকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, "আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।"

"কী?"

"লোকটাকে আমি কোথায় যেন দেখেছি!"

"এই মূর্তিমানকে?" পার্থ ভুরু কুঁচকোল।

"না। ওর সঙ্গীটাকে। ঝট করে ওই মুখটা মনে পড়ে গেল। তখনই কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল।"

"কোথায় দেখেছ? চাইবাসায়? টাটায়? ট্রেনে? কলকাতায়?"

মিতিন হতাশভাবে মাথা ঝাঁকাল, "সেটাই তো মনে করতে পারছি না।"

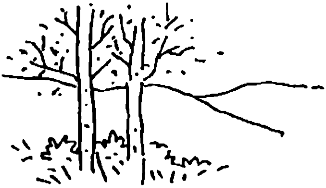

আবার আড়াআড়ি বাঁশ। আবার বনদফতর পথ আটকেছে। করমপদায় থেমে গেল টুপুরদের জিপ।

নজরুল হোসেন প্যাঁ-পোঁ হর্ন বাজিয়েই চলেছেন। জঙ্গলের মধ্যে এত জোরে শব্দ করা উচিত নয়। কিন্তু উপায়ই বা কী, বিট অফিসারের টিকি দেখা যাচ্ছে না যে!

কাছেই একখানা একতলা পাকাবাড়ি। দেখে মনে হয় প্রাইমারি স্কুল। দরজা জানলা বন্ধ, সামনের ফাঁকা জায়গায় আপন মনে ছোটাছুটি করছে গোটাকয়েক বাচ্চা। জিপের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না বাচ্চাগুলো। সম্ভবত এমন জিপ দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত। অদূরে একটি লালচে-দেওয়াল মাটির বাড়ি, মাথায় টিনের চালা। বাড়িটায় লোকজন আছে কি না ঠাহর করা যাচ্ছে না গাড়ি থেকে। যদি কেউ থাকেও, তারা নির্ঘাত কালা। এত আওয়াজেও কেউ একবার উঁকি দিল না?

নজরুল হোসেন স্টিয়ারিং ছেড়ে নামলেন, "হল কী? গেল কোথায় সব?"

সহেলি ঝটিতি বললেন, "মধুবাবার আশ্রমে চলে যায়নি তো?"

অবনী ঝেঁঝে উঠলেন, "তুমি থামবে? মধুবাবা মধুবাবা করে পাগল হয়ে গেলে!"

"তুমি বুঝবে কী করে? তোমার তো আর হাঁটু-কোমরে ব্যথা নেই।"

মিতিন দু' হাত তুলে বলল, "শান্তি, শান্তি। জঙ্গলে ঝগড়া করলে জন্তুজানোয়াররা ঘাবড়ে যাবে। তার চেয়ে বরং নামো, হাত-পা ছাড়াই।"

সেই কোন ভোরে উঠেছে সকলে। মেঘাতুবুরুর সূর্যোদয়ও আজ জমেনি তেমন। দিগন্তে মেঘ ছিল ছেঁড়া-ছেঁড়া। বেজার মুখে গেস্ট হাউসে ফিরে ঝটপট তৈরি হয়ে নিল টুপুররা। তারপর জলখাবার খেয়েই স্টার্ট। থলকোবাদে কিছুই নাকি পাওয়া যাবে না, তাই বনবাসের রসদ সংগ্রহ করতে হল বাজার থেকে। চাল, ডাল, আলু, আটা, ময়দা, তেল, মশলা, নুন, লঙ্কা...। চা চিনি, বিস্কুট, চানাচুর, গুঁড়ো দুধ। ঝিনিকপানির মুরগিবধের দৃশ্য এখনও টুপুরের চোখ থেকে মোছেনি, সহেলিও জ্যান্ত মুরগি বেঁধে নিয়ে যেতে রাজি নন, তাই মুরগি শেষ পর্যন্ত বাদই দেওয়া হল। তার বদলে নেওয়া হল অফুরন্ত ডিম।

বড় বড় ব্যাগে যজ্ঞিবাড়ির বাজার নিয়ে কিরিবুরুর ঢাল বেয়ে জিপ নেমে গেল জঙ্গলে। তারপর অরণ্য ভেদ করে যাত্রা। কী অপূর্ব যে কাটল সময়টা। চারধারে অগুন্তি শালগাছ, মধ্যিখান দিয়ে রাস্তা, মাঝে-মাঝে শিশু, মহাশিমুল, সেগুন, কেঁদ আর মহুয়াও ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে। সেগুন আর মহুয়া গাছগুলো থোকা থোকা সাদা ফুলে ঢাকা। ভারী মিষ্টি একটা গন্ধে ছেয়ে ছিল গোটা পথ। পাশাপাশি অন্য একটা গন্ধও লাগছিল নাকে। জঙ্গলের গন্ধ। বুনো বুনো। কত যে নাম-না-জানা পাখি ডেকে উঠছিল জঙ্গলে। জিপের

যান্ত্রিক শব্দে ফুড়ুত করে উড়ে পালাচ্ছিল তারা, হারিয়ে যাচ্ছিল ঘন পাতার আড়ালে।

সরু নালার মতো একটা নদীও সঙ্গে সঙ্গে চলল অনেকক্ষণ। কখন যেন কোন বাঁকে হারিয়ে গেল। এই নদীটার নামই কি কারো? না কি ওটা নদী নয়, নেহাতই কোনও নালা?

এখন করমপদায় জঙ্গল অনেকটাই ফিকে। তাও সূর্যকিরণ সরাসরি পৌঁছতে পারছে না মাটিতে, নরম সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। গাছগাছালির নীচে আবছায়া। জঙ্গলের মাটি ঢেকে আছে চৈত্রের শুকনো পাতায়।

টুপুর অ্যান্ড কোম্পানি নেমে পড়ল জিপ থেকে। পার্থ গাড়ির বনেট ধরে ওঠবোস করে নিল একটু। ব্যায়ামের ভাষায় একে নাকি বলে বৈঠক। অবনীর পরনে আজ পাজামা-পাঞ্জাবি। এতক্ষণ আষ্টেপৃষ্ঠে শালও জড়ানো ছিল। এবার গরম লাগছে, তাই শালখানা রেখে দিলেন গাড়িতে। পায়চারি করছেন। পরীক্ষার হলে গার্ড দেওয়ার ভঙ্গিতে। ছাত্রদের টুকলি আবিষ্কার করার মতো করে সরু চোখে দেখছেন প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি। সহেলি জিপের গা ঘেঁষে এমনভাবে দাঁড়িয়ে, যেন বিপদের আশঙ্কা দেখতে পেলেই টুক করে গাড়িতে উঠে পড়বেন। বুমবুম উল্লাসে বিকট শব্দ করতে করতে খানিক স্প্রিন্ট টানল। এবার টুপুরদিদির ক্যারাটের স্টাইল নকল করে হাত-পা ছুড়ছে শূন্যে। গলায় হুহ্-হা, হুহ্-হা।

নজরুল গেছে বিট অফিসারের সন্ধানে। মিতিন ঘুরে ঘুরে চারদিকটা দেখছিল। আপন মনে বলল, "সাড়ে দশটা বাজে, কখন যে থলকোবাদ পৌঁছব!"

সময় নিয়ে সহেলি ভাবিত নন। তিনি বললেন, "চল না মিতিন, এই ফাঁকে মধুবাবাকে দর্শন করে আসি।"

টুপুর অসহিষ্ণু মুখে বলল, "এখন নয়। এখন কোনও

মধুবাবা-ফদুবাবা হবে না। ও মিতিনমাসি, বাঁশ ফেলা গেটের দু'পাশটাই তো ফাঁকা, গাড়ি সাইড দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না?"

অবনী তর্জনী তুললেন, "খবরদার, আইন ভাঙবে না। অপেক্ষা করো।"

টুপুর মুঠো পাকাল, "আর কতক্ষণ?"

বেশিক্ষণ অবশ্য দাঁড়াতে হল না। নজরুল পাকড়ে এনেছেন বনকর্মীকে। কেরোসিন কিনতে গিয়েছিল আদিবাসী তরুণটি।

খালি গা, খাকি ট্রাউজার, হাতে কেরোসিনডিব্বা বনকর্মীটি অপ্রস্তুত মুখে বলল, "দুকান মে লাইন ছিল স্যার।"

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "করমপদাতেও কিউ? কত লোক থাকে এখানে?"

উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে দ্রুত টিনের চালায় গিয়ে একটা পেল্লাই চাবি নিয়ে এল তরুণটি। চাবি ঘুরিয়ে লোহার আংটা খুলতেই তড়াং করে দাঁড়িয়ে গেছে বাঁশ।

নজরুল ওপারে গাড়ি নিয়ে গেলেন। অবনীই একমাত্র উঠে বসলেন সিটে। নিজস্ব রাষ্ট্রভাষায় সহেলি বনকর্মীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই, করমপদামে মধুবাবার আশ্রম কাঁহা হ্যায়?"

বনকর্মী রীতিমতো চমকিত, "আপ মধুবাবাকো পহচানতেঁ?"

"এদিকে আসা ইস্তক নাম শুনছি খুব।"

"হাঁ, মধুবাবা বহুত বড়া মহারাজ আছেন। যা ছোঁবেন, তাই মিঠা হবে। যা বলবেন, ফলিয়ে যাবে।" তরুণটির চোখে আপ্লুত ভাব, "হামার বিবির বারবার বুখার হচ্ছিল। দো দিন মধুবাবাকা মিঠা পানি পিয়েছে, ব্যস, বুখার গায়েব। সে এখন বাপ কা ঘর চলিয়ে গেল।"

"মিঠাপানি খেয়ে সোজা বাপের বাড়ি?" পার্থ টিপ্পনি কাটল, "তোমার তো তা হলে এখন মহা গেরো, হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হচ্ছে?"

পার্থর রসিকতা বুঝল না তরুণটি। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তা ভাই, তোমাদের মধুবাবার আশ্রম এখান থেকে কদ্দূর?"

"এই তো, সামনেই আছে। ইধার এক হাট লাগতা হ্যায়, উস হাটকা বগলমে এক মন্দির আছে, বাবা ওঁহি'পর থাকেন। রেললাইনকে উস পার।"

"এখানে রেললাইনও আছে নাকি?"

"স্টিশান ভি আছে। কিরিবুরুসে আসে ট্রেন, বারসোই তক যায়।"

"বলো কী! বারসোই তো ওড়িশায়?"

"জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লাইন আছে দিদি। লোহাপাথর চালান যায় ট্রেনে। আদমি ভি যায়।"

"লাইনটা কি কিরিবুরু থেকেই শুরু?"

"কী আবোল তাবোল ভ্যাজরং ভ্যাজরং করছিস মিতিন?" সহেলি অধৈর্য হলেন, "বলো তো ভাই, এখন গেলে বাবার দর্শন হবে?"

"আজ তো নেহি হোগা। বাবা তো আভি করমপদামে নেহি হ্যায়।"

"সে কী!" সহেলির মাথায় হাত, "মধুবাবা চলে গেছেন?"

"দো চার দিনকে লিয়ে। রাউরকেলাসে এক চেলা এসে নিয়ে গেল।"

"ও। ফিরবেন কবে?"

"কাল। নেহি তো পরশু। এখানে পরশু হাট আছে। হাটের দিন বাবা জরুর বসবেন বলেছেন।"

পার্থ বলল, "তা হলে আর কী বড়দি, চলুন। পরশুই আসব।"

"হাঁ, আসেন। আপনারা জঙ্গলমে কতদিন থাকছেন?"

“থলকোবাদে পাঁচদিনের বুকিং। পূর্ণিমাতে জঙ্গল দেখে তবে ফিরব।”

“বহুত আচ্ছা। পরশু তবে দু’পহরে চলিয়ে আসেন। সিধা আমার কাছে আসবেন। বাবা ফরেস্টের স্টাফদের বহুত খাতির করেন, আমি আপনাদের লিয়ে গিয়ে ইস্পিশাল দর্শন করিয়ে দেব।”

সহেলি মহা খুশি, “আমরা তবে পরশুই আসি, কী বলো?”

মিতিনের প্রশ্ন এখনও ফুরোয়নি। জিজ্ঞেস করল, “বাবা কি এরকম মাঝে-মাঝেই চেলাদের বাড়ি চলে যান?”

“ডাকলে যান। একবার কিরিবুরু ভি গিয়েছিলেন।”

“তা ক’দিন এখানে এসেছেন মধুবাবা?”

“জাদা দিন নেহি।” বনকর্মীটি মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বলল, “এক মাহিনাসে ভি কম। হোলিকে দিন এসেছিলেন।”

স্কুলমাঠের বাচ্চাগুলোর কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বুমবুম। বড়দের মতো ছোটদের খেলা নিরীক্ষণ করছিল। পার্থ তাকে ধরে এনে জিপে পুরে দিল। নিজেও উঠতে যাচ্ছিল, কী ভেবে আবার এল বনকর্মীটির কাছে, “ভাই, শুনলাম জঙ্গলে একটা হাতি নাকি পাগল হয়ে গেছে?”

“হাঁ। সামটা রেঞ্জের সাহাব কাল এসেছিলেন। সাবধান করিয়ে গেছেন। ফরেস্টগার্ডরা ভি গণেশজী কো ঢুঁড়নে কে লিয়ে জঙ্গলে ঘুরছে।”

“পাগল হল কেন হাতিটা?”

“কেয়া মালুম! চোট ওট লাগা হোগা। অ্যায়সা হোতা কভি কভি।”

টুপুর সামান্য অবাক হল। হাতির গুলি খাওয়ার কথা কি জানে না বনকর্মীটি?

পার্থ জিজ্ঞেস করল, “তেমন ভয়ের কিছু নেই তো?”

“গাড়ি নিয়ে জঙ্গলে বেশি যাবেন না। আর যদি যান তো সুমায়াকে সাথমে লিবেন।”

“সুমায়া কে?”

“থলকোবাদ রেস্টহাউসকা চৌকিদারকা বেটা। বহুত চালু লেড়কা। সুমায়া রহনেসে আপনাদের কুছু হবে না।”

“যাক, একটা কাজের কাজ হল।” পার্থ নিশ্চিন্ত, “ভাল একটা গাইডও পাওয়া গেল।”

জিপ চলতে শুরু করার পরও কিছুক্ষণ মধুবাবা আর সুমায়াকে নিয়ে আলোচনা হল। জঙ্গলের মধ্যে কখন ঢোকা হবে, ঢুকলেও রাত্তিরে একদম নয়, এসব নিয়েও কথা হল খানিক।

থলকোবাদ যাওয়ার রাস্তাটা বেশ জটিল। কখনও জঙ্গল অসম্ভব ঘন, লতাপাতা গাছগাছালিতে অন্ধকার হয়ে থাকে। কোথাও আবার একেবারেই খোলামেলা, মাঠ-মাঠ। পথে ছোট-ছোট গ্রামও পড়ল এক-আধটা। কখনও রাস্তা দুর্গম হচ্ছে। খাড়া চড়াই ভেঙে অনেকটা উঠতে হচ্ছে জিপকে, গোঁ গোঁ করছে ইঞ্জিন। ঘন ঘন বাঁক। একপাশে জঙ্গল, একপাশে খাদ। নজরুলের মতো হাসিখুশি মানুষেরও চোয়াল শক্ত, এক মুহূর্তের জন্যও উইন্ডস্ক্রিন থেকে চোখ সরাচ্ছেন না। পলকের অসাবধানতা পাহাড়ি রাস্তায় বিপদ ডেকে আনে।

কিছুদূর অন্তর অন্তর শুকনো পাতা আর কাঠকুটোর ডাঁই। সযত্নে জড়ো করা। টুপুর অবনীকে জিজ্ঞেস করল, “কারা এভাবে রেখে গেছে বাবা? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক?”

“না রে।” অবনী বললেন, “রেখেছে গাঁয়ের লোকজন। এই ফাল্গুন-চৈত্রই তো ওদের কাঠকুটো কুড়নোর সময়।”

“কেন?”

“পোড়াবে। ছাই ছড়িয়ে দেবে চাষের জমিতে। তারপর

পাহাড়ের গায়ে ওইসব জমিতে ওরা চাষ শুরু করবে। একে বলে ঝুম চাষ।"

"পাতাটাতা পোড়ানোর আরও একটা কারণ আছে অবনীদা।" পার্থ বিজ্ঞ মতামত দিল, "শুকনো পাতা সাফ না করলে মাটিতে রোদ জল পৌঁছবে কী করে?"

টুপুর মনে মনে ঠিক করল, এই কথাগুলো আজই ডায়েরিতে লিখে নিতে হবে।

থলকোবাদ পৌঁছতে বারোটা বাজল। গোটা পথ সবাই সতৃষ্ণ নয়নে বাইরে তাকিয়ে ছিল, যদি কোনও জন্তুজানোয়ার দেখা যায়। কোথায় কী! একটা জন্তুকে শেয়াল মনে হল, কাছে গিয়ে বোঝা গেল সেটি একটি নিরীহ কুকুর।

থলকোবাদের বিট অফিসার বেশ প্রবীণ মানুষ। গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মাথায় ছড়ানো টাক। নাম দীননাথ সহায়। দীননাথ কথা বলেন ধীরেসুস্থে, নড়াচড়াও করেন অলস মেজাজে। টুপুররা যখন পৌঁছল, তিনি তখন নিজস্ব কোয়ার্টারের দাওয়ায় বসে আরাম করে গায়ে সরষের তেল মাখছিলেন। নামেই কোয়ার্টার, আদতে মাটির বাড়ি। উঠোনে মুরগি চরে বেড়াচ্ছে, সপরিবারে।

বিট অফিসের ইয়া জাবদা খাতায় নামধাম লিখতে হচ্ছে পার্থকে। বাকিরা পায়ে পায়ে বনবিশ্রামাগারের দিকে এগোল। রেস্টহাউসটা বেশ খানিক উঁচুতে, দীননাথের কোয়ার্টার থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে।

কাছাকাছি আসতেই এক হেঁড়ে গলার গান, "আমার যাওয়ার সময় হল, দাও বিদায়...।"

টুপুর আর মিতিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। রেস্টহাউসের কাঁটাতার ঘেরা কম্পাউন্ডে এসে আবিষ্কার করল গায়ককে। এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক। প্রকাণ্ড চেহারার মানুষটি গান গাইতে গাইতে

জিপে মালপত্র তুলছেন। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোকও আছেন, তিনজন মহিলাও।

টুপুরদের দেখেই ভদ্রলোক বললেন, "সুস্বাগতম, সুস্বাগতম।"

মিতিন বলল, "আপনারা...?"

ভদ্রলোক মজার ভঙ্গিতে গেয়ে উঠলেন, "তোমার হল শুরু, আমার হল সারা...।"

অবনী গানটান বেশি বোঝেন না। ভুরু কুঁচকে বললেন, "মানে?"

"আমাদের জঙ্গল দেখা শেষ। থলকোবাদ এবার আপনাদের জিম্মায়।"

মিতিন হাসতে হাসতে বলল, "কেমন দেখলেন জঙ্গল?"

রসিক ভদ্রলোক এককথায় উত্তর দিলেন না। বললেন, "ভাল বলব না মন্দ বলব ভেবে পাচ্ছি না। পাক্কা ছ'দিন রইলাম, নো টাইগার, নো ভালুক, নো হাতি, নট ইভ্ন বুনো শুয়োর...। শুধু একপাল হনুমান এসে কাল রেস্টহাউসের মাথায় দাপাদাপি করেছিল। একদিনই মাত্র তিনটে শম্বর হরিণ দেখেছি। তাও ফর ফিউ সেকেন্ডস। আমাদের দেখে হরিণগুলো এমন লজ্জা পেল...।"

"অর্থাৎ জঙ্গল-ভ্রমণ ফ্লপ?"

"পুরোটা নয়। জঙ্গলের বিউটি দেখেছি। মারভেলাস।" বলেই ভদ্রলোক ডাকলেন, "ব্রতীন, ক' রিল যেন ছবি তোলা হল?"

ডিগডিগে লম্বা ভদ্রলোকের চটপট জবাব, "দু' রিল শেষ। প্লাস থার্ড রিলের সাতটা।"

"অর্থাৎ সেভেন্টিনাইন ফিল্মস। বুঝতেই পারছেন, ছ'-ছ'টা দিন দেড়েমুশে এনজয় করেছি। গোটা থলকোবাদ এখন আমাদের ক্যামেরায় বন্দি। হা হা হা।"

টুপুর ফস করে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা পাগলা হাতিটাকেও দেখতে পাননি?"

"গপ্পোটা এরা বাইরেও চাউর করে দিয়েছে?" ভদ্রলোক অবনীর দিকে ফিরলেন, "পুরো গাঁজাখুরি কেস মশাই। টুরিস্টদের প্রাণ খুলে বেড়ানোয় বাধা দেওয়ার চেষ্টা। ওই হাতি দেখিয়েই আমাদের পরশু থেকে আটকে রেখেছে। আরে মশাই, সুস্থ হাতিই নজরে এল না, তো পাগলা হাতি!"

অবনী বললেন, "জঙ্গলে জন্তুদর্শন-ভাগ্য সবার সমান হয় না।"

"এটা হক কথা।" ভদ্রলোক মাথা দোলালেন, "দেখুন, আপনাদের যদি চোখে পড়ে। খুঁজে পেলে পাগলা হাতিকে পাগলাগারদে দিয়ে আসবেন। কাছেই তো রাঁচি।" নিজের রসিকতায় ভদ্রলোক নিজেই হাসছেন ফের, "ওসব হাতিফাতি ছাড়ুন। এখানকার আসলি জিনিসটা অবশ্যই দেখে যাবেন।"

"কী?"

"করমপদার মধুবাবা। রিয়েল সেন্টলি পারসন। টাকাপয়সার লোভ নেই, হামবড়া ভাব নেই..."

সহেলি গদগদ গলায় বলেন, "আপনারা বুঝি তাঁকে দেখে এসেছেন?"

"দু'বার। আসার দিন করমপদার বিট অফিসারের মুখে শুনে খুব কৌতূহল হয়েছিল। বিকেলেই গেছিলাম দেখতে। বিশ্বাস করবেন না, রীতিমতো তাক লেগে গেল। একটা লঙ্কাতে হাত ঘষে দিলেন, অমনই ঝাল লঙ্কা মিষ্টি বনে গেল! প্রণামী দিতে গেলাম, হাঁ হাঁ করে আটকে দিলেন। বললেন, টাকা ছুঁলেই নাকি ওঁর গায়ে ফোস্কা পড়ে! তার পরেও মনটা খুঁতখুঁত করছিল। মনে হচ্ছিল, ভেলকিবাজি দেখিয়ে বোকা বানাচ্ছেন না তো? পরদিনই সকালে আবার গেলাম। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, কী রে, আমায় বিশ্বাস না করে কষ্ট পাচ্ছিস তো? আয়, তোর সব দ্বিধা দূর করে দিই! বলেই আমার হাতে হাত বুলিয়ে দিলেন। কী কাণ্ড, আমার হাত পর্যন্ত মিষ্টি হয়ে

গেল! এমন যোগসিদ্ধ সাধু অনেক কপাল করলে দেখা যায় মশাই।”

“বলছেন?”

“আলবাত। পারলে একবার দেখা করে আসবেন। সারান্ডা বেড়ানো সত্যিই সার্থক হবে।”

ভদ্রলোকের সঙ্গীরা ডাকাডাকি শুরু করেছেন। ভদ্রলোক হাত নেড়ে বিদায় নিলেন।

সহেলি কড়া গলায় বললেন, “কী, এবার বিশ্বাস হল তো?”

টুপুর ধন্দে পড়ে গেল। সত্যিই কি মানুষের ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে?

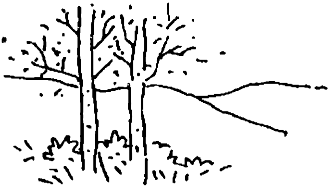

বাড়িটা ইউ শেপের। দু'পাশের দুই বাহুতে তিনখানা তিনখানা করে মোট ছ'খানা ঘর। ইউ-এর তৃতীয় বাহুটি বনবিশ্রামাগারের ডাইনিং হল। খাবার টেব্‌লটি রীতিমতো প্রকাণ্ড, সেখানে স্বচ্ছন্দে জনা কুড়ি লোক আহারে বসতে পারে।

ডাইনিং হলের পিছনে কিচেন। বড় বড় দু'খানা উনুন আছে রান্নাঘরে। জ্বালানি হিসেবে শুধু কাঠই ব্যবহার হয়। সরু মোটা বেঁটে লম্বা নানান মাপের শুকনো ডালপালা রান্নাঘরে মজুত।

রান্নাবান্না করে বনবিশ্রামাগারের চৌকিদার। সারগিয়া। ষাটের কাছাকাছি বয়স। কপালে বলিরেখা এসে গেলেও তার শরীরটি বেশ শক্তপোক্ত। কোনও কাজেই সে না বলে না, সর্বক্ষণই তার মুখে হাসি লেগে আছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই টুপুরের সঙ্গে আলাপ জমে গেছে সারগিয়ার। বাংলা বুঝতে পারে সারগিয়া, ভাঙা ভাঙা বলতেও পারে। এই বাংলোয় সে প্রায় চল্লিশ বছর চাকরি করছে। এখানে যারা বেড়াতে আসে তাদের বেশিরভাগই বাঙালি, ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে কথা বলে-বলেই সারগিয়া মোটামুটি ভাষাটা রপ্ত করে নিয়েছে।

দুপুরে আজ খাওয়ার আয়োজন অতি সংক্ষিপ্ত। খিচুড়ি, ডিমভাজা, আলুভাজা আর ঘি। সারগিয়া চালে-ডালে খিচুড়ি বসিয়ে দিল, তারপর বাঁক কাঁধে চলল টুপুরদের স্নানের জল আনতে।

টুপুর আর বুমবুম সারগিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। খেটো ধুতি পরা সারগিয়ার গা খালি, বুকে পিঠে অজস্র কাটাছেঁড়ার দাগ।

টুপুর প্রশ্ন করল, "তোমার গায়ে ওগুলো কীসের দাগ, সারগিয়াদাদা?"

"ভালুক আঁচড়ে দিয়েছে।" সারগিয়ার নিরুত্তাপ উত্তর, "অনেক সাল আগে। আমার উমর তখন তেইশ-চব্বিশ হবে। জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়েছিলাম, অচানক মহুয়া গাছের পেছন থেকে ভালুকটা এসে গায়ে লাফিয়ে পড়ল। তখন আমার শরীরে তাকত অনেক বেশি ছিল, খুব লড়াই হল ভালুকের সঙ্গে। ভালুক ভি ছাড়বে না, হামি ভি নেই ছোড়ুঙ্গা...। আধা ঘণ্টা পর ভালুক পালিয়ে গেল। তখন আমার গা দিয়ে খুন ঝরছে। চাইবাসায় নিয়ে যেতে হয়েছিল আমাকে, এক মাস হাসপাতালে ছিলাম।"

"তার মানে তুমি শেষ পর্যন্ত জিতেছিলে সেদিন?"

"জঙ্গলে জিত হার নেই দিদি। সেদিন ভালুকটা মাতাল ছিল, বহুত মহুয়া খেয়েছিল ব্যাটা। নেশায় না থাকলে ওই ভালুক তো সেদিন আমায় চিরে খতম করে দিত।"

বুমবুম অবিশ্বাসের স্বরে বলল, "যাহ্, ভালুক আবার নেশা করে নাকি?"

"করে বইকী খোকাবাবু! ভালুক আদমি সে ভি জাদা নেশা করে।"

খোকাবাবু বলে ডাকলে বুমবুম ভীষণ বিরক্ত হয়। পলকে তার মুখ হাঁড়ি। আর কথা বলছে না, গোঁজ হয়ে হাঁটছে। একটা লাঠি কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে, সপাং সপাং লাঠি চালাচ্ছে হাওয়ায়।

ঢাল বেয়ে নামতেই রাস্তার ধারে এক ক্ষীণ জলধারা। রাস্তা থেকে খানিকটা নিচুতে পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে প্রায় নিঃশব্দে। জলটার রং কালচে।

বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র পায়ে জলধারার কাছে নেমে গেল সারগিয়া। টিনে জল ভরছে।

বিট অফিসারের ঘরের দিক থেকে হঠাৎ একটা ছেলেকে আসতে দেখা গেল। টুপুরের থেকে কিছুটা বড়ই হবে। কালোকুলো হাট্টাকাট্টা চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, প্যান্ট শার্ট পরা, হাতে বাজারের থলি।

টুপুরদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটা। দুর্বোধ্য ভাষায় সারগিয়াকে কী যেন বলছে। সারগিয়াও চেঁচিয়ে উত্তর দিল, আঙুল দেখাচ্ছে ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা দৌড়ল রেস্টহাউসের দিকে।

সারগিয়া জল নিয়ে উঠে আসতেই টুপুর বলল, "ও কে গো?"

"আমার ছেলে। সুমায়া।"

"ও। এই তা হলে সুমায়া? ও নাকি খুব জঙ্গল চেনে?"

"হাঁ খোকি। বিলকুল আমার মতো হয়েছে। দিনরাত জঙ্গলে ঘুরছে।"

টুপুরকে খুকি বলাতে বুমবুম মহা খুশি। তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে, ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে ছুড়ছে জলে।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "তোমার বুঝি ওই একটাই ছেলে?"

"আমার তিন লেড়কা, তিন লেড়কি।" বাঁক কাঁধে দুলে দুলে হাঁটছে সারগিয়া। হাঁটতে হাঁটতেই নিজের কথা শোনাচ্ছে, "আমার বড় মেয়ের শাদি হয়েছে নোয়ামুন্ডিতে। মেজোর করঞ্জিয়ায়। আর ছোট বেটির কিরিবুরু। বড়া দুই লেড়কা ভি কিরিবুরুতে আছে। মাইনে কাজ করে। ওরা পড়ালিখা ভি জানে। স্কুল পাশ করেছে। স্রেফ এই সুমায়াই পড়াই করল না। জামদার বোর্ডিং-এ রেখে এলাম, পালিয়ে এল। জঙ্গল ছেড়ে ও এক দিন থাকতে পারে না।"

টুপুর বলল, "খুব খ্যাপা আছে তো!"

"জংলি আছে।" সারগিয়ার স্বরে হালকা বিরক্তি, "থাক, জঙ্গলেই থাকুক। দো সাল বাদ আমার রিটারমিন, তখন ও আমাদের বুড়াবুড়ির দেখভাল করবে। রেঞ্জারসাব বলেছেন, থলকোবাদের চৌকিদারের পোস্টের জন্য সুমায়াকে রেকমিন্ড করবেন।"

"ভালই তো। সাহেবের রেকমেন্ডেশনে চাকরিটা হয়ে গেলে সুমায়ার পাকাপাকি হিল্লে হয়ে যাবে।"

"তা হবে। তবে তার আগে আমি ওর ডানা ছেঁটে দেব দিদি। শাদি দিয়ে দেব সুমায়ার। ইস সালই। লেড়কি ভি দেখা আছে।"

টুপুর হেসে গড়িয়ে পড়ল, "ওইটুকু ছেলের বিয়ে দেবে কী?"

"ছোট কোথায়? পন্দরা বরস পুরে গেছে। আমার তো শাদি হয়েছিল তেরো বছর বয়সে।"

কথায় কথায় রেস্টহাউসে পৌঁছে গেছে টুপুররা। বাথরুমে জল দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সারগিয়া, টুপুর আর বুমবুম এসে দাঁড়াল রেস্টহাউসের চাতালটায়। সেখানে এখন সুমায়াকে ঘিরে ছোট্ট জটলা।

পার্থ জেরা করছে সুমায়াকে, "তুমি তা হলে বলছ জন্তুজানোয়ার দেখা যাবে?"

সুমায়া বলল, "হাঁ সাব।"

"আগে যারা ছিল তারা যে বলে গেল কিচ্ছু চোখে পড়েনি?"

"ওঁরা তো ঘর ছেড়ে বেরোতেনই না সাব। সারাদিন বসে বসে তাস খেলতেন। স্রেফ দুপুরবেলায় এক দো ঘণ্টার জন্য ঘুমোতেন, ব্যস। বেশি দূর ভি যেতেন না। জাদা সে জাদা সাত আট কিলোমিটার। ইতনা নজদিক কোন জানোয়ার মিলবে? বহুত ডরপুক থে উয়োলোগ। পাগলা হাতির খবর শুনে তো রুমসে নিকালনা বিলকুল বন্ধ কর দিয়ে থে।"

টুপুর তো হাঁ। ভদ্রলোক তো ডাহা মিথ্যেবাদী। উঁহুঁ, মিথ্যেবাদী নয়, চালবাজ। এমন ভান করলেন, যেন গোটা জঙ্গলটা চরকি মেরে বেড়িয়েছেন। শুধু কথাবার্তা শুনেই কোনও লোক সম্পর্কে ধারণা করা যে কী কঠিন!

পার্থ বলল, "তার মানে তুমি বলছ জন্তু দেখতে গেলে আমাদের ভোরে বা সন্ধেবেলায় বেরোতে হবে?"

"হাঁ সাব। এমনি টাইমে হরিণ ছাড়া কিছু মিলবে না। আলো যখন কম থাকে, তখনই জানোয়ার জাদা দেখা যায়। রাতে বেরোতে পারলে তো সবচেয়ে ভাল।"

সহেলি আঁতকে উঠলেন, "না, না, রাত্তিরে বেরোতে হবে না। সাপখোপ আছে, কোন দিক থেকে বাঘ ভালুক গায়ে লাফিয়ে পড়বে ঠিক নেই..."

টুপুর বলল, "আমরা তো জিপে থাকব মা।"

"ওই পাগলা হাতিটা এসে গেলে? সে তো জিপ নিয়ে ফুটবল খেলবে!"

সুমায়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হাতি যেদিকে আছে, রাতে সেদিকে যাব কেন মা-জি?"

"তুমি বুঝি জেনে বসে আছ ওই হাতি কোথায় থাকবে?"

"আমি বুঝতে পারি মা-জি। জানোয়ার যেমন আদমির গন্ধ পায়, আমিও তেমনই জানোয়ারের গন্ধ পাই।"

"বলো কী হে!" পার্থর চোখ বড় বড়, "তুমি কি টারজান? একমাত্র টারজানই তো বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডারের গন্ধ পেত জানতাম!"

সুমায়া কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "নেই সাব, সচ্ বাত। আমি বুঝতে পারি। আমিই তো পাগলা হাতিকে প্রথম দেখেছি।"

"আচ্ছা?" অবনী সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। "কোথায় দেখলে?"

"তিরিলপোসির বাংলো থেকে আরও দো কিলোমিটার আগে। ওখান দিয়ে সালাই যাওয়ার একটা রাস্তা আছে, ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে ডাকছিল। খুন বেরোচ্ছিল হাতির শুঁড় দিয়ে। বুড়া হাতি, ভাল করে চলতে ভি পারছিল না।"

"তারপর?"

"আমিই তো গিয়ে রেঞ্জারসাবকে খবর দিলাম।"

"তুমি বুঝলে কী করে পাগল হয়ে গেছে?"

"পাগল না হলে হাতি কক্ষনও দল ছাড়ে না। দল যখন ওকে ছেড়ে দিয়েছে, তার মানেই ও দল থেকে বাতিল। পাগলা হাতি আর বুড়া হাতি, ইয়ে দোনোকো দলমে জাগাহ্ নেহি। ও এখন একা একাই ঘুরবে, আর চারদিকে ক্ষতি করে বেড়াবে। গাঁয়ে ঢুকে আদমিকে পিষে দেবে।"

"তেমন কিছু করেছে নাকি?"

"আভি তক তো করেনি। যাতে কিছু না করতে পারে এইজন্যই তো আমি রেঞ্জ অফিসে খবর করে দিলাম। ওরা এখন টিম পাঠাবে, হাতিটাকে পাকড়াও করবে।"

"পাগলা হাতিকে ধরে কী করা হবে?"

"হাতির তো গোলি লেগে গেছে সাব। গোলি বার করতে হবে না?"

"তুমি দেখেছ গুলি লেগেছে?"

"হাঁ সাব। জখম দেখেই বোঝা যাচ্ছে।"

"কত কাছ থেকে দেখেছ তুমি?"

"দশ বারা হাত।"

অবনীর বিশ্বাস হল না। বললেন, "অত কাছে গেলে, আর হাতি তোমায় কিছু বলল না?"

"হাতির তখন বহুত দর্দ্ হচ্ছিল সাব। ব্যথায় ছটফট করছিল। আমাকে নজর করেনি। জখম একদম টাটকা, এক দো দিন কা অন্দর লেগেছে গোলি।"

মিতিন চুপচাপ সব শুনছিল এতক্ষণ। হঠাৎ প্রশ্ন জুড়ল, "তুমি কবে দেখেছ হাতিটাকে?"

"পরশু। পরশুই খবর করে দিলাম।"

"কিন্তু গুলিটা করল কে?"

"কৌন জানে! হোগা কোই শয়তান। এসেছে কোথাও থেকে। এ জঙ্গলে কত দিক থেকেই তো ঢোকা যায়। গুয়াসে, মনোহরপুরসে...ওড়িশাসে ভি আসতে পারে।"

সারগিয়া বেরিয়ে এসে হাঁক পাড়ছে, "এই সুমায়া, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গপ্‌সপ্ করলেই হবে? বাবুদের পিনে কা পানি কে আনবে?"

আসর ভেঙে গেল। সুমায়া কাজ করতে ছুটেছে।

টুপুররাও পায়ে পায়ে যে যার নিজের ঘরে।

থলকোবাদের রেস্টহাউসটি তেমন দেখনবাহার নয় বটে, তবে ঘরগুলো মোটামুটি চলনসই। প্রতি ঘরেই দু'খানা করে চৌকি পাতা। চৌকির ওপর বিছানাও বেশ পরিচ্ছন্ন। চেয়ার-টেব্‌ল,

আলমারি, আয়নাও আছে ঘরে। লাগোয়া একখানা অ্যান্টিরুমও। বাথরুমও নেহাত ফ্যালনা নয়, বাথরুমের জানলা দিয়েও দিব্যি জঙ্গলের শোভা দেখা যায়।

টুপুর স্নানটান সেরে মিতিন পার্থদের ঘরে এল। এ ঘরটা একেবারে প্রান্তে। জানলার বাইরেই জঙ্গল। দুপুরবেলাতেও জঙ্গলে বেশ অন্ধকার, চোখ পড়লে গা ছমছম করে ওঠে। কী নিঝুম! এই ঘরটাই টুপুরের বেশি পছন্দ ছিল, মিতিনমাসিও এ-ঘরেই তাদের থাকতে বলেছিল। কিন্তু সহেলি কিছুতেই রাজি হননি। রাতদুপুরে জানলায় যদি ভালুক এসে দাঁড়ায়!

পার্থ স্নানে গেছে। মিতিন চুল আঁচড়াচ্ছিল। টুপুরকে বলল, "মশার ধূপগুলো মনে করে ঘরে নিয়ে যাস্। দুপুরবেলাতেই জ্বালিয়ে দেওয়া ভাল।"

"খুব মশা আছে কি? কামড়াচ্ছে না তো।"

"জানলার জাল দেখে বুঝতে পারছিস না? মশারিগুলোই বা বিছানায় দিয়ে গেছে কেন? বিনা কারণে? জঙ্গলের মশা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। বিশেষ করে সারান্ডার আর সিমলিপালের। মুকুলবাবু ট্রেনে সাবধান করে দিয়েছিলেন, মনে নেই?"

"সত্যি ম্যালেরিয়া হয়?"

"যে-সে ম্যালেরিয়া নয়। ফরেস্ট ম্যালেরিয়া। ফ্যালসিফেরাম জীবাণু থেকেই হয়। খুব খারাপ ধরনের অসুখ। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ব্রেন অ্যাটাক করে, ঘাড় স্টিফ হয়ে যায়, এবং তারপরে অক্কা। তোর মাকে আবার গল্প করিস না, শুনলে তোর মা আরও নার্ভাস হয়ে যাবে।"

"সে আর বলতে।" টুপুর মুচকি হাসল। চোখ চালিয়ে দেখছে ঘরখানাকে। বলল, "পোকামাকড়ও কম নেই!"

"জঙ্গলে পোকামাকড় থাকবে না?" মিতিন চুলে বিনুনি করতে

করতে বলল, "তোর সুমায়া ছেলেটাকে কেমন লাগল রে?"

"সুমায়া নয়, বলো টারজান। ব্ল্যাক টারজান।" টুপুর খিলখিল হেসে উঠল, "জানো, এ বছরই ব্ল্যাক টারজানের বিয়ে হবে!"

মিতিন মোটেই অবাক হল না। বলল, "তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ গো। বউও নাকি ফিট্। ভাবো একবার, পনেরো বছরের একটা ছেলে বিয়ে করতে চলেছে!"

"বাল্যবিবাহ তো সর্বত্রই চলছে এখনও। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও কত গ্রামে হয়। আর এরা তো উপজাতি, বাল্যবিবাহটাই তো এদের রেওয়াজ। তাও তো সুমায়া বয়সের তুলনায় অনেক সাব্যস্ত..."

"সুমায়ারা কী উপজাতি?"

"হো। সারান্ডা রেঞ্জে হো উপজাতিই বেশি। ইনফ্যাক্ট, সারান্ডা নামটাই হো উপজাতির ভাষা থেকে এসেছে। সারান্ডা মানে কী জানিস? সাতশো পাহাড়ের দেশ।"

"এখানে সাতশো পাহাড় আছে?"

"এগ্‌জ্যাক্ট নাম্বারটা নাও মিলতে পারে। ছশো নব্বইও হতে পারে, সাতশো দশও হতে পারে। মোটামুটি সাতশোর কাছাকাছি।...তবে পঞ্চাশ একশো বছর পরে পাহাড়ের সংখ্যা অনেক কমে যাবে।"

"কেন?"

"দেখলি না, কীভাবে পাহাড় কাটা হচ্ছে? বিশ-তিরিশ বছর পরে কিরিবুরু অদৃশ্য হয়ে যাবে। মেঘাতুবুরুও। তখন লোহার খোঁজে আবার একটা বুরু কাটা শুরু। যন্ত্রপাতিরও উন্নতি হচ্ছে দিন দিন, এর পর পাহাড় সাফ করতে সময় লাগবে আরও কম।"

"ইস্, পাহাড়গুলো প্লেন হয়ে গেলে কী বিশ্রী লাগবে, না মিতিনমাসি?"

"কী করা যাবে! সভ্যতার অভিশাপ।"

টুপুরের মনটা একটু ভার হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বুমবুমের চিৎকারে চমকে উঠল, "টুপুরদিদি, জলদি আয়। অ্যানিম্যাল!"

বুমবুমের ডাকের উৎসটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল মিতিন টুপুরের। তার পরেই দু'জনে দৌড়েছে। প্রত্যেকটা ঘরের পিছনেই একটা করে দরজা আছে, টুপুর আগে লক্ষ করেনি। দরজার পরেই সিঁড়ি, ধাপগুলো সোজা নেমে গেছে জঙ্গলে। ওই দরজা দিয়েই কখন বেরিয়ে গেছে বুমবুম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে আছে এক শালগাছের নীচে।

মিতিন ধমকে উঠল, "কী করছ? ওখানে কেন গেছ? উঠে এসো।"

বুমবুমের গম্ভীর জবাব, "আমি অ্যানিম্যাল দেখছি।"

"কোথায় অ্যানিম্যাল?"

"ওই তো। টাইগারের আন্টি।"

একজোড়া বেড়ালবাচ্চা খেলা করছে গাছের তলায়। মিতিন বকবে কী, ছেলের কথা শুনে হেসে খুন। হাসতে হাসতে বলল, "সত্যি সত্যি যখন আন্টির নেফিউ চলে আসবে, তখন টেরটি পাবে।"

"আমায় বাঘ খাবেই না।"

"কেন?"

"তুমিই তো বলো, আমি পেকে ঝুনো নারকেল। বাঘ কি নারকেল খায়?"

এবার আর হাসল না মিতিন। ছেলেকে হিড়হিড় করে তুলে এনেছে ওপরে। ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল।

পার্থ স্নান সেরে পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে। মিতিনকে বলল, "দ্যাখো, সাদা পোশাক চলবে তো?"

জঙ্গলে উজ্জ্বল রঙের জামাকাপড় পরতে পই পই করে নিষেধ করেছে মিতিন। সবুজ চলতে পারে। ঘিয়ে-ঘিয়েও চলবে, কিন্তু লাল, হলুদ, মেরুন, কটকটে নীল একদম নয়। চড়া রং বুনো প্রাণীরা মোটেই পছন্দ করে না।

মিতিন ভুরু কুঁচকে বলল, সাদাও না পরলেই পারতে। সাদা রংও চোখে লাগে। যাকগে, এটা মন্দের ভাল।"

পার্থ বলল, "আমি কিন্তু এখন সিগারেটও কম খাচ্ছি।"

"রেস্টহাউসের ঘরে বসে দু'-চারটে খেতে পারো। কিন্তু জঙ্গলে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে যাওয়া চলবে না। মনে রেখো, সিগারেটের আগুন আর ধোঁয়া, দুটোই জীবজন্তুদের কাছে অসহ্য।"

পার্থ হেসে বলল, "ওফ টুপুর, তোর মাসির নাম প্রজ্ঞাপারমিতা না হয়ে জ্ঞানদাসুন্দরী হওয়া উচিত ছিল। সারাক্ষণ যা জ্ঞান দেয়!"

"প্রজ্ঞাপারমিতাও জ্ঞানের দেবী স্যার। হিন্দুদের নয়, বৌদ্ধদের।" মিতিন কটাস করে পার্থকে চিমটি কাটল, "চলো, এবার তো তোমার পেটপুজোর পালা।"

সারগিয়ার রান্নার হাত মন্দ নয়। ধনে জিরের গুঁড়ো ছড়িয়ে একটা অন্যরকম স্বাদ করেছে খিচুড়ির। সকলেরই পেট চুঁই চুঁই, থালায় পড়তে না পড়তেই খিচুড়ি সাবাড়। অবনী যে অবনী, তিনিও আজ এক হাতা চেয়ে নিলেন।

রাতের মেনুও বলে দেওয়া হল সারগিয়াকে। রুটি, বেগুনভাজা, ডিমের ডালনা আর স্যালাড। শুধু বুমবুম রুটি খায় না, তার জন্য একটু ভাত।

নজরুলের জন্য ডাইনিং হলের পাশের একটা ঘর খুলে দিয়েছে সারগিয়া। নজরুলও খেলেন টুপুরদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি এখন বেরোবেন?"

মিতিন বলল, "কাছেপিঠে ঘুরব। আপনি রেস্ট নিন। বিকেল সন্ধেয় বেরোলে আপনাকে ডেকে নেব।"

অবনী আঁচাতে আঁচাতে ঘোষণা করলেন, "আমি এখন একটা লম্বা ঘুম দেব। তোমরা জঙ্গলে যাও, জাহান্নমে যাও, কেউ আমাকে ডাকবে না।"

সহেলিও ক্লান্ত। ইয়া ইয়া হাই তুলছেন। বললেন, "যাই বাবা, আমিও একটু গড়িয়ে নিই। সারগিয়া চা করলে আমায় ডেকে দিস।"

পার্থরও শোয়ার বাসনা ছিল। মিতিন টুপুর বেরোচ্ছে দেখে সে'ও সঙ্গী হয়েছে। আর বুমবুম তো এক পায়ে খাড়া, সুমায়ার কাঁধে উঠে পড়ল।

খুব দূরে গেল না টুপুররা। বিট অফিসারের ঘরের সামনের রাস্তাটা চলে গেছে জঙ্গল অভিমুখে, সেই পথ ধরেই হাঁটছে। একটু এগোতেই চতুর্দিক সুনসান। অসম্ভব নিস্তব্ধ। হঠাৎ হঠাৎ হাওয়া উঠছে জঙ্গলে, চারদিকে তখন শব্দ বাজছে ঝুমঝুম। বাতাস থেমে গেলেই আবার সেই নৈঃশব্দ্য। শাল-সেগুনের তলা যথারীতি সাদা হয়ে আছে ফুলে। মৃদু সুরভি ছড়িয়ে বনময়। তবে ওই গন্ধকেও যেন ছাপিয়ে যায় অরণ্যের ঘ্রাণ।

একপাশে জঙ্গল উঁচু হয়ে গেছে ক্রমশ। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি কোনও হিংস্র জন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে।

টুপুরের গা শিরশির করছিল। জঙ্গল ধরে খানিক হেঁটে ফিরল তারা। ডাইনে ঘুরে অন্য একটা পথ বেয়ে উঠছে ওপরে।

বন দফতরের কম্পাউন্ডের মধ্যেই দু'-তিনটে ভাঙাচোরা বাড়ি। পরিত্যক্ত।

মিতিন সুমায়াকে জিজ্ঞেস করল, "এ বাড়িগুলো কীসের গো?"

সুমায়া বলল, "বহুত দিন পহেলে এগুলোই ছিল ফরেস্ট

বাংলো। তখন আপনাদের ওই রেস্টহাউস ছিল না।”

“আর পাশে কাঁটাতার ঘেরা সুন্দর মতো বাড়িটা?”

“ওটা অফিসারদের ইনিসপেকশান বাংলো দিদি। ভি আই পি-রা এসে ওখানে থাকে।”

মিতিনদের রেস্টহাউস থেকেই দেখা যাচ্ছিল বাড়িটা। তফাত খুব বেশি নয়, বড়জোর তিরিশ-চল্লিশ গজ। সামনে একটা কাঠের গেট, মিতিন গেট ঠেলে ঢুকল ভেতরে। সামনে গিয়ে ভাল করে দেখল বাড়িটাকে। খাঁটি ব্রিটিশ প্যাটার্নের বাংলো। উঁচু সিলিং, চওড়া বারান্দা, সার সার ঘর। সবক'টা ঘরই তালাবন্ধ।

পার্থ টুপুররাও গেছে পিছন পিছন। পার্থ একটা দরজা ফাঁক করে দেখল ভেতরটা। বলল, “ওয়াও! কী দারুণ অ্যারেঞ্জমেন্ট! ডানলোপিলোর বেড, সোফা, ড্রেসিংটেবিল, ফায়ার প্লেস, মাথার ওপর ফ্যান...”

টুপুর বলল, “ফ্যান এল কোত্থেকে? এখানে তো কারেন্ট নেই?”

সুমায়া বলল, “জেনারেটার আছে। সাবলোগ এলে চালানো হয়।”

“কোন ভি আই পি আসে এখানে?”

“ডি-এফ-ও আসেন, ডি-এম আসেন, মিনিস্টারলোগ ভি আসেন।”

বাংলোর সামনে সুন্দর লন। মিতিন লনে চলে গিয়েছিল, চেঁচিয়ে ডাকছে, —“এই, শিগগিরই আয়।”

মিতিনের পাশে গিয়ে পার্থ, টুপুর, বুমবুম তিনজনই হতচকিত। লন যেখানে শেষ, সেখান থেকে খাড়া নেমে গেছে জঙ্গল। সামনেই কী অপূর্ব দৃশ্য। অরণ্য যে এত সুন্দর হতে পারে, টুপুরের কল্পনাতেও ছিল না। নিবিড় অরণ্যে সবুজের কতরকম বাহার। গাঢ় সবুজ, ফিকে সবুজ, কালচে সবুজ...। তার মধ্যেই কোথাও লাল রং ছড়িয়ে আছে,

কোথাও কমলা। দেখে মনে হয়, বনে যেন আগুন লেগেছে।

বিস্ময়ে সকলে বাকরুদ্ধ।

পার্থ অস্ফুটে বলল, "ক্যামেরা লোড করা আছে, নিয়ে আসব?"

মিতিন বলল, "দরকার নেই। এমন ছবি চোখের ফিল্মেই ধরা থাক।"

মিনিটখানেক পর হঠাৎই সুমায়ার উত্তেজিত স্বর, "শুনছেন দিদি? শুনতে পাচ্ছেন?"

মিতিন চমকে তাকাল, "কী?"

"ভাল করে শুনুন, হাতিটা ডাকছে।"

"কই? কোথায়?"

"হুউউই যে।" জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিম কোনায় আঙুল দেখাল সুমায়া, "পাগলা হাতি আরও নজদিক চলে এসেছে দিদি। তিরিলপোসিসে ভি ইধার। কোরাঙ্গার আশপাশ।... ও কি থলকোবাদের দিকেই আসছে?"

বুমবুম খামচে ধরল মিতিনকে, "মা, চলো বাড়ি যাই।"

টুপুর কানখাড়া করে হাতির ডাক শোনার চেষ্টা করছিল। কই, বৃংহণ তো শোনা যায় না!

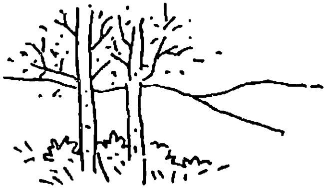

"কালিঝরনা যাওয়ার রাস্তাটা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ছিল, তাই না?"

"রাস্তাটাই যা এনজয়েব্‌ল। ঝরনাটি অতি থার্ড ক্লাস। পাহাড়ের গা বেয়ে ছ্যার ছ্যার করে জল পড়ছে কি পড়ছে না, তলায় একটা কুচ্ছিৎ কালো মিনি ডোবা, ওটাকে কেউ ঝরনা বলে?"

"আহা রে, চৈত্রমাসের ঝরনায় আর কত জল থাকবে? হত এটা বর্ষাকাল, দেখতেন ওই ঝরনা দেখেই চোখ ফেরাতে পারছেন না।"

অবনী তবু তর্ক করে যাচ্ছেন, "তা হলে তোমার কালিঝরনা দেখতে বর্ষাকালেই এলে হত। কষ্ট করে আজ ভোরবেলা বিছানা থেকে টেনে তোলার কী দরকার ছিল?"

মিতিন হাসতে হাসতে বলল, "ভোরের জঙ্গলটাও তো দেখতে পেলেন। এটাও তো লাভ। তার ওপর ধরুন, সুমায়া দুটো বুনো শুয়োর দেখিয়ে দিয়েছে, পাঁচখানা চিতল হরিণ। ওগুলোও তো নিশ্চয়ই আপনার লাভের খাতাতেই যাবে। মনে করুন না, ঝরনাটা ফাউ।"

পার্থ ফুট কাটল, "ইচ্ছে থাকলেও বর্ষাকালে আপনি আসবেন কী করে অবনীদা? জঙ্গল তো বর্ষাকালে বন্ধ থাকে। জুন থেকে অক্টোবর।"

"কেন?" সহেলি প্রশ্ন জুড়লেন, "বর্ষায় কি জীবজন্তুদের ভেকেশান চলে? তোমাদের অবনীদার কলেজের মতো?"

"অনেকটা তাই। পাহাড়ের সরু সরু নদীগুলোতে তখন বন্যা হয়। জঙ্গল ভেসে যায়, গাছটাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ, বাঘ ভালুক তখন মানুষদের শো দেবে কী করে?" পার্থ ভুরু নাচাল, "সাপ আর জোঁকদেরও তখন মহা আহ্লাদ। তারা মনের সুখে বনে খেলা করে।"

নজরুল আর চুপ থাকতে পারলেন না। গাড়ি চালাতে চালাতে বলে উঠলেন, "আমি একবার বর্ষাকালে সারান্ডা এসেছিলাম। দিল্লির এক বড় অফিসার চাইবাসা থেকে স্পেশ্যাল পারমিশান করিয়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে। জঙ্গলে ঢুকে সে কী দুর্ভোগ। আগের দিন যে রাস্তা দিয়ে গেছি, পরের দিন দেখি সে রাস্তা আর নেই। রাস্তার চেসিস একেবারে ভেঙে চুরমার। রাত্তিরে মাত্র দু'-তিন ঘণ্টা বৃষ্টি, ব্যস অমনই নদী স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে চাকা উঠিয়ে দিয়েছে রাস্তায়।

ওই মরা ঝরনাও সেবার দেখেছিলাম। একদম টপ গিয়ারে চলছিল।”

“শুনলেন তো অবনীদা?”

“আমি শুনে কী করব? আমি তো কোনও সিজ্‌নেই জঙ্গলে আসতে চাই না ভাই। সে কী বা গ্রীষ্ম, কী বা শীত, কী বা বর্ষা। জঙ্গল দেখার জন্য কষ্ট করে জঙ্গলে আসার দরকার কী তাই তো বুঝি না। বই পড়েই তো সব জেনে ফেলা যায়। এই তো, আমাজনের বইটা পড়ে আমি আমাজনের জঙ্গল সম্বন্ধে সব জেনে গেলাম।”

পার্থ জোরে হেসে উঠল, “এটা বেড়ে বলেছেন। বই পড়ে জঙ্গলভ্রমণ! বিছানায় শুয়ে শুয়ে মানস ভ্রমণ!”

হালকা গল্প, গম্ভীর মতামত, আর লঘু বাদানুবাদ করতে করতে চলেছে সকলে। ভোরবেলা কালিঝরনা দর্শন শেষ, এখন বিকেলে লিগিরদার পালা।

থলকোবাদ থেকে লিগিরদা মাত্র আট কিলোমিটার। কিন্তু পথ বেজায় দুর্গম। গাড়িই চলছে আট কিলোমিটার স্পিডে। চড়াই উতরাই তেমন নেই বটে, কিন্তু জঙ্গল ভয়ঙ্কর ঘন। কোথাও রাস্তা বেজায় সরু। প্রায় শুঁড়িপথের মতো। গাছের নুয়ে পড়া ডালে আর লতাপাতায় ঘষা খেতে খেতে এগোচ্ছে জিপ।

টুপুর কথা বলছিল না। কথা শুনছিলও না। সে যেন খানিকটা আনমনা। ভাবছে পাগলা হাতিটার কথা। সত্যি সত্যিই কি হাতিটা আসছে এদিক পানে? এক্ষুনি যদি জঙ্গল ভেঙে সামনে আবির্ভূত হয়, কী ঘটতে পারে? জিপটাকে উলটে দেবে? পিষে মেরে ফেলবে টুপুরদের? সুমায়া অবশ্য বলছিল হাতিটা নাকি ভাল করে হাঁটতে পারছে না। আহা রে, বেচারা গুলি খেয়ে না জানি কত যন্ত্রণা পেয়েছে! ব্যথায় একেবারে পাগলই হয়ে গেল?

মিতিনমাসিরও সাহসের বলিহারি যাই। হাতিটাকে কেয়ারই করছে না। নেহাত কাল মা প্রবল আপত্তি করল বলে নৈশ সফরে বেরনো হল না, কিন্তু সকাল থেকে মিতিনমাসিকে রোখে কে! নিজে তো বেরোলই, সবাইকে টেনে টেনে বার করেছে। জঙ্গল দেখতে এসে একটা হাতির ভয়ে দরজায় খিল এঁটে বসে থাকব? আমরা তো হাতিটার কোনও ক্ষতি করিনি, হাতি কেন আমাদের ক্ষতি করবে?

হাতিটাও কি মিতিনমাসির মতো করে ভাববে? না কি ও এখন বিশ্বসংসারের ওপরই খেপে আছে? যারা গুলি করেছে, তাদের কি খুঁজে খুঁজে বের করে শিক্ষা দিতে পারে না হাতিটা?

সুমায়া বসেছে একদম পিছনের সিটটায়। এতক্ষণ সে জঙ্গলই দেখছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "কাল আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

সহেলি কালবিলম্ব না করে বলে উঠলেন, "কালকের প্রোগ্রাম তো ঠিক করাই আছে। দুপুরে খেয়ে উঠেই করমপদার মধুবাবা।"

"আর সকালে?"

"সকালে দুপুরের জন্য তৈরি হব।"

মিতিন বলল, "তোমরা যদি না যাও, না যাবে। আমি কিন্তু কাল সকালে সুমায়ার সঙ্গে কুমডি ঘুরে আসব।"

"তোর বেশি বাড়াবাড়ি। কী আছে কুমডিতে?"

"একখানা বাংলো আছে।"

"বাংলোতে তো তুই এখনও আছিস, মিছিমিছি বিশ-পঁচিশ মাইল ঠেঙিয়ে আর একটা বাংলোয় যাওয়ার দরকার কী?"

"আহা, ওই পথের জঙ্গলটা দেখব না?"

"অনেক তো জঙ্গল দেখা হল, আর কেন?"

"বা রে, জঙ্গলের বিউটি এক এক জায়গায় এক একরকম না? দেখতে হবে না ঘুরে ঘুরে?"

“বুঝেছি। তুই বেঘোরে মরবি।”

সহেলির কথা শেষ হতে না হতেই ঘচাং ব্রেক। গোটা গাড়ি থরথর কেঁপে উঠল, পরক্ষণে নিশ্চল।

পার্থ সামনের সিটে বসেছিল। চেঁচিয়ে উঠল, “সর্বনাশ, এ কী বিপত্তি?”

বিপদ একটা ঘটেছে বটে। তবে পাগলা হাতি নয়, জিপের রাস্তা রোধ করে শুয়ে আছে এক ইয়া মোটা গাছের গুঁড়ি!

নজরুলের মাথায় হাত, “কী হবে এখন?”

সহেলি বললেন, “চলুন, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাই।”

নজরুল বললেন, “সম্ভব নেই দিদি। এখানে রাস্তার যা হাল, গাড়ি ব্যাক করা যাবে না।”

“তা হলে উপায়?”

সুমায়া লাফিয়ে নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। কোমরে হাত রেখে গুঁড়িটাকে জরিপ করল একটুক্ষণ। তারপর সুড়ুৎ করে ঢুকে গেছে বনে। মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, “তরিকা একটা আছে। গুঁড়ির ওপরে বেশ কয়েকটা কাঠ ফেলে দিতে পারি।”

নজরুল বুঝে ফেলেছেন প্রস্তাবটা। বললেন, “হ্যাঁ, গোল গুঁড়ির ওপরটা যদি কাঠ ফেলে স্ল্যান্ট করে ফেলা যায়, তা হলে গাড়ি টপকে যেতে পারে।”

“কিন্তু ছোট কাঠ পাব কোথায়?”

“আছে। ওদিকে আছে। আমি দেখে এসেছি।”

সুমায়াকে সাহায্য করতে পার্থ, মিতিন নেমে পড়ল জিপ থেকে। টুপুরও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবনীও। সবাই মিলে ধরাধরি করে বেশ কয়েকখানা শুকনো কাঠের টুকরো এনে রাখল গুঁড়ির ওপর। নজরুল সুমায়াকে নিয়ে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ফেললেন কাঠগুলো। দিব্যি একটা ঢেউখেলানো পথ তৈরি হয়ে গেল। ব্রিজের মতো।

ফের গিয়ে স্টিয়ারিং-এ বসেছেন নজরুল। একবারের চেষ্টায় পেরোতে পারলেন না গুঁড়ি, গাড়ির চাকা উঠেও নেমে এল। দ্বিতীয়বারেও ফেল। তৃতীয় চেষ্টায় ঝপাং করে গুঁড়ি পার।

বুমবুম দারুণ মজা পেয়েছে। হাততালি দিচ্ছে আনন্দে। সবাই মিলে আবার গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিয়েছে জিপ।

নজরুল স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "অত বড় গুঁড়িটা রাস্তায় কী করে এল বলুন তো?"

পার্থ বলল, "যেভাবে আসে। শেকড় উপড়ে পড়ে গেছে।"

"কোথায় শেকড়? ডালপাতাও তো নেই! ওটা তো স্রেফ গাছের কাণ্ড!"

সুমায়া বলল, "আমি পরশু লিগিরদা এসেছিলাম, তখন তো ওটা ছিল না!"

"তার পর হয়তো কাটা হয়েছে। কন্ট্রাক্টর হয়তো ফেলে রেখে গেছে।"

মনে সামান্য সংশয় জাগলেও এ নিয়ে আর আলোচনা হল না বিশেষ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এসে গেছে লিগিরদা।

জায়গাটা রীতিমতো রোমাঞ্চকর। একদিকে ভয়াল জঙ্গল, অন্যদিকে গভীর খাদ। মাঝে খানিকটা অঞ্চল কেমন ফাঁকা ফাঁকা। সেখানে একখানা ভগ্নপ্রায় ওয়াচ টাওয়ার বিরাজমান। কোনওকালে বোধহয় টাওয়ারে উঠে জীবজন্তু দেখা হত। লোহার সিঁড়ি এখন মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে, পা রাখতে ভয় হয়।

ওই সিঁড়ি বেয়েই বেড়ালপায়ে তরতরিয়ে উঠে গেল সুমায়া। ওপর থেকে ডাকছে, "চলে আসুন। এখান থেকে বহু দূর তক্ দেখতে পাবেন।"

অবনী জিজ্ঞেস করলেন, "স্পেশ্যাল কী আছে?"

"সামটা নালা।"

"অ্যাঃ! নালা? পাহাড়ে এসে নালানর্দমা দেখব?"

"বড়িয়া নালা বাবু। ঝোরা কা মাফিক। জানোয়াররা পানি পিনে আসে। এই টাইমেই।"

মুখে যতই গাঁইগুঁই করুন, অবনীর দেখার শখ ষোলো আনা। দেখে সমালোচনা করবেন, এটাই তাঁর স্বভাব। দোনামোনা করে বললেন, "পারব উঠতে? খাড়া সিঁড়ি, মাথা ঘুরে যাবে না?"

"নীচে বিলকুল তাকাবেন না। আঁখ বন্ধ করে উঠুন।"

সহেলি আর বুমবুম ছাড়া একে একে সিঁড়ি চড়ল সবাই। সিঁড়িগুলো অনেকটা ফাঁক ফাঁক, বুমবুম পা পাবে না। তাকে পাহারা দেওয়ার নাম করে সহেলিও রয়ে গেলেন।

ওয়াচ-টাওয়ারের মাথাটা খোলা। চাতাল মতন। সেখানে দাঁড়িয়ে সত্যিই একটা বিশাল রেঞ্জ দেখা যায় জঙ্গলের। মাথার ওপর আকাশ ঝকঝকে নীল। শেষ সূর্যের আলোয় বনের সবুজ রং ঝলমল করছে। তবে খাদের দিকে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব, ঝরনা বা নালাটা দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট।

পার্থ ক্যামেরার শাটার টিপে যাচ্ছিল। বলল, "আলো আরও না কমলে নালা ঝরনা কিছুই বোঝা যাবে না।"

অবনী বললেন, "তখন বাঘ ভালুকের দর্শন মিললেও মিলতে পারে। ওরা তো শেষ বিকেলেই জল খেতে আসে।"

"তো আর একটু দাঁড়ানো যাক।"

অপেক্ষা অবশ্য করা গেল না। সহেলি হঠাৎ নীচ থেকে আর্তনাদ করে উঠেছেন, "অ্যাই মিতিন, অ্যাই পার্থ, বুমবুম কোথায় পালিয়ে গেল!"

শুনেই তড়িৎ গতিতে নীচে নেমে গেল সুমায়া। পিছনে হুড়মুড়িয়ে বাকিরাও। সবাই মিলে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। খুঁজছে। গলা ছেড়ে ডাকছে বুমবুমকে।

প্রত্যুত্তর নেই। নিঝুম জঙ্গলে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে ডাকগুলো। মিতিনের মুখ শুকনো ক্রমশ, সহেলি টুপুর কাঁদো কাঁদো।

বেশ খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পাওয়া গেল বুমবুমকে। সুমায়াই দেখতে পেল। ওয়াচ-টাওয়ারের গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা ছোট্ট পাথুরে টিলা, তার ভেতরে সার সার গুহা, বুমবুম একটা গুহায় ঘাপটি মেরে বসে আছে।

পার্থ উত্তেজিত স্বরে বলল, "তুই এখানে কী করছিস? এই অন্ধকারে?"

"লুকিয়ে আছি।" বুমবুমের রাগি জবাব, "তোমরা আমায় ওপরে নিয়ে গেলে না কেন? আমি কেভ্‌ম্যান হয়ে যাব।"

সুমায়া বলল, "তুমি আমার পিঠে চড়ো, আমি তোমায় আভি নিয়ে যাচ্ছি।"

মিতিন গোমড়া মুখে বলল, "এক সেকেন্ড। এখানে এমন গুহা আছে আগে বলোনি তো?"

"কী বলব দিদি? ইস্‌মে তো কুছু নেই। ঠাণ্ডার সময়ে কভি কভি জানোয়াররা এসে এখানে থাকে।"

মিতিনের তবু ভুরুতে ভাঁজ। ঘুরে ঘুরে দেখছে গুহাগুলোকে। খুব বড় নয়, বেঁটে বেঁটে খুপরি। বেশিরভাগ খুপরিই মাকড়সার জাল আর ধুলোময়লায় ভরা। তুলনায় বুমবুমের খুপরিটাই যা একটু পরিষ্কার।

মিতিনের ভুরুর ভাঁজ গাঢ় হল, "এই গুহাটায় লোকজন ছিল মনে হচ্ছে?"

টুপুর বলল, "কী করে বুঝলে?"

"দেখছিস না, একটা গুহাই শুধু পরিষ্কার! এটা কেউ ঝাঁটটাট দিয়ে সাফ করে নিয়েছে।"

"হ্যাঁ, তাই তো! কে করল?"

সহেলি বললেন, "এখানে আর দাঁড়াতে হবে না বাবা। গাড়িতে ওঠো। কোত্থেকে কোন ডাকাত এসে পড়বে..."

মিতিন যেন শুনেও শুনল না। খপ করে মাটি থেকে একটা আধপোড়া সিগারেটের টুকরো তুলেছে, "ঠিকই ধরেছি। এখানে কেউ ছিল।"

পার্থ সিগারেটের টুকরোটা হাতে নিয়ে দেখল, "এটা তো দেখছি ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ!"

"অর্থাৎ বিদেশি সিগারেট।" অবনী বললেন, "মানে বেশ মালদার লোকই ছিল। ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল দেখার জন্য অনেকে জান লড়িয়ে দেয়। হয়তো সেরকমই কেউ..."

"তাই কি?" মিতিন নিচু হয়ে মাটিটা দেখছে ভাল করে। একটা মোমবাতির টুকরোও পেয়েছে। মাথা না তুলেই বলল, "একজন নয় অবনীদা, দু'-তিনজন ছিল। এবং রাত্তিরবেলা। অন্তত তিনরকম জুতোর ছাপ রয়েছে ধুলোয়।"

সহেলি ফের বললেন, "ওরে, চলে আয়। এখানে আর থাকিস না।"

মিতিনের ভ্রূক্ষেপ নেই। এগিয়ে গেছে খানিকটা। ছোট্ট একটা গুহার সামনে দাঁড়াল। পাথর রেখে বন্ধ করা আছে গুহার মুখ।

মিতিন সুমায়াকে বলল, "একটু হাত লাগাও তো। সরাও পাথরটা।"

সুমায়ার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে পার্থ। নজরুল আর অবনী সাহায্য করছেন তাদের। পাথর যথেষ্ট ভারী, সরাতে পরিশ্রম হল বেশ।

পাথর সরে যেতেই ভক করে একটা গন্ধ ঝাপটা মেরেছে নাকে। ঝাঁঝালো গন্ধ। বিদেশি অ্যালকোহলের।

মিতিন হাত বাড়িয়ে একটা ফাঁকা মদের বোতল বার করল

ভেতর থেকে। একখানা বড় পলিথিনের বস্তাও দেখা যাচ্ছে। মাল ভর্তি।

সুমায়া গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেল গুহায়। বস্তায় হাত ছুঁইয়ে জিভে ঠেকাল হাত। অবাক স্বরে বলল, "আরে দিদি, এ তো নিমক্‌কা বোরা!"

"নুন!" পার্থর গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল, "পাহাড়ি গুহায় নুনের বস্তা?"

সহেলি বললেন, "ডাকাতরা নুনের বস্তা নিয়ে ঘোরে, এ তো আমি জন্মে শুনিনি!"

"আমি কিন্তু ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছি।" মিতিন মাথা নাড়ল, "সুমায়া, ওয়াচ টাওয়ারের ওপাশে একটা সল্টলিক আছে না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওটা তো..."

"দেখেছি। সল্টলিকটা এখন আর চালু নেই।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "সল্টলিক কী?"

অবনী বললেন, "নুন চাটার গর্ত। মানুষের মতো জন্তু-জানোয়ারের শরীরেও নুনের প্রয়োজন আছে। আমরা রান্নায় নুন পাই, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার খায় কাঁচা খাবার, নুন ছাড়া। আর তাই একটু নুনের জন্য তারা ছটফট করে বেড়ায়। সব জায়গাতেই বনদফতর জঙ্গলে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে নুন ঢেলে আসে, যাতে হাতি বাঘ ভালুক হরিণরা নুনটা পেয়ে যায়। সত্যি বলতে কী, জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার দেখানোরও এটাই সবচেয়ে চালু পদ্ধতি।"

"কিন্তু যেসব জঙ্গলে সল্টলিক বানানো যায় না?"

"জন্তু-জানোয়ার সেখানে নুনের অন্য সোর্স খোঁজে। হয় মাটি চাটে, কিংবা কোনও পাহাড়ে যদি সামান্যতম নুনের সন্ধান পায় তো সেই পাথর চাটে।"

মিতিন বলল, "কিন্তু এখানে ব্যাপারটা কোন দিকে এগোচ্ছে বুঝতে পারছেন অবনীদা? একদল লোক সুপরিকল্পিতভাবে একটা দাঁতাল হাতিকে মারার চেষ্টা করছে। একবার তাদের টিপ ফসকেছে, তারা আর টারগেট মিস করতে রাজি নয়। এবং সেইজন্যই এই নুনের বস্তার আয়োজন। শয়তানগুলো এও জানে, পাগলা হাতি এদিকেই আসছে, তাই পাথর চাপা দিয়ে রেখে গেছে বস্তাটা। আজকালের মধ্যেই বস্তার নুন সল্টলিকে ফেলে দেবে। হাতি গন্ধে গন্ধে সল্টলিকে আসবেই। তখন..."

"সর্বনাশ!" পার্থ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, "এক্ষুনি তো তা হলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে খবর পাঠাতে হয়!"

"সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। আমরা থলকোবাদ পৌঁছে খবর পাঠাব, তারপর ওরা কখন আসবে...।" মিতিন জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল, "তার আগেই হাতি খুন হয়ে যেতে পারে।"

"তা হলে উপায়?"

"আপাতত আমরা নুনের বস্তাটা খাদে ফেলে দিতে পারি। ওরাও তা হলে আর হাতিটাকে প্রলুব্ধ করে এখানে আনতে পারবে না।"

"কিন্তু হাতিটা তো ঘুরতে ঘুরতে এমনিই চলে আসতে পারে? তখনও তো খুন হতে পারে?"

"পাগলা হাতিকে মারা অত সহজ নয়। আচ্ছা আচ্ছা শিকারিদেরও কাঁপ ছটকে যায়। তারা বলে, জখমি শেরের চেয়েও জখমি হাতি অনেক বেশি ভয়ানক। এমনিতেই হাতি অসম্ভব অ্যালার্ট প্রাণী। আর রোগ্ বনে গেলে সে আরও সতর্ক হয়ে যায়। এই হাতিটা গুলি খেয়েছিল চার-পাঁচদিন আগে। অর্থাৎ তার জখম এখন অনেকটা ভরে এসেছে। নুনের লোভ দেখিয়ে অন্যমনস্ক না করতে পারলে ওই হাতিকে নিখুঁত নিশানায় গুলি করা খুব কঠিন। কী সুমায়া, ঠিক বলেছি?"

সুমায়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ঢক করে ঘাড় নেড়ে দিল, "হাঁ দিদি।"

মিতিন বলল, "অবশ্য সুমায়ার হিসেব যদি ঠিক হয়, তা হলে এখনই হাতি লিগিরদা পৌঁছচ্ছে না। তবু আমাদের চান্স নেওয়ার দরকার নেই। নুনের বস্তাটা বিদেয় করাই ভাল।"

"কিন্তু শয়তানগুলো বস্তাটা গুহায় রেখে গেছে কেন? টুপুর বলল, "নুনটা তো সল্টলিকেই ফেলে দিয়ে যেতে পারত?"

"ওদেরও হিসেব আছে। বেশি আগে ঢাললে যদি অন্য জানোয়ার নুনটা চেটেপুটে সাফ করে দিয়ে যায়!"

টেনেটুনে বের করা হল বস্তাটা। কম নয়, কুড়ি কেজি নুন। স্বাস্থ্যবান নজরুল বস্তার একদিক ধরেছে, অন্যদিক সুমায়া। পাহাড়ের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে দিল খাদে।"

জিপে ওঠার আগে মিতিন বলল, "আপনি ঠিকই ধরেছিলেন নজরুলভাই। গাছের গুঁড়িখানা ওই শয়তানগুলোই রাস্তায় ফেলে রেখেছে। যাতে লিগিরদা ওয়াচ টাওয়ারে হুটহাট লোকজন চলে আসতে না পারে। এখন ফেরার সময়ে আমাদের সেট করা কাঠের টুকরোগুলো আমরা সরিয়ে দিয়ে যাব।"

নজরুল বললেন, "কিন্তু ওরা তো নুনের বস্তা নেই দেখেই বুঝে ফেলবে কেউ না কেউ এসেছিল?"

"তা বুঝুক। একটু ধাঁধাতেও থাক। আমরাই শুধু ওদের কথা ভেবে মরব কেন, ওরাও একটু ভাবুক।" বলেই মিতিন সুমায়ার দিকে ফিরেছে, "শোনো, থলকোবাদে গিয়ে কিন্তু কাউকে গল্প করবে না। অন্তত আজকের রাতটা। নইলে হাতিটাকে বাঁচানো যাবে না।"

আবার ঢক করে মাথা নাড়ল সুমায়া, "কেউ জানবে না দিদি। ঘর-কা লোগ ভি না।"

সিটে হেলান দিয়ে বসল মিতিন। চোখ বুজে ফেলল।

পার্থ গাড়ির দরজা বন্ধ করতে করতে টেরচা চোখে মিতিনকে বলল, "যাক, এখানে এসেও তোমার একটা কেস তবে জুটে গেল?"

মিতিন মৃদু হাসল, "দেখছি তো তাই। ভেবেছিলাম ক'দিন জঙ্গলে একটু নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাব। কপালে যদি না সয় ঘি, ঠকঠকালে হবে কী!"

নজরুল ঘুরে ঘুরে দেখছেন মিতিনকে। আমতা আমতা স্বরে প্রশ্ন করে বসলেন, "দিদি, আপনি কি...?"

"চিনতে পারেননি এখনও?" পার্থ নজরুলের মুখের কথা কেড়ে নিল, "উনি একটি মেয়ে-টিকটিকি।"

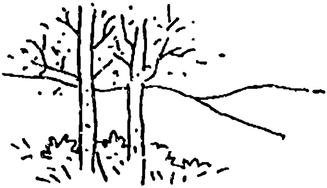

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল টুপুরের। ভুটভুট শব্দ হচ্ছে একটানা। কয়েক সেকেন্ড উৎকর্ণ হয়ে টুপুর শুনল আওয়াজটা। কীসের আওয়াজ? সেই মোটরসাইকেলটা এল নাকি?

সহেলি আর অবনী অকাতরে ঘুমিয়ে। কৌতূহল দমন করতে পারছে না টুপুর, মশারি সরিয়ে সন্তর্পণে নামল চৌকি থেকে। রাতের দিকে ভালই ঠাণ্ডা পড়ছে থলকোবাদে, গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে নিল টুপুর। দরজা খুলতে গিয়েও থামল একটু। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। কমানো আছে পলতেটা। হ্যারিকেনটা নিতে গিয়েও নিল না, দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়।

বেরিয়েই অবাক! অদূরে ইনস্পেকশন বাংলোয় আলো জ্বলছে!

ইলেকট্রিক লাইট। তার মানে শব্দটা মোটরসাইকেলের নয়, জেনারেটরের। এত রাতে কোন ভি আই পি এল ওই বাংলোয়?

চাঁদ এখনও ডোবেনি। পরশু পূর্ণিমা পড়ছে, শুক্লপক্ষের মায়াবী জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে চারদিক। রেস্টহাউসের লাগোয়া কাঁঠালগাছের গায়ে চিকচিক করছে চাঁদের আলো।

অন্ধকার গাঢ় নয় বলেই বুঝি একটু সাহস পেল টুপুর। পায়ে পায়ে বারান্দার ধারে এল। ডিঙি মেরে দেখছে বাংলোর দিকটা।

আচমকা ফিসফিস স্বর, "অ্যাই, তুই বেরিয়েছিস কেন?"

ভীষণ চমকে উঠল টুপুর। পাঁচ-সাত হাত দূরে, মহুয়াগাছের নীচে একটা ছায়ামূর্তি!

ছায়া গাছের তলা থেকে সরে আসতেই টুপুরের ধড়ে যেন প্রাণ এল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মিতিনমাসি, তুমি?"

মিতিন ঠোঁটে আঙুল রাখল, "চুপ, চুপ।"

টুপুর চাপা স্বরে বলল, "কারা এসেছে গো?"

মিতিনের গলা আরও নীচে, "বুঝতে পারছি না। খানিকক্ষণ আগে একটা জিপ এল। ডেকে নিয়ে গেল সারগিয়াকে। তারপর থেকেই তো লাইট জ্বলছে..."

"কে সারগিয়াকে ডেকে নিয়ে গেল?"

"দেখতে পাইনি মুখটা। সারগিয়া তো ডাইনিং হলে ঘুমোয়, ওকে রান্নাঘরের দিক দিয়ে এসে ডাকছিল। যখন গেট দিয়ে বেরোচ্ছে, তখন শুধু পেছনটা দেখলাম।"

"জঙ্গলের কোনও অফিসার?"

"তা হলে পেছনে গিয়ে ডাকবে কেন? সোজাসুজিই তো হাঁক পাড়তে পারে।"

"হয়তো ডেকেছে। হয়তো সারগিয়ার ঘুম ভাঙেনি।"

"উঁহুঁ। জিপটা যখন ঢুকছিল, তখনই আমি জেগে গেছি। ডাকলে শুনতে পেতাম।"

"তা হলে সারগিয়াকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না।"

"সারগিয়া নেই। সেও এখন ওই বাংলোতেই। ফেরেনি।"

"তাই?"

"হুঁ। ভাবছি একবার গিয়ে দেখলে হয়।"

"যাবে?"

"দাঁড়া, গায়ের একটা শাল নিয়ে আসি।"

শুধু শাল নয়, মিতিন একখানা টর্চও এনেছে ঘর থেকে। তবে টর্চ জ্বালানোর দরকার হল না, চাঁদের আলোয় ছোট ছোট নুড়িপাথরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

টুপুর চলেছে মিতিনের গা ঘেঁষে। মিতিন নিচু গলায় বলল, "পায়ে রবারের চটি আছে তো?"

"হুঁ।"

"টোয়ে ভর রেখে হাঁট। শব্দ না হয়।"

"হুঁ।"

"পাশে পাশে থাক। ভয় পাস না।"

"হুঁ।"

তিরিশ-পয়ঁত্রিশ গজ নুড়ি বিছানো পথ তুরতুরিয়ে পেরিয়ে গেল দু'জনে। আস্তে করে গেট ঠেলে ঢুকল বাংলোর হাতায়। সামান্য ক্যাঁচ শব্দ হয়েছিল, ওইটুকু আওয়াজকেই যে কী প্রকট মনে হল! একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিঃশব্দ অভিযান।

একটামাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা বন্ধ। জানলার একটা পাট খোলা। পরদা টানা আছে জানলায়। ভেতরে দু'-তিনজনের কণ্ঠস্বর।

আশ্চর্য, লোকগুলো পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে!

জানলার কোণে এসে দাঁড়িয়েছে মাসি বোনঝি। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল একবার।

চাপা স্বরে কথাবার্তা চলছিল অন্দরে। হঠাৎ একটা চড়া গলা শোনা গেল, "আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? ওড়িশা থেকে কি আমি হাতিদের ট্রেল করে এনেছি? দুশো-আড়াইশো কিলোমিটার রাস্তা এল হাতিগুলো, তোমরা কেউ ছুঁতেও পারলে না, এখন দায় আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ?"

"চেল্লাচ্ছ কেন? গণ্ডগোল তো তুমিই পাকালে। নিজেই বড় মুখ করে বললে, এটা নাকি তোমার বাঁয়ে হাত কা খেল!"

"সব নিশানা কি সবসময়ে ঠিকঠাক হয়?"

"তা হলে দুম করে ফায়ার করলে কেন? নয় আরও এক দু'দিন ওয়েট করতাম।"

"অপেক্ষা করার সময় কোথায়? ওদিকে সিংহমশাইও অস্থির হয়ে উঠেছেন।"

"তুমি একটি অপদার্থ। তোমার জন্যই টাকাটা হাতছাড়া হবে। এমন একটা ঢ্যাঁড়সকে লাথি মেরে গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া উচিত।"

"মুখ সামলে, মুখ সামলে। আমি যদি ঢ্যাঁড়স হই, তুই কী? চিচিঙ্গের চামচে চামচিকে।"

"চোপ।" এবার তৃতীয় কণ্ঠ মুখর হল। স্বরটা রীতিমত জলদগম্ভীর, "তোরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবি? না চুপচাপ শুনবি প্ল্যানটা?"

"ও কেন এইভাবে কথা বলছে?"

"বেশ করব বলব। হাজারবার বলব।"

"ফের ঝগড়া? এবার কিন্তু তোদের দু'জনকেই..."

ভারী গলা থেমে গেল। বাকি দু'জনও চুপ।

জানলার পাল্লা আর দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে মিতিন দেখল সারগিয়া ঢুকেছে ঘরে। দু' হাতে দুটো পকোড়া ভর্তি কাচের প্লেট। টেবিলে মদ আর সোডার বোতল, সেগুলোকে সরিয়ে পকোড়ার প্লেট রাখল টেবিলে। ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ফিরেছে। হাতে জলের জগ আর তিনখানা গ্লাস। জগ গ্লাস টেবিলে রেখে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ।

ভারী গলার লোকটা বলল, "কেয়া মাংতা? ভাগ হিঁয়াসে।"

সারগিয়া বিনীতভাবে বলল, "অউর কুছ চাহিয়ে সাব?"

"নেহি। তু যাকে সো যা। হামলোগ অউর আধা ঘণ্টা ঠহেরেঙ্গে। হামলোগ যানে কে বাদ জেনারেটার অফ্ কর দেনা। ঠিক হ্যায়?"

সারগিয়া তবু দাঁড়িয়ে আছে।

ভারী গলার লোকটা পার্স থেকে টাকা বার করে বাড়িয়ে দিল, "লে। পাঁচশো রুপিয়া হ্যায়, চলেগা?"

"জি সাব! হাঁ সাব।"

সারগিয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, ভারী গলা পিছু ডাকল, "সুন?"

"জি সাব?"

"উয়ো বাত ইয়াদ নেহি রাখনা। ভুল যা। হামলোগ বুরা আদমি নেহি হ্যায় রে। জরা মস্তি করেঙ্গে, ব্যস।"

এবার আর জি হাঁ কিছু বলল না সারগিয়া। চুপচাপ বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

মিতিন একজনেরও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। তিনজনে তিনটে বেতের চেয়ারে বসেছে, জানলার দিকে পিছন করে। দু'জনের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, একজন ফুলস্লিভ সোয়েটার। সোয়েটার পরাটাই দলপতি, সে বসেছে মাঝখানে। বাকিরা দু'পাশে।

ডানদিকের লোকটা বোতল খুলে গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালছে। ওপেনার দিয়ে ফটাস ফটাস সোডা খুলল। মেশাচ্ছে মদে।

দলপতি হাতে গ্লাস তুলে নিতেই অন্য দু'জনও পানীয় নিয়েছে হাতে। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে চিয়ার্স বলে উঠল।

টুপুর মিতিনের কানে কানে বলল, "এইমাত্র ঝগড়া হচ্ছিল না?"

মিতিন টুপুরের ঠোঁটে হাত চাপা দিল, "চুপ।"

দলপতির ভারী গলা গমগম করল আবার, "ভাল করে প্ল্যানটা শুনে নাও। এটাই লাস্ট চান্স। আর যেন কোনও ভুলচুক না হয়। আমাদের হাতে আর দু'দিন মাত্র সময় আছে। পরশু রাতের মধ্যে কাজ হাসিল করতেই হবে।"

ডানদিকের লোকটা বলল, "পারব। ও যদি না গুবলেট করে।"

"কেউ কাউকে দোষ দেবে না। টাকা সমান পাচ্ছ, টিম হয়ে কাজ করো। লিগিরদা গিয়ে তিনজনকে তিনটে পজিশান নিতে হবে। নুন ঢেলে দিয়ে তুমি চলে যাবে টিলার মাথায়।" আঙুল তুলে ডানদিকের লোকটাকে নির্দেশ দিল দলপতি। বাঁদিকের লোকটার পিছে একটা হাত রেখে বলল, "তুমি থাকবে জঙ্গলের সাইডে।"

"আর আপনি?"

"আমি টাওয়ারে। তোমরা মিস করলে ফাইনাল শট তো আমাকেই মারতে হবে।"

"দাঁত দুটো কীভাবে নিয়ে যাওয়া হবে?"

"সে ভাবনা তোমাদের নয়। ওটা আমার আর সিংহমশায়ের ওপর ছেড়ে দাও।"

"আমি জানি।" ডানদিকের লোকটা ফস করে বলল, "রাউরকেলা থেকে কনসাইনমেন্ট বুক করা আছে।"

"তুমি একটু বেশিই জেনে ফেলেছ হালদার।" ভারী স্বর চাবুকের মতো শোনাল, "তুমি জানো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জানা আমি পছন্দ করি না?"

"ভুল হয়ে গেছে স্যার। মাফ করে দিন।"

"তোর তো সবসময়ে ভুল হয়। আড়াইশো কিলোমিটার ছুটেও একটা হাতির লেজ ছুঁতে পারিস না।"

"আবার ঝগড়া?" দলপতি ধমকে উঠল। বাঁদিকের লোকটাকে বলল, "শোনো গোলদার, আজকে হাতি মরল তো ভাল। তুমি বেঁচে গেলে। নইলে কাল আমি তোমার ওপরেই টিপ প্র্যাকটিস করব।"

"যদি হাতি আজ আদৌ না আসে?"

"তা হলে তুমি কাল সারাদিন টিপ প্র্যাকটিস করবে।"

আর কোনও কথা হচ্ছে না। নীরবে পানীয় শেষ করছে তিনজন। গপাগপ পকোড়া খাচ্ছে।

মিতিন নিথর দাঁড়িয়ে থাকা জিপটাকে দেখতে গেল। নড়তে বারণ করল টুপুরকে।

জিপের দরজা খোলা। মিতিন ড্যাশবোর্ড হাতড়াচ্ছে। কিছু কাগজ বার করে টর্চের আলোয় পড়ছে। দুটো কাগজ শালের আড়ালে চালান করে বাকিগুলো রেখে দিল ড্যাশবোর্ডে। ফের ফিরেছে জানলায়।

পানীয় শেষ। সোডা খতম। পকোড়া সাবাড়। তিন মক্কেল উঠে দাঁড়িয়েছে। অনুচর দু'জন আড়মোড়া ভাঙল।

টুপুরকে টেনে নিয়ে মিতিন দ্রুত সরে এল বাংলোর পাশে। একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে, অন্ধকার ছায়ায়। গাছের ছায়ার চেয়েও এখানে অন্ধকার অনেক বেশি গাঢ়।

একে একে বেরিয়ে এসেছে তিন মূর্তি। চাঁদের আলোয় টুপুর স্পষ্ট দেখতে পেল দলপতির মুখখানা। সেই ঝিনিকপানির মোটরসাইকেল আরোহীটা, যে মুরগি দুটোর ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল। তাই কি ভারী গলাটা চেনা চেনা লাগছিল? দোকানে এসে সিগারেট নিচ্ছিল, মুহূর্তের জন্য হলেও গলাটা কানে এসেছিল টুপুরের।

পিছনের আরোহীটাও আছে। ওই গোলদার। এর স্বর অবশ্য

টুপুর অনেক আগেই চিনে ফেলেছে। মেঘাতুবুরুতে শোনা উদ্ধত বাচনভঙ্গি কি সহজে ভোলা যায়!

তবে হালদারকে সে আগে দেখেনি। ওই লোকটা ওড়িশা থেকে হাতিটাকে ধাওয়া করে এসেছে?

এই তিন শয়তাই হাতিটাকে মারার ষড়যন্ত্রী? ইস্, লোক তিনটেকে যদি এক্ষুনি ধরে গারদে পুরে ফেলা যেত!

হালদার আর গোলদার টলছে অল্প অল্প। দু'জনের হাতেই দুটো করে খালি বোতল।

গোলদার একটা বোতল ছুড়ে দিল সামনের খাদে।

অমনই হালদারও একটা বোতল ছুড়েছে। উল্লসিত হয়ে বলল, "আমারটা তোর চেয়ে দূরে গেছে।"

"কী করে বুঝলি?"

"বোঝাবুঝির কী আছে! আমার কব্জির জোর তোর চেয়ে ঢের বেশি।" বলেই গোলদার দ্বিতীয় বোতলটাও ছুড়ে দিল, "দ্যাখ। আবার দ্যাখ।"

দলপতি জিপে উঠে পড়েছে। স্টিয়ারিং-এ বসে হুঙ্কার ছুড়ল, "কী ছেলেমানুষি হচ্ছে? দুটোকেই আমি এবার..."

সুড়সুড় করে গাড়িতে চলে গেল দুই শাগরেদ। যে গেট দিয়ে মিতিন টুপুর ঢুকেছিল, সেটা ছাড়াও আর একটা গেট আছে বাংলোর। ওই গেট পেরিয়েই আজ লিগিরদা গিয়েছিল তারা। তিন শয়তানের জিপও ওই রাস্তাই ধরল, প্রচণ্ড স্পিড তুলে মিশে গেল জঙ্গলে।

দরজা হাট করে খোলা। হরিণপায়ে ঘরটায় ঢুকল মিতিন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ চোখ গেছে বট্‌ল-ওপেনারটার দিকে। হাতির শুঁড়ের শেপ। টেবিলে পড়ে আছে।

জিনিসটা হাতে তুলে নিতেই ঝুপ করে আলো নিভে গেল।

টুপুর হাত খামচে ধরল মিতিনের, "কী হবে এখন?"

মিতিন টর্চ জ্বেলে শান্ত গলায় বলল, "ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সারগিয়া জেগে আছে। জিপ বেরিয়ে যেতেই জেনারেটার বন্ধ করেছে। চল, সারগিয়ার কাছে যাই।"

রেস্টহাউস অবধি যেতে হল না, সারগিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বাংলোর হাতাতেই। রান্নাঘরের পাশে রাখা জেনারেটার বন্ধ করেই হনহনিয়ে রেস্টহাউস থেকে আসছিল সারগিয়া। বোধহয় বাংলোর দরজায় তালা মারতে।

মিতিন টুপুরের মুখোমুখি পড়ে ভূত দেখার মতো চমকেছে সারগিয়া। তোতলাচ্ছে, "আআআপনারা? ইইইধার?"

উত্তর দিল না মিতিন। কড়া গলায় পালটা প্রশ্ন করল, "টাকার লোভে তুমি যাকে-তাকে সরকারি বাংলো খুলে দিলে? জানো, কমপ্লেন করলে তোমার চাকরি চলে যাবে?"

সারগিয়া মাথা নামাল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "টাকার লোভে আমি করিনি দিদি। সচ্।"

"বিলকুল ঝুট। আমি তোমায় টাকা নিতে দেখেছি।"

"বিশ্বাস করুন দিদি, ওরা আমায় তুলে এনেছিল। রিভলভার দেখিয়ে। পকোড়া ভেজে দেওয়ার জন্য জোর করল।" সারগিয়া ঝপ করে বসে পড়ল মিতিনের পায়ের কাছে, "অত রুপিয়া আমি চাইনি দিদি, ওরা আমায় দিল। আমি গরিব আদমি, আমারও লোভ লেগে গেল, না বলতে পারলাম না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওঠো।" মিতিন খানিকটা নরম হয়েছে। বলল, "ওদের চেনো?"

"জিন্দেগি মে এই পহেলা বার দেখা।"

"সত্যি বলছ?"

"ঝুট বললে আমার জবান খসে যাবে।"

"ওরা কী জন্য এসেছিল তুমি জানো?"

"নেহি দিদি। ওরা আমার সামনে কুছু বলছিল না।"

"হুম।" মিতিন কী যেন একটু ভাবল। তারপর বলল, "কাল আমি একটা জরুরি চিঠি দেব তোমার হাতে। সোজা গিয়ে রেঞ্জ অফিসে দিয়ে আসবে।"

"জি।"

"কেউ যেন চিঠির কথা জানতে না পারে। বিট অফিসার দীননাথ সহায়ও না।"

"জি।"

"জানলে কিন্তু তোমারই ক্ষতি হয়ে যাবে, মনে রেখো।"

"আমার নামে কমপ্লেন করবেন না তো দিদি?"

"না। তুমি যাও।"

সারগিয়া চোখ মুছতে মুছতে বাংলোর দিকে চলে গেল।

মিতিন একটুক্ষণ দেখল সারগিয়ার চলে যাওয়া। তারপর টুপুরকে বলল, "কী বুঝলি?"

টুপুরের মায়া হচ্ছিল সারগিয়ার ওপর। বলল, "সারগিয়াকে কিন্তু ইনোসেন্টই মনে হল মিতিনমাসি। জোর করে রিভলভার দেখিয়ে তুলে আনলে ও বেচারা কী করে?"

"যদি অবশ্য সারগিয়ার ভার্সান সত্যি হয়।"

"তুমি সারগিয়ার কথা কি বিশ্বাস করছ না?"

"করছি বটে। করছি নাও বটে। জঙ্গলে এত বড় একটা অপারেশন হচ্ছে, অথচ কোনও বনকর্মী জানে না, এমনটা হওয়া কি সম্ভব? একাধিক কর্মীও যুক্ত থাকতে পারে।"

টুপুর ভেবেচিন্তে বলল, "আমার মনে হয় দীননাথ সহায় এর মধ্যে থাকলেও থাকতে পারেন। দেখতে একটু বেশিই ভালমানুষ।"

"আর কেউ?"

“আর কে হতে পারে?”

“দেখা যাক। ভাবছি।” মিতিন হাঁটতে শুরু করল রেস্টহাউসের দিকে। থামছে। হাঁটছে। থামছে। হঠাৎ বলল, “আমাদের একটা ডিসিশান কিন্তু খুব ভাল হয়েছে। লোকগুলো আজ রাত্তিরে কোনওভাবেই হাতিটাকে কব্জা করতে পারবে না।”

টুপুর হিহি হেসে উঠল, “ইস্, নুনের বস্তা দেখতে না পেয়ে নির্ঘাৎ চুল ছিঁড়বে। লিডারটা রাগের চোটে হালদার গোলদারকে না মেরেই দেয়।”

“উঁহুঁ, কিচ্ছু করবে না। যতক্ষণ না কাজ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ হালদার গোলদারের টিকিটিও ছোঁবে না।”

“লোক দুটো কিন্তু বেশ বোকা-বোকা আছে। চাইল্ডিশ আচরণ করছিল।”

“ওই ধরনের হাফ-উইট অনুচরই শয়তানদের বেশি পছন্দ। ওই সর্দারটি অতি ধুরন্ধর। রাবণ। জানে নির্বোধ লোকদের দিয়ে বেশি নিষ্ঠুর কাজ করানো যায়।”

বহুক্ষণ পর হাওয়া উঠেছে একটা। জঙ্গলের দিক থেকে শব্দ করতে করতে রেস্টহাউসের কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ল বাতাস। নেড়ে দিচ্ছে ইউক্যালিপটাসের ঝুঁটি।

উঁচু গাছটাকে দেখতে দেখতে মিতিন বলল, “রাবণ প্ল্যানটা একা ছকেনি। সঙ্গে একজন মেঘনাদও আছে। তাকে সামনে দেখা যায় না, প্রত্যেক অপারেশনেও সে নেই, কিন্তু হাতির দাঁত সেই লোকটার মাধ্যমেই চালান যাবে।”

টুপুর চোখ পিটপিট করল, “কে সে?”

“শুনিসনি, রাবণ এক সিংহমশায়ের কথা বলছিল?”

“হ্যাঁ। হ্যাঁ।” টুপুর উত্তেজিত মুখে বলল, “কিন্তু সিংহটা কে বলো তো? জামদার সিংহ?”

মিতিন ক্ষণকাল নীরব। ধীর পায়ে রেস্টহাউসের চাতালে উঠল। চাতালে একটা কুকুর শুয়ে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় তুলল কুকুরটা, তারপর আবার মুখ গুঁজেছে পায়ের ফাঁকে।

কুকুরটাকে টপকে বারান্দায় উঠল মিতিন। বলল, "পুরুষোত্তম সিংহ লোকটা খুব স্ট্রাইকিং। জঙ্গলের হাড়হদ্দ চেনেন, একসময়ে ক্র্যাকশট ছিলেন, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও আছে। শিকারি, অথচ অ্যানিম্যাল লাভার।"

"তুমি কি পুরুষোত্তমবাবুকে সন্দেহ করছ?"

"সন্দেহের তালিকায় তাঁকে রাখার কারণ আছে কি না ভাবছি।"

"বিকাশ সিংহকে ধরছ না কেন? লোকটা জঙ্গল থেকে ফিরল, পরদিন আবার নাকি মনোহরপুর যাবে। হাতিগুলোও তো মনোহরপুরের দিক দিয়েই ঢুকেছে।"

"মন্দ বলিসনি। এ পয়েন্টটাও খতিয়ে দেখা দরকার।"

টুপুর উৎসাহিত মুখে বলল, "হয়তো হাতির পাল এসেছে শুনেই বিকাশবাবু হাতির দাঁত চুরির প্ল্যানটা ছকেছেন।"

"কেন?"

"টাকার লোভ। যাদের যত বেশি আছে, তারা তো তত বেশি চায়।"

মিতিন কিছু বলল না। মুঠো খুলে টর্চ জ্বালিয়ে বট্‌ল-ওপেনারটা দেখছে। ঘুরে টুপুরকে বলল, "যা, এবার গিয়ে শুয়ে পড়।"

"ধুস, আর ঘুম আসবে না।"

"উঁহুঁ, ঘুমটা খুব জরুরি। কাল অনেক ছোটাছুটি আছে।" মিতিন কেমন দূরমনস্ক, "কাল কুমডি ক্যানসেল। সকালেই একবার মেঘাতুবুরু যেতে হবে।"

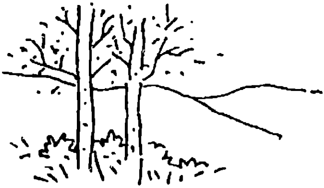

কাকভোরে রেঞ্জ অফিসে চলে গেছে সারগিয়া। মিতিনের চিঠি নিয়ে। একটু পরে মিতিনও রওনা হল মেঘাতুবুরু। একাই। টুপুরের খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার, কিন্তু তাকে নিল না মিতিন। পার্থকেও না। জঙ্গলের রাস্তা বিপদসঙ্কুল বটে, তবে নজরুলের ওপর মিতিনের যথেষ্ট ভরসা আছে। বাকিরা বরং সকালে একটু এদিক-ওদিক ঘুরুক।

সকালটা বেজায় ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছিল টুপুরের। মিতিনমাসির ওপর অভিমান হচ্ছে মনে মনে। রাতেও তো মিতিনমাসির কথা শুনে মনে হয়েছিল টুপুরকে সে সঙ্গে নেবে। শেষ পর্যন্ত কেন যে টুপুরকে কাটিয়ে দিল? এখনও কি টুপুরের ওপর আস্থা জন্মায়নি মিতিনমাসির?

সারগিয়ার বদলে সুমায়া আজ রান্নাঘরে। উনুন জ্বালিয়ে ময়দাটয়দা মেখে দিল সুমায়া, ঝটপট লুচি ভেজে ফেললেন সহেলি। দুপুরের রান্নার ভারও আজ সহেলির ওপর। রেঞ্জ অফিস মাইলদশেক দূর। পোরঙ্গায়। সাইকেলে গেছে সারগিয়া, এই পাহাড় জঙ্গলের রাস্তা ঠেঙিয়ে কখন ফেরে তার ঠিক কী!

সহেলি কুটনো কুটছেন। সুমায়া সামনের কাঁঠালগাছ থেকে একটা কচি এঁচোড় পেড়েছিল সকালে, সহেলি আজ বড় করে এঁচোড়ের ডালনা রাঁধবেন। সরষে দিয়ে ডিম। সুমায়া হাতে হাতে সাহায্য করছে তাঁকে। এমনিতেই অবশ্য সুমায়ার আজ অনেক কাজ। ঘরদোর পরিষ্কার করবে, জলটল তুলবে, কাচাকুচিও আছে

কিছু। হ্যারিকেনের চিমনিগুলোতে কালি পড়েছে, সেগুলোও ভাল করে মোছার জন্য নির্দেশ জারি করেছেন সহেলি।

পার্থ টুপুরকে বলল, "চল, আমরা একটু থলকোবাদটা সার্ভে করে আসি।"

অবনী বারান্দার বেতের চেয়ারে। বই পড়ছেন। আমাজনের পোকামাকড় খতম, এখন তিনি ডুবেছেন মহাসমুদ্রের গভীরে। ওশ্‌নোগ্রাফির একখানা বই এখন তাঁর সঙ্গী।

বইতে চোখ রেখেই অবনীর মন্তব্য, "কী দেখার আছে আর থলকোবাদে?"

পার্থ বলল, "গ্রামটা দেখব।"

"সে তো কাল কালিঝরনা যাওয়ার পথেই দেখে নিয়েছ। খানচল্লিশেক কুঁড়েঘর, গোটাপাঁচেক দোকান, একটা টেলারিং শপ, একখানা স্কুল, আর কিছু মুরগি, ভেড়া, ছাগল। পাঁচটা দোকানের তিনটে মুদিখানা, দুটো টি-স্টল। সবথেকে বড় মুদিখানার মালিকটি মোটেই আদিবাসী নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।"

"আইব্বাস! যাতায়াতের দুই দুই চার মিনিটে আপনি এত কিছু নোট করে নিয়েছেন?"

"ডিটেকটিভগিরি করি না ভাই। করলে অনেকের অন্ন মারা যেত।"

কথাটায় যেন সামান্য ঠেস আছে। মিতিনের উদ্দেশে। বোধহয় মনে মনে মেঘতুবুরু যাওয়ার সাধ ছিল অবনীর, মিতিন তাঁকে একবারও ডাকেনি বলে তিনি ঈষৎ ক্ষুব্ধ। তার ওপর উৎসাহ নিয়ে কাল রাতের কাহিনী যখন সবে শোনাতে শুরু করেছিল টুপুর, মিতিন তাকে নিষেধ করল, এটাও বোধহয় ক্ষোভের আর একটা কারণ।

পার্থ বলল, "বুঝেছি। এবার গাত্রোত্থান করুন।"

অবনী বললেন, "আমি বেরোব না। তোমরা যাও। ঘুরে এসে বোলো আমার ইনফরমেশানে কোনও গলতি আছে কি না।"

অগত্যা বেরিয়ে পড়ল টুপুররা। আগে আগে লাফাতে লাফাতে বুমবুম। বিট অফিসারের কোয়ার্টার পেরিয়ে ডানদিকে মেঠো পথ। রাস্তার দু'ধারে থলকোবাদ গ্রাম। গভীর জঙ্গলের মধ্যেও থলকোবাদ মোটেই পাণ্ডববর্জিত এলাকা নয়, গ্রামে লোকবসতি আছে ভালই। ছোট্ট একটা বাজার মতোও আছে। সাইকেল চড়ে আদিবাসীরা এসেছে বাজারে, শাকসবজি কেনাকাটা করছে। একটা দোকান উগ্র গন্ধে ম ম। বাইরে বেঞ্চিতে বসে আদিবাসীরা শালপাতার দোনায় পান করছে কী যেন। পার্থই বলে দিল পানীয়টা মহুয়া। অবনীর কথামতো দরজির দোকানও দেখা গেল একটা। বড় মুদিখানাও। মুদিখানার মালিক সত্যিই এক গৌরবর্ণ মধ্যবয়সি পুরুষ। এবং তিনি যে আদিবাসী নন, এক ঝলকেই চেনা যায়।

স্কুলটাও রাস্তার ধারে। কাল টুপুর নজর করেনি। বেশ বড়ই বলা যায় স্কুলটাকে। একতলা পাকাবাড়ি, ভেতরে কম করেও খানদশেক ঘর। সামনে বিশাল মাঠ। ফুটবল পেটাচ্ছে কয়েকটি আদিবাসী কিশোর। এই সকালবেলাতেই। কখন এদের স্কুল বসে? না কি থলকোবাদে এখন বসন্তের ছুটি?

স্কুলটাকে দেখতে দেখতে টুপুর বলল, "সুমায়াকে কেন জামদায় পড়তে পাঠিয়েছিল সারগিয়াদাদা? এই স্কুলটাই তো ভাল ছিল।"

পার্থ বলল, "বোধহয় আরও ভাল স্কুলে পড়ানোর শখ হয়েছিল।"

"তো? এখনও তো সুমায়া এখানে ভর্তি হতে পারে!"

"ও একবার না পড়ার স্বাদ পেয়ে গেছে। আর কি ওকে স্কুলে ঢোকানো যাবে?"

পার্থ হাসতে হাসতে বলল, "তা ছাড়া ওর ন্যাক জাঙ্গল-লাইফে, ও নিজের মতোই বড় হোক।"

"সুমায়ার কিন্তু কাল থেকে খুব মনখারাপ।"

"হবেই তো। জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারকে ও ভীষণ ভালবাসে।"

স্কুল পেরিয়ে ছোট ছোট খেত। কচি সবুজ ধানগাছে নরম গালিচার মতো হয়ে আছে খেতগুলো। এ জায়গাটা মোটামুটি সমতল। কোনও পাহাড়ি ঝোরা থেকে নালা কেটে এনে সেচের বন্দোবস্ত করা হয়েছে খেতে। নালার জল অতি স্বচ্ছ। কাকচক্ষুর মতো। বুমবুম দৌড়ে গিয়ে জলটা ছুঁয়ে এল। আবার যাচ্ছে ছুঁতে। খেলা।

গ্রামের শেষে ফের জঙ্গল। প্রথমে হাল্‌কা, ক্রমশ ঘন। কচি শালপাতায় সবুজ হয়ে আছে গাছগাছালি। পাখি ডাকছে পিক পিক। গ্রামে চড়া রোদ ছিল, এখানে সূর্য অনেক নরম।

জঙ্গলের মধ্যিখানে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল পার্থ। বলল, "চোখ বোজ।"

"কেন?"

"বোজ না। বুমবুম, তুইও চোখ বন্ধ কর।"

চোখের পাতা একটুখানি বন্ধ রাখতেই এক অপার্থিব অনুভূতি। প্রায় নিস্তব্ধ জঙ্গলে টুপ টুপ টুপ টুপ শব্দ হচ্ছে একটানা। যেন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

পার্থ বলল, "শব্দটা কীসের বল তো?"

"কীসের?"

"ফুল ঝরছে অবিরাম। পাতা খসছে।"

শব্দটা দারুণ ভাল লেগে গেল টুপুরের। একটু হাঁটছে। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। শুনছে। সাদা সাদা ফুলে ছেয়ে আছে বনতল। বুমবুম আর টুপুর কুড়োচ্ছে ফুল। শুঁকছে ফুলগুলোকে।

টুপুর বলল, "একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার লক্ষ করেছ মেসো? শাল সেগুন গাছের নীচে কত ফুল পড়ে থাকে, কিন্তু মহুয়াগাছের নীচটা একেবারে ফাঁকা। মহুয়াগাছের ফুল কি ঝরে না?"

পার্থ মুচকি হাসল, "ঝরে, কিন্তু থাকে না। সাফ হয়ে যায়।"

"বুঝেছি।" টুপুরও মুখ টিপে হাসছে, "আদিবাসীরা ওই ফুল দিয়ে নেশা করার মহুয়া বানায়।"

"শুধু নেশার কাজে নয়, মহুয়ার ফুল ফল আরও অনেক কাজে লাগে রে! ওই ফুল কিংবা ফল সেদ্ধ করে খাদ্যবস্তু হিসেবে খায় আদিবাসীরা। পেট ভরানোর জন্যে। মহুয়া ফলের বীজ থেকে তেল বার করে ওরা রান্নাবান্না করে। মহুয়ার খোল ব্যবহার হয় সার হিসেবে। গোরু ছাগলেও খায়। ওই খোলের ধোঁয়ায় মশা পালায়।"

পার্থর বক্তৃতার মাঝেই বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "টুপুরদিদি, টুপুরদিদি, ওই দ্যাখো খরগোশ!"

বুমবুমের গলার আওয়াজে খরগোশগুলো থমকে গেছে। পিছন ঘুরে সাঁ দৌড় লাগাল জঙ্গলে।

পার্থ বুমবুমকে বলল, "যাক, তোর তবে আর একটা অ্যানিম্যাল দেখা হয়ে গেল।"

টুপুর বলল, "খরগোশগুলো কী লাভ্‌লি! ইস্‌, মিতিনমাসি মিস করল!"

"কিচ্ছু মিস করেনি। তোর মাসি এখন আসল ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালের পেছনে ছুটছে।"

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "মেঘাতুবুরুতে মিতিনমাসি কী করতে গেল বলো তো?"

"মনে হল কাউকে ফোনটোন করবে। টেলিফোনের ছোট নোটবইটা তো নিয়ে গেল।"

"শুধু ফোন?"

"আরও কিছু প্ল্যান আছে হয়তো। আমাদের এখনই জানাতে চায় না।"

সাড়ে দশটা বাজে। জঙ্গলে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না টুপুররা। ফিরছে।

রেস্টহাউসের কাছাকাছি এসে টুপুর দেখল কম্পাউণ্ডে একখানা জিপ দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ছলাৎ করে উঠেছে। মিতিনমাসি ফিরে এল নাকি?

আরও কাছে এসে ভুল ভাঙল। অন্য জিপ। জে এইচ কে সাতশো ঊনত্রিশ। ছোকরা সারথি ড্রাইভিং সিটে বসে কানে পালক ঘোরাচ্ছে।

চাতালে উঠে টুপুর ভীষণ অবাক! বারান্দায় অবনীর পাশে মুকুল সিংহ! দু'জনের হাতেই চায়ের কাপ।

পার্থ বিস্মিত স্বরে বলল, "আপনি কোত্থেকে?"

মুকুল গাল ছড়িয়ে হাসলেন, "এসেছি কুমডিতে। আমাদের আই-আই-টির এক প্রোফেসর ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন সারাণ্ডায়। জোর করে আমায় জামদা থেকে তুলে নিয়ে এলেন। জঙ্গলে ওঁর খুব ভয়, আমাকে না নিয়ে তিনি জঙ্গলে ঢুকবেনই না। আমার মতো প্যাংলা লোক নাকি ওঁদের বাঘ সিংহের হাত থেকে বাঁচাবেন! হা হা।"

"তা ওঁরা কোথায়?"

"বললাম যে, কুমডিতে। রেস্টহাউসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সেই খড়্গাপুর থেকে টানা এসেছেন, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাহিল। মুকুল চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখলেন, এই সুযোগে আমিও ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু মোলাকাত করে আসি। আমার বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিন দেখা হল না..."

"ভালই করেছেন।" পার্থ ঘর থেকে চেয়ার টেনে এনে বসল,

"ফেরার পথে আর দেখা হত কি হত না..."

মুকুল বললেন, "আপনাদের সারান্ডা ভ্রমণ তো শুনলাম খুব জমে উঠেছে? ম্যাডামও দিব্যি একটা কেস পেয়ে গেছেন?"

"আপনি লিগিরদা এপিসোডটা শুনলেন?"

"অবনীবাবু বলছিলেন। কী ডেঞ্জারাস কাণ্ড বলুন তো? জঙ্গলে জঙ্গি হানা!"

অবনী বললেন, "কাল রাতেও তো কীসব কাণ্ড হয়েছিল। মাঝরাত্তিরে কারা নাকি জিপ নিয়ে ইনস্পেকশন বাংলোয় এসেছিল।"

"তাই নাকি! কারা?"

"টুপুর বলতে পারবে। এই টুপুর, বল না কী হয়েছিল!"

টুপুর ঢোক গিলল। কাল রাতের ঘটনাটার প্রচার চায় না মিতিনমাসি, মুকুলবাবুকে বলাটা কি উচিত হবে? বিশেষ করে মুকুলবাবুর বাবা আর ভাই যখন মিতিনমাসির সন্দেহের তালিকায় আছে? তা ছাড়া এই মুকুলবাবুও তো একজন সিংহ, এ-কথা তো ভুললে চলবে না।

টুপুর সপ্রতিভ স্বরেই বলল, "দেখলাম তো রেস্টহাউস থেকে। হুশ করে একটা জিপ ঢুকল, জেনারেটার চলল, আলো জ্বলল... তারপর কিছুক্ষণ থেকে জিপটা চলে গেল, আলোও নিভে গেল।"

"কারা ছিল জিপে?"

"দেখতে পাইনি। জিপটা তো এদিকে আর আসেইনি। বোধহয় বাংলোর ভেতর দিয়ে জঙ্গলে নেমে গেছিল।"

অবনী বললেন, "তাই? লিগিরদা গেল নাকি?"

মুকুল বললেন, "ওই গেট দিয়ে তো হাজারো দিকে যাওয়া যায়... আপনাদের চৌকিদার কী বলছে? ক'জন ছিল?"

টুপুর একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, "তিনজন।"

"ও চেনে?"

"বলল তো, না।"

"তার মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেউ নয়।" মুকুল মাথা নাড়লেন, "অনেক সময়ে রাত্তিরে উলটোপালটা পাবলিকও চলে আসে। অনেকেরই তো রাতে জঙ্গল দেখার নেশা। তারা পারমিট টারমিটের পরোয়া করে না, চৌকিদারকে পয়সা খাইয়ে হুটহাট বাংলোয় ঢুকে যায়। অথচ আপনারা, আই মিন জেনুইন টুরিস্টরা, গভর্নমেন্টকে পয়সা দিলেও ওই বাড়ি ভাড়া পাবেন না।"

পার্থ তির্যক স্বরে বলল, "জঙ্গলের কানুন বোধহয় এরকমই হয়।"

"জঙ্গলের কানুন! ভাল বলেছেন তো! হা হা হা।" মুকুল হাসতে হাসতেই বললেন, "তবে লোকগুলো যদি কালপ্রিটও হয়, তা হলে তাদের কাল রাতের এক্সপিডিশান মাটি হয়েছে। আপনার মিসেসের নুন ফেলে দেওয়ার আইডিয়াটা ব্রিলিয়ান্ট।"

"পার্থ বলল, "হ্যাঁ, মিতিনের মাথায় চটপট বুদ্ধি এসে যায়।"

মুকুল বললেন, "দেরি না করে আজই রেঞ্জ অফিসে খবর পাঠিয়ে দেওয়াটাও ভাল কাজ হয়েছে। যদিও, ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, এখানকার রেঞ্জ অফিসগুলোর ওপর আমার খুব ভরসা নেই।"

"কেন?"

"ওরা তো সব ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। গোটা সারান্ডায় আপনি সাকুল্যে কুড়িখানা রাইফেল পাবেন কিনা সন্দেহ।"

"আমার স্ত্রী বোধহয় চাইবাসাতেও ফোন করবে।"

"গুড। ভেরি গুড। যদি কিছু করতে পারে, তো ডিস্ট্রিক্ট অফিসই পারবে। মনে হয় ম্যাডামের দৌলতে হাতিটা বোধহয় এযাত্রা রেহাই পেয়ে গেল। ডি-এফ-ও সাহেব হুকুম ছাড়লেই জঙ্গলের সমস্ত গেট

সিল হয়ে যাবে। ব্যস, তখন কালপ্রিটদেরও পালানোর রাস্তা বন্ধ।”

অবনী বললেন, “ব্যাটাদের ধরে আচ্ছাসে জেলের চাক্কি পেষানো দরকার। হাতির মতো একটা প্রাণীকে অ্যাটাক করবে...ছি ছি ছি।”

শুরু হয়ে গেল হস্তী প্রসঙ্গ। সারান্ডার জঙ্গলেরই অজস্র হাতির কাহিনী উপকাহিনী শোনাতে লাগলেন মুকুল। কোথায় দুই হাতিতে নাকি টানা ছাব্বিশ দিন লড়াই চলেছিল, কীভাবে একটা বাচ্চা হাতিকে উদ্ধার করেছিল অন্য হাতিরা, পাগল হাতিকে কেন বাকিরা দলে রাখে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গল্পের মাঝেই রান্নাঘর থেকে সহেলির আবির্ভাব। সহেলি মুকুলকে বললেন, “এবেলা আর ফিরবেন কেন? ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের এখানেই চাট্টি খেয়ে নিন। তারপর চলুন করমপদা। মধুবাবার দর্শন করে আসি।”

অবনী বললেন, “উত্তম প্রস্তাব। ফেরার পথে আমরাই নয় আপনাকে কুমডিতে ছেড়ে দিয়ে আসব। জানেন তো, আমার শ্যালিকার আজ সকালে কুমডি যাওয়ারই প্ল্যান ছিল।”

“ওরেব্বাস, অসম্ভব।”

“কেন?”

“প্রথমত, আমার সঙ্গীরা তিনটের মধ্যে জঙ্গল ছাড়বে, আমাকে ওদের সঙ্গে থাকতেই হবে। দ্বিতীয়ত, আমার ওই মধুবাবাতে কোনও আকর্ষণ নেই। কারণ আমি কোনও বুজরুক সাধুতে বিশ্বাস করি না।”

“মধুবাবা বুজরুক?” সহেলি হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

“ভেলকি দেখানো সাধুমাত্রই বুজরুক। এই নিয়ে বাড়িতে আমার ভাইয়ের সঙ্গে কত তর্ক হয়ে গেল। বিকাশের আবার এসবে খুব বিশ্বাস। ওই মধুবাবার কাছে তো বারতিনেক ঘুরে গেছে।

একবার বউমাকে নিয়েও এসেছিল।” মুকুল ঘড়ি দেখলেন, “বারোটা বাজল, এবার আমি চলি। ম্যাডামের সঙ্গে আজ আর দেখা হল না। বাই দা বাই, আপনারা যেন ফিরছেন কবে?”

“শনিবার। রাত্তিরটা চাইবাসায় থেকে রবিবার চক্রধরপুর থেকে ট্রেন ধরার ইচ্ছে আছে।

“আমার রিটার্ন নেক্সট রবিবার।” মুকুল উঠে গাড়ির দিকে গেলেন, “পারলে শনিবার চলে আসুন জামদায়। আমি হোল-ডে বাড়িতেই আছি।”

মুকুল চলে যাওয়ার অনেক পরে মিতিন ফিরল। প্রায় দুটোয়। থমথমে মুখে।

মিতিন ফেরার খানিক আগে সারগিয়া ফিরেছে। সারগিয়া চিঠি পৌঁছে দিয়েছে বটে, তবে রেঞ্জার সাহেব অফিসে ছিলেন না, তিনি নাকি গেছেন সেরাইকেলা।

খেতে খেতে সারগিয়ার মুখে রেঞ্জ অফিসের বৃত্তান্ত শুনল মিতিন। টুপুর পার্থ শোনাল মুকুল সিংহর কথা।

মিতিন কথা বলছে অস্বাভাবিক কম। আহারের পর চাতালে হাঁটছে একা একা।

সহেলি তাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী রে, করমপদায় যাবি তো? না কি আজ ক্যানসেল করে দেব? কাল না হয়...।”

মিতিন মাথা নেড়ে বলল, “না। আজই চলো।”

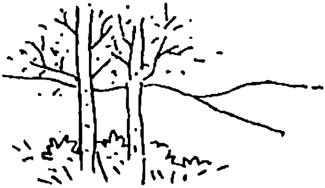

বড়সড় বেলগাছের নীচে ছোট্ট শিবমন্দির। বাঁধানো। নিয়মিত পুজোআর্চার বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরের গায়ে মধুবাবার আশ্রম। নামেই আশ্রম, আদতে বাঁশ দরমার কাঠামোর মাথায় টিনের চাল ফেলা একখানা বড় ঘর। বহিরঙ্গের চেহারা দেখে বোঝা যায় ঘরখানা হালে হয়েছে।

আশ্রমের পিছনেই রেললাইন। সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। প্রকৃতপক্ষে মাঠও নয়, হালকা বন। খোলামেলা জায়গায় অনেকটা দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে শালগাছ। ওই শাল গাছগুলোর নীচেই হাট বসে করমপদায়।

চারটে বাজে। হাট এখন ভাঙার মুখে। কেনাকাটার আর ভিড় নেই তেমন, সওদা সেরে ফিরছে আদিবাসীরা। বেশ কিছু আদিবাসী আশ্রমের সামনে জড়ো। জোর ক্যালর ব্যালর চলছে। আদিবাসী মেয়েদের মাথায় পলাশ শিমুল। সেগুনফুলও খোঁপায় গুঁজেছে কেউ কেউ। রংচঙে পোশাকে রঙিন হয়ে আছে জায়গাটা। মহুয়ার উগ্র গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

ভক্তদের সামনে ছোট একটা বেদিতে বসে আছেন মধুবাবা। বেদি মানে বেঁটে বেঁটে চারখানা শালবল্লার খুঁটির ওপর চেরা চেরা কাঠের পাটাতন। একা নন মধুবাবা, তাঁর পাশে এক চ্যালাও বিরাজমান।

গেরুয়া রং-এর আলখাল্লা পরে আছেন মধুবাবা। ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি বুকের কাছে ঝুলছে! কপালে

গালে খানতিনেক বড় বড় আঁচিল। চ্যালাটিরও মুখ শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত। তবে তাঁর আলখাল্লার রং সাদা।

টুপুরদের জিপ থেকে নামতে দেখে পুরো সমাবেশটাই থমকে গিয়েছিল। ভক্তরা ঘুরে ঘুরে দেখছে টুপুরদের। মধুবাবার মোটা মোটা ভুরুতে পুরু ভাঁজ, চ্যালার চোখে জিজ্ঞাসা।

করমপদার বনকর্মীটি টুপুরদের সঙ্গে এসেছে। বেদির কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলল চ্যালাটিকে। চ্যালাও গুরুকে ফিসফিস করে বলল কীসব।

মধুবাবার ভুরু স্বাভাবিক হল। হাত নেড়ে ডাকলেন টুপুরদের। সামনে এসে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

মিতিন অস্ফুটে বলল, "তোমরা যাও। আমি এখানেই আছি।"

সহেলি বললেন, "সে কী! কেন? তুইও চল।"

"আমি দূর থেকেই দেখি।"

টুপুর বলল, "আমিও তা হলে মিতিনমাসির সঙ্গে থাকি।"

মিতিন আদেশের সুরে বলল, "না। তুই সামনে গিয়ে বোস। ভাল করে দ্যাখ, সাধুবাবা কোনও চালাকি করছে কি না।"

মিতিনমাসি একটা কাজের ভার দিতে টুপুর মহা আহ্লাদিত। বুমবুমের হাত ধরে গটগট এগিয়ে গেল। বেদির হাতদুয়েক তফাতে বসল আসনপিঁড়ি হয়ে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে মধুবাবার ঐশী কার্যকলাপ।

টুপুরের পাশে পার্থ। তার পাশে সহেলি। হাতজোড় করে বসেছেন সহেলি, মুখে গদগদ ভাব। অবনী আসেননি সঙ্গে, মুধবাবাতে তাঁর কণামাত্র আগ্রহ নেই। তিনি এখন থলকোবাদের জঙ্গলে বসে মহাসমুদ্রের টানে বিভোর।

মধুবাবা এক আদিবাসী মহিলার সমস্যা শুনছিলেন। টুপুরদের আগমনে কিছুক্ষণের জন্য অমনোযোগী হয়েছিলেন তিনি, আবার

মগ্ন হয়েছেন মহিলার আবেদনে। শুনছেন মহিলার কথা।

বেদির পাশে প্রকাণ্ড ড্রাম। মহিলার কথা শেষ হওয়া মাত্র ড্রাম থেকে জল তুলে ঢালা হল একখানা স্টিলের ডেকচিতে। চ্যালা ডেকচিটা মধুবাবার সামনে এনে ধরল। জলে ডান হাত ডুবিয়ে দিলেন মধুবাবা। চক্ষু নিমীলিত। জলে ঘোরাচ্ছেন হাতখানা, ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প। পনেরো-কুড়ি সেকেন্ড পর হাতখানা তুলে নিয়ে ইশারা করলেন চ্যালাকে।

আদিবাসী মহিলাটিকে ফ্যাসফেসে গলায় চোস্ত হিন্দিতে নির্দেশ দিল চ্যালা, "এই জল তোর বোতলে ঢেলে নে। ছেলেকে আজ তিন বার খাওয়াবি, কাল তিনবার। দু' চুমুক করে। পূর্ণিমা লাগার পরে আর খাওয়াতে হবে না।"

মহিলাটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "পেটের ব্যথা সেরে যাবে তো মহারাজ?

মধুবাবা চোখ বুজে ঘাড় নাড়লেন। হাতে অভয়মুদ্রা।

মহিলা মধুবাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। কোঁচড়ে রাখা প্লাস্টিকের বোতলে ঢেলে নিল জলটা। তারপর উঠে গেছে ধীর পায়ে।

এবারে এক আদিবাসী বৃদ্ধ।

চ্যালা ফের ফ্যাসফেসে স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী সমস্যা?"

বৃদ্ধ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, "আমার বুড়ি বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। হাত পা মুখ সব ফুলে গেছে।"

চ্যালা বলল, "কেঁদো না। বাবার ওপর ভরসা রাখো।"

এবার জল নয়, ঝোলা থেকে এক মুঠো চাল বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়েছে চ্যালা। বলল, "চাল খেয়ে দেখো। মিঠা?"

বৃদ্ধ দু'-তিনটে চাল দাঁতে কেটে মাথা নাড়ল, "না।"

"এবার চাল বাবার হাতে দিয়ে দাও।"

বৃদ্ধ কুঁজো হয়ে চাল দিচ্ছে। দু' হাতে চালটা নিলেন মধুবাবা। ফের চক্ষু নিমীলিত, ঠোঁট নড়ছে, হাতে চাল ঘষছেন।

চ্যালা বলল, "এবার এক দানা চাল মুখে দাও।"

চাল দাঁতে কেটে বৃদ্ধ বিহ্বল। বারবার কপালে হাত ঠেকাচ্ছে।

চ্যালা প্রশ্ন করল, "চাল মিঠা লাগছে?"

"হ্যাঁ মহারাজ।"

"জোরে জোরে সবাইকে বলো।"

বৃদ্ধ ঘড়ঘড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "চাল মিঠা। চাল মিঠা।"

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা ধ্বনি তুলেছে, "মধুবাবাকি জয়। মধুবাবাকি জয়।"

চ্যালা বলল, "এই চাল এবার গিয়ে বউকে খাইয়ে দাও। জলে ভেজাবে না, সেদ্ধ করবে না, কাঁচা খাবে।"

বৃদ্ধ কোঁচড়ে চাল বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

টুপুর কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ করছিল। এক নম্বর, মধুবাবা বসে আছেন নির্বাক হয়ে। যা বলার বলছে তাঁর চ্যালা। দু' নম্বর, চ্যালাটির ভাষা বিশুদ্ধ হিন্দি, যা এই আদিবাসী অঞ্চলে অপ্রচলিত। শিষ্যটিকেও কি গুরু সঙ্গে এনেছেন? সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, কারুর কাছ থেকেই প্রণামী নিলেন না মধুবাবা। অনেক জায়গায় এরকম ক্ষেত্রে বাক্সটাক্স রেখে দেওয়ার নাকি চল আছে, ভক্তরা যে যা পারে সেই বাক্সে দিয়ে যায়। এখানে সেরকম কোনও বন্দোবস্তও নেই। যদি ভণ্ডামিটাই উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বিনা পয়সায় খেল দেখাবেন কেন?

মধুবাবার মুখে তৃপ্তির হাসি। দৃষ্টি পড়েছে বুমবুমের দিকে। একটা আঙুল নেড়ে বুমবুমকে ডাকলেন কাছে।

বুমবুম নয়, সহেলিই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঢিপ করে একটা প্রণাম

ঠুকলেন বেদিতে। নিজস্ব হিন্দিতে বললেন, "আমাদের আশীর্বাদ করুন বাবা।"

"মধুবাবা একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। চ্যালা বলল, "বাবা আপনার হাত ধরতে চাইছেন।"

সম্মোহিতের মতো দুটো হাতই বাড়িয়ে দিলেন সহেলি।

মধুবাবা ডান হাতখানা ধরলেন। নিজের দু' হাতের মাঝখানে হাতটাকে রেখে ঘষছেন। একটু পরেই ছেড়ে দিলেন।

চ্যালা সহেলিকে বলল, "আপনার হাত জিভে ঠেকান। মিষ্টি হয়ে গেছে।"

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই সহেলি হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন মধুবাবার পায়ে, "বাবা, আপনি ভগবান। আমাকে দয়া করুন।"

চ্যালা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আপনার?"

"হাঁটু আর কোমরে ভয়ানক যন্ত্রণা মহারাজ। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় বাড়ে।"

মধুবাবা ইশারা করলেন চ্যালাকে। চ্যালা বলল, "আপনাদের কাছে এক টাকার কয়েন আছে?"

পার্থ চকিতে পার্স খুলে চার-পাঁচখানা কয়েন রাখল বেদিতে।

মধুবাবা তার থেকে মাত্র দুটো কয়েন তুলে নিলেন। আঙুলে ঘষে ফেরতও দিলেন সঙ্গে-সঙ্গে। চ্যালাও যথাবিহিত নির্দেশ দিল সহেলিকে, "ব্যথার স্থানে কয়েনটা ঘষবেন। রাত্রে শোয়ার সময়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে। যন্ত্রণার উপশম হবে।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কয়েন মিষ্টি হয়ে গেছে?"

চ্যালা বলার আগেই সহেলি জিভে ঠেকিয়েছেন কয়েন দুটো। আপ্লুত গলায় বললেন, "ওমা, এ যে লজেন্সের চেয়েও মিষ্টি!"

বুমবুম বায়না জুড়ল, "আমায় দাও। আমায় দাও।"

সহেলি মোটেই কয়েন দুটো হাতছাড়া করতে রাজি নন। বেঁধে

ফেলেছেন আঁচলে।

ঘন ঘন জয়ধ্বনি চলছে। এক এক আদিবাসীর এক এক সমস্যা, মধুবাবা কাউকেই নিরাশ করছেন না। কারুর কপালে জুটছে মিষ্টি জল, কেউ বা পাচ্ছে মিষ্টি চাল। খোঁপার ফুল পর্যন্ত অবলীলায় মিঠে হয়ে যাচ্ছে মধুবাবার ছোঁয়ায়।

টুপুর ধন্দে পড়ে যাচ্ছিল। কী ঘটছে ব্যাপারটা? এ তো ম্যাজিশিয়ানের হাত সাফাই নয়, মার হাতটাই তো মিষ্টি হয়ে গেছে! বুমবুমকে দু'খানা বেলপাতা দিলেন মধুবাবা, দুটো পাতাই যেন গুড়! কী করে সম্ভব? তা হলে কি অলৌকিক ক্ষমতা বলে সত্যিই কিছু আছে?

মুগ্ধ হয়েছে পার্থও। বলল, "তোর মাসি পেছনে দাঁড়িয়ে করছেটা কী? ডেকে আন। দেখুক।"

বটেই তো! মিতিনমাসি না দেখলে হয়?

টুপুর ভিড় টপকে পিছনে এল। এদিক ওদিক খুঁজল মিতিনকে। কোথায় গেল মিতিনমাসি? এখানেই তো ছিল!

নজরুলও ভিড়ে মিশে মধুবাবার কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করছিলেন। টুপুরকে দেখে সরে এলেন, "এবার যাবে নাকি?"

"মা কি এক্ষুনি নড়বে? ...মিতিনমাসি গেল কোথায়?"

"দিদি তো লেভেল ক্রসিং-এর দিকে গেলেন।"

শ'খানেক গজ দূরে লেভেল ক্রসিং। কয়েকটা রেলের কোয়ার্টার মতন আছে ওদিকে। তার পিছনেই জঙ্গল। ওটা তো ফেরার রাস্তা, ওখানে কেন গেছে মিতিনমাসি?

টুপুর একাই এগিয়ে দেখবে কি না ভাবছে, তখনই দেখা গেল মিতিনকে। কাঁধে ক্যামেরাখানা ঝুলিয়ে হনহনিয়ে ফিরছে।

কাছে এসে হাসল মিতিন, "গোটাকয়েক স্ন্যাপ নিলাম করমপদার।"

"হঠাৎ?"

"সব জায়গারই কিছু-কিছু স্মৃতি থাক। মিতিনের হাসি সামান্য চওড়া হল, "তোর মাকে এবার ডাক। বিকেল ফুরিয়ে এল, অন্ধকারে ফিরতে বড়দির ভাল লাগবে?"

বনকর্মীটিও চলে এসেছে। তাকে দিয়ে সহেলিদের ডাকিয়ে জিপে বসল মিতিন।

গাড়ি গতি নিয়েছে। মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কেমন দেখলে মধুবাবাকে?"

সহেলি এখনও ঘোরে। বললেন, "তুই যে কী মিস করলি মিতিন! একবার যদি বাবাকে ছুঁয়ে আসতিস!"

দুপুরের গোমড়া ভাবটা কেটে গেছে মিতিনের। মুচকি হেসে বলল, "আমি যা দেখার দেখে নিয়েছি।"

"কী করে দেখলি? তুই তো পেছনে ছিলি!"

"বেশি সামনে গেলে তোমাদের মধুবাবার অসুবিধে হত।"

"তার মানে তোর এখনও বিশ্বাস হয়নি?"

"কোনটা বিশ্বাস করার কথা বলছ? ওই মিষ্টি করে দেওয়ার ক্ষমতাটা? না কি মধুবাবার দৈবশক্তি?"

"ওমা, মিষ্টি করার ক্ষমতাটাই তো দৈবশক্তি।"

"মোটেই না বড়দি। তোমার মধুবাবাটি একটি তৃতীয় শ্রেণীর ফ্রড। করমপদার মতো রিমোট জায়গায় না উঠে কলকাতায় আড্ডা গাড়লে অ্যাদ্দিনে ওর চামড়া উঠে যেত। কীভাবে সব কিছু মিষ্টি করে দিচ্ছে জানো? অজস্র ধরনের প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট আছে, যেগুলো দারুণ মিষ্টি হয়। চিনি গুড়ের চেয়ে ঢের ঢের বেশি মিষ্টি। সবচেয়ে কমন উদাহরণ, সরবিট্ল, গ্লিসারল। কিংবা তোমাদের মধু। এরা প্রায় চিনির মতোই। কিন্তু এদের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার চিনির চেয়ে আলাদা। রক্তে চিনির মাত্রা বেড়ে গেলে এদের চিনির পরিবর্তে

ব্যবহার করা হয়। ডায়েবিটিস রুগিদের সন্দেশ তৈরি হয় সরবিট্ল দিয়ে। হজমের ওষুধে গ্লিসারল মেশায়, মিষ্টি করার জন্যে।

মিতিনের কথাগুলো মগজে ঢুকছিল না সহেলির। বললেন, "তার সঙ্গে মধুবাবার চাল জল মিষ্টি করার কী সম্পর্ক?"

"আছে। আছে। ডাল্সিটল বা স্টেভিওসাইড চিনির চেয়ে তিনশো গুণ মিষ্টি। এগুলোও উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয়। এবং সেই গাছ খুব বিরল নয়। এমনকী কলকাতাতেও মেলে। অ্যাজিরেটাম বলে একটা গাছ আছে, যার পাতা, কাণ্ড সবই ভয়ানক মিষ্টি। এরকম যে-কোনও একটা উদ্ভিদের নির্যাস হাতে লাগিয়ে মধুবাবার খেলাটি দেখানো সম্ভব। এমনিতে হাত দেখে কিছু টের পাওয়া যাবে না, কিন্তু ওই হাতে যা ছোঁবে তাই মিষ্টি হয়ে যাবে। মিতিন পার্থর দিকে ফিরল, "তোমার সেই গোড়বাবার কেসটা মনে আছে?"

"কোনটা বলো তো? সেই মহারাষ্ট্রে...?"

"ইয়েস। পুনে ডিস্ট্রিক্টের বারামতীতেও এরকম একটা মিষ্টি বানানো বাবার আবির্ভাব হয়েছিল। উনিশশো বিরানব্বই সালে। প্রতারকটির নাম ছিল ভানুদাস গায়কোয়াড়। সে ঝাল কাঁচা লঙ্কাকেও মিষ্টি করে দিত। তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এক আয়ুর্বেদ ডাক্তার। খেলাটা অবশ্য বেশিদিন চালাতে পারেননি ভানুদাস ওরফে গোড়বাবা ওরফে গুড়বাবা। যুক্তিবাদী সমিতির লিডাররা গিয়ে লোকটাকে ধরেও ফেলেছিল। কিন্তু পাবলিক সেন্টিমেন্টের জন্য কিছুই করা যায়নি। ভানুদাস তাদের চোখে ছিল একজন হিরো। লোকটা যে চিটিংবাজ হতে পারে, এ তারা মানেইনি। তা ছাড়া ভানুদাসের পেছনে অনেক বড় বড় চাঁই ছিল, তারাও ভানুদাসকে প্রোটেকশান দিয়েছে। এই মধুবাবা হচ্ছে ওই ভানুদাস গায়কোয়াড়েরই করমপদা সংস্করণ।"

সহেলির চোখ কেমন ঘোলা হয়ে গেছে। বললেন, "তাই? হাতে রস মাখিয়ে রাখে?"

"তোমাকে উনি কী দিয়েছেন? মিঠে জল?"

"না। একজোড়া কয়েন।"

"রেস্টহাউসে ফিরে সারগিয়াকে বোলো ভাল করে কেরাসিন দিয়ে মুছে দিতে, তারপর চুষো। এক ফোঁটা মিষ্টি পেলে বোলো আমায়।"

"কিন্তু... এখানে যে সকলের অসুখ সেরে যাচ্ছে?"

"এখানকার আদিবাসীদের শরীর খুব পল্‌কা নয়। হাজার হাজার বছর ধরে এরা জঙ্গলে রয়েছে। বেশিরভাগ অসুখবিসুখ এদের শরীরই প্রতিরোধ করতে পারে।" মিতিন হাসল, "তা ছাড়া দৈব ওষুধের মজটা তো এরকমই। দশজনের মধ্যে একজনের অসুখ এমনিই সারে। আর তখন দৈব ওষুধের প্রচারে গগন ফাটে। যাদের সারে না, তারা চুপচাপ চেপে যায়। ভাবে, এ বুঝি তাদের পাপের ফল। আর এইভাবেই বাবারা মহাবাবা হয়ে যান।"

সহেলি গুম মেরে গেলেন।

টুপুর মজা পেয়েছে খুব। বলল, "আমারও তাই কেমন কেমন ঠেকছিল!"

"বাজারের পেছনে তো একটা নিমগাছও ছিল। নিমপাতা এনে বাবার হাতে ঘষে দিলি না কেন? রহস্য ফাঁস হয়ে যেত।"

পার্থ বলল, "সে তো তুমিও করতে পারতে।"

"না স্যার। পাবলিক সেন্টিমেন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে বললাম যে। আদিবাসীরা সবাই মিলে আমায় ঠেঙাত তা হলে। এখন যা করতে হবে, সব রয়েসয়ে।"

টুপুর বলল, "কিন্তু লোকটা করমপদায় এসে ডেরা বেঁধেছে কেন? লোকটা তো পয়সাকড়িও নেয় না?"

"কারণ নিশ্চয়ই আছে।" মিতিনের স্বর ফের গম্ভীর, "শিগগিরই জানতে পারবি।"

পাহাড়ের আড়ালে ঝুপ করে হারিয়ে গেছে সূর্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে জঙ্গল অন্ধকার। সাবধানে চড়াই-উতরাই ভাঙছেন নজরুল। জিপেও সবাই চুপচাপ।

আঁধার বনে অস্বস্তি কাটাতেই পার্থ হঠাৎ বলে উঠল, "তোমার মেঘাতুবুরু অভিযানের কী ফল?"

"কাজ হয়েছে। আশা করছি আজই ফোর্স এসে যাবে।"

"চাইবাসায় ফোন করেছিলে?"

"তার চেয়েও বড় জায়গায়। চিফ কন্‌জারভেটর অব ফরেস্টকে ফোন করেছি।"

"তাঁর নম্বর কোত্থেকে পেলে?"

"অনিশ্চয়বাবু। আমাদের লালবাজারের ডি সি সাহেব। ওঁর শালা দেবজ্যোতি সরকার গোটা পূর্ব ভারতের বনজঙ্গলের হর্তাকর্তা। তাঁকেই ফোনে বললাম এলিফ্যান্ট এপিসোড। খবর উনিও পেয়েছেন, তবে স্কেচি। ডিটেলে শুনে উনি রীতিমতো এক্সাইটেড। ইমেডিয়েটলি ডি-এফ-ও চাইবাসাকে অর্ডার করবেন বললেন।"

পার্থকে খুব আশান্বিত মনে হল না। বলল, "দ্যাখো কী করে! সরকারের তো আঠারো মাসে বছর!"

"কোনও-কোনও সময়ে তিন মাসেও বছর হয়। যদি ওপরওয়ালা চান। এবং আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, থলকোবাদে এখন এক দু'জন ফরেস্ট অফিসারকে আমি পাব।"

"অনিশ্চয়বাবুর সঙ্গে কথা হল? বললে হাতির কেসটা?"

"তার চেয়ে অনেক বেশিই কথা হয়েছে।"

"কী কথা?"

"বললাম যে, জানতে পারবে। ধৈর্য ধরো।"

মিতিনের অনুমানই সঠিক। জঙ্গলের বেশ কয়েকজন অফিসার

পৌঁছে গেছেন থলকোবাদের ইনস্পেকশন বাংলোয়। ডি-এফ-ও সাহেব তো আছেনই, উপগ্রহের মতো সাম্‌টা গুয়া কোয়না, তিন রেঞ্জেরই রেঞ্জার সাহেব হাজির। বাংলোর কম্পাউন্ড জিপে জিপে ছয়লাপ।

অবনীর সঙ্গে বাংলোর হাতায় কথা বলছিলেন ডি-এফ-ও। নাম ছবিলাল মারান্ডি। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জঙ্গলেও তাঁর পরনে হাফশার্ট।

মিতিনকে দেখে ছবিলাল এগিয়ে এলেন, "আপনি দেবজ্যোতিবাবুর পরিচিত, এ-কথা চাইবাসাতে একবার বলেননি কেন? আমি আপনাদের জন্য ইনস্পেকশন বাংলোটাই বুক করে দিতাম।"

"রেস্টহাউসেই বেশ আছি।" মিতিন মুখ টিপে হাসল। সরাসরি চলে এল কাজের কথায়, "আপনাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট কদ্দূর?"

"ফোর্স আসছে। আজ রাতে, নইলে কাল সকালেই পৌঁছে যাবে। আমি রাঁচিতে খবর করে দিয়েছি।"

"দেরি হয়ে যাবে না তো?"

"কী করা যাবে ম্যাডাম? চাইবাসায় আমার হাতে যে ক'জন গার্ড আছে, সবাইকে আমি জঙ্গলে পোস্ট করে দিয়েছি। গেটগুলোতেও আর্মড গার্ড বাড়াতে হয়েছে। বদমাইশগুলো পালাতে গেলে তাদের সঙ্গে ফাইট হতে পারে। অ্যাডিশনাল ফোর্সের জন্য আমাকেও তো রাঁচির ওপর ডিপেন্ড করতেই হয়। রাঁচি টু থলকোবাদ দূরত্বটাও ভাবুন। প্রায় দুশো সত্তর কিলোমিটার। ওখান থেকে পৌঁছতে দশ থেকে বারো ঘণ্টা তো লাগবেই।"

পার্থ বলল, "সে তো বটেই। রাস্তাঘাটও তো তেমন..."

প্রথম আলাপ সাঙ্গ করে মিতিনকে নিয়ে বাংলোয় গিয়ে বসলেন ডি-এফ-ও সাহেব। সারান্ডার ম্যাপ খুলেছেন। বললেন, "আমি এক্ষুনি এক্ষুনি যা স্টেপ নেওয়ার নিয়েছি। বদমাইশগুলো নুনের

প্ল্যান থেকে সরবে না বলেই আমার ধারণা। লিগিরদায় ওরা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু অন্য কোথাও ওরা ট্রাই করবেই। হাতিটাকে লাস্ট দেখা গেছে তিরিলপোসির তিন কিলোমিটার ওয়েস্টে। ওখান থেকে মোটামুটি পনেরো কিলোমিটার রেডিয়াসে আমাদের আরও তিনটে সল্টলিক আছে। ডি-এফ-ও সাহেব ম্যাপে ঝুঁকলেন। আঙুল দিয়ে দেখালেন বিন্দুগুলোকে। বললেন, "সবক'টাই ওয়েলগার্ডেড। তবে..."

"কী তবে?"

কোয়েনার রেঞ্জার বলে উঠলেন, "স্যার মনে করছেন আজকের রাতটা ওর চুপচাপই থাকবে। কাল পূর্ণিমা পড়ছে। পূর্ণিমার রাতটাকে পছন্দ করে পোচাররা। জ্যোৎস্নায় চারদিক আলো হয়ে থাকে তো। তখন লক্ষ্যস্থলের অনেক দূরে গাড়ি রেখেও হেঁটে ওরা টার্গেট পয়েন্টে পৌঁছে যেতে পারে।"

ডি-এফ-ও বললেন, "ইয়েস। পূর্ণিমাতেই জঙ্গলে শিকার খুব সহজ। এর ওপর যদি ওদের কাছে টেলিস্কোপিক রাইফেল থাকে, তা হলে তো ওরা অনেক দূর থেকেই ট্রাই নিতে পারে।"

মিতিন অস্ফুটে বলল, "অরণ্যের জ্যোৎস্না এত নিষ্ঠুর হয়?"

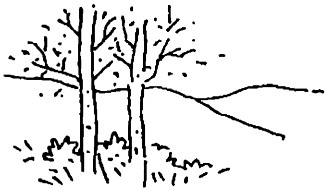

এত চেষ্টা সত্ত্বেও হাতিটাকে বাঁচানো গেল না।

সকালে সবে ঘুম থেকে উঠেছে টুপুর, মিতিনদের ঘর তখনও বন্ধ, সুমায়া হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিল। কাল রাতেই খুন হয়ে গেছে হাতিটা।

টুপুর উদ্‌ভ্রান্তের মতো মিতিনদের দরজায় ধাক্কা দিল। চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে মিতিনও হতচকিত, "তুমি খবর পেলে কোত্থেকে?"

সুমায়া ফুপিয়ে কেঁদে উঠল, "ফরেস্টগার্ড এসে খবর দিয়ে গেল দিদি। শয়তানরা ওকে লিগিরদাতেই মেরেছে।"

"লিগিরদা?" একসঙ্গে টুপুর আর মিতিনের গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল।

"হ্যাঁ দিদি। দাঁত ভি উপড়ে নিয়েছে।"

মিতিন দু' হাতে চুল খামচে ধরল। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, "সাহেবরা কোথায়?"

"সাহাবলোগ তো শুনেই জিপ লিয়ে বেরিয়ে গেল। হামাকেই বললেন আপনাদের জানিয়ে দিতে।"

অবনী আর সহেলি বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। পার্থও। কয়েক সেকেন্ড কারও মুখেই কথা নেই। যেন মৃত হাতির স্মরণে শোকপালন চলছে।

মিতিনই বরফ ভাঙল। গলা থেকে ধিক্কার ঝরছে, "ছি ছি ছি, আমরা কী নির্বোধ! ওরা যে আবার লিগিরদাতেই চেষ্টা করবে এই সরল সত্যিটুকু কেন মাথায় এল না?"

পার্থ বলল, "না আসাই তো স্বাভাবিক। ওখানে তো ওরা ফেল করেছিল।"

"এবং সেইজন্যই ওরা মাস্টার প্ল্যানটা বদলায়নি। চোরাশিকারি দলের পাণ্ডা সাত ঘাটের জল খাওয়া লোক। আমরা কী ভাবতে পারি, সেটাও সে আমাদের আগে ভেবে ফেলেছে। হি ইজ অলওয়েজ ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড। লিগিরদার প্ল্যান ভেস্তে গেছে বলে ওরা আর লিগিরদা যাবে না, আমাদের এই ভাবনাটাও পড়ে ফেলেছে রাবণ। জানত, কাল লিগিরদায় পাহারা থাকবে না।"

সহেলি বললেন, "কী ডেঞ্জারাস লোক রে!"

মিতিন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, "আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। আমার তো অন্তত বোঝা উচিত ছিল রাবণ হস্তি চরিত্র আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানে। সে নিশ্চিত ছিল হাতি এক-দু'দিনের মধ্যে লিগিরদায় আসবেই।"

পার্থ বলল, "তো এখন আমরা কী করব?"

"লিগিরদা যাব। এক্ষুনি। তুমি নজরুল ভাইকে ডাকো।"

সুমায়া বলল, "আমি যাব দিদি। হামার দিল বহুত দুখাচ্ছে।"

"চল।"

মিতিন ঘরে ঢুকে পোশাক বদলে নিল চটপট। টুপুরও। পার্থ অবনীও রেডি। জঙ্গলে এই প্রথম অবনীকে তাড়াহুড়ো করতে দেখা গেল। বুমবুম ঘুমোচ্ছে, তাকে আর ডাকা হল না। ওইটুকু ছেলের ওই বিচ্ছিরি দৃশ্য দেখার কোনও দরকার নেই।

সহেলি রয়ে গেলেন বুমবুমের কাছে। তড়িঘড়ি জিপে উঠে বসল বাকিরা।

লিগিরদার রাস্তাটা আজ বড় বেশি লম্বা মনে হচ্ছিল সকলের। কেন যে পথ ফুরোয় না?

বন দফতরের বহু কর্মীই পৌঁছে গেছে লিগিরদায়। খবর ছড়িয়ে গেছে চারদিকে, ভিড় করেছে জঙ্গলবাসীরাও। টুপুররা গিয়ে দেখল দৃশ্যটাকে যত ভয়ঙ্কর ভাবছিল, দৃশ্যটা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে হাতিটা, সল্টলিক থেকে হাত তিরিশেক তফাতে। শুঁড়ের ঠিক পাশে, কানের কাছে তিন-তিনটে বুলেটের গর্ত। এবং দুটি দাঁতের একটিও নেই।

ডি-এফ-ও হন্তদন্ত মুখে দৌড়ে এলেন, "কী বাজে ব্যাপার হল বলুন তো? আমি যে স্যারকে এখন কী জবাবদিহি করব?"

হাতির মৃত্যু নিয়ে নয়, ডি-এফ-ও ব্যাকুল ওপরঅলাকে

কৈফিয়ত দেওয়ার চিন্তায়।

মিতিন গোমড়া মুখে বলল, "ওসব নয় পরে ভাববেন। আগে গজদন্ত দুটো উদ্ধারের চিন্তাটা তো করুন।"

"দাঁত নিয়ে পালাতে পারবে না। জঙ্গলের সব গেটে ওয়াকিটকিতে মেসেজ চলে গেছে। প্রত্যেকটি গাড়ি সার্চ করা হবে।"

"যদি তারা গাড়িতে না যায়? ভুলে যাবেন না, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা ট্রেনলাইনও আছে।"

"তাই তো!" ডি-এফ-ও'র চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, "এটা তো ভাবিনি!"

"জঙ্গলের ভেতরে একটাই তো স্টেশন। করমপদা। প্যাসেঞ্জার ট্রেন সকালে করমপদায় কখন আসে?"

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন ডি-এফ-ও। সাম্‌টার রেঞ্জার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "কিরিবুরু থেকে ট্রেন ছাড়ে আটটা পাঁচে। করমপদায় সাড়ে আটটায় পৌঁছবে।"

ডি-এফ-ও ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠলেন, "সর্বনাশ, সাতটা যে বেজে গেছে! এখনই তবে ওয়াকিটকিতে করমপদায় জানিয়ে দিই, ট্রেনটাকে আটকাক।"

"না। আপনারই যাওয়া উচিত।"

মিতিনের স্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে, তাকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না ডি-এফ-ও। দৌড়ে জিপে উঠে পড়েছেন। হাতের ইশারায় চারজন সশস্ত্র বনরক্ষীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিতিনকে বললেন, "আপনি আসবেন না?"

"যাচ্ছি। আপনারা এগোন।"

লিগিরদা ছাড়ার আগে আর একবার হাতিটার কাছে দিয়ে দাঁড়াল মিতিন। পাশে টুপুর আর সুমায়া। কী অসহায় ভাবে পড়ে আছে

অত বড় প্রাণীটি! দু' চোখের মণি স্থির, যেন এখনও এই নিষ্ঠুর পৃথিবীটাকে দেখা তার ফুরোয়নি। জঙ্গলের সম্রাটের চোখে এখনও জঙ্গলের ছায়া। আহা রে!

মিতিন দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "শয়তানগুলোকে ছাড়া চলবে না রে সুমায়া।"

শুকনো পাতা মাড়িয়ে ছুটল জিপ। হাতির মৃত্যুতে নজরুলও দারুণ ব্যথিত। চাপা ক্রোধে চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে তাঁর। সাঁ সাঁ ছোটাচ্ছেন গাড়ি। খানিকটা বেপরোয়াভাবেই। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আগের জিপখানাকে ধরে ফেললেন নজরুল।

করমপদার গেটে পৌঁছে জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছেন ডি-এফ-ও। বনকর্মীটি দৌড়ে এল। আজ সে উর্দি পরেছে। খটাস সেলাম ঠুকে বলল, "জি সাব?"

মিতিন লাফিয়ে নামল জিপ থেকে। চেঁচিয়ে ডি-এফ-ওকে বলল, "এক্ষুনি ওকে অ্যারেস্ট করুন মিস্টার মারাণ্ডি।"

বনকর্মীটির মুখ পলকে পাংশু।

ডি-এফ-ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগই দিল না মিতিন। বলল, "পরে কথা হবে। আগে ওকে তুলে নিন জিপে। এর কোয়ার্টারেই আমি গজদন্ত প্যাকিং-এর বাক্স দেখেছি।"

কোনও প্রতিবাদ জোড়ার আগেই সশস্ত্র বনরক্ষী জিপে পুরে ফেলল বনকর্মীটিকে।

মিতিন নজরুলকে বলল, "এবার সোজা স্টেশন। জলদি।"

পার্থ কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল, "আটটা আটাশ! ট্রেন বেরিয়ে যায়নি তো?"

রোমাঞ্চকর অভিযানের সঙ্গী হয়ে অবনীও রীতিমতো উত্তেজিত। হাত মুঠো করে বললেন, "পেয়ে যাব মনে হচ্ছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন কি আর ঠিক টাইমে আসবে?"

অবনীর অনুমানই সঠিক। ট্রেন ঢোকেনি এখনও। তবে সিগনাল ডাউন হয়ে গেছে। বেশ কিছু লোক অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্য।

প্ল্যাটফর্মের অন্য প্রান্তে একটা বড়সড় জটলা। ভিড়ের মধ্যে মধুবাবাকে দেখা যাচ্ছে। ইয়া ইয়া দু'খানা প্যাকিংবাক্স রাখা রয়েছে প্ল্যাটফর্মে, একটায় অধিষ্ঠান করছেন মধুবাবা, পাশেরটায় তাঁর চ্যালা। আদিবাসী ভক্তরা বিদায় জানাতে এসেছে মধুবাবাকে। ঢিপ ঢিপ প্রণাম ঠুকছে। আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে একটা হাত উঁচু করে তুলে রেখেছেন মধুবাবা।

মিতিন দৌড়তে দৌড়তে মধুবাবার সামনে গেল। মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলল, "চললেন কোথায়?"

পাশের বাক্সটার ওপর থেকে চ্যালার যথারীতি হিন্দিতে উত্তর, "বাবা বারসোই যাচ্ছেন।"

"হঠাৎ বারসোই? কালই তো রাউরকেলা থেকে ফিরলেন!"

চ্যালা একটি লোককে দেখিয়ে বলল, "ইনি বাবার শিষ্য যদুনাথ মোহান্তি। ইনিই বাবাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।"

অদূরে দণ্ডায়মান লোকটির পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। নাকের নীচে শোভা পাচ্ছে এক জবরদস্ত বীরাপ্পান গোঁফ।

মিতিন হেসে বলল, "কী হালদারবাবু, আপনি টাইটেল পালটালেন কবে? এমন বদখত একখানা গোঁফই বা লাগিয়েছেন কেন? দু' দিকটা তো সমান হয়নি। ডানপাশটা তো ঝুলে যাচ্ছে।"

যদুনাথ ওরফে হালদার ভুল করে গোঁফে হাত দিয়ে ফেলল। এবং তৎক্ষণাৎ খুলে পড়েছে গোঁফজোড়া।

মিতিনকে কষ্ট করে গ্রেফতার করার কথা বলতেও হল না, ডি-এফ-ওর সঙ্গী এক বন্দুকধারী ঘেঁটি চেপে ধরেছে হালদারের। নির্বিবাদে হালদার গোঁফজোড়া দিয়ে দিল বনরক্ষীটিকে।

মিতিন ততক্ষণে দুই প্যাকিং বাক্সের মধ্যিখানে ঢুকে পড়েছে।

ব্যঙ্গের সুরে বলল, "সাধুমহারাজ, আপনার তো আর বারসোই যাওয়া হল না। এবার আপনিও ভালয় ভালয় আপনার গোঁফদাড়ি জমা করে দিন। আপনার আলখাল্লাটাও কি খুলে নেব?"

চ্যালা প্যাকিংবাক্স থেকে নেমে পড়েছে। গুটিগুটি পায়ে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল, মিতিন তর্জনী তুলল, "অ্যাই, একদম নড়ার চেষ্টা নয়। ফরেস্টগার্ডদের রাইফেল কিন্তু লোডেড।"

সঙ্গে-সঙ্গে ডি-এফ-ও হুঙ্কার ছুড়লেন, "গেট সেট।"

তড়াক করে একসঙ্গে সবক'টা রাইফেলের সেফ্‌টিক্যাচ উঠে গেল।

চ্যালাটি মুখে অসহায়তার ভাব ফুটিয়ে বলল, "ইয়ে কেয়া হো রহা হ্যায় বহিনজি?"

"অ্যাই, চোপ। আর হিন্দি নয়, হালদারের পো এবার বাংলায় কথা বল। বলেই এক হ্যাঁচকায় তার দাড়িটা খুলে নিল মিতিন।"

ঠিক তখনই একটা ভোজবাজি ঘটল। কিংবা সার্কাস। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় একখানা ব্যাক ভল্ট খেলেন মধুবাবা। প্যাকিংবাক্সের পিছনে পড়েই স্প্রিং দেওয়া ছুরির মতো লাফিয়ে উঠলেন। সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করেছেন প্ল্যাটফর্ম বেয়ে।

সমস্ত রাইফেলের নল ঘুরে গেছে মধুবাবার দিকে। কিন্তু তারা নিশানা স্থির করতে পারছে না। ডি-এফ-ও গর্জন করছেন, "পাকড়ো। পাকড়ো।"

সহসা এক আশ্চর্য কাণ্ড! তীব্র বেগে কোনও একটা বস্তু উড়ে গিয়ে আঘাত করল মধুবাবার ঘাড়ের নীচটায়। সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়লেন মধুবাবা।

সবক'টা চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল। সুমায়ার হাতের গুলতিটা তখনও কাঁপছে থরথর। চোখ জ্বলছে সুমায়ার।

অবনী স্থানকালপাত্র ভুলে শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠলেন, "শাবাশ। সুমায়া তো কামাল করে দিল!"

মিতিন বলল, "ও আর উঠলে হয়! মাটি পুড়িয়ে গুলতির গুলি বানিয়েছে সুমায়া। আর সারান্ডা পাহাড়ের মাটিতে তো লোহা। মধুবাবার ভবলীলা বোধহয় সাঙ্গ হল।"

কাছে গিয়ে অবশ্য দেখা গেল মধুবাবা ভালরকমই জীবিত। জ্ঞানও ফিরেছে, তাকাচ্ছে পিটপিট।

পার্থ ঝুঁকল, "আসুন, এবার আপনার চুলদাড়িটা খুলে নিই।"

অবনী বললেন, "পরচুলাটা তুমি খোলো, দাড়িটা আমি খুলি। এমন দুর্দান্ত অভিযানে আমারও একটা শেয়ার থাক।"

ডি-এফ-ও'র কাছে পুরো ঘটনাটাই বুঝি প্রহেলিকার মতো লাগছিল। দৃশ্যটাকে মনে হচ্ছিল হ্যালুসিনেশান।

মিতিন তাঁকে বাস্তবে ফেরাল। কেজো গলায় বলল, "প্যাকিং বাক্স দুটো খুলে দেখে নিন। দুটো গজদন্তই আছে। আর এই মধুবাবাটিকে একটু সাবধানে নিয়ে যান। এ কিন্তু জেল ভাঙাতে দারুণ ওস্তাদ। দু'-দু'বার কেনিয়ার জেল থেকে পালিয়েছে।"

ডি-এফ-ও হতভম্ব মুখে বললেন, "আপনি একে আগে চিনতেন?"

"ছবি দেখেছি। এ লোকটার আসল নাম গর্জন রায়। এক অতি প্রতিভাধর শয়তান। একসময়ে নামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। মূল বাড়ি জলপাইগুড়ির কাছে রানিনগরে। এখন বিশ্বনাগরিক। পেশা চৌর্যবৃত্তি। হাতির দাঁত লুঠ করায় ইনি স্পেশালাইজ করেছেন।"

মধুবাবা ওরফে গর্জন রায়কে হাতকড়া পরিয়ে দিল বনরক্ষীরা। হালদার গোলদার জুটিরও হাতে শিকল। স্টেশনে উপস্থিত আদিবাসীদের চোখে পলক পড়ছে না। সরল মুখগুলো হাঁ হয়ে আছে বিস্ময়ে।

ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা গেল। বারসোই যাওয়ার গাড়ি ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে।

ডি-এফ-ও আরও কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, মিতিন তাঁকে থামিয়ে দিল। বলল, "আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও একজনকে খাঁচায় পুরতে হবে।"

"কাকে?"

"সিংহমশাই। ...এই গর্জন রায় যদি রাবণ হন, তো তিনি মেঘনাদ। আমার আন্দাজ বলছে, এই ট্রেনেই আমরা দর্শন পাব জামদার সিংহর।"

টুপুরের চোখ বিস্ফারিত, "পুরুষোত্তমবাবু? এই ট্রেনে আসছেন? তিনিই আড়াল থেকে...? না কি বিকাশ সিংহ?"

"এক্ষুনি দেখতে পাবি।"

ট্রেন থামল। ওঠানামা করছে যাত্রীরা।

ডি-এফ-ওকে সঙ্গে নিয়ে কামরায় কামরায় উঁকি মারছিল মিতিন। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

হিমশীতল গলায় বলল, "আসুন সিংহমশাই। আমরা আপনারই পথ চেয়ে আছি।"

দীর্ঘকায় মানুষটা সুড়সুড় করে নেমে এল প্ল্যাটফর্মে।

টুপুরের গলা দিয়ে শব্দ ঠিকরে এল, "আরে, এ যে মুকুলবাবু!"

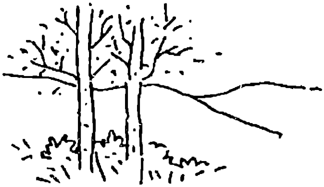

ভরা পূর্ণিমা। একটু আগে চাঁদ উঠেছে। চরাচরে এখন অপরূপ জ্যোৎস্নার মসলিন। সারান্ডার জঙ্গল সেজেছে রুপোলি সাজে। হালকা হালকা বাতাস বইছে। শাল সেগুন মহুয়ার বনে থিরথির কাঁপন।

ইনস্পেকশন বাংলোর লনে গোল হয়ে বসে গল্প করছিল টুপুররা। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর।

দূরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সহেলি বললেন, "কী অপূর্ব লাগছে দেখতে, তাই না? ঠিক মনে হচ্ছে গোটা জঙ্গল যেন গয়নাগাঁটি পরে ঝলমল করছে। আহা, চক্ষু আজ সার্থক হল।"

অবনী বললেন, "আমার কিন্তু চক্ষু আগেই সার্থক হয়েছে। মিতিনের কেরামতি দেখে।"

মিতিন লাজুক মুখে বলল, "ধুস, কেরামতি কীসের? ঘটনার পরম্পরাগুলো স্টাডি করলেই ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। আর আমি তো বেশ কয়েকখানা সূত্রও পেয়ে গিয়েছিলাম।"

টুপুর বলল, "আমি বলব কী কী সূত্র?"

"বল।"

"যেমন ধরো, ঝিনিকপানিতে মোটরসাইকেলের চালকটিকে দেখেই তোমার খুব স্ট্রাইক করেছিল। মনে হয়েছিল লোকটা খুব চেনা চেনা।"

"এটাকে কি ঠিক সূত্র বলা যাবে?" মিতিন মৃদু হাসল, "কারণ লোকটা তো আমার চেনা ছিল না। বহুকাল আগে খবরের কাগজে

গর্জন রায়ের একটা ছবি বেরিয়েছিল, ছবির সেই মুখটাই আমার স্মৃতিতে ছিল আবছা-আবছা। আর তাই কোথায় দেখেছি, কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলাম না। বরং বট্‌ল-ওপেনারটাকেই ক্লু হিসেবে ধরা যায়। ওই ছোট্ট জিনিসটাই তো আমার স্মৃতিকে ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে দিল।"

পার্থ বলল, "বট্‌ল-ওপেনার, মানে যেটা তুমি বাংলো থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?"

"হুম।" মিতিন ঘাড় নাড়ল, "বট্‌ল-ওপেনারটার গায়ে লেখা ছিল এলিফ্যান্ট ফেস্টিভ্যাল, নাইনটিন নাইনটিটু, কিনিয়া। ওটা দেখেই মনে পড়ে গেল কিনিয়ায় হস্তি-উৎসবের পরপরই কিনিয়ার নাকুরুতে গর্জন রায় নামের লোকটা ধরা পড়েছিল। কাগজে মোটামুটি ডিটেলেই বেরিয়েছিল খবরটা। যতদূর মনে আছে, হেডিং ছিল গজদন্ত পাচারের দায়ে বিদেশে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার গ্রেফতার। মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটাও চোখের সামনে ভেসে উঠল। আরে, সেই লোকই তো এই লোক! হাতি মারতে সারান্ডায় হানা দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল গর্জন রায়! তাও গর্জন রায়ের বর্তমান খবরাখবর জানার জন্য মেঘাতুবুরু গিয়ে ফোন করলাম অনিশ্চয়বাবুকে। উনি আমার কাছে ঘণ্টাখানেক সময় চেয়ে নিলেন। তারপর ইন্টারনেট আর পুলিশ ফাইল ঘেঁটে কনফার্ম করলেন বছর দেড়েক আগে কিনিয়ার জেল ভেঙে পালিয়েছে গর্জন রায়। অতএব সে ভারতে চলে আসতেই পারে। তোমাদের হয়তো মনে আছে, গত বছর নর্থ বেঙ্গলে দুটো হাতিকে মেরে গজদন্ত লুঠ করা হয়েছিল। সম্ভবত ভারতে গর্জন রায়ের ওটাই প্রথম কীর্তি।"

পার্থ বলে উঠল, "গর্জন রায় নর্থ বেঙ্গলের লোক বলেই কি প্রথমে ওখান থেকে অপারেশন শুরু করেছে?"

"নিশ্চয়ই তাই। স্থানীয় জঙ্গলের টোপোগ্রাফি ভাল করে জানা

না থাকলে সেখানে চোরাশিকার চালানো সম্ভব নয়।”

“কিন্তু মুকুল সিংহ এর মধ্যে এল কী করে?”

“আমারও এটা নিয়ে প্রথমে খটকা ছিল। মুকুল সিংহকে আপাত চোখে দেখে ভালমানুষ বলেই তো মনে হয়।”

“বটেই তো!” অবনী বললেন, “মুকুল সিংহ এর মধ্যে থাকবে, আমি কল্পনাই করতে পারিনি।”

“আমিও একে একে দুই, দুয়ে দুয়ে চার করলাম অনেক পরে। গর্জন রায়ের অতীত জীবন সম্পর্কে ভাবতে গিয়েই মুকুল সিংহর সঙ্গে তার যোগাযোগের সম্ভাবনাটা মাথায় খেলে গেল। গর্জন রায় আই-আই-টির ছাত্র ছিল, মুকুল সিংহ ওখানকারই স্টুডেন্ট হস্টেলের কর্মচারী। আমি শিওর গর্জন রায় যে হস্টেলে থাকত, মুকুল সিংহও সেই হস্টেলেরই স্টাফ।”

“তো? গর্জন রায় তো বহুকাল আগে পাশ করে গেছে, মুকুল সিংহর সঙ্গে তার যোগাযোগ হল কীভাবে?”

“মনে রেখো, গর্জন রায় একজন ক্রিমিনাল হলেও সে কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। তার মাথাও অত্যন্ত সাফ। এক বছর নর্থবেঙ্গলে বদমাইশি করেই সে বুঝতে পেরেছে এবারে তাকে জায়গা পালটাতে হবে। কারণ বন দফতর ওখানে এখন অ্যালার্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া ওখানে তার চেনাজানার সংখ্যাও অনেক, অতএব ওখানে তার ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। অন্য কোন জঙ্গলে অপারেশন শুরু করা যায় ভাবতে গিয়েই সম্ভবত মুকুল সিংহর কথা মাথায় আসে গর্জন রায়ের। মুকুল সিংহর বাড়ি যে প্রায় সারান্ডাতেই, এটাও যেমন জানত গর্জন, সঙ্গে সঙ্গে মুকুলের নেচারটাও তার অজানা ছিল না।”

“মুকুল সিংহর নেচার? মানে?”

“মুকুল সিংহ একজন পাঁড় জুয়াড়ি। ছেলেবেলা থেকেই কুসঙ্গের

প্রতি তার টান প্রবল। কুসঙ্গে পড়ে একবার বাড়ি থেকেও পালিয়েছিল। খড়্গাপুরে পাঠিয়েও ছেলের চরিত্র বদলাতে পারেননি পুরুষোত্তম। তবে তিনি শক্ত ধাতের মানুষ, বিজনেস বাঁচানোর জন্য মুকুলকে কাজকারবারের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেননি। মুকুলের যে কিছু একটা বদ নেশা আছে, এই সন্দেহটা আমার চাইবাসাতেই মাথায় উঁকি মেরেছিল। অনন্ত চ্যাটার্জির কথায়। জুয়াড়িরা অসম্ভব লোভী হয়, গর্জন রায় লোকচরিত্র ভালই বোঝে, তাই মুকুলকেই সে সারান্ডা অভিযানের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। সে ভালই জানত সারান্ডা অঞ্চলে সিংহপরিবারের যথেষ্ট প্রতাপ আছে, আর তাই মুকুলের মাধ্যমে হাতির দাঁত পাচার তার পক্ষে সহজ হবে।"

অবনী বললেন, "কিন্তু মুকুল সিংহর জুয়ার নেশা আছে তুমি বুঝলে কী করে?"

"ওই যে বললাম একে একে দুই, দুয়ে দুয়ে চার করতে করতে। সেদিন রাতে সিংহমশাই নামটি শোনার পর থেকেই আমি ভাবতে শুরু করি এই সিংহটি কে হতে পারে। পুরুষোত্তম সিংহ? ভদ্রলোকের সুনাম যেমন আছে, বদনামও তো আছে। তারপর মনে হল যে মানুষ খ্যাতি আর সম্পদের চূড়ায় উঠে গেছেন, তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে হঠাৎ হাতির দাঁত চুরির কাজে নামতে যাবেন কেন? তাও আবার অন্য কারুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে? নাহ্, পুরুষোত্তমের চরিত্রের সঙ্গে এ-কাজটা মেলানো যায় না। তা হলে দ্বিতীয় সন্দেহের লোক বিকাশ সিংহ। বিকাশ অত্যন্ত উদ্ধত ধরনের। দাম্ভিক। জঙ্গলেও তার নিয়মিত আনাগোনা। তার দিকেই সন্দেহের তির যাওয়াটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে পাগলা হাতি মারাটাকে সে যখন তেমন অন্যায় বলে মনেও করে না। পাশাপাশি আর একটা চিন্তাও মনে এল। বিকাশ তার দাদার তুলনায় জীবনে অনেক বেশি সফল, ব্যর্থ দাদার ওপর তার তো কিছুটা করুণাই থাকা উচিত।

অথচ দাদার ওপর তার যথেষ্ট বিতৃষ্ণা, এমনকী সে দাদার বন্ধুবান্ধবদেরও পছন্দ করে না। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে এর পেছনে। আগুন ছাড়া তো ধোঁয়া হয় না। বট্‌ল-ওপেনারটা হাতে আসার পর থেকে আই-আই-টির ব্যাপারটা তো মাথায় ঘুরছিলই, মুকুল সিংহর নেচারটা কনফার্ম করার জন্য আমি মেঘাতুবুরু থেকে চাইবাসার অনন্ত চ্যাটার্জিকেও ফোন করেছিলাম। সেদিনও অনন্তবাবু চেপে যেতে চাইছিলেন, পরে কিছুটা খুলে বলতে ওই টিপ্‌সটা আমায় দিয়ে দিলেন। মুকুল সিংহ আগে পরিবারের টাকাপয়সাও অনেক নষ্ট করেছে, এবং এই নিয়ে বিকাশের সঙ্গে তার বহু ঝগড়াঝাঁটিও হয়েছে—এমন একটা ইম্পর্ট্যান্ট সংবাদও আমায় সাপ্লাই করলেন অনন্তবাবুই। ব্যস, আমার অঙ্কটাও অনেকটা এগিয়ে গেল। তারপর থলকোবাদ ফিরে যখন শুনলাম মুকুল সিংহ থলকোবাদে এসেছে, তখন তো হিসেব প্রায় কমপ্লিট।

টুপুর পুট করে বলে উঠল, "হ্যাঁ, মুকুলবাবু খুব মিথ্যে কথা বলেন।"

"কী করে বুঝলি?"

"সেদিন থলকোবাদে এসে বললেন তাঁর পরিচিত ভদ্রলোকরা নাকি খড়্গপুর থেকে টানা জিপে এসেছেন। অথচ জিপের নাম্বারটা পশ্চিমঙ্গের নয়, ঝাড়খণ্ডের।"

"আগে বলিসনি কেন?"

লজ্জা লজ্জা মুখে টুপুর বলল, "তখন মাথায় আসেনি, এক্ষুনি মনে এল।"

"এই খুঁটিনাটিগুলোই তো আগে লক্ষ করা উচিত।" মিতিন ভারিক্কি স্বরে বলল, "গাড়ির নাম্বার ছাড়া আর কিছু মনে আসছে? মুকুলবাবুর সম্পর্কে?"

টুপুর মাথা চুলকে বলল, "আর কী বলো তো?"

"লোকটা বারবার আমাদের সারান্ডার জঙ্গলে থাকতে নিষেধ করছিল। হার্ডকোর ক্রিমিনাল তো নয়, কিছু টাকার লোভে এ-কাজে নেমেছে...তাই পাছে আমরা ওকে জঙ্গলে আবিষ্কার করে ফেলি এই অস্বস্তিটা ওর মনে কাজ করেছে। ইনফ্যাক্ট আমরা ওকে আদৌ সন্দেহ করছি কি না সেটা বুঝতেই ওর থলকোবাদে আসা।"

পার্থ বলল, "যাহ, শুধু এইজন্য থলকোবাদ আসবে কেন? অপারেশনের খোঁজখবর নিতেও জঙ্গলে এসেছিল।"

"সে তো বটেই। লিগিরদা থেকে নুনের বস্তা হাপিস হয়ে যাওয়ার খবরটা মুকুল পেয়েছিল। আর সে কাজটা আমরাই করেছি কি না, অথবা আমরা আদৌ কিছু টের পেয়েছি কি না বুঝে নিতে এসেছিল। গর্জন রায়ের মতো ঝানু তো নয়, তাই বোঝেনি ওর ওই হঠাৎ দর্শন দেওয়াটা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে।"

সহেলি বললেন, "মুকুল সিংহর ব্যাপারটা নয় বুঝলাম, কিন্তু গর্জন রায়ের মতো পাকা ক্রিমিনাল হঠাৎ মধুবাবা সেজে বসেছিল কেন বল তো?"

"এটা বোঝা তো খুব সহজ বড়দি। হাতি মারা হবে সারান্ডার জঙ্গলে, হাতির দাঁত চালান যাবে সারান্ডা দিয়ে, সুতরাং এদিকে তো ওর এক দেড় মাস ঘাঁটি গাড়া দরকার। উটকো লোকের মতো জঙ্গলে ঘোরাফেরা করলে লোকের মনে সন্দেহ হবেই, তাই ওই ভেক। মধুবাবা সেজে আদিবাসীদের মন জয় করে সবার চোখের সামনেও থাকল, এবং কেউ ওকে সন্দেহও করল না। করমপদা থেকে অপারেশনের প্রস্তুতি চালানোটাও তো অনেক সোজা।"

পার্থ বলল, "হা হা, ব্যাটা সাধু সেজে থাকলেও মুরগি খাওয়ার লোভ সামলাতে পারত না। দাড়ি গোঁফ খুলে, গেরুয়া বসন ছেড়ে মোটরসাইকেলে করে মুরগির খোঁজে বেরোত।"

"শুধু মুরগি কেন, শিষ্যর বাড়ি যাওয়ার নাম করে গর্জনবাবু আর

গর্জনবাবুর চ্যালারা মোটরসাইকেলে সর্বত্রই ঘুরে বেড়াত। স্ফূর্তি করার ব্যাপারটা তো ছিলই, তবে খবর কালেকশনও ছিল অন্যতম কাজ। ঝিনিকপানিতে যেদিন ওদের সঙ্গে দেখা হল, পরে কিরিবুরুতেও, সেদিন শিওর ওদের একটা আরজেন্ট মিটিং ছিল। সম্ভবত জামদার কাছেপিঠেই। কারণ মুকুল সিংহও ছিল সেই মিটিং-এ। পরে গর্জনবাবু চ্যালাকে নিয়ে মেঘাতুবুরুতে রাতে একটু আসর জমাতে যান।"

"সত্যি, এখন সব একেবারে জলের মতো পরিষ্কার।" পার্থ একটা হাই তুলল, "চলো, গর্জন মুকুল ছেড়ে এবার আমরা শুতে যাই। কাল সক্কাল-সক্কাল তো আবার রওনা দিতে হবে।"

"ইস্, কী ঝড়ের মতো পাঁচটা দিন চলে গেল।" সহেলি বললেন, "আবার সেই কলকাতায় ফিরে হাঁড়ি ঠ্যালো।"

অবনী বললেন, "ছ'খানা বই এনেছিলাম, দুটোও তো শেষ হল না।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গল আর সমুদ্রের পরে আর কী কী আছে আপনার কাছে? পাহাড়? মহাশূন্য?"

প্রশ্নের ভঙ্গিতে মিতিন সহেলি হেসে কুটিপাটি।

টুপুর হাসছিল না। কারুর কথাও শুনছিল না। তার উদাস চোখ জ্যোৎস্নামাখা জঙ্গলে স্থির। বিষণ্ণ মনে হাতিটার কথা ভাবছিল টুপুর। হাতিটার সেই নিষ্প্রাণ চোখ দুটোর কথা সে ভুলতে পারবে না কোনওদিন। ইস্, কেন যে কিছু কিছু মানুষ এমন হৃদয়হীন হয়!

9 788177 563061

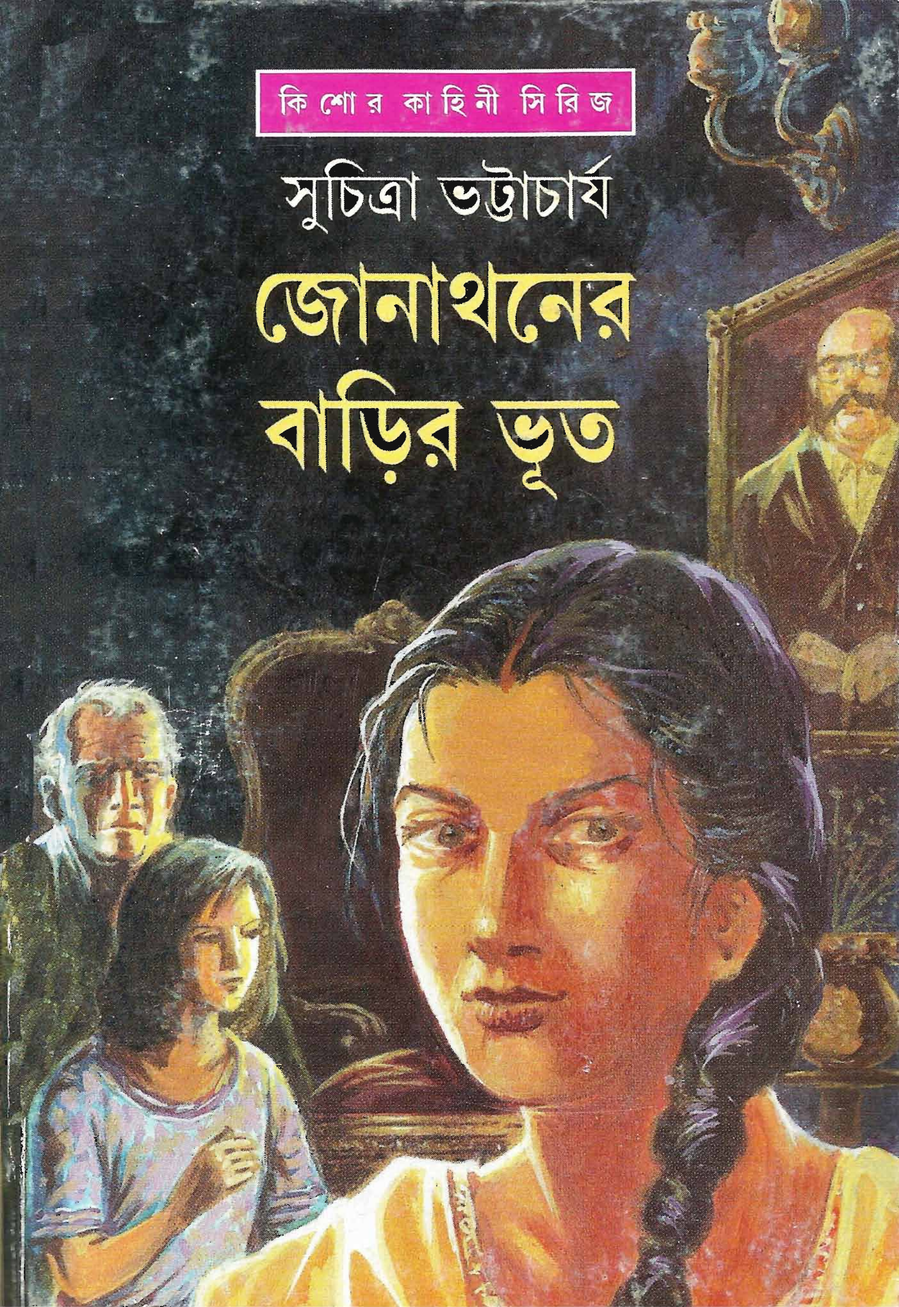
কিশোর কাহিনী সিরিজ
সুচিত্রা ভট্টাচার্য
জোনাথনের বাড়ির ভূত

জোনাথনের বাড়ির ভূত

জোনাথনের বাড়ির ভূত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আ ন ন্দ

আদরের মাম্‌মোকে

মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল টুপুর। পড়ছিল না বলে গিলছিল বলাই ভাল। মিতিনমাসির নির্দেশে ইদানীং এই অভ্যেসটা গজিয়েছে টুপুরের, ফাঁক পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গলাধঃকরণ করে আস্ত কাগজখানা। খুদে খুদে বিজ্ঞাপনগুলোকে পর্যন্ত ছাড়ে না। মিতিনমাসি বলেছে খবরের কাগজের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে অনেক সময়ে মজার মজার গল্প লুকিয়ে থাকে। চোখ মেলে খুঁজতে জানলে কখনও-সখনও ছোটখাটো রহস্যের সূত্রও নাকি মিলে যায়।

আজ অবশ্য বিজ্ঞাপন নয়, একটা খবরই চোখ টেনেছে টুপুরের। তৃতীয় পাতায় বেশ বড় করে বেরিয়েছে খবরটা। বার দুয়েক পড়ে টুপুর চোখ তুলল কাগজ থেকে। উত্তেজিত মুখে ডাকল, "পার্থমেসো, ও পার্থমেসো।"

পার্থ বাইরের ঘরের বড় সোফায়। কোলে খাবারের প্লেট। লুচির দিস্তে আর পাহাড়ের মতো আলুছেঁচকি নিয়ে বসেছে পার্থ। বাঁ হাতে খবরের কাগজের শব্দজব্দের পাতাখানা, ডান হাতে ডটপেন। মাঝেমাঝে ডটপেন নামিয়ে লুচি, আলুছেঁচকিতে থাবা বসাচ্ছে, পেটে চালান করেই ফের খুচখাচ কলম চালাচ্ছে শব্দের ধাঁধায়। রবিবার সকালে কোলে লুচি না থাকলে শব্দজব্দ মেলাতে পারে না পার্থ।

কচর কচর লুচি চিবোতে চিবোতে পার্থ ফিরে তাকাল। ভুরু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন ছুড়ল, "জুতোর একটা প্রতিশব্দ বল তো? তিন অক্ষরের?"

টুপুর চটপট বলল, "পাদুকা।"

"হল না।"

"খড়ম?"

"উঁহু।"

"চপ্পল?"

"না, না।"

"তা হলে কী? কাবলি?"

"তুৎ, তুই একটি কেবলি। ব দিয়ে স্টার্টিং। না, না, বি দিয়ে।"

টুপুর মাথা চুলকোতে শুরু করল, "বি দিয়ে?"

"ইয়েস। ব-এ হ্রস্ব ই বি।"

পার্থ টুপুরের কথার মাঝেই মিতিন কখন ঘরে এসেছে। হাতে নিজের জলখাবারের প্লেট। টুপুরের উলটো দিকের সোফায় বসে বলল, "শেষ অক্ষর কী? মা?"

"কারেক্ট।"

"লেখো, বিনামা। বাংলায় এত কম ফান্ডা নিয়ে শব্দজব্দ করতে বসো কেন?"

পার্থ যেন শেষটুকু শুনতেই পেল না, টুকটুক করে ছক ভরতি করছে। আবার একটা লুচি তুলে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "তখন আমায় ডাকছিলি কেন রে?"

শব্দের ধাঁধায় খেই হারিয়ে গিয়েছিল টুপুরের। এক সেকেন্ড থমকে বলল, "আজ একটা নিউজ দেখেছ? কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!"

"কী হয়েছে?"

"লেবুতলায় একটা দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি হঠাৎ ধসে পড়েছে! ভেতরে চাপা পড়ে মারা গেছেন এক বৃদ্ধ!"

মিতিন খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করল, "এমনি-এমনি ভেঙে পড়ল?"

"দমকল বলছে বাড়িটার হাল ভাল ছিল না। কিন্তু পুলিশ অন্য

রকম সন্দেহ করছে। প্রোমোটাররা নাকি অনেক দিন ধরেই টার্গেট করেছিল বাড়িটাকে। মোটামুটি বড় বাড়ি। জমিও আছে বেশ খানিকটা। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের প্রায় লাগোয়া। বাড়িটা ভেঙে নাকি মাল্টিস্টোরিড বানানোর ধান্দায় ছিল প্রোমোটার। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মাঝে-মাঝেই নাকি চাপ দিচ্ছিল।"

"ভদ্রলোক একাই থাকতেন?"

"প্রায় একাই। মধ্যবয়সী এক মহিলা ভদ্রলোকের দেখাশুনো করতেন। গত বছর ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন। দুই বোন, দু'জনেই বিদেশে। মহিলা বেঁচে গেছেন। তাঁর মুখ থেকেই প্রোমোটারবৃত্তান্ত জানতে পেরেছে পুলিশ। তা ছাড়া বাড়ি ভাঙার সময়ে একটা জোর বিস্ফোরণের আওয়াজও নাকি শোনা গেছে। মুচিপাড়া থানা তো কাছেই, সেখান থেকেও নাকি শোনা গেছে আওয়াজটা।"

"হুম।" মিতিন ছোট্ট শ্বাস ফেলল, "এই প্রোমোটারদের উৎপাতে কলকাতায় আর কোনও পুরনো বাড়ি বোধহয় থাকবে না। কত সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য যে এদের দৌলতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।"

"অত আফসোস করার কিছু নেই। পুরনো না গেলে নতুন আসবে কী করে? তা ছাড়া কলকাতায় যা বিপুল জনসমস্যা, সেখানে পেল্লাই একটা বাড়িতে মাত্র একজন মানুষ থাকবে, এটাই বা কেমন কথা?" পার্থ সোফায় পা তুলে গুছিয়ে বসল। কাঁচালঙ্কায় কুটুস কামড় দিয়ে বলল, "ইনফ্যাক্ট, লেবুতলা নামটার মধ্যেই একটা বাড়ি ভাঙার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। যে-সে বাড়ি নয়, একটা গির্জা।"

টুপুরের চোখ গোল গোল হল, "মানে?"

"এখন যে জায়গাটাকে আমরা লেবুতলা বলি, আই মিন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার অঞ্চলটা, ওখানে একসময়ে সেন্ট জেম্স গির্জা ছিল।

রাস্তাটার নাম ছিল সেন্ট জেম্‌স স্ট্রিট। কলকাতার প্রথম বিশপ টমাস ফ্যান্‌শ মিডলটনের উদ্যোগে বানানো হয়েছিল গির্জাটা। তখন ওই্‌ জায়গাটাকে বলত কেরানিবাগান। কেন কেরানিবাগান বলত?"

টুপুর থতমত মুখে বলল, "কেন?"

"কারণ ওখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানিরা বাস করত। তারা ছিল পর্তুগিজ। ওই্‌ কেরানিবাগানের আদি মালিক ছিলেন একজন পাঞ্জাবি। শিখ। নাম হুজুরিমল। এই্‌ হুজুরিমল ছিলেন সিরাজদ্দৌলার দরবারের আমিরচাঁদের শালা। আমিরচাঁদ মানে উমিচাঁদ। তা হুজুরিমল বউবাজারের বৈঠকখানায় একটা পঞ্চান্ন বিঘের পুকুর কাটিয়েছিলেন। সেই পুকুর বুজিয়েই্‌ কেরানিবাগান। পরে এই্‌ কেরানিবাগানের মালিক হন মিস্টার রবার্ট ল্যাজেরাস দ্য অলিভিয়েরা। তিনি বিশপকে গির্জা তৈরি করার জন্য বাগানটা দান করে দেন। আঠারোশো কুড়িতে গির্জা তৈরি শুরু হল, শেষ হল আঠারোশো তেইশে।"

মিতিন অধৈর্যভাবে বলল, "পয়েন্টে এসো না। ঘুরপাক খাচ্ছ কেন?"

"কোনও কিছু জানতে হলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হয়। তাও তো আমি হুজুরিমলের পুকুরের নামটা বলিনি।"

"কী নাম? হুজুরিপুকুর?"

"আজ্ঞে না। পদ্মপুকুর।"

টুপুর প্রতিবাদ করল, "যাহ্‌, পদ্মপুকুর তো ল্যান্সডাউন রোডে।"

"কলকাতায় কতগুলো পদ্মপুকুর ছিল জানিস? এন্টালিতে একটা..."

"তুমি আবার ট্র্যাক চেঞ্জ করলে? গির্জার কথা বলো।"

"হ্যাঁ, গির্জা। চার্চ।" শেষ লুচিতে তরকারি পুরে মুখে গুঁজল

পার্থ। চিবোতে চিবোতে বলল, "গির্জেটা তো তৈরি হল পুকুর ভরাট করা জমিতে। এখনকার প্রোমোটাররা যা আকছার করছে। পরিণতি যা হওয়ার তাই হল। আস্তে-আস্তে বসে যেতে লাগল গির্জাটা। ভয় পেয়ে গির্জার কর্তাব্যক্তিরা গির্জার চূড়া বানানো বন্ধ করে দিলেন। লোকজনের কাছে গির্জার নামই হয়ে গেল ন্যাড়া গির্জা। জলা জমি হওয়ার কারণে উইপোকা ধরে গেল কড়িবরগায়। তৈরি হওয়ার মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে আঠেরোশো আটান্নর অগাস্টে বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়ল গির্জার ছাদ। ব্যস্, গির্জা গন। আরও আছে। তখন ওই গির্জার জন্য দান করা জমির একটা পোরশান গির্জার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন রবার্ট ল্যাজেরাসের নাতি মিস্টার এলিয়ট। বাকিটা কিনেছিলেন এক বাঙালি। তখন ওই জায়গাটা মোটেই ঘিঞ্জি ছিল না। বরং বলা যায় একেবারেই বসতিহীন ছিল। ওই বাঙালি ভদ্রলোকই প্লট করে করে জমি বেচে এখানে লোকজন এনে বসান। জায়গাটায় প্রচুর লেবুগাছ ছিল, তাই নাম হয়ে গেল লেবুতলা বা নেবুতলা। কলকাতার লোক তো ল-কে বলত ন। নুচি নেবু নংকা নেবুতলা..."

টুপুর বলল, "ন্যাড়া গির্জা শেষে নেবুতলা? এ যে ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল!"

"উঁহু। রুমাল টু বেড়াল, টু চশমা, টু দাঁতের মাজন।"

"তা সেই বাঙালি ভদ্রলোকের নাম কী ছিল?"

"ইতিহাসের এটাই তো পরিহাস রে। কত ইম্পর্ট্যান্ট লোকের নাম যে ইতিহাস মিস করে যায়। দেখি, কোথাও যদি পাই তো নামটা তোকে বলে দেব।" পার্থ আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল, "তা যা বলছিলাম। কলকাতার কত জায়গা যে কত ভাবে বদলেছে।"

"যেমন বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড থেকে পার্ক স্ট্রিট।"

“বেরিয়াল কিংবা বেরিয়িং। কিন্তু নামটা বদলে পার্ক স্ট্রিটই বা হল কেন, বল তো?”

“ওই যে একটা পার্ক আছে ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়টায়!”

“ঘেঁচু। এখন যাকে বলে মিডলটন রো, সেখানে লোরেটো হাউসটা দেখেছিস তো? ওটা ছিল আসলে স্যার ইলাইজা ইম্পের বাড়ি। ইলাইজা ইম্পে কে ছিলেন নিশ্চয়ই বলতে হবে না?”

“ওয়ারেন হেস্টিংসের বন্ধু। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। ইলাইজা ইম্পের সঙ্গে চক্রান্ত করেই তো ওয়ারেন হেস্টিংস মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়েছিলেন। পরে দেশে ফিরে গিয়ে এর জন্য ইলাইজা ইম্পে সাজাও পেয়েছিলেন। শেষ জীবনটা খুব কষ্টে কেটেছিল ইম্পের।”

“ব্র্যাভো! ইতিহাসে তো তুই লেটার পাবি রে।” পার্থ চমৎকৃত, “তা এই ইলাইজা ইম্পের বাড়ির চারদিকে ছিল এক বিশাল পার্ক। সেখানে হরিণটরিনও থাকত। লোকে বলত ডিয়ার পার্ক। উঁচু পাঁচিল ঘেরা ওই পার্কটার জন্য কবরখানার রাস্তার নাম বদলে হয় পার্ক স্ট্রিট। তারপর ধর, এখন বেলেঘাটায় যেখানে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিস, ঠিক ওইখানটায় ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদটারও ইতিহাস কম ইন্টারেস্টিং নয়। অরিজিনালি ওটা ছিল কালীপ্রসাদ দত্তর বাগানবাড়ি। তিনি বাড়িটি দান করেন এক মহিলাকে। সেই মহিলাকে বিয়ে করেন মুন্সিবাজারের মালিক মুন্সি আমির। তাঁদের বংশধর বাড়িটাকে বেচে দেয় ভিজিয়ানাগ্রামের রাজাকে। ওই বাড়ির দু'-তিনটে বাড়ি পরেই আছে মুন্সি আমিরের বংশধর শেখ নবাব হোসেনের বাগানবাড়ি...”

“তুমি থামবে?” মিতিন আর চুপ থাকতে পারল না, “তুমি যে আজকাল মন দিয়ে কলকাতার ইতিহাস পড়ছ, আমরা বেশ মালুম পাচ্ছি। কিন্তু এবার যে তোমায় একটু গাত্রোত্থান করতে হয়।”

“কেন?”

“বাজার যাবে না? মেয়েটা মাসির বাড়ি বেড়াতে এসে শুধু জ্ঞান খেয়ে পেট ভরাবে?”

পার্থ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, “কী রে টুপুর, কী খাবি আজ? চিকেন? মাটন? ইলিশ? চিংড়ি?”

টুপুর লজ্জা-লজ্জা মুখে বলল, “আনো না, যা হয় কিছু।”

“আজ তবে চিংড়ির মালাইকারি হোক। আর কষা কষা মাটন।”

“হোক।”

“রাঁধব কিন্তু আমি। একেবারে নিজস্ব কায়দায়। মোগলাই ঘরানায়।। তোর মাসিকে বলে দে, সে যেন একদম নাক গলাতে না আসে।”

“আমার ভারী বয়ে গেছে।” মিতিন একগাল হাসল, “ভালই হল। আজ তা হলে ঝাড়া হাত-পা হয়ে ঘরদোরগুলো একটু গুছিয়ে ফেলি। টুপুর তো আছে, আমায় হেল্প করবে।”

মিতিনমাসির কোনও কাজে সহকারী হতে টুপুরের কণামাত্র আপত্তি নেই। সে গোয়েন্দাগিরিই হোক, কি নিছক ঘরোয়া কাজ। সত্যি বলতে কী, এই জন্যই না গরমের ছুটি পড়তে-না-পড়তে মিতিনমাসির বাড়ি চলে আসা। সর্বক্ষণ মিতিনমাসির গা-ঘেঁষে থাকবে, প্রতি পদে কিছু-না-কিছু শিখবে, আর এর মধ্যে যদি জম্পেশ একটা কেস এসে পড়ে তো কথাই নেই, ছুটিটা সার্থক হয় টুপুরের। গত বছর সারান্ডা বেড়াতে গিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই চোরা হাতিশিকারিকে ধরার কথা মনে পড়লে এখনও টুপুরের গায়ে কাঁটা দেয়।

এ-বছর অবশ্য বেরোনোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। পার্থমেসোর প্রেসে হুট করে অনেক কাজ এসে গেছে, এখন পার্থমেসোর পক্ষে দু’-তিন দিনের জন্যও কলকাতা ছাড়া অসম্ভব।

আর টুপুরের বাবা তো এ-বছর বেজায় ব্যস্ত। ইউনিভার্সিটির হেড এগজামিনার হয়েছেন অবনী, রাশি-রাশি দর্শনের খাতা সামলাচ্ছেন, পরীক্ষকদের বাড়িতে ডেকে ডেকে খাতা বিলি করছেন, এখন তাঁকে কে নড়াবে! টুপুরের মা'রও শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, হাঁটু কোমরের ব্যথা বেশ বেড়েছে। গরমের ছুটিটা কলকাতায় কাটানো ছাড়া টুপুরের এবার কোনও উপায় নেই।

পার্থ চা খেয়ে বেরিয়ে গেল বাজারে। মিতিনও কাজে নেমে পড়েছে। টুপুরকে নিয়ে। বসার ঘরের জিনিসপত্র বেশিদিন একভাবে রাখা পছন্দ করে না মিতিন, তাতে নাকি একঘেয়েমি এসে যায়। মাসি-বোনঝি ধরাধরি করে ঘোরাচ্ছে সোফাগুলো। সোফাকভারগুলোও খুলে ফেলল মিতিন। অন্য আর-এক সেট লাগাবে। তিনখানা পাতাবাহারের টব রাখা আছে বাইরের ঘরে, সেগুলোকেও ঠাঁইনাড়া করল। এখানে-সেখানে বসিয়ে দেখছে, মানাচ্ছে কি না।

কাজের মাঝেই ডোরবেল। দরজা খুলতেই হা-হা রবে ঢুকে পড়ল বুমবুম। সঙ্গে ভারতী। এ-বাড়িতে মাস তিনেক হল কাজে ঢুকেছে ভারতী। ক্যানিং লাইনের ঘুটিয়ারি শরিফের মেয়ে। বয়স বছর কুড়ি। তেমন একটা চটপটে নয় বটে, তবে বুদ্ধি আছে। বেশ তাড়াতাড়ি শিখে নিচ্ছে কাজকর্ম। বুমবুমের সঙ্গে তার মোটামুটি পটেও গেছে। বুমবুমের স্কুল, কুংফু-ক্যারাটে ক্লাস, বিকেলের পার্ক, সর্বত্রই সে পাঁচ বছরের বুমবুমের ছায়াসঙ্গী।

বুমবুম হাহ্ হুহ্ হাহ্ হুহ্ করে ক্যারাটে প্র্যাকটিস করে চলেছে। টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী রে, তোর না সাড়ে ন'টা অব্দি ক্লাস? সওয়া ন'টার মধ্যে চলে এলি যে?"

বুমবুম কিম্ভূত পোজ করে শূন্যে পা ছুড়ল, "আজ আমায় তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিল।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভারতী হাউমাউ করে উঠেছে, "না গো বোন, মিছে কথা। ওকে তো আজ কেলাস থেকে বের করে দিয়েছে।"

"সে কী? কেন?"

"হাত-পা ছোড়া খেলতে খেলতে একটা ছেলের পেটে ক্যাঁত করে ঘুষি মেরে দিয়েছিল।"

"ও মা, তাই?" মিতিনের ভুরু জড়ো হল, "কেন মেরেছ বুমবুম?"

"মারিনি তো।" বুমবুমের চটজলদি জবাব, "কুংফু-ক্যারাটের সঙ্গে দীপকে একটু বক্সিং শেখাচ্ছিলাম।"

"দাঁড়াও, এবার আমি তোমাকে ওঠ-বোস করা শেখাচ্ছি।"

শুনেই বুমবুম সামনে থেকে ধাঁ। তাকে পাকড়াও করতে পিছনে ধাওয়া করেছে মিতিন। টুপুর আর ভারতী ফিক ফিক হাসছে।

তখনই ফোনটা বেজে উঠল। টুপুর গিয়ে রিসিভার তুলেছে, "হ্যালো?"

ওপারে এক পুরুষকণ্ঠ, "এটা কি পার্থপ্রতিম মুখার্জির বাড়ি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি তো নেই এখন। বেরিয়েছেন।"

"কখন ফিরবেন?"

"বাজারে গেছেন তো, আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট দেরি হবে।"

"ও।"

"ফিরলে কিছু বলতে হবে?"

"হ্যাঁ, মানে... না, মানে... আমি একটু পরে আবার ফোন করছি।"

"আপনার নামটা জানতে পারি?"

"উৎপল।" একটুখানি থেমে রইল গলাটা। তারপর কেটে-কেটে বলল, "উৎপল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস। আমি আর পার্থ একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।"

"ও, আচ্ছা। আমি মেসোকে নিশ্চয়ই বলব।"

ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিল টুপুর, ও প্রান্ত আবার বলে উঠল, "আচ্ছা, পার্থর মিসেস কি বাড়ি আছেন? আই মিন, যাঁর ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি আছেন।" টুপুর ঝটপট বলে উঠল, "ডেকে দেব?"

"প্লিজ। যদি না উনি খুব বিজি থাকেন।"

"এক মিনিট ধরুন।"

রিসিভার সন্তর্পণে ক্রেডলে নামিয়ে রাখল টুপুর। মিতিনমাসি তাকে শিখিয়েছে বাইরে থেকে ফোন এলে এভাবেই নামিয়ে রাখতে হয় রিসিভার। এতে লাইনও কাটে না, এপারের কথাও শোনা যায় না ওপারে।

ছুটে টুপুর পাশের ঘরে এল। সেখানে চলছে এক আজব দৃশ্য। মিতিনমাসি আর বুমবুম যুগলে ওঠ-বোস করছে। মিতিনমাসির হাত দুটো শক্ত করে ধরে আছে বুমবুমের কান, অপমানে চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ছে বুমবুমের।

টুপুর হাসতে গিয়েও হাসল না। মিতিনকে তাড়া লাগাল, "মিতিনমাসি, তোমার টেলিফোন।"

"কে?"

"মেসোর কলেজের এক ক্রিশ্চান সহপাঠী।"

"তো আমি কী করব? বলে দে মেসো বাজারে গেছে।"

"বলেছি। মেসো নেই শুনে তোমাকেই ডেকে দিতে বলল, মনে হল দরকারটা তোমারই সঙ্গে।"

"কী করে বুঝলি?"

ডিটেকটিভ এজেন্সি সংক্রান্ত উৎপলের প্রশ্নটা চেপে গেল টুপুর। কায়দা করে বলল, "ধরে নাও গেস। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে।"

"বটে?"

বুমবুমকে মুক্তি দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে এসে রিসিভার ওঠাল মিতিন। শান্ত স্বরে বলল, "বলুন? আমি পার্থর স্ত্রী বলছি।"

"..."।

"ও আচ্ছা, নমস্কার। কিন্তু পার্থ তো..."

"...।"

"আমার সঙ্গে দেখা করবেন?"

"...।"

"কী হয়েছে? প্রবলেমটা কী?"

"...।"

"ও। ঠিক আছে, চলে আসুন। আপনি কি বাড়ির ঠিকানাটা জানেন?"

"...।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢাকুরিয়ায়। সতেরোর তিনের বি, বাবুবাগান লেন। একতলায়।"

"...।"

"হ্যাঁ, ঢাকুরিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছেই।"

"...।"

"এগারোটা নাগাদ আসবেন? নো প্রবলেম।"

"...।"

"নমস্কার।"

ফোন রেখে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মিতিন। অস্ফুটে বলল, "গান বাজছিল। এলটন জন।"

টুপুর সায় দিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ইংলিশ টিউন কানে আসছিল বটে।"

"যে-সে গান নয়। সেই বিখ্যাত গানটা। প্রিন্সেস ডায়ানা মারা যাওয়ার পর এলটন জন যেটা কম্পোজ করেছিলেন।" বলেই

টুপুরকে প্রশ্ন, "আর কিছু টের পেয়েছিস?"

"কী বলো তো?"

"কুকুর আছে বাড়িতে। সম্ভবত ল্যাপ ডগ। ডাক শোনা যাচ্ছিল।"

"তাই?"

"হুঁ।"

"কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ তোমার কাছে আসছেন কেন?"

"নিশ্চয়ই কোনও কারণ ঘটেছে।"

"তুমি কি কোনও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ?"

মিতিন হেসে ফেলল, "ওরে, ডিটেকটিভগিরি করি বলে কি সবই আন্দাজ করা যায়? তবে ভদ্রলোকের গলাটা একটু উদ্বিগ্ন লাগছিল। প্লাস, ওই উৎপল নিশ্চয়ই তোর মেসোর প্রাণের বন্ধু নয়, সম্ভবত নিয়মিত যোগাযোগও নেই। তেমন হলে তো আমি চিনতামই। এমন একজন খামোখা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেই বা কেন? সমস্যা একটা হয়েছে তো বটেই।"

"তার মানেই ডালমে কুছ কালা হ্যায়!"

"দাঁড়া, আগে ডালটাকে দেখি। তবে না বুঝব।"

টুপুরের মনটা নেচে উঠল। গরমের ছুটিটা এবার তা হলে পুরোপুরি বিফলে না-ও যেতে পারে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তেও পারে।

পার্থ বাজার থেকে ফেরামাত্র টুপুর উগরে দিল ফোনের কথাটা। শুনে পার্থ তো হাঁ, "উৎপল ক্রিস্টোফার ফোন করেছিল? উৎপল তোর মাসিকে খুঁজছিল?"

টুপুর উত্তেজিত মুখে বলল, "হ্যাঁ গো। তাই তো বললেন।"

মিতিন জানলার পরদা বদলাচ্ছে। পেলমেট-রডে রিং পরাতে পরাতে ঘাড় ঘোরাল, "তোমার বন্ধুটি কেমন?"

"ভুৎ, থোড়াই বন্ধু! জাস্ট ব্যাচমেট ছিল। আমাদের সঙ্গে তেমন মিশত না। ওর সার্কলটা ছিল আলাদা। ব্যাটার ফিজিকটা ছিল দেখার মতো। ইয়া চওড়া কাঁধ, ভি-শেপ কোমর। শুধু হাইটটাই যা একটু শর্ট। মেরেকেটে পাঁচ-ছয়। রেগুলার ওয়েট ট্রেনিং করত, জিমনাস্টিকস কম্পিটিশনে নাম দিয়ে প্রাইজটাইজও পেয়েছিল অনেক। ফাইনাল পরীক্ষাটা দেয়নি, হুট করে একটা সার্কাস কোম্পানিতে কাজ জুটিয়ে পাকাপাকি ওই লাইনেই চলে গেল।"

"তা সে তোমার ফোন নম্বর পেল কোত্থেকে?"

"মাঝে ওর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। এই মাস পাঁচ-ছয় আগে। মল্লিকবাজারে একটা মোটরপার্টসের দোকানে বিল ভাউচার ছাপানোর পেমেন্ট আনতে গেছি, তখনই হঠাৎ মুখোমুখি। বলল, এখন নাকি সার্কাসটার্কাস ছেড়ে দিয়ে কোনও একটা জিমনাসিয়ামে ইনস্ট্রাকটার হয়েছে। বাচ্চাকাচ্চাদের ট্রেনিং দেয়। সেদিনই আমি ওকে আমার কার্ডটা দিয়েছিলাম।"

"এবং আমার প্রফেশান নিয়েও গপ্পো করেছিলে?"

"এতে অন্যায়টা কী আছে? বরং আমাকে তোমার ক্রেডিট দেওয়া উচিত। আমার পাবলিসিটির গুণে তোমার শুখা মরশুমে কেমন হেঁটে হেঁটে কেস আসছে।" বলেই পার্থ চোখ টিপল, "আমার বন্ধু বলে ছাড়টাড় দিয়ো না কিন্তু। পুরো পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবে। আর, টাকা পেলে আমার কমিশনটা চাই। ফিফ্‌টি পারসেন্ট। নিদেনপক্ষে ফরটি-সিক্সটি।"

"আহা, কী জন্যে আসছে তার ঠিক নেই, আদৌ আমাকে দিয়ে তার কাজ হবে কি না জানি না, এখনই কালনেমির লঙ্কা ভাগ শুরু হয়ে গেল।"

"মুফতে কোনও পরামর্শও দেবে না। তার জন্যও ফি চার্জ করবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবেখ'ন। তা তোমার এই উৎপল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস থাকেন কোথায়?"

"কলেজে পড়ার সময়ে তো এক্সট্রিম সাউথ থেকে আসত। কেওড়াপুকুর না ঠাকুরপুকুর, কোথায় যেন থাকত। এখন মল্লিকবাজারের কাছেই বাসা নিয়েছে বলল। জোড়া গির্জার দিকটায়।" বলেই পার্থ টুপুরের দিকে ফিরে চোখ নাচাল, "অ্যাই, জোড়াগির্জা চিনিস?"

"খুব চিনি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডে।"

"আগে যেটা ছিল লোয়ার সার্কুলার রোড। আরও আগে যেখানটায় ছিল মারহাট্টা ডিচ ক্যানাল। বর্গি আক্রমণ রুখতে শহরে ওই খাল কাটা হয়েছিল। বর্গি, মানে মরাঠাদের সেনাপতি ছিল ভাস্কররাম কোলহাতকর। ইতিহাসে যাঁর নাম ভাস্কর পণ্ডিত। লোকটা মহাদুষ্টু ছিল। ভীষণ লুটপাট চালাত। তাকে সামলাতেই একুশ হাত চওড়া, সাত মাইল লম্বা পরিখা খোঁড়ার প্ল্যান করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এন্টালি অবদি খালটা খোঁড়ার পর ভাস্কর

পণ্ডিত খতম হয়ে গেল মুস্তাফা খাঁ নামে এক আফগান সৈনিকের হাতে। পরে মরাঠারা আর-একবার অ্যাটাক করেছিল। তখন খালটাকে এন্টালি থেকে বেকবাগান অবদি বাড়ানো হয়। ওই খাল বুজিয়েই সার্কুলার রোড।"

টুপুর অপ্রসন্ন মুখে বলল, "আমাদের কিন্তু জোড়াগির্জা নিয়ে কথা হচ্ছিল মেসো।"

"তোকে বলেছি না, যা জানবি, ডিটেলে জানবি?"

"আহ্, বলো না জোড়াগির্জার কথা।"

"তার আগে তুই বল দেখি নামটা জোড়াগির্জা কেন?"

"দুটো চার্চ আছে, তাই।"

"তোর মাথা। ওখানে একটাই গির্জা। সেন্ট জেম্স চার্চ।"

"আর-একটা সেন্ট জেম্স চার্চ ছিল বললে না? লেবুতলায়?"

"সেটাই তো এটা। ন্যাড়া গির্জার ছাদ ভেঙে পড়ার পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যেই নতুন করে চার্চটা বানানো হয় এই সার্কুলার রোডে। আগের চার্চে একটাও চুড়ো ছিল না, এখানে বানানো হল দু'-দুটো চুড়ো। ওই দেখেই লোকে চার্চটাকে ডাকতে লাগল জোড়াগির্জা বলে। ওই চার্চের পাশের জমিতে ছিল চিৎপুরের নবাব মহম্মদ রেজা খাঁ-র বংশধর নবাব সৌলদ জং-এর বাগানবাড়ি। এখন যেটা হয়েছে নোনাপুকুর ট্রামডিপো। নোনাপুকুর নামটা আবার এসেছে..."

"ফের তুমি ইতিহাসের ঝাঁপি খুলে বসলে?" মিতিন কাজ থামিয়ে চোখ পাকাল।

"বন্ধ করতে পারি, যদি জমিয়ে এক কাপ কফি খাওয়াও।"

ইতিহাস, উৎপল ক্রিস্টোফার, সবই আপাতত চাপা পড়ে গেল। পার্থমেসোর কল্যাণে টুপুরেরও কফি জুটল এক কাপ। বাজার থেকে আরও তিনখানা খবরের কাগজ কিনে এনেছে পার্থমেসো,

কফিতে চুমুক দিতে-দিতে ফের মজেছে শব্দ খোঁজার খেলায়। বুমবুমের জন্য কার্টুন চ্যানেল চলছে, সে এখন শোওয়ার ঘরে টিভিতে মগ্ন। এ-বাড়িতে ড্রইংরুমে টিভি থাকে না, পাছে মিতিনমাসির কাছে লোকজন এলে কথাবার্তায় অসুবিধে হয়।

টুপুরও কাপ হাতে বুমবুমের পাশে গিয়ে বসল। রোড রানার শো চলছে। দেখতে মজাই লাগে। কিন্তু এখন মন বসছে না, বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। সময় যেন আর কাটেই না, এগারোটা আর বাজেই না। এল এগারোটা, পেরিয়েও গেল। শুরু হল সেই চিরপরিচিত টম অ্যান্ড জেরি। এখনও উৎপল ক্রিস্টোফারের দেখা নেই কেন?

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। ডোরবেলে ডিং ডং। পাক্কা এগারোটা আঠাশে।

ভারতী দরজার দিকে যাচ্ছিল, তাকে টপকে আগেই পৌঁছে গেছে টুপুর। এবং ল্যাচ খুলেই চমক। সামনে এক শ্যামলা রং স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক, কিন্তু তিনি একা নন। পাশে এক মহিলা। পরনে দেশীয় পোশাক। সবুজ জংলাছাপ শিফন শাড়ি। তবে চেহারায় খাঁটি বিদেশিনী। টুকটুকে লাল গায়ের রং, নীল চোখ, মুখের আদলটিও ইউরোপিয়ান ধাঁচের। মাথার চুলটাই যা কুচকুচে কালো। মহিলা বেশ লম্বাও। হাইহিল পরা আছে বলে যেন আরও বেশি ঢ্যাঙা দেখাচ্ছে।

পার্থও এসেছে টুপুরের পিছন-পিছন। সাদরে অভ্যর্থনা জানাল, "আয় আয়। আমরা তোর জন্যই ওয়েট করছি।"

উৎপল অপ্রতিভ মুখে বলল, "সরি। একটু লেট হয়ে গেল। তোদের এখন বোধহয় লাঞ্চ টাইম..."

"ধুৎ, আমাদের এখনও রান্নাই চড়েনি। ছুটির দিনে আমরা দুপুর দুটোর আগে খেতে বসি না।"

উৎপল ভেতরে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মহিলাও। সোফায় পাশাপাশি বসেছে দু'জনে। মিতিন আসামাত্র দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

উৎপল হাতজোড় করে নমস্কার করল মিতিনকে। বিনীতভাবে বলল, "আমি কে সে তো বুঝতেই পারছেন। উৎপল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস। আর ইনি আমার মিসেস। মির্না বিশ্বাস।...মির্না, ইনিই ফেমাস ডিটেকটিভ প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি।"

মিতিন স্মিত মুখে বলল, "ফেমাস-টেমাস কিছু নয়। পেটের ধান্দায় লোকে চাকরি-বাকরি করে, আমি করি গোয়েন্দাগিরি।" বলেই হাত বাড়িয়ে টুপুরকে দেখাল, "এ আমার বোনঝি। ঐন্দ্রিলা। টুপুর। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

টুপুর প্রায় গলে গেল। মিতিনমাসি তাকে বাইরের লোকের সামনে সহকারীর স্বীকৃতি দিচ্ছে! খুশি-খুশি মুখে বলল, "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা চা খাবেন তো? না কফি?"

উৎপল ঈষৎ সংকুচিত, "থ্যাঙ্কস। কিছু লাগবে না। এত বেলায় আপনাদের জ্বালাতে এসেছি..."

"সে কী কথা! পুরনো বন্ধুর বাড়ি প্রথম দিন এলেন..."

"তা হলে কফি। শুধু কফি কিন্তু। আমারটা চিনি-দুধ ছাড়া। মির্নার নরমাল।"

মিতিন ভারতীকে নির্দেশ দিয়ে এসে বসার আগেই পার্থ কথা শুরু করে দিয়েছে, "হঠাৎ তোর হলটা কী? এমন হাঁকপাক করে ছুটে এলি?"

"একটা সিরিয়াস প্রবলেমে পড়ে গেছি ভাই।"

"কী প্রবলেম?"

"আজকের ইংলিশ ডেলিতে একটা নিউজ দেখেছিস? হাউস কোলাপসড অ্যাট লেবুতলা?"

"বাংলা কাগজেও আছে।" মিতিন বলল, "ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মারা গেছেন।"

"ওই নিউজটাই আমাদের বাধ্য করেছে ছুটে আসতে।"

"ভদ্রলোক আপনাদের কেউ হন বুঝি?"

"না না, আমাদের সঙ্গে কোনও রিলেশন নেই। কিন্তু খবরটা আমার মিসেসকে খুব টেনশনে ফেলে দিয়েছে। স্পেশ্যালি, ডেথ অফ দ্যাট ওল্ড ম্যান।"

"পরিষ্কার হল না। একটু খুলে বলুন।"

"এক সেকেন্ড।" উৎপল সামান্য দম নিল। তারপর সসংকোচে বলল, "আমি কি একটা সিগারেট ধরাতে পারি?"

"তুই সিগারেট খাস?" পার্থ অবাক, "কলেজে আমরা সিগারেট খেলে তুই তো নাক টিপে সরে যেতিস!"

"এখনও তেমন একটা খাই না। তবে মাঝেসাঝে...ওই মাথাটা যখন খুব জ্যাম হয়ে যায়..."

"বুঝলাম। চাপে আছিস।" পার্থ নিজের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল, "আমার থেকে নে। রিলাক্সড মুডে বল কী হয়েছে।"

খানিকটা ধোঁয়া গিলে একটু বুঝি থিতু হল উৎপল। সেই ফাঁকে বুঝি মনে-মনে বক্তব্যটাকেও সাজিয়ে নিল। বলল, "আমার স্ত্রীকে দেখে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছিস ও আমার মতো বাঙালি খ্রিস্টান নয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। আমার শ্বশুরবাড়ি ইলিয়ট রোডে। মেন রাস্তা থেকে একটু গলিতে ঢুকতে হয়। ব্লাইন্ড লেন। বাড়িটা একতলা, তবে মোটামুটি বড়ই। চারপাশে খানিকটা জমি আছে। জমি আর বাড়ি মিলিয়ে কম-বেশি দেড় বিঘা মতন জায়গা। একশো চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে বাড়িটার। ওই বাড়ি আর বাড়িকে কেন্দ্র করে আমার ফাদার-ইন-ল আমাদের উদ্বেগের কারণ।"

"বুঝলাম। তোদের বাড়িটাও গ্রাস করার জন্যে প্রোমোটাররা

ছোঁক-ছোঁক করছে। এবং তোর শ্বশুরমশাই বাড়ি ভাঙার বিপক্ষে।”

“ঠিক তাই। অলরেডি দু’-তিনজন প্রোমোটার নজর ফেলেছে। তার মধ্যে একজন তো খুবই পাওয়ারফুল। ভেরি ওয়েল কানেকটেড, হাতে মাসলম্যান আছে। অলরেডি একবার হানা দিয়ে লোকটা প্রেশারও তৈরি করে গেছে। ফোনও করছে মাঝে-মাঝে। আমরা ভয় পাচ্ছি দুম করে লেবুতলার মতো কোনও অঘটন না ঘটে যায়!”

“প্রোমোটার কি থ্রেট করছে?”

“তা ঠিক নয়। তবে রিসেন্টলি একটা স্ট্রেঞ্জ ইন্‌সিডেন্ট ঘটতে শুরু করেছে বাড়িতে। সেটা কোনও প্রোমোটারই করাচ্ছে, না অন্য কিছু, আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।”

“কী রকম?”

“আমার শ্বশুরবাড়িতে একটা রুমে কিছু অ্যান্টিক ফার্নিচার রাখা আছে। রুমটা এমনিতে আন্ডার লক অ্যান্ড কি থাকে, মাঝেমধ্যে ঝাড়পোঁছ করার জন্য খোলা হয়। রিসেন্টলি আমি কয়েকটা স্পেয়ার ফার্নিচার, মানে কিছু চেয়ার টেবিল, ওই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর থেকেই কী বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড! মাঝরাতে ওই ঘরে বিশ্রী আওয়াজ হতে শুরু করেছে। মনে হয়, কেউ যেন ঠেলে চেয়ারটাকে ফেলে দিল, টেবিল নড়াচ্ছে....”

“বলিস কী?” পার্থ সোজা হয়ে বসল, “আপনা-আপনি হচ্ছে?”

“সেইজন্যই তো অদ্ভুত লাগছে। মাঝে-মাঝে আওয়াজটা কী জোর হয় তুই ভাবতে পারবি না। দুম দাম ধপাস। ও-ঘরে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো আছে, একদিন তো পিয়ানোটাও ঝং করে বেজে উঠল। সেদিন মির্না ও-বাড়িতে ছিল, আওয়াজটা শুনে ও তো প্রায় সেন্সলেস হওয়ার জোগাড়।”

পার্থ বলল, “ঘটনাটা ঘটার সময়ে দরজা খুলে দেখা হয় না?”

"হয়েছে। কোনও রাত্রে আমি যদি ও-বাড়িতে থেকে যাই, আমি খুলেছি। কিছু পাওয়া যায়নি। থরো সার্চ করে দেখেছি, ইঁদুর-টিঁদুরও নেই তেমন।"

"এ যে দেখি ভূতুড়ে কাণ্ড!"

"অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। আমার ধারণা এটা প্রোমোটারেরই কারসাজি। ড্যাডিকে ভয় দেখানোর জন্য।"

"তোর শ্বশুরমশাই ভয় পাচ্ছেন?"

"কিছুটা নার্ভাস তো হয়েছেনই। তবে ড্যাডি মনে করেন প্রোমোটার-টোমোটার নয়, কাণ্ডটা ভূত করছে। ওই ঘরে বহুকাল আগে একটা আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছিল, তাঁর আত্মা নাকি রাত্তিরে আসেন ওখানে। এবং তিনিই নাকি কোনও কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।"

মির্না এই প্রথম মুখ খুলল। আড়ষ্ট বাংলায় বলল, "কাজটা যদি কোনও প্রোমোটারেরই কনসপিরেসি হয়, তা হলে সে সামডে অর আদার আরও মারাত্মক কিছু তো ঘটাতে পারে। লেবুতলার ইনসিডেন্টটার মতো।"

"আপনার ড্যাডি এখন কী ভাবছেন? ভূতের ভয়ে বাড়ি বেচে দেবেন?"

"প্রশ্নই আসে না। কোনও অবস্থাতেই ড্যাডি বাড়ি বেচবেন না।"

মিতিন চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ প্রশ্ন ছুড়ল, "কতদিন ধরে চলছে এই ভূতের ইনসিডেন্ট?"

"তা ধরুন, সপ্তাহদুয়েক।"

"রোজই হচ্ছে?"

"না। ছ'-সাত দিন হয়েছে এর মধ্যে।"

"সেই প্রোমোটারটি কবে এসেছিল আপনাদের বাড়ি?"

"মাস দেড়েক আগে। তবে বললাম না, ফোন করে। মাঝে মাঝেই।"

"ঘটনাটা শুরু হওয়ার পরেও ফোন এসেছে?"

"না। সুরজমল এখন অদ্ভুত রকম সাইলেন্ট। আর সেইজন্যই তো আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"প্রোমোটারের নাম বুঝি সুরজমল?"

"সুরজমল অগ্নিদেব। রিগাল প্রপার্টিজের মালিক। ক্যামাক স্ট্রিটে অফিস। কলকাতার অনেক পুরনো বাড়ি ভেঙে অ্যাপার্টমেন্ট বানিয়েছে।"

কফি এসে গেছে। সঙ্গে আলুর চিপস্, বিস্কুট আর সন্দেশ। টুপুর হাতে হাতে কাপ তুলে দিয়ে আবার বসল মিতিনের পাশটিতে। মোড়ায়। উৎপল মির্না কী ধরনের সাহায্য চাইতে এসেছে তার মাথায় ঢুকছে না। প্রোমোটার ভয় দেখাচ্ছে, তো মিতিনমাসি কী করবে? এ-সব কেসে তো পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত। আর ভূত তাড়ানোও তো মিতিনমাসির কাজ নয়! তার জন্য বাজারে অজস্র ফেরেব্বাজ ওঝা আছে।

পার্থ মুঠোয় চিপ্‌স তুলে নিয়েছে। চিবোচ্ছে কচরমচর। মিতিন কফির কাপে চুমুক দিল। উৎপলকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার শ্বশুরমশাই কি একাই থাকেন?"

"না। মির্নার ভাই থাকে সঙ্গে। তবে ডিক, আই মিন রিচার্ড, চাকরি করে হোটেলে। টেলিফোন অপারেটার। বেশির ভাগ দিনই তার নাইট শিফ্‌ট থাকে। রাত্তিরে বাড়িতে ড্যাডি একাই।"

মির্না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "অবশ্য আমরাও এখন প্রায়ই কেউ-না-কেউ রাতে ও-বাড়িতে রয়ে যাচ্ছি। হয় আমি, নয় উৎপল।"

"আপনাদের বাড়ি কি কাছেই?"

"মিনিট দশেকের রাস্তা। মুজফ্‌ফর আহমেদ স্ট্রিটে। আমরা

কলকাতায় ফিরে আসার পর থেকে ড্যাডির কাছাকাছিই আছি।”

পার্থ বলল, “আপনারা মানে? আপনিও কি উৎপলের সার্কাসের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতেন?”

মির্নার হয়ে উৎপলই উত্তর দিল, “মির্নাও সার্কাসেই ছিল। আমার সঙ্গে ট্রাপিজের খেলা দেখাত।”

“তাই বল। তোরা দু'জনেই সার্কাস প্লেয়ার? জীবনেও জুটি, সার্কাসেও জুটি....! দারুণ।”

মিতিন মৃদু হেসে বলল, “তা আপনারা তো আলাদা থাকেন। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার শাশুড়িও নেই?”

“মাম্মি আট বছর আগে মারা গেছেন। আমাদের বিয়ের পর পরই। ক্যানসার।”

“ও। ....তার মানে আপনার শ্বশুরমশাইয়ের সংসারে এখন আপনার শ্বশুরমশাই আর আপনার শ্যালক?”

“হ্যাঁ ম্যাডাম।”

“শ্যালক বিয়ে করেননি?”

“এখনও না।”

“সংসারের দেখভাল কে করেন? আই মিন রান্নাবান্না?”

“আছেন একজন মহিলা। মিসেস জোন্‌স। মির্নার মাম্মির অসুখের সময় থেকেই তিনি কিচেনের চার্জে। রুমগুলোর ডাস্টিং ক্লিনিং-ও তিনিই করেন। তিনিও কাছেই থাকেন। তেত্রিশ নম্বর রিপন লেনে। মর্নিং-এ আসেন, সন্ধেয় চলে যান। হাজব্যান্ড অসুস্থ, রাতে থাকা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।”

“বুঝলাম।” মিতিন সন্দেশের প্লেট উৎপল মির্নার দিকে বাড়িয়ে দিল, “কিন্তু আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

“আপনি কাইন্ডলি মিস্ট্রিটা সল্‌ভ করে দিন। মানে ওই ভূতুড়ে আওয়াজের। যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন কাজটা প্রোমোটারের,

তা হলে ড্যাডিরও ভূতের আতঙ্কটা কেটে যাবে, আমরাও সহজে পুলিশের কাছে প্রসিড় করতে পারব, সুরজমলও আর ট্যাঁফোঁ করার সুযোগ পাবে না।"

"মনে হচ্ছে আপনারাও বাড়ি ভাঙার বিপক্ষে?"

"ড্যাডি যখন চান না, তখন তাঁর জীবৎকালে ও-বাড়ি নয় নাই ভাঙা হল। সেন্টিমেন্ট বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।"

"ডিকও কি বাড়ি ভাঙা চায় না?"

"ডিক হ্যাঁ-তেও নেই, না-তেও নেই। তবে এখন তার অভিমত, অযথা প্রবলেমে না গিয়ে বাড়িটার একটা এস্‌পার ওস্‌পার করে ফেলাই ভাল।"

"তার মানে ডিক এখন বাড়ি ভাঙার পক্ষে?"

"অন্তত ড্যাডির মতো ডেড এগেন্‌স্টে নয়। তবে সে-ও খুব ভূতে বিশ্বাস করে। তারও ধারণা আত্মাফাত্মাই ফার্নিচার ফেলছে।"

কথার মাঝেই মির্না হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি কিন্তু আর একটা কথা ওঁদের এখনও বলোনি উৎপল।"

"কী বলো তো?"

"ওই মিথের ব্যাপারটা।"

"ও হ্যাঁ," উৎপল গলা ঝাড়ল, "মিথ ঠিক নয়। একটা গুজবের মতো। আমার শ্বশুরমশাই ইলিয়ট রোডের বাড়িটা পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের সূত্রে। এই বাড়ির যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সিপাই বিদ্রোহের সময়ে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ফৌজে। সিপাই বিদ্রোহের কোনও এক নেতা নাকি যুদ্ধে তাঁর হাতে নিহত হন। প্রবাদটা হল এই, সিপাই বিদ্রোহের সেই নেতার কোনও একটি বহুমূল্য সম্পদ তিনি হস্তগত করেছিলেন। সেটিও নাকি ওই বাড়ির কোথাও একটা লুকোনো আছে। একশো তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে অনেকেই নাকি সেটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাড়ির আদি মালিক কোথায় যে

সেটি রেখে গেছেন, কেউ তার সন্ধান পায়নি। এখন প্রায় ধরেই নেওয়া হয়েছে ওটা একটা গালগল্প।"

মিতিন একবার আড়চোখে মির্নাকে দেখে নিয়ে বলল, "কিন্তু গুজব রটারও তো একটা কোনও কারণ থাকে?"

মির্না বলল, "তাঁর উইলে নাকি এ ব্যাপারে কী একটা লেখা ছিল। আমি এই জিনিস রেখে গেলাম, যে এটা পাওয়ার চেষ্টা করবে তাকে মরতে হবে.... এই ধরনের কিছু। ডিটেলটা ড্যাডি ভাল বলতে পারবেন। ইন ফ্যাক্ট, ড্যাডির বিশ্বাস, জিনিসটা এখনও বাড়িতেই আছে। এবং তাঁর আত্মা সেটিকে পাহারা দেয়।"

"ইন্টারেস্টিং! আপনাদের বাড়ি তো তা হলে একবার যেতেই হয়।"

"প্লিজ আসুন। রহস্য সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে যদি জিনিসটাও উদ্ধার করে দিতে পারেন তো নাথিং লাইক ইট," উৎপল সোৎসাহে ঝুঁকল, "কবে আসছেন?"

"দেখি। ফোন নাম্বার আর অ্যাড্রেস রেখে যান। আমি জানিয়ে দেব।"

উৎপল মির্না চলে যাওয়ার পর পার্থ হাঁ হাঁ করে উঠল, "কেসটা এমনি এমনি নিয়ে নিলে? একটা অ্যাডভান্স চাইলে না?"

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "গোড়াতেই টাকার কথা বললে দাম কমে যায় স্যার।"

টুপুর চকচকে চোখে বলল, "কেসটা বেশ জমবে মনে হয়, তাই না মিতিনমাসি? একদিকে ভূত, একদিকে অগ্নিদেব, সঙ্গে আবার বহুমূল্য সম্পদও রয়েছে!"

মিতিন বলল, "এতক্ষণ যা যা শুনলি সব মগজে গেঁথে নিয়েছিস তো?"

"অবশ্যই।"

"আজই আমায় পয়েন্ট বাই পয়েন্ট নোট করে দেখাবি। আর তোর মেসোকে বল এখন আর কায়দা করে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না। মাংস আর চিংড়িমাছ আমিই রেঁধে ফেলছি।"

টুপুর খুশিতে ডগমগ। একই দিনে কেস, আর মিতিনমাসির রান্না—এ যে মণিকাঞ্চন যোগ।

ইলিয়ট রোড আর সার্কুলার রোডের ঠিক মুখটায় দাঁড়িয়ে ছিল উৎপল। মিতিন আর টুপুরকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এল। হেসে সম্ভাষণ জানাল, "হ্যালো ম্যাডাম! হাই ইয়াং লেডি! আপনারা যে আজকেই চলে আসবেন ভাবতেই পারিনি।"

মিতিন হেসে বলল, "ভাবলাম কেসটা যখন নেবই, তখন আর দেরি করা কেন!"

"সো কাইন্ড অফ ইউ। আসুন। ড্যাডিকে বলে রেখেছি, উনি আপনাদের জন্য ওয়েট করছেন।"

"কদ্দূর এখান থেকে?"

"বেশি নয়, মিনিট পাঁচ-সাত।"

বেজায় গরম পড়েছে আজ। সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। বিকেল চারটে বেজে গেছে, এখনও রোদের ঝাঁঝ এতটুকু মরেনি। পিচরাস্তা থেকে ভয়ংকর তাত উঠছে। হাওয়াও আছে। লু-এর মতো। গা হাত পা যেন ঝলসে ঝলসে যায়।

গলগল ঘামতে ঘামতে হাঁটছিল টুপুর। দেখছিল চারদিক। এদিককার অধিকাংশ বাড়িই প্রায় পুরনো আমলের। চেহারায় জীর্ণ

জীর্ণ ভাব। দোকানপাট অবশ্য মোটামুটি ঝকঝকে। স্কুল, চার্চ, মিনি-প্যালেস, কী নেই রাস্তাটায়। তবে গির্জাটা দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত, এমনই মলিন দশা। রাস্তায় ভিড় নেই বটে, তবে অল্পস্বল্প পথচারীই মালুম দিচ্ছে এ অঞ্চলে হরেক কিসিমের মানুষের বাস। একই ফুটপাথ ধরে হাঁটছে বোরখাধারিণী আর মিনিস্কার্ট। অপরিসর রাস্তার অর্ধেকটা জুড়ে ট্রামলাইন। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে ঢিমে তেতালায় চলে যাচ্ছে ফাঁকা ট্রাম।

হাঁটতে হাঁটতে উৎপলের সঙ্গে কথা বলছিল মিতিন, "আপনার আজ জিমনাসিয়ামে যাওয়া নেই?"

"মির্না আছে। মির্নাই সামলাচ্ছে আজ।"

"আপনারা কি চাকরিও একই জিমনাসিয়ামে করেন?"

"আমরা তো এখন চাকরি করি না।" উৎপল হাসল, "ও, আপনাদের কাল বলাই হয়নি। আমরাই একটা জিমনাসিয়াম খুলেছি।"

"ও মা, তাই? কবে খুললেন? কোথায়?"

"এই তো মাস আড়াই হল। ড্যাডির বাড়ির চারটে বাড়ি আগে। ভেবে দেখলাম পরের গোলামি করার চেয়ে স্বাধীনভাবে কিছু একটা করা ভাল।"

"বাহ্।"

উৎপল লাজুক লাজুক মুখ করে হাসল সামান্য। ডানপাশের একটা গলিতে ঢুকেছে। উলটোদিক থেকে হনহনিয়ে আসছে এক জিন্‌স পরা ঝাঁকড়াচুলো তরুণ, চোখে সবুজ সানগ্লাস।

উৎপল হাত তুলল, "হাই ডিক!"

ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেল, "হাই!"

মিতিনকে দেখিয়ে উৎপল ইংরিজিতে বলল, "মিট মিসেস মুখার্জি। কাল এঁর কথাই বলছিলাম।"

ডিক সানগ্লাস খুলল না, তবে চোয়াল সামান্য ফাঁক করে মাথা ঝোঁকাল, "হাই!"

উৎপল জিজ্ঞেস করল, "যাচ্ছ কোথায়?"

"টু মিট সামওয়ান।"

"ফিরছ কখন?"

ডিক উত্তর না দিয়ে ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকাল।

"একটু থাকবে না? ম্যাডাম কিন্তু তোমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন।"

ইংরিজির মেলট্রেন ছুটিয়ে দিল ডিক, "উনি আমার সঙ্গে মোটেই দেখা করতে আসেননি। যাঁর কাছে যাচ্ছেন তিনি তো বাড়িতেই আছেন। তা ছাড়া আমার না থাকাই ভাল, কী বলতে কী বলে ফেলব, ড্যাডি চটে যাবেন।"

বলেই সাঁই করে পাশ কাটিয়ে হাঁটা লাগিয়েছে ডিক। মিতিন আর টুপুর ঘুরে তাকানোর আগেই ডিক ভ্যানিশ।

মিতিন আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল, "কোন হোটেলে চাকরি করে ডিক?"

"রাসেল স্ট্রিটের হোটেল ফ্লোরেন্স।"

"সে তো বেশ বড় হোটেল!"

"হুঁ।" উৎপলকে ঈষৎ অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল। বলল, "দেখলেন তো কেমন ছেলে! বাড়িতে বিপদ, ভ্রূক্ষেপ নেই! কোনও ঝঞ্ঝাটে থাকতে চায় না, সুটসাট কেটে পড়ে।"

মিতিন হুঁ হ্যাঁ করল না। হাঁটছে আবার। গলিতে একটা বাড়ির গায়ে বড় সাইনবোর্ড দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, "এটাই বুঝি আপনাদের জিমনাসিয়াম?"

"হ্যাঁ। এই আমাদের রুটিরুজি।"

"নামটা তো খাসা দিয়েছেন! নাদিয়া!"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "নাদিয়া কোমানিচির নামে?"

"হ্যাঁ। মির্না ওঁর দারুণ ফ্যান। মির্নাই রেখেছে।"

মিতিন বলল, "চলুন না, আগে আপনাদের জিমনাসিয়ামটা দেখে নিই।"

"দেখবেন? এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে ঢুকতে হল পুরনো বাড়িটায়। ভেতরে গিয়ে টুপুর হাঁ। রীতিমতো এক প্রকাণ্ড হলঘর। তবে চতুর্দিক চাপা বলে আলো বাতাস বোধহয় তেমন একটা ঢোকে না। সিলিং-এর ওপর থেকে ঝোলানো হয়েছে বেশ কয়েকটা জোরালো বাল্‌ব, তাতেই অবশ্য ঝলমল করছে ঘরখানা। একদিকে স্ট্যান্ডফ্যান ঘুরছে ঝড়ের মতো। ইতস্তত সেট করা আছে জিমনাস্টিক্সের উপকরণ। প্যারালাল বার, হরাইজন্টাল বার, আনইভন বিম....। উঁচু সিলিং থেকে টাঙানো হয়েছে রোমান রিং। ঘরের এক প্রান্তে ছোট করে হলেও ফ্লোর এক্সারসাইজের ম্যাট পাতা আছে। পাঁচটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে কসরত করে চলেছে এপাশে-ওপাশে।

মির্নাও রয়েছে। তার পরনে আজ আকাশি রঙের ট্র্যাকস্যুট। চুল পনিটেল করে বাঁধা। মির্নাকে দেখে আজ মিতিনমাসির থেকে যেন অনেক ছোট বলে মনে হয়।

মির্না হইহই করে এগিয়ে এসেছে, "আপনারা ড্যাডির সঙ্গে মিট করে এলেন?"

"না। এইবার যাব।" মিতিন হলঘরটায় চোখ ঘোরাল, "দারুণ জিমনাসিয়াম বানিয়েছেন তো!"

"কোথায় দারুণ? এইটুকু জায়গায় কী হয়? পমেলড হর্স লাগাতে হবে, তার স্পেসই পাচ্ছি না।"

"যা আছে তাই বা কম কী? এত বড় রুম ...."

উৎপল পাশ থেকে বলল, "চারটে ঘর ছিল। আমরা পার্টিশান

ওয়ালগুলো ভেঙে নিয়েছি।"

"বাড়িঅলা অ্যালাও করলেন?"

"এই গ্রাউন্ড ফ্লোরটার মালিক মির্নার ছোটবেলার বন্ধু। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে এখন অস্ট্রেলিয়ায়। সিডনিতে। মির্নার রিকোয়েস্ট সে ফেলতে পারেনি।"

"ভাড়া কত?"

"নমিনাল ভাড়া। বলার মতো কিছু নয়। কপালজোরে পেয়ে গেছি।"

"বাহ্। সত্যি আপনারা লাকি। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জিমনাস্টিক্স শিখতে আসছে দেখেও খুব ভাল লাগছে।"

"জিমনাস্টিক্সে অনেক বাচ্চারই আগ্রহ আছে। প্রপার ট্রেনার পেলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও মিরাক্‌ল দেখাতে পারে।"

"দেখুন, যদি একটা নাদিয়া কোমানিচি তৈরি করতে পারেন।"

"অত দূর না পারলেও ন্যাশনাল লেভেল অবদি যাবই। এবারেই তো আমাদের দুটো মেয়ে স্টেট মিটে যাচ্ছে। দেখবেন নাকি এদের প্রোগ্রেস?"

"অন্য একদিন হবে। আজ যে-কাজে এসেছি, সেটা বরং সেরে নিই।"

মির্না বলল, "আমি যাব সঙ্গে?"

"প্রয়োজন নেই। আপনি ট্রেনিং চালান। উৎপলবাবু তো আছেনই।"

জিমনাসিয়াম থেকে বেরিয়ে বিশ পা যেতে না যেতে মিতিনের ব্যাগের মধ্যে বাজনা বেজে উঠেছে। মাসছয়েক হল মোবাইল ফোন নিয়েছে মিতিন। রাস্তাঘাটে যখন-তখন ফোন করার দরকার হয়, যন্ত্রটা সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে।

মিতিন মোবাইল বার করে পরদায় ভেসে ওঠা নম্বরটা দেখল।

পার্থর ফোন। প্রেস থেকে।

টুপুরকে মোবাইলটা বাড়িয়ে দিল মিতিন। আলতো হেসে বলল, "তোর মেসো।"

টুপুর ফোন কানে চাপল, "আমি টুপুর। কী বলছ?"

ওপারে পার্থর কৌতূহলী স্বর, "তোর মাসি কোথায়? যায়নি?"

"এই তো যাচ্ছি। আমরা পথে আছি। ইলিয়ট রোডেই।"

"উৎপলের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"সঙ্গেই আছেন।"

"মাসিকে টিপে দিস, আজ যেন কিছু নিয়ে নেয়।"

টুপুর চোরাচোখে একবার উৎপলকে দেখে নিয়ে বলল, "আচ্ছা।"

"আর শোন। আমার ফিরতে রাত হবে। একজন কম্পোজিটার ডুব মেরে বসে আছেন। এদিকে আজই একটা স্যুভেনির ছাপা কমপ্লিট করতে হবে। পার্টিদের পরশু ফাংশান, কাল বিকেলের মধ্যে বাইন্ডিং করে ডেলিভারি না দিলে আমার পাঞ্জাবি খুলে নেবে বলে শাসিয়ে গেছে। কী ফ্যাসাদে যে পড়লাম!"

টুপুর অনেক কষ্টে হাসি চাপল, "আচ্ছা, মাসিকে জানিয়ে দিচ্ছি। এখন ছাড়ি?"

ফোন অফ করে মিতিনকে যন্ত্রটা দিয়ে দিল টুপুর।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "দরকারি কথা?"

"তেমন কিছু নয়। ফিরতে রাত হবে। অনেক কাজ পড়েছে।"

উৎপল সামান্য এগিয়ে গিয়েছিল। গলির শেষ প্রান্তে একটা ভাঙাচোরা লোহার গেটঅলা উত্তরমুখো বাড়ির সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেছে।

টুপুররাও পায়ে পায়ে গেটের সামনে এল, "এই বাড়ি?"

"ইয়েস। এটাই।"

বাড়িটার নামটা ভারী অদ্ভুত তো! গেটের পাশে পাথরের ওপর প্রায় ক্ষয়ে আসা অক্ষরগুলো চোখে পড়ল টুপুরের। এম ই জি এন এ। মেগনা।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মেগনা মানে কী? বাংলাদেশের মেঘনা নদী?"

"বলতে পারব না।" উৎপল সামান্য অপ্রতিভ, "সত্যি বলতে কী, নামটা নিয়ে কখনও ভাবিইনি।"

"বাড়ির মালিক কি কখনও বাংলাদেশে ছিলেন? আগেকার পূর্ববাংলায়?"

"তাও তো বলতে পারব না।"

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল টুপুররা। বাড়িটা প্রাচীন, কিন্তু শ্রীহীন নয়। এককালের লাল রং মরে এলেও আভাসটুকু রয়ে গেছে। ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য। মোটা মোটা থামঅলা বারান্দা, দু'পাশে দেওয়াল বেয়ে সিমেন্টের লতাপাতা উঠে গেছে, বারান্দার মাথা থেকে নেমে এসেছে সবুজ কাঠের খড়খড়ি। বাড়ি ঘিরে আধভাঙা পাঁচিলের ভেতরে বেশ খানিকটা জমি আছে। প্রায় ন্যাড়া। শুধু একদিকের এক কোণে গোটাকয়েক মরকুটে গোলাপগাছ শোভা পাচ্ছে। ওটাই কি মির্নার বাবার বাগান করার শখের নমুনা?

সাত-আটখানা চ্যাপটা সিঁড়ি ভেঙে চওড়া বারান্দায় উঠল তিনজনে। উৎপল চেঁচিয়ে ডাকল, "ড্যাডি? মিসেস জোনস?"

বারান্দার তিনদিকে তিনটে দরজা। বাঁদিকেরটা খুলে গেল। বেরিয়ে এসেছেন এক প্রবীণ মানুষ। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা, মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা, গায়ের রং বাদামি। দেখতে একদমই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতো নয়, বরং বাঙালি ঘরের দাদুদের সঙ্গেই ভদ্রলোকের বেশি মিল।

বয়স্ক মানুষটা এগিয়ে এলেন সামনে। চোখ সামান্য কুঁচকে টুপুর

মিতিনকে দেখলেন। তারপর ঝরঝরে বাংলায় মিতিনকে প্রশ্ন করলেন, "তুমিই বুঝি ডিটেকটিভ?"

"হ্যাঁ। প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"আর এটি? তোমার বোন?"

"দিদির মেয়ে। ঐন্দ্রিলা।"

"তোমাদের আজকাল এরকম খটোমটো নাম হয় কেন?"

"এখন সকলের আনকমনের দিকে ঝোঁক তো।" মিতিন হাসল।

"ও। আমি জোনাথন। জোনাথন মাইকেল। এসো, ঘরে এসো।"

ঢুকেই ঘরখানা জরিপ করে ফেলল টুপুর। প্রকাণ্ড সাইজ। স্কোয়ার শেপ। বড় বড় দরজা জানলা। উঁচু উঁচু সিলিং। সবুজ স্কার্টিং করা ঝকঝকে লাল মেঝে। লাল-নীল-সবুজ-বেগুনি কাচ আর্চ করে বসানো আছে জানলার মাথায়। বন্ধ জানলায় দুটো করে পাল্লা। কাঠের। কাচের ঘরে কী সুন্দর সুন্দর আসবাব। এক দেওয়ালে তিন পাল্লার আয়না বসানো অপরূপ ডিসপ্লে ক্যাবিনেট। দু'কোণে দু'খানা কারুকাজ করা কাঠের কর্নার ক্যাবিনেট। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোফা, কাচ বসানো সেন্টার টেবিল। টেবিলের কাঠের রং মিশকালো। আবলুশ নাকি? ঘরের মধ্যিখানে পাতা আছে পুরু কার্পেট। ভারী নরম, নিশ্চয়ই কাশ্মীরি। রংটা অবশ্য একদমই জ্বলে গেছে, ইরানি কাজ প্রায় বোঝাই যায় না। গোটাতিনেক বেঁটে বেঁটে কাচের আলমারি আছে ঘরে, প্রত্যেকটাই পোর্সিলিনের পুতুল ঠাসা। আছে একখানা শ্বেতপাথরের টেবিল, তার ওপরে চোঙাঅলা গ্রামাফোন। পাশেই টেলিফোনটা অবশ্য ব্রিটিশ আমলের ফার্নিচারের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। আধুনিক স্ট্যান্ডের ওপর রাখা টিভিটাও। দেওয়ালেও কত কী যে আছে। মোষের শিং, হরিণের মাথা, ক্রস করা ঢাল তলোয়ার শিরস্ত্রাণ, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি, বাঁধানো ফোটোগ্রাফে মাদার মেরির কোলে ছোট্ট যিশু।

ঘরের দু'খানা ফ্যানই চালিয়ে দিলেন জোনাথন। টিউবলাইট জ্বালালেন। সোফায় বসতে বসতে উৎপলকে বললেন, "মিসেস জোনসকে একটু চা-টা করতে বলো।"

টুপুর তাড়াতাড়ি বলল, "আমি চা খাই না।"

"তবে সফ্‌ট ড্রিংকস নাও। আজ খুব গরম, ভাল লাগবে।"

ঘরে ঢুকে বাইরের উৎকট তাতটা আর টের পাচ্ছিল না টুপুর। যা পুরু দেওয়াল। চার ব্লেডের পাখা দুটো আয়েশ করে ঘুরছে বটে, তবে হাওয়া ভারী মিঠে। শরীর জুড়িয়ে যায়।

উৎপল অন্দরে যাওয়া মাত্র জোনাথন টানটান হয়ে বসেছেন। গলা নামিয়ে বললেন, "শোনো, তোমাদের প্রথমেই চুপি চুপি একটা কথা বলে নিই। আমার মেয়ে-জামাইয়ের ধারণা কিন্তু ভুল। আমার বাড়িতে কোনও প্রোমোটারের হামলা হচ্ছে না।"

মিতিন বলল, "কিন্তু উৎপলবাবুর মুখে যে শুনলাম আপনাকে কে ভয় দেখিয়ে গেছে?"

"সুরজমল? সে একদিন চেলাচামুণ্ডা নিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু সে তো লোভ দেখাতে। কত টাকার অফার দিয়ে গেছে জানো? পঞ্চাশ লাখ নগদ, প্লাস দু'খানা ফ্ল্যাট।" জোনাথন মাইকেলকে ঈষৎ বিষণ্ণ দেখাল, "কিন্তু আমি কী করে রাজি হই বলো? এ বাড়িতে ন্যান্সি মারা গেছে, আমার মা মারা গেছেন...। ন্যান্সি মানে মির্নার মা। তাদের কত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এ বাড়ির আনাচে-কানাচে। বাড়ি ভাঙলে তারাও মুছে যাবে না?"

"হুম। কিন্তু শুনছিলাম যে সুরজমল লোক ভাল নয়, সে আপনার অনিষ্ট করতে পারে?"

"অনিষ্ট মানে কী? মেরে ফেলা? ফেলুক। মরলে তো দেখতে আসব না কী হচ্ছে। অবশ্য যদি আমিও না ভূত হয়ে ঘুরি।"

"আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

"ভূত তো আছেই। মানুষ যদি শান্তিতে না মরতে পারে, তা হলে তার আত্মা কখনওই তার প্রিয় জায়গা ছেড়ে যেতে পারে না। শুনেছ নিশ্চয়ই, এ বাড়িতেও সেরকম একজন রয়ে গেছেন!"

জোনাথনের স্বর এমন দৃঢ়, যে টুপুরের গা শিরশির করে উঠল। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "মানে যিনি বন্ধ ঘরের ফার্নিচার নাড়ান?"

"ঠিক তাই। উৎপল নিশ্চয়ই বলেছে এ বাড়িতে একটা সুইসাইডের ঘটনা ঘটেছিল?"

"সুইসাইড বলেননি। ওঁরা বলছিলেন আনন্যাচারাল ডেথ।"

"নিজের পিস্তল নিজের গলায় ঠেকিয়ে গুলি করেছিলেন তিনি। মার কাছে শুনেছি, তিনিই নাকি এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা।"

"কী নাম? কত সালে মারা গেছেন?"

"রবার্ট ম্যাকগ্রেগর। আমার মা'র দিদিমার বাবা। মারা গেছিলেন এইট্টিন সিক্সটি ফোরে।"

"স্কটল্যান্ডের লোক?"

"ইয়েস। অ্যাবারডিনের। আমার মা অবশ্য আইরিশ। মাকে এ-বাড়ি উইল করে দিয়ে গেছিলেন আমার দিদিমা। বাড়িটা যে প্রোমোটারকে দিতে চাই না এটাও তার একটা কারণ। নিজের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি হলে যা খুশি করা যায়, কিন্তু মা'র উপহার পাওয়া বাড়ি আমি বেচব কোন স্পর্ধায়?"

"আপনার বাবার বাড়ি কোথায় ছিল?"

"ভাগলপুরে।"

"আপনার বাবা বিহারি ক্রিস্টান?"

"নাহ্। তিনি বাঙালি। হিন্দু।" জোনাথন হাসলেন, "নাম সুরেন ভাদুড়ি। মা'কে বিয়ে করে বাবা ক্রিস্টান হন। মাইকেল মধুসূদনের খুব ভক্ত ছিলেন বাবা, তাই নাম নিয়েছিলেন সুরেন মাইকেল। সেই

সূত্রে আমরাও মাইকেল। এবং আমিই ফার্স্ট জেনারেশান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।”

টুপুর এতক্ষণে বুঝতে পারল কেন জোনাথন মাইকেলকে এত বাঙালি বাঙালি লাগছিল। কেনই বা প্রথম দর্শনে ইউরোপিয়ান মনে হয়েছিল মির্নাকে। নির্ঘাত মির্না তার ঠাকুরমার মতো হয়েছে। ডিক মাঝামাঝি। গায়ের রঙে, চেহারায়, মুখশ্রীতে। না পুরোপুরি এদেশি, না পুরোপুরি ওদেশি।”

মিতিন নড়েচড়ে বসেছে। জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি জন্ম থেকেই কলকাতায়?”

“না। ছোটবেলায় ভাগলপুরেই ছিলাম। বাবার মৃত্যু পর্যন্ত।”

“আপনার বাবা ভাগলপুরেই থেকে গেছিলেন?”

“বাবা ছিলেন খুব জেদি মানুষ। তিনি ইউরোপিয়ান বিয়ে করেছিলেন বলে আমার ঠাকুরদা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। ঠাকুরদাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ভাগলপুরের পাট চোকাতে রাজি হননি বাবা। ভাগলপুরেই খেটেখুটে একটা বেকারি খুলেছিলেন। কারখানায় কেক প্যাটিস পাউরুটি বানানো হত। ক্রমে ক্রমে বিশাল নাম হয়ে যায় মাইকেল্‌স বেকারির। পরে অবশ্য ঠাকুরদার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক খানিকটা জুড়েছিল। ছেলেকে সম্পত্তি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেননি তিনি, সামান্য কিছু ভাগ দিয়েছিলেন। মাই গ্র্যান্ডপা ওয়াজ এ ফেমাস ডক্টর। ভাগলপুরের খরমনচকে তাঁর বিস্তর জমিজায়গা ছিল। মূল বাড়ির ভাগ না দিলেও বুড়ানাথ মন্দিরের কাছে ছোট্ট একটা বাড়ি তিনি বাবার নামে লিখে দিয়েছিলেন। বাবা নিজেও অবশ্য ভাগলপুরে একটা বাড়ি কিনেছিলেন। ভিখানপুরে। চার্চ রোডের ওপর। বাবা হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যাওয়ার পর মা ভাগলপুরের বেকারিটা বেচে দেন। দু’ বাড়িতেই ভাড়া বসিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। আমার

তখন বয়স সতেরো।”

“আপনি কি বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান?”

“আমার এক দিদি ছিল। বাবার মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে প্রভু যিশু তাকে টেনে নেন। স্মল পক্স। পর পর দুটো বড় আঘাত পেয়ে মা'র ভাগলপুর থেকে মন উঠে গিয়েছিল, আর কখনও ওখানে ফিরে যাননি। আমাদের বেকারির ম্যানেজার গণপতি চৌধুরী খরমনচকে থাকেন। উনিই কিনে নিয়েছিলেন বেকারিটা। ভাল লোক। আমাদের বাড়ি দুটোরও দেখাশুনো করতেন, মানি অর্ডার করে ভাড়াও পাঠিয়ে দিতেন নিয়মিত।”

“দিতেন কেন? এখন ভাড়া পান না?”

“এই তো জানুয়ারির শেষে দুটো বাড়িই বিক্রি হয়ে গেল। মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আমিও শেষবারের মতো ভাগলপুর ঘুরে এলাম। অবশ্য শেষ যাওয়াটা সুখের হয়নি।”

মিতিন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কেন? কথা থমকে গেল। কাচের ট্রলিতে একগাদা খাবার-দাবার সাজিয়ে ঘরে এসেছেন এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা। বয়স বছর পঞ্চাশ, কালো মতন, মোটাসোটা, পরনে ছিটের গাউন। মিসেস জোনস। সঙ্গে উৎপল।

মধুর হেসে মিসেস জোনস বললেন, “গুড ইভনিং গার্লস। কথা পরে হবে। আগে খেয়ে নাও।”

মিসেস জোন্‌সকে দেখে পরিচারিকা বলে ভাবা কঠিন। কথায়-বার্তায় হাবেভাবে তিনিই যেন এ বাড়ির গৃহিণী। স্বভাবটিও ভারী মিষ্টি। নরম গলায় বকাঝকা করে গোটা প্লেটটাই শেষ করতে বাধ্য করলেন টুপুরকে। বাক্যালাপ করছেন ইংরিজিতে, কিন্তু কথা বলার ভঙ্গিটি এমন, যেন মিতিন টুপুর তাঁর কতকালের চেনা।

চা শেষ করে মিতিন বলল, "চলুন, তা হলে এবার ফার্নিচারের ঘরটা একবার দেখে আসি।"

জোনাথন বললেন, "কী দেখবে ও ঘরে? দেখে তো কিছুই বোঝা যাবে না। তিনি আসেন রাত্রে, রোজ মালুমও দেন না। যেদিন মেজাজ বিগড়ে যায় সেদিনই হয়তো একটু-আধটু বিরক্তি প্রকাশ করেন।"

উৎপল বলল, "দেখছেন তো ম্যাডাম? ড্যাডি ভূত থিয়োরির বাইরে কিছুতেই বেরোবেন না।"

"ভূত বোলো না। ভূত নয়।" মিসেস জোন্‌স ঘোরতর আপত্তি জানালেন। চোখ বন্ধ করে দ্রুত ক্রস আঁকলেন বুকে, "যিনি আসেন, তিনি হোলি স্পিরিট। কারণ এখনও পর্যন্ত তিনি কারুর ক্ষতি করেননি।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আপনি তাঁকে দেখেছেন?"

"তাঁকে কি দেখা যায়? তবে তিনি যে আছেন সে আমি বহুকাল আগেই টের পেয়েছি। সেই ন্যান্সির অসুখের সময়ে যখন রাত জাগতাম, তখন। শেষদিকে ন্যান্সি যখন ক্যান্সারের যন্ত্রণায় ছটফট

করত, উনি নিঃশব্দে ন্যান্সির মাথার পাশে এসে দাঁড়াতেন। স্বর্গীয় এক সৌরভে ভরে যেত গোটা ঘর। তিনি হাত বোলাতেন ন্যান্সির মাথায়। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ত ন্যান্সি।"

"এখন কি গন্ধটা পাওয়া যায়?"

"সেটা মিস্টার মাইকেল বলতে পারবেন।"

জোনাথন বললেন, "তাঁর মুড ভাল না থাকলে গন্ধ বোধহয় পাওয়া যায় না। ও ঘর কতকাল ধরে পরিত্যক্ত, উনি ওখানে এক ধরনের ফার্নিচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছিলেন, সে জায়গায় এককাঁড়ি উটকো জিনিস ঢোকালে উনি সহ্য করবেন কেন?"

উৎপল বলল, "আর কোন ঘরে চেয়ার টেবিলগুলো ঢোকাতাম ড্যাডি? ইউজ হয় না বলেই তো ওই রুমে..."

"ভাল করোনি।"

উৎপল কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল। বসার ঘর থেকে অন্দরে যাওয়ার দুটো দরজা। বাঁ দরজায় পরদা ঝুলছে, সম্ভবত ওটা জোনাথনের বেডরুম। অন্য যে দরজা দিয়ে উৎপলরা খাবার নিয়ে ঢুকেছিল, সেই পথেই ভেতরে ঢুকল সকলে।

প্রথমেই একটা চওড়া প্যাসেজ। প্রায় ঘরের মতো। জিনিসপত্র খুব বেশি নেই সেখানে, একটাই শুধু অতিকায় গোল শ্বেতপাথরের টেবিল মাঝখানটায় পাতা। টেবিলে ম্যাগাজিন আর খবরের কাগজের স্তূপ। একধারে টানা জুতো রাখার র‍্যাক, অন্যধারে সাহেবি আমলের টুপি-ছাতা রাখার স্ট্যান্ড।

প্যাসেজের একদিকের দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় পড়া যায়। অন্য দরজা দিয়ে বেরোলে প্রকাণ্ড হলের মতো ঢাকা বারান্দা। তার ওপারে বাঁধানো উঠোন। রোদ বৃষ্টি আটকানোর জন্য বারান্দার মাথায় ঝুলন্ত কাঠের শেড। সবুজ। ঢেউখেলানো। বারান্দার মাঝখানে খাবার টেবিল, দেওয়াল ঘেঁষে টানা কাচের আলমারিতে

প্লেট গ্লাস কাঁটা চামচ ছুরি টিসেট কফিসেট। আলমারির মাথায় টোস্টার মিক্সি মাইক্রোওভেন। সাবেকি মডেলের ঢাউস রেফ্রিজারেটারও রয়েছে এক জায়গায়। দেওয়ালে রয়েছে খানআষ্টেক ছোট ছোট বাঁধানো ছবি।

বারান্দার দু'পাশে পর পর ঘর বাথরুম কিচেন। ডানপাশের শেষ ঘরের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে থামলেন জোনাথন। চাবির গোছা বার করে দরজা খুললেন।

মিতিন ঘুরে ঘুরে চারদিকটা দেখছিল। বলল, "আপনার বাড়িখানা এত বড় বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। কত জায়গা ভেতরটায়?"

"এ তো হালফ্যাশনের খুপরি খুপরি ফ্ল্যাট নয়। রবার্ট ম্যাকগ্রেগর ব্রিটিশ আর্কিটেক্ট দিয়ে ডিজাইন করিয়েছিলেন। নিজে থাকতেন একেবারে শেষ প্রান্তে। এই ঘরটায়।" বলতে বলতে ভারী দরজা ঠেললেন জোনাথন, "এসো, দেখবে এসো।"

ভেতরে পা রাখতেই ঝাং করে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ঝাপটা মারল টুপুরের নাকে। বোঝাই যাচ্ছে এ-ঘর রোজ খোলা হয় না। তবে ঘরে আলোর তেমন ঘাটতি নেই। বন্ধ জানলার মাথার রঙিন কাচ বেশির ভাগই ভাঙা, শেষ বিকেলের সূর্য ওই সব ফোকর দিয়ে দিব্যি উঁকি দিচ্ছে। সিলিং-এ বোধহয় টানাপাখা ছিল এককালে, তার দড়ি যাওয়ার রাস্তা দিয়েও আলো আসছে ঘরে।

ড্রয়িংরুমের চেয়েও এ-ঘর আরও বড়। গোটা ঘরখানাই পুরু কার্পেটে মোড়া। প্রচুর অ্যান্টিক ফার্নিচার ছড়িয়ে আছে চারদিকে। খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল, বিশাল একখানা দোল আয়না, পিয়ানো, কারুকাজ করা আলনা, কী আছে আর কী নেই। সদ্য ঢোকানো চেয়ার টেবিল ডাঁই হয়ে আছে মাঝখানে। আছে একখানা দেওয়াল জোড়া অয়েল পেন্টিং, দেওয়ালে গাঁথা কাঠের চ্যানেলের

ওপর বসানো। ছবিটা একটা যুদ্ধজাহাজের। আরও কয়েকটা ছোটখাটো পেন্টিং ঝুলছে এপাশে ওপাশে, ফুলদানিতে একগোছা ফুল, নীলচোখ কিশোরীর নিষ্পাপ মুখ, শীতের দেশের নিসর্গ দৃশ্য।

টুপুর মন দিয়ে ছোট ছবিগুলো দেখছিল। ধুলো পড়ে বেশ মলিন দশা। প্রাচীন প্রাচীন ভাব এসে গেছে, তবু দেখতে বেশ লাগে।

মিতিন নিরীক্ষণ করছে যুদ্ধজাহাজ। ঝুঁকে ছবির কোণটা দেখতে দেখতে বিস্ময়ের সুরে বলল, "এ যে দেখি রবীন্দ্রনাথের জন্মের বছরে আঁকা। আঠেরোশো একষট্টি!"

জোনাথন বললেন, "হ্যাঁ। বাড়িটাও ওই বছরই তৈরি হয়েছিল। দ্যাখো, আর্টিস্টের নামও লেখা আছে। পিটার ডুভাল। ব্রিটিশ পেন্টার।"

ছবিটার তলায় বসানো কাঠের চ্যানেলে আলগা হাত বোলাল মিতিন। ঘুরে ফিরে অন্য আসবাবগুলোও দেখল ভাল করে। একটা চেয়ারে আঙুল ছুঁইয়ে নাক কুঁচকে বলল, "এহ্, খুব ধুলো জমেছে তো!"

উৎপল বলল, "মিসেস জোন্স এখন এ ঘরে ঢুকতেই চাইছেন না।"

মিসেস জোন্স বুকে ক্রস আঁকলেন, "এক্সট্রা চেয়ার টেবিলগুলো বার করে দাও, আবার সব ঝকঝকে করে রাখব। ওগুলো থাকলে আমি এ ঘর ছোঁবই না।

মিতিন উৎপলকে বলল, "সত্যি তো, চেয়ার টেবিল এখানে ঢোকালেনই বা কেন?"

"উঠোনে পড়ে থেকে থেকে সব নষ্ট হচ্ছিল ম্যাডাম। দামি কাঠ রোদে পুড়ছে, জলে ভিজছে, কারুর কোনও গা নেই..."

"তো বেচে দিতে পারতেন।"

"ড্যাডি এ বাড়ির একটা কুটোও বেচতে দেবেন না।"

টুপুর অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। দুম করে জিজ্ঞেস করল, "এ ঘরের কোন কোন জিনিসগুলো নড়ে? চেয়ার টেবিল ছাড়া?

উৎপল বলল, "মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, বাইরে থেকে বুঝব কী করে কী কী নড়ানো হচ্ছে? তবে মাঝে-মাঝে শব্দটা বেশ জোরেই হয়। ঢকঢক ঢকাঢক।"

মিতিন বলল, "আপনি বলছেন ব্যাপারটা বাইরের কারুর কারসাজি। কেন এরকম ভাবছেন?"

"ওই যে দেখুন না, জানলার মাথায় অর্ধেক কাচ নেই। তা ছাড়া পাঙ্খাপুলারের দড়ি যাওয়ার গ্যাপটাও..."

"ওইসব ফাঁক দিয়ে কোনও মানুষ গলতে পারে?" জোনাথনের গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল, "কী যে পাগলের মতো বারবার একই কথা বলো উৎপল!"

"কাচ বসানোর ফ্রেম খুলে নিলেই ফাঁক বড় হয়ে যায় ড্যাডি। আমি দেখেছি অন্তত খান দু'-তিন ফ্রেম একেবারেই আলগা।"

"তাও অসম্ভব।"

"ড্যাডি, আমি জিমনাস্টিক্সের লোক। জানি শরীরকে কতটা নমনীয় করা যায়। কতটুকু জায়গা দিয়ে একটা বাচ্চা তার শরীর গলিয়ে দিতে পারে। যদি কেউ ভয় দেখানোর ছক সাজায়, সে কোনও বাচ্চাকে কাজে লাগাতেই পারে।"

"ভুলে যেয়ো না উৎপল, শব্দ পাওয়ার পর পরই কিন্তু দরজা খোলা হয়েছে। মাঝে কত টাইম গেছে? বড়জোর পাঁচ মিনিট। ওইটুকু সময়ের মধ্যে মানুষই হোক, কি বাচ্চাই হোক, তার পক্ষে কি আবার ওই ফাঁক দিয়ে গলে পালানো সম্ভব?"

"ওইটাই তো আমায় ভাবাচ্ছে ড্যাডি। তাই তো ম্যাডামকে ডেকে আনা। উনি দেখেশুনে বলুন, রহস্য উদ্ধার হয়ে গেলে আমরাও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হই।"

মিতিন স্থির চোখে শ্বশুর-জামাইয়ের চাপান উতোর শুনছিল। বলল, "এ ঘর দেখা শেষ। চলুন, এবার অন্য রুমগুলো দেখে নিই।"

জোনাথন যেন একটু অবাক হয়েছেন। বললেন, "অন্য ঘরে কী দেখবে?"

"কিছু না। এমনি। এত সব অ্যান্টিক ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ঘর, দেখলেও তো চোখ জুড়োয়।"

ভূতুড়ে ঘর তালাবন্ধ করে সদলবলে বেরিয়ে এলেন জোনাথন। পাশের ঘরে ঢুকতে যাবে, হাঁপাতে হাঁপাতে মির্নার আবির্ভাব। উত্তেজিত মুখে বলল, "কী আশ্চর্য, তোমরা বাইরের দরজা খুলে রেখে এসেছ?"

জোনাথন কাঁধ ঝাঁকালেন, "তাতে হয়েছেটা কী? বিকেলবেলা... বাড়িতে এত লোক রয়েছে... এখন কে ঢুকবে?"

"এই তো একটা বাচ্চা ছেলে কম্পাউন্ডে ঘুরঘুর করছিল। আমাকে দেখেই পাঁচিল গলে ভোঁ দৌড়।"

জোনাথন আমল দিলেন না, "ও তো প্রায়ই আসে। পেছনের পেয়ারা গাছটাই ওদের টার্গেট।"

"ওফ্ ড্যাডি, তুমি দেখছি বড়সড় একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না। কতদিন ধরে বলছি, সাবধানে থাকো, সাবধানে থাকো...।"

"থাম তো। তোরা আবার বেশি বেশি ভাবিস।"

"দেখলেন তো ড্যাডির অ্যাটিচিউড?" মির্না মিতিনের দিকে তাকাল।

মিতিন বলল, "হুম।"

"ফার্নিচার রুম দেখা হল? কী বুঝলেন?"

"ভাবছি। ...আপনি চলে এলেন যে? ক্লাস শেষ?"

"না। চলছে। আমার খুব টেনশান হচ্ছিল, তাই..."

মিতিন আর কিছু বলল না। ঘুরে ঘুরে দেখল ঘরগুলো। মির্না

উৎপল যে ঘরে এসে থাকে সেই ঘরটা, ডিকের ঘর, জোনাথনের বেডরুম, রান্নাঘর, বাথরুম, স্টোররুম...। উঠোনের বন্ধ সারভেন্টস কোয়ার্টারটাও খুলিয়ে দেখে নিল। বাড়ির পিছনটাও। জায়গাটায় আগাছার জঙ্গল। মাটিও উঁচু নিচু বেশ। ঘাসে ঢাকা এক লোহার আংটায় হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল টুপুর, মিতিন ছুটে এসে ধরল তাকে। নিচু হয়ে একবার দেখে নিল আংটাটা। পিছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে পর্যবেক্ষণ করে এল স্যান্ডকাস্টিং-এর রেলিং-এ ঘেরা ছাদখানাও।

পরিক্রমা শেষ করে সকলে মিলে ফিরেছে ড্রয়িংরুমে। মিসেস জোন্‌সকে ফের এক রাউন্ড কফির অর্ডার দিলেন জোনাথন। মৃদু কৌতুকের ভাব ফুটিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে ডিটেকটিভ, রসহ্য ভেদ হল?"

"উঁহু। এখনও তিমিরে।"

"তিমিরেই থাকবে। ম্যাকগ্রেগরের আত্মা তিমিরেই আসেন।"

"হুম্।...আচ্ছা মিস্টার মাইকেল, একটা কথা বলতে পারেন? ম্যাকগ্রেগর সাহেবের অমন একটা যুদ্ধজাহাজ আঁকানোর শখ হয়েছিল কেন?"

"কারণ তিনি নিজে একসময়ে যুদ্ধজাহাজে ছিলেন। মার মুখে শুনেছি তিনি ছিলেন রয়্যাল আর্টিলারিতে। সিপাই বিদ্রোহের সময়ে তিনি একটি গানবোট থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই গানবোটটার নামেই বাড়ির নামও মেগ্‌না।"

"ও। ওটা মেগনার ছবি? তার মানে মেগনা ম্যাকগ্রেগর সাহেবের জীবনের একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ছিল?"

"শুধু ইম্পর্ট্যান্ট নয়। মা বলতেন ওই মেগনাই নাকি তাঁর জীবন-মৃত্যুর নিয়ামক। তোমায় বললাম না, সিপাই বিদ্রোহের এক নেতাকে তিনি মেরেছিলেন? সে ওই মেগনা থেকেই। কিন্তু তার

পরিণাম ভাল হয়নি। বিদ্রোহ শেষ হওয়ার পরই মিলিটারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। ঘোড়ার গাড়ি তৈরির। সেই সময়ে পর পর বেশ কয়েকটা অঘটন ঘটে যায় তাঁর জীবনে। দুই ছেলে মাত্র দু'দিনের তফাতে কলেরায় মারা যায়। একমাত্র ভাই ডুয়েল লড়তে গিয়ে নিহত হন। এবং তার পরেই তাঁর মনে ধারণা হতে শুরু করে, যাকে তিনি সিপাই বিদ্রোহের সময়ে মেরেছেন, তাঁর অভিশাপেই এই সর্বনাশগুলো ঘটছে। তীব্র মানসিক অবসাদ থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি...। তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে, মানে আমার মার দিদিমা আর তাঁর মা অবশ্য থাকতেন এ-বাড়িতে। তবে তাঁরা ওই ঘরটি আর কেউ ব্যবহার করতেন না।"

মির্না হতবাক মুখে বলল, "আমাদের তো এত গল্প কখনও বলোনি ড্যাডি?"

"তোমরা জানতে চেয়েছ কোনওদিন? জানার উৎসাহ দেখিয়েছ?"

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "একটা খবর কিন্তু মির্না জানেন।"

"কী খবর?"

"ম্যাকগ্রেগর সাহেবের এক মহামূল্যবান সম্পদ নাকি এ-বাড়িতে লুকোনো আছে।"

"হ্যাঁ, ওই খবরটুকুই শুধু জানে। তবে ও জিনিস খোঁজার চেষ্টা করে লাভ নেই। পেতে গেলে মরতে হবে।"

মিতিন বলল, "মির্না-উৎপলবাবুর মুখে সেরকমই একটা কথা শুনছিলাম বটে। ব্যাপারখানা কী বলুন তো?"

"মৃত্যুর আগে ম্যাকগ্রেগর বাড়িটা স্ত্রী আর মেয়ের নামে উইল করে গেছিলেন। উইলের শেষে অদ্ভুত একটা কথা লেখা ছিল।"

"কীরকম?"

চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন জোনাথন। তারপর

বললেন, "এক সেকেন্ড।"

বলেই মিতিনদের চমকে দিয়ে উঠে গেছেন নিজের ঘরে। ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক পর, হাতে একখানা মলিন কাগজ। মিতিনকে কাগজখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমার মা অরিজিনাল উইলটা দেখেছিলেন। ছোটবেলায়। এই দিদিমার বাড়িতেই। উইলের পিকিউলিয়ার লাইনদুটো মা লিখে রেখেছিলেন আলাদা করে। কাগজে। পড়ো, পড়ে দ্যাখো।"

মিতিন জোরে জোরে পড়ল, "লিভিং বিহাইন্ড দা মোস্ট প্রেশাস পজেশান অফ মাই লাইফ। হুএভার লঙ্স ফর ইট শ্যাল গো টু গ্রেভ। আমেন।"

টুপুর বলল, "সত্যিই কী স্ট্রেঞ্জ! বলে যাচ্ছেন জিনিসটা রইল, অথচ যে চাইবে তাকেই..."

জোনাথন বললেন, "উনি নিশ্চয়ই চাননি কেউ জিনিসটা পাক।"

"তাই হবে।"

কফি খেয়ে উঠে পড়ল টুপুররা। সার্কুলার রোডের মোড় পর্যন্ত সঙ্গে এল উৎপল, ট্যাক্সিও ধরে দিল। ট্যাক্সি স্টার্ট দেওয়ার আগে সুরজমলের ঠিকানাটা দিতেও ভুলল না।

চোরা কৌতূহলে ফুটছিল টুপুর। আড়ে আড়ে দেখছিল মিতিনমাসিকে। পার্ক স্ট্রিট ক্রসিং-এ জ্যামে আটকে আছে ট্যাক্সি। সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে মিতিনমাসি, দৃষ্টি জানলার বাইরে। বাঁদিকের বড় কবরখানায়। চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে মিতিনমাসিকে।

উসখুস করতে করতে টুপুর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "কী এত ভাবছ গো?"

"মনে মনে অঙ্ক কষছি। মিতিন ঘুরে বসেছে, "তা ঐন্দ্রিলা, কেমন লাগল আজকের অভিযান?"

"ঠিকই আছে। একটা অন্য রকম বাড়ি দেখা হল। একজন ফার্স্ট

জেনারেশান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকেও মিট করলাম।"

"বাড়িটা কেমন লাগল?"

"দারুণ। সর্বাঙ্গে ইতিহাসের গন্ধ।"

"আর জোনাথন মাইকেল...?"

"মনে হল বেশ ভালমানুষ টাইপ। ভূতের ব্যাপারটা জেনুইনলি বিশ্বাস করেন। মিসেস জোন্‌সও। যেভাবে বার বার বুকে ক্রস আঁকছিলেন।"

"জোনাথন মাইকেলের আর কী অবজার্ভ করলি?"

"ভূতের ভয়ে ভেঙে পড়েছেন বলে তো মনে হল না। দিব্যি হাসিখুশি মেজাজেই তো গল্প করছিলেন।"

"আর?"

"মেয়ে জামাইয়ের ওপর দুর্বলতা বেশি। বাড়ি বিক্রি করার সময়ে মেয়ে জামাইকে নিয়ে গেছিলেন, ছেলেকে নয়।"

"হয়তো ছেলে যেতে চায়নি।"

"হতে পারে।"

"ডিককে কেমন দেখলি?"

"দেখলাম কোথায়, সে তো উড়ে গেল। তবে ডিক বেশ টিপটপ। ঘরটাও বেশ সাজানোগোছানো। টেপরেকর্ডারের ক্যাসেটগুলো পর্যন্ত কী সুন্দর করে রাখা।"

"উৎপল মির্নার জিমনাসিয়ামটা কেমন?"

"খুব ছোট নয়।"

"হুম। বরং একটু বেশিই বড়। অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে।"

"সে তো বটেই।...আচ্ছা মিতিনমাসি, একটা খটকা কিন্তু আমার যাচ্ছে না।"

"কী?"

"উইলে লেখা আছে, যে খুঁজবে সেই মরবে! অথচ উৎপলবাবু

সেদিন বলছিলেন অনেকেই নাকি খুঁজেছে!"

"ওরে বোকা, মৃত্যুভয়ে কি আর গুপ্তধন খোঁজা বন্ধ থাকে? জোনাথন মুখে যাই বলুন, উনিও অবশ্যই বিস্তর সন্ধান চালিয়েছেন।"

আবার মিতিনের ব্যাগে বাজনা শুরু। কথা থামিয়ে তড়িঘড়ি মোবাইল বার করল মিতিন। চোখ কুঁচকে নম্বর পড়ে ক্ষুদে যন্ত্রটা বাড়িয়ে দিল টুপুরকে, " নে, আবার তোর মেসো।"

"তুমিই কথা বলো না।"

"জানতে তো চাইবে আমরা কী কী খেলাম। তুইই বলে দে।"

মিতিনমাসির কথা একদম ঠিক। টুপুরের সাড়া পেয়েই পার্থমেসোর প্রথম প্রশ্ন, "কী রে, খুব সাঁটাচ্ছিস বুঝি বসে বসে?"

"আমরা ফিরছি। ট্যাক্সিতে আছি।"

"কী খাওয়াল?"

"অনেক কিছু। পিৎজা পেস্ট্রি কাজুবাদাম কোল্ড ড্রিংকস..."

"থাম থাম। আর বেদনা জাগাস না। আমি এখন মুড়ি চিবোচ্ছি। উইথ মিয়োনো চিনেবাদাম।... তোদের কাজ কিছু হল?"

"ভূতুড়ে ঘরটা দেখলাম।"

"মাসি ধরতে পারল কেসটা কী?"

"এক দিনেই কি বোঝা যায়? আবার হয়তো যেতে হবে।"

মিতিন পাশ থেকে বলে উঠল, "না-ও যেতে হতে পারে, টুপুর। হয়তো বেড়ালটেড়াল গোছের কিছু ফাঁক দিয়ে ঢুকে উৎপাত চালাচ্ছে।"

পার্থ শুনতে পেয়ে গেছে। চেঁচিয়ে বলল, "বলে কী তোর মাসি? ভূত নয়, মানুষ নয়, বেড়াল? তা উৎপলের কাছ থেকে ফিজ্‌টা নিয়ে নিয়েছে তো?"

টুপুর ফিসফিস করে বলল, "মেসো টাকার কথা জিজ্ঞেস করছে।"

মিতিন ভারিক্কি গলায় বলল, "তোর মেসোকে বলে দে, বেড়াল লাফানোর মতো পেটিকেসে পয়সা নিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি হাতে গন্ধ করে না।"

পার্থ বিরস গলায় বলল, "বুঝলাম। উৎপলটা ফালতু ফালতু এসে জ্বালিয়ে গেল।"

'"হুঁ।"

"ফিরে কথা হবে। ছাড়ছি।"

ফোন অফ করে টুপুর প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, "তুমি শিওর, বেড়ালই আওয়াজ করছে?"

"আর কী হতে পারে বল? ভূত বলে কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, উৎপল যতই বোঝাক, ওইটুকু ফাঁক দিয়ে একটা বাচ্চাছেলের পক্ষেও কি আসা-যাওয়া করা সম্ভব? তা হলে থার্ড অলটারনেটিভ একটাই পড়ে থাকে। বেড়ালই চেয়ার-টেবিলের ওপর নৃত্য করে, পায়ের চাপে পিয়ানো বাজায়, আর মানুষের সাড়া পেলে টুক করে পালায়।"

"এ ছাড়া কিছুই হতে পারে না?"

"চান্স কম। তবে...

"তবে কী?"

"একটা ধন্দ আছে। বেড়ালই যদি হবে তা হলে কার্পেটে নয় নাই পড়ল, চেয়ার টেবিলের ধুলোয় তার পায়ের ছাপ থাকত। দাগ আছে কিছু, কিন্তু ছাপ নেই। তা ছাড়া ছবি বসানোর কাঠের চ্যানেলটায় ধুলোই নেই তেমন..."

টুপুর নড়ে বসল, "তার মানে মিস্ট্রি একটা আছে?"

"ধীরে বৎস, ধীরে।" মিতিন ফিক করে হাসল, "রহু ধৈর্যং, রহু ধৈর্যং।"

টুপুরকে চমকে দিয়ে সেই রাত্রেই কেসটা থেকে হাত ধুয়ে ফেলল মিতিন। ফোন করেছিল উৎপল ক্রিস্টোফার, তাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিল ঘটনাটা তার মোটেই চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হচ্ছে না। সুরজমল অগ্নিদেবের সঙ্গে মোলাকাতেও সে মোটেই আগ্রহী নয়। শুনে বুঝি আহত হয়েছে উৎপল, আর তার কোনও সাড়াশব্দ নেই।

টুপুর রীতিমত হতাশ। ভেবেছিল এবারও মিতিনমাসির তদন্তে সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকবে, জম্পেশ করে লিখবে রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাহিনী। কী কপাল, শুরুতেই জল পড়ে গেল! অগত্যা আর কী করা, টুপুর এখন ভূতের মতো বসে থাকছে সারাদিন। পুরনো কলকাতার ওপর আরও খানচারেক বই এনেছে পার্থমেসো, ইচ্ছে হলে দেখছে উলটেপালটে। সবক'টা বইই পার্থমেসোর ভাষায় হাইলি ইন্টারেস্টিং। আজব আজব তথ্যে ঠাসা। কীভাবে লটারি কমিটি করে তৈরি হয়েছিল কলকাতার রাস্তাঘাট, কত কিসিমের ঘোড়ার গাড়ি চলত শহরে, কবে থেকে চালু হয়েছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম, বিদ্যুৎই বা কলকাতায় এল কোন সালে, এরকম হাজারো খবর। পড়তে তো ভালই লাগে টুপুরের, কিন্তু কিছুতেই সেভাবে মন বসে না। হঠাৎ হঠাৎ ভারী হয়ে যায় বুকটা। ইশ্, গরমের ছুটিটা এ বছর মাঠে মারা গেল!

টুপুরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রোববার নামি চাইনিজ রেস্তরাঁয় জব্বর খাওয়াল পার্থমেসো। হালকা মশলাদার খাঁটি চিনা খাবার।

চিংড়ি আর কাঁকড়া মিশ্রিত লোভনীয় ফ্রায়েড রাইস, ব্যাঙের ছাতা সহ লেমন চিকেন, গার্লিক প্রন। সঙ্গে খিদে বাড়ানোর ডিশ হিসেবে মুচমুচে পালংশাক ভাজা। মিতিনমাসিও একদিন ঘুরিয়ে আনল সায়েন্স সিটি থেকে। সেখানে ডায়নোসর দেখে আর টাইমমেশিনে চড়ে বুমবুম দারুণ পুলকিত। বিশাল গম্বুজাকৃতি পরদায় অ্যাসট্রাভিশনে সেরেঙ্গেটির জঙ্গল দর্শন করে টুপুরও রোমাঞ্চিত। ওই একটা দিনই যা টুপুর বুমবুমকে নিয়ে ঘুরল মিতিনমাসি। বাকি সবক'টা দিনই তো দুপুরে খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফিরছে সেই সন্ধেবেলা। কম্পিউটার চালানোর কী একটা ক্র্যাশ কোর্স করছে। নিজস্ব একটা যন্ত্রগণক কেনার খুব ইচ্ছে মিতিনমাসির, তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

হঠাৎই নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল পড়ল।

সেদিন বিকেলবেলা জোর একটা কালবৈশাখী হয়ে গেছে, সঙ্গে ঝমঝমাঝম বৃষ্টি। জৈষ্ঠ্যের উত্তাপ কমে গিয়ে মৃদুমন্দ সমীরণ বইছিল সন্ধেবেলা। টুপুর একটু বই-খাতা নিয়ে বসেছিল। ছুটির আগে নতুন ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে, টুকটাক হোমওয়ার্ক আছে কিছু, টাস্কগুলো সেরে নিচ্ছিল। প্রথমে হাত দিয়েছে অ্যালজেব্রায়। সহজ অঙ্কগুলো কষে ফেলছে তাড়াতাড়ি, কঠিনগুলো জমিয়ে রাখছে পার্থমেসোর জন্যে। মিতিনমাসি ফিরেছে সবে, গা ধুয়ে ঢুকেছে রান্নাঘরে।

তখনই হঠাৎ উৎপলের আবির্ভাব। মুখেচোখে প্রবল উত্তেজনা।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ম্যাডাম, গ্রেভ ডেঞ্জার। অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে। আমি মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।"

মিতিনকে তেমন একটা অবাক দেখাল না, সহজভাবে বলল, "কী হল আবার?"

"বলছি। আগে এক গ্লাস জল খাওয়ান।"

এক গ্লাস নয়, পর পর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেল উৎপল। খানিকটা থিতু হয়ে যা শোনাল তা রীতিমতো রোমহর্ষক। জোনাথন মাইকেলের বাড়িতে নাকি আপনাআপনি সব কাচ ভাঙতে শুরু করেছে! টিউবলাইট ফাটছে ফটাফট, বাল্‌ব উড়ে যাচ্ছে, খসে খসে পড়ছে দেওয়াল-আলমারির কাচ! কত যে কাচের ফার্নিচার চৌচির হয়ে গেছে!

মিতিনের ভুরু কুঁচকেছে সামান্য। জিজ্ঞেস করল, "কবে থেকে শুরু হল এসব?"

"পরশু। আই মিন শনিবার সন্ধে থেকে।"

"প্রথম কী ভেঙেছে?"

"টিউবলাইট। ড্যাডির ঘরে। মিসেস জোন্‌স বাড়ি যাওয়ার আগে ঘরদোরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যান। পরশুও নিয়মমাফিক লাইটগুলো অন করেছিলেন, হঠাৎই নাকি শব্দ করে...."

"নাকি বলছেন কেন? আপনি বুঝি স্পটে ছিলেন না?"

"মির্না আর আমি তো তখন জিমনাস্টিক্স ক্লাসে।"

"ও। আপনারা মিসেস জোন্‌সের মুখে খবর পেলেন?"

"হ্যাঁ। বেচারি ছুটতে ছুটতে এসে জানালেন সব কটা লাইটই নাকি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম ফেটে যাচ্ছে। ড্রয়িংরুমের টিউব ফাটার পর বালব্‌দুটো জ্বালিয়েছেন, দুটোই গন। বাল্‌বের কাচ ঝরে গিয়ে ফিলামেন্ট ঝুলছে। বলতে বলতে মিসেস জোন্‌সের তো প্রায় কেঁদে ফেলার দশা।"

"তো আপনারা তখন কী করলেন?"

"মির্না তো শুনেই কাঁপছে। আমি প্রথমে অতটা গা করিনি। মিসেস জোন্‌সের তো একটু তিলকে তাল করার বাতিক আছেই, উনি তো কথায় কথায় হোলি স্পিরিট দেখেন। ভেবেছিলাম হয়তো একটা-দুটো লাইট কেটে যেতেই উনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। ও

জিসাস, গিয়ে দেখি ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস। বারান্দার আলোটা জ্বলছে বটে, কিন্তু ঘরগুলো অন্ধকার। ড্যাডি মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে ঠকঠক কাঁপছেন। ড্যাডিকে সাহস দেওয়ার জন্য আমাদের ঘরে সুইচ মারলাম। বিশ্বাস করবেন না, তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে টিউব ফটাস। বাল্‌বটা তো পনেরো সেকেন্ডও টেকেনি। ডিকের ঘরেও সেম কেস। ফটাস শব্দ, টুকরো টুকরো হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে কাচ।”

টুপুর খাড়া হয়ে বসল, “তারপর?”

“স্টোররুমে দু-তিনটে নতুন বাল্‌ব রাখা ছিল, একটা এনে ড্রয়িংরুমে লাগালাম। এগেন সেম ইন্সিডেন্ট। তখন আমারও একটু নার্ভাস নার্ভাস লাগল। আর কিছু করলাম না, ঠিক করলাম রাতটা যাক, সকালে দেখছি। বোধ হয় আধ ঘণ্টাও কাটেনি, আর এক কাণ্ড! ডিকের ঘরে ঝনঝন! গিয়ে দেখি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিক, তার দেওয়াল-আলমারির কাচ খসে পড়েছে মাটিতে। ডিক জাস্ট পাল্লাটা টেনেছিল, তাতেই নাকি....”

“ও। সন্ধেবেলা বাল্‌ব-টিউব ফাটার সময়ে ডিক কোথায় ছিল? বাড়িতেই?”

“ডিক কখন কোথায় থাকে লর্ড জিসাসই জানেন। তবে বাড়িতে ছিল না এটুকু বলতে পারি।”

“ডিক বাড়ি ঢোকার পর পরই কি কাচটা ভাঙল?”

“মিনিট পনেরো পর। এসে বাল্‌ব-টিউবের ঘটনাটা শুনে লাইন চেক করানোর উপদেশ দিয়ে সবে নিজের ঘরে গেছে, তার পর পরই.... ”

“তারপর কী করল ডিক?”

“একটুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। দেন ডিনার টিনার সেরে হোটেল। নাইট ডিউটি।”

"কোনও ওপিনিয়ন দেয়নি?"

"না। কেমন গুম মেরে গেছিল।"

"হুম। তা লাইট আর দেওয়াল-আলমারি ছাড়া আর কী ভাঙল?"

"অনেক কিছু। আমাদের ঘরের শোকেস, ড্যাডির ওয়াল আলমিরা, ড্রয়িংরুমের ডিসপ্লে ক্যাবিনেটের নীচের তাকে কাচ বসানো ছিল, সেটাও। টিউব-বাল্‌ব দিনের বেলা দিব্যি জ্বলছে, নো প্রবলেম। যেই না সন্ধে হল, অমনি প্রথমে গেল আলো, তারপর একে একে ওই সব কাচ। আমাদের সে এক দিশেহারা অবস্থা ম্যাডাম। অন্ধকারে একবার এ ঘরে ছুটছি, একবার ও ঘরে।"

টুপুর ফস করে জিজ্ঞেস করল, "আর সেই ফার্নিচার রুমের কী খবর? সেখানে কিছু ভাঙছে না?"

"খুলে দেখার সাহস পাইনি। ড্যাডি নিজেও আর ও ঘরে ঢুকছেন না, আমাদেরও ঢুকতে দিচ্ছেন না। চাবি আগলে রেখে দিয়েছেন।"

"ভেতরে আর আওয়াজ হচ্ছে?"

"মাঝে খানিকটা কমেছিল। লাস্ট উইকে মাত্র একদিন....। পরশুও কিছু হয়নি। তবে কাল রাত্তিরে আবার প্রবল দাপাদাপি। পিয়ানো এক বার শব্দ করে থামল না, বাজতেই লাগল। মনে হচ্ছিল ভারী ভারী আলমারি দুটোয় কেউ ধাক্কা মারছে। গোটা ঘর জুড়ে চলছে যেন তাণ্ডব। ড্যাডি সারারাত ঠায় বিছানায় বসে ছিলেন। সিঁটিয়ে। প্রায় কোলাপ্‌স করার দশা। রাত্তিরে কতবার বললাম, চাবিটা দিন, একবার খুলে দেখি, মনে হয় বেড়ালটা বেকায়দায় আটকা পড়ে গেছে..... ড্যাডি কিছুতেই রাজি হলেন না," উৎপল থামল একটু, তারপর ফ্যাকাশে হেসে বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনার কথায় আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম ও ঘরে বেড়ালই ঢোকে। আমার সার্কাসের অভিজ্ঞতাও বলছিল বেড়াল জাতীয়

প্রাণীরা অসম্ভব নিঃসাড়ে আর ক্ষিপ্র গতিতে চলাফেরা করতে পারে। এখন কিন্তু আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে ম্যাডাম।”

মিতিন বলল, “অর্থাৎ এখন আপনারও মনে হচ্ছে ভূত?”

“তা ছাড়া আর কী হতে পারে বলুন? বেড়াল তো লাইট কাচ ভাঙছে না!”

“কেন, সুরজমলের কথা আর আপনার মাথায় আসছে না?”

“বুঝতে পারছি না ম্যাডাম, কিছু মাথায় ঢুকছে না,” উৎপল দু'দিকে মাথা নাড়ল, “সুরজমলকে আর সন্দেহ করব কোন যুক্তিতে? তবে হ্যাঁ....।” উৎপল সামান্য থমকে থেকে বলল, “একটা কথা এখনও আপনাকে বলা হয়নি। উত্তেজনার মাথায় মিস করে গেছি। সুরজমল কিন্তু এর মধ্যে আরও এক বার ড্যাডির কাছে এসেছিল।”

“তাই নাকি? কবে?”

“ওই পরশুই। সকালবেলা।”

“হঠাৎ?”

“সুরজমল তো মহা ঘোড়েল, ড্যাডিকে এবার ভুজুংভাজুং দিয়ে কায়দা করতে চাইছিল। চেলাচামুণ্ডা আনেনি, সঙ্গে এসেছিলেন সুরজমলের খোদ গুরুদেব। এসেই নাকি সুরজমল বলতে থাকে, ড্যাডিই তাকে ডিড সেট্‌ল করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন। ড্যাডি অবশ্য গুলগল্পে আমল দেননি, সোজা হাঁকিয়ে দিয়েছেন।”

টুপুর চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, “সুরজমলের গুরুদেবও আছেন?”

“সুরজমলদেরই তো গুরুদেব থাকে মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি। অধর্ম করতে গেলে ধর্মের আড়ালটা তো চাই। সুরজমলের গুরুদেবটি শুনেছি বাঙালি। নাম মুক্তকেশানন্দ। ইয়া লম্বা চুল আছে। সর্বদা খোলা থাকে চুল। ওই চুলেই নাকি তাঁর যত তেজ।”

"স্যামসনের মতো?" টুপুর ঠাট্টা জুড়ল, "তা সেই গুরুদেবই কোনও তুকতাক করে দিয়ে যাননি তো? হয়তো তাঁর ..... ওই যে, কী যেন বলে,.... ঐশীশক্তির প্রভাবে......"

উৎপলের মুখচোখ পালটে গেছে সহসা। যেন শুকনো মুখ থেকে কেউ রক্তটুকুও শুষে নিল। কাঁপা কাঁপা গলায় উৎপল বলল, "এ লাইনে তো ভেবে দেখিনি! শুনেছি বটে অনেক হিন্দু সাধু যোগবলে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটাতে পারেন। কাচ ভাঙা হয়তো ওই সাধুর জাদুতেই..." উৎপল অসহায় চোখে মিতিনের দিকে তাকাল, "এরকমটাও তো হতে পারে, না ম্যাডাম?"

"পারে হয়তো। কোনও বিশেষ শক্তি যে কাজগুলো করছে তাতে আমারও কোনও সন্দেহ নেই।"

"বলছেন? বলছেন সুরজমলের কাজ? ও গড, ড্যাডির তো তা হলে সমূহ বিপদ।"

"উতলা হবেন না। দেখছি কী করা যায়। বাই দা বাই, বাড়ির ইলেক্ট্রিক লাইন চেক করিয়েছেন?"

"ডিকই ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে এনেছিল। আজই বিকেলে।" উৎপল ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, "আগাপাশতলা টেস্ট হয়েছে। লাইনে কোথাও গণ্ডগোল নেই। নো শর্টসার্কিট, নো লিকেজ, নাথিং।"

"আপনাদের ওখানে ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশান কীরকম?"

"ইউজুয়াল। নাথিং এক্সট্রা অরডিনারি। ভোল্টেজের প্রবলেম হলে তো আমার জিমনাসিয়ামেও হত।"

"আর একটা কথা। বাড়ির কোনও পয়েন্টের কোনও আলোই কি টিকছে না?"

"বারান্দার লাইট ঠিক আছে। বাইরের। ভেতরের। কিচেন-বাথরুমেও প্রবলেম নেই। শুধু রুমগুলোতেই...। আজ বলে এসেছি,

যেন কোনও ঘরেরই আলো জ্বালানো না হয়।”

“আর একটা কথা। কাচ ভাঙার কথা ইনফর্ম করতে দু'-দিন লেট করলেন কেন?”

“ফ্র্যাংক্লি স্পিকিং, প্রথমেই আপনার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু হেজিটেট করছিলাম। আজ মির্না ছাড়ল না, জোর করে ঠেলে পাঠাল।”

“হুম,” মিতিন পলক ভাবল কী যেন। তারপর বলল, “এক কাজ করুন না। এক্সট্রা চেয়ার-টেবিলগুলো আবার আগের জায়গায় বের করে দিন।”

“কী বলছেন?” উৎপল থতমত খেয়ে গেল, “তাতে কী লাভ হবে? ভূতই হোক, কি মানুষ, সে তো এখন বাইরে কাজ আরম্ভ করেছে।”

“তবু বের করে দিন। অনর্থক জেদ করবেন না। এতে হয়তো আপনার শ্বশুরমশাইয়ের কনফিডেন্স একটু বাড়লেও বাড়তে পারে।”

“বলছেন যখন, দেব।” উৎপলকে ঈষৎ অপ্রসন্ন দেখাল। পলকের জন্য। তারপর অল্প হেসে বলল, “মনে হচ্ছে আপনিও ভূতে বিশ্বাস করে ফেলেছেন ম্যাডাম?”

“বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!” মিতিনও হাসল, “আপনি তো মিস্ট্রির সল্যুশান চান। তাই না? আর যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত আমি ভূতই আবিষ্কার করি, আপনি নিশ্চয়ই অখুশি হবেন না?”

উৎপল এক মুহূর্ত চুপ। পরমুহূর্তে শার্টের বুকপকেট থেকে একটা চেক বার করেছে। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, “এটা রাখুন ম্যাডাম। আপনার ফিজ তো জানি না, জাস্ট একটা টোকেন অ্যাডভান্স।”

মিতিন নিয়ে নিল চেকটা। আলগা চোখ বোলাতে বোলাতে

আজব প্রশ্ন ছুড়ল, "মিস্টার বিশ্বাস, আপনার বাড়ির ল্যাপডগটা কি ককার স্প্যানিয়াল?"

প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বদলে যাওয়ায় উৎপল ক্ষণিকের জন্য থতমত। বিস্ময়ের সুরে বলল, "না। আমার তো লাসা। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে আমার কুকুর আছে? "

মিতিন মুচকি হাসল, "বলুন তো কী করে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে উৎপলও হেসে ফেলেছে। বলল, "বুঝেছি। আপনাকে সেদিন যখন ফোন করছিলাম, তখন আপনি টিপসির ডাক শুনেছেন।"

"রাইট। আপনি কি ডগলাভার?"

"কুকুরের মতো বিশ্বস্ত প্রাণীকে না ভালবেসে পারা যায়?"

"আপনার মিসেসও ভালবাসেন?"

"অবশ্যই। তবে আমার সঙ্গগুণে।"

টুকটাক কথা বলতে বলতে উৎপলের সঙ্গে দরজা অবধি এসেছে মিতিন। হালকা ভাবে বলল, "এখন কি আবার শ্বশুরবাড়ি?"

"একবার তো ঢুঁ মারতেই হবে। তারপর ভাবছি আজ বাড়ি ফিরে যাব। পর পর দু'রাত্তির ঘুম হয়নি, চোখটা টানছে।"

"মিস্টার মাইকেলের কাছে আজ তা হলে কে থাকবেন? মির্না? "

"থাকতেও পারে। তবে মির্নাও মেন্টালি খুব এগ্‌জসটেড। ওরও একটু ঘুম দরকার। তেমন বুঝলে ড্যাডিকেও আজ একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে আসব।"

"হ্যাঁ, আপনাদের সবারই ঘুম দরকার। যা ঝড়টা যাচ্ছে।"

উৎপল চলে যেতেই টুপুর প্রায় লাফিয়ে উঠেছে, "দেখেছ তো, তোমার বেড়াল থিয়োরি খাটল না?"

"আমি তো জানতামই খাটবে না।" মিতিন সোফায় হেলান দিল,

"তা ঐন্দ্রিলা, তোমার কী রিডিং? রিগার্ডিং দিস নতুন মোচড়?"

"প্রোমোটারের গুরুদেবের হাত থাকলেও থাকতে পারে।"

"তুকতাক? তার এফেক্টে বাড়ির কাচ ভেঙে পড়ছে? "

টুপুর ঈষৎ মিইয়ে গেল। করুণ মুখে বলল, "কিন্তু ভূত বলে তো কিছু নেই মিতিনমাসি!"

"বুঝেছি। ভূতের আইডিয়াটা তোর পছন্দ নয়। তুই এমন কিছু চাস যা ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।"

বুমবুম পাশের ঘরে ভারতীর সঙ্গে লুডো খেলছিল। কখন যেন এসেছে দরজায়, গোল গোল চোখে গিলছে মা আর টুপুরদিদির সংলাপ। কৌতূহলী মুখে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ভূত আছে মা?"

"ভূত যেখানে থাকে। তোমার মাথায়।"

গোমড়া মুখে বুমবুম বলল, "না। আমার মাথায় ভূত নেই। বুদ্ধি আছে।"

"কাঁচকলা আছে।" ভারতী পিছন থেকে ফুট কাটল, "মাথায় ভূত চাপে বলেই তো খেলার সময়ে বার বার সাপলুডো উলটে দাও।"

"এহ্, আমি কেন বারবার সাপের মুখে পড়ব?" বুমবুম দুষ্টু হেসে মিতিনকে বলল, "মা, একটা কাজ করা যায় না? সাপের মুখে পড়ে লেজে নেমে না এসে যদি লেজ থেকে মুখে উঠে যাই?"

টুপুর বলল, "এই বিটকেল বুদ্ধিগুলোকেই তো বলে ভূতের বুদ্ধি।"

মিতিন বলল, "যেমন বন্ধ ঘরে সুবিধে করতে না পেরে এখন জোনাথনের বাড়ির কাচ ভাঙতে শুরু করেছে ভূত।"

"তাই কি?" টুপুর মাথা নেড়ে ফের আলোচনায় ফিরল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, যদি ধরেও নিই ভূত আছে, তা হলে সে তো অশরীরী। যার শরীরই নেই, সে তো কিছু ধরতেও পারবে না, ধাক্কাও মারতে পারবে না। নয় কি?"

মিতিন হাসল, "বুঝলাম। ভূতের থিয়োরিটা তোর একদমই মনে ধরছে না।"

"তুমিই ভেবে দ্যাখো না, একটা বাড়ি তৈরি হয়েছে প্রায় দেড়শো বছর আগে, সেখানে একজন কতকাল আগে সুইসাইড করেছেন। মাঝে তো কখনও ভূতের উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি?"

"তা কেন। মিসেস জোনস তো বললেন, মিসেস মাইকেল মারা যাওয়ার সময়ে তিনি আত্মার উপস্থিতি টের পেয়েছেন।"

"মিসেস জোন্‌স বড্ড বেশি ধর্মপ্রাণা। এমন মহিলার তো মনের ভুল হতেই পারে। ওঁর কথাটাকে বেদবাক্য বলে ধরবে কেন? কিছু একটা গড়বড় চলছে।"

"কীরকম?"

"তা আমি কী করে বলব! ভূত না মুক্তকেশানন্দ, সে তো বার করবে তুমি।"

কথার মাঝেই ডোরবেল। পার্থ ফিরল।

মেসো ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে তড়বড় করে তাকে কাচভাঙা এপিসোডের বিস্তৃত ধারাবিবরণী দিয়ে দিল টুপুর।

শুনে পার্থ রীতিমতো উৎফুল্ল, "আইব্বাস, এ যে রিয়েল ভূত রে। এমন একটা ভূতের বাড়ি তো স্বচক্ষে দেখে আসতে হয়।"

টুপুর বলল, "তুৎ, তুমিও ভূত ভাবছ? ভূত তো নেহাতই মানুষের কল্পনা।"

"ডেঁপোমি করিস না। জানিস, কলকাতায় এখনও কতগুলো ভূতের বাড়ি আছে? খোদ মহাকরণই তো ভূতেদের সদর দপ্তর। এখনও গভীর রাতে রাইটার্স বিল্ডিং-এ টাইপরাইটারের খটাখট শোনা যায়।"

মিতিন ফোড়ন কাটল, "ভূতরা টাইপ করে? কেন? কোথায় কী ভূতুড়ে কাণ্ড করতে হবে তার অর্ডার পাঠানো হয় বুঝি তখন?"

"বিদ্রূপ কোরো না। ক'টা খবর রাখো? জানো, প্রতি পূর্ণিমায় রাজভবন থেকে এখনও একটা চেরোট বেরোয়? চেরোট, মানে চ্যারিয়ট। বিশাল সাইজের ঘোড়ার গাড়ি। সেই চেরোট গিয়ে থামে গঙ্গার ধারে, ইডেন গার্ডেনের পশ্চিমগেটে। গাড়ি থেকে নেমে জ্যোৎস্নারাতে স্ট্র্যান্ডে হাওয়া খান এক সাহেব। অনেকেই দেখেছে। স্ট্র্যান্ড মানে জানো তো? ইডেনের পশ্চিমগেটের ভেতরে যে উঁচু ধাপিটা আছে সেটাকে বলে স্ট্র্যান্ড।"

"ইয়েস। ওই স্ট্র্যান্ডের নামেই তো গঙ্গার ধারের রাস্তাটার নাম স্ট্র্যান্ড রোড।"

"রাইট। ...তারপর ধরো, রাসেল স্ট্রিটের ওই পুরনো বাড়িটা, যেখানে আগে কলকাতার বিশপ থাকতেন। বাড়িটার পেছনে প্রকাণ্ড এক দিঘি ছিল, চৌরঙ্গির সাইডে। ওই দিঘিতে ডুবে মারা গেছিলেন এক বিশপ। তাঁর আত্মা এখনও রাসেল স্ট্রিটের বাড়িটায় ঘুরপাক খায়। তিনি যখন আসেন, একটা মোমপোড়া গন্ধ ভাসতে থাকে বাতাসে। উৎপলের বাড়িতেও সেরকমই কেউ আবির্ভূত হচ্ছেন কিনা সেটা কি জোর দিয়ে...?"

আচমকা কথা থামিয়ে দিল পার্থ। চোখ আটকেছে সেন্টার টেবিলে। খপ করে তুলে নিল চেকটা। উদ্ভাসিত মুখে বলল, "যাক, উৎপলের জ্ঞানগম্যি হয়েছে তা হলে!"

টুপুর বলল, "ভাল অ্যামাউন্ট দিয়ে গেছেন। সাড়ে সাত হাজার।"

পার্থ বিজ্ঞের মতো বলল, "খুব তো টিকটিকির চামচে হয়েছিস, বল তো এই চেক দেখে উৎপলের চরিত্র সম্পর্কে কী আন্দাজ করা যায়? "

আর এক বার চেকটা দেখে নিয়ে টুপুর বলল, "সইটা খুব সিম্পল। অর্থাৎ উৎপলবাবুর মধ্যে তেমন প্যাঁচ নেই।"

"কিছুই শিখিসনি।" পার্থ আলগা চাঁটি মারল টুপুরের মাথায়, "শোন্, উৎপল মহা কিপটে। ব্যাটার ইচ্ছে ছিল পাঁচ হাজার দেওয়ার। পরে মনে হয়েছে দশ হাজারের কম দিলে খারাপ দেখাবে, তাই শেষ পর্যন্ত তানানানা করে সাড়ে সাত গলিয়েছে। অর্থাৎ কৃপণ উৎপল এখন একজন দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ।" পার্থ টেরচা চোখে মিতিনকে দেখল, "অ্যাম আই রাইট শ্রীমতী প্রজ্ঞাপারমিতা?"

"চমৎকার ডিটেকশান।" মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "তবে একটা তুচ্ছ জিনিস তোমাদের নজরে আসেনি। সইটা ইউ বিশ্বাসের নয়, এম বিশ্বাসের। অর্থাৎ মির্নার। চেকটাও মির্না লিখেছে, উৎপল নয়।"

পরদিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে মিতিন বলল, "এই, চটপট খেয়ে নে। এক্ষুনি বেরোতে হবে।"

টুপুর অবাক, "কোথায় যাবে?"

"ইলিয়ট রোড।"

"জোনাথন মাইকেলের বাড়ি?" টুপুর আকাশ থেকে পড়ল, "এই সাতসকালে?"

"সকালই ভাল। দুপুরে আমার কম্পিউটার ক্লাস আছে।"

পার্থ ওমলেট খুঁটে খুঁটে কাঁচালঙ্কা বার করছিল। মাথা না তুলেই বলল, "আমি কিন্তু টিমে আছি আজ।"

"তুমি বাজার যাবে না?"

"তিন দিনের বাজার করা আছে ম্যাডাম। রুই, চিংড়ি, মুরগি। পালা করে রান্না হবে।"

"আর তোমার প্রেস?"

"প্রেস ক্যান ওয়েট, বাট মিস্ত্রি ক্যান নট। মাইকেলের ভূতুড়ে বাড়ি দেখেই নয় প্রেসে যাব। শুধু পাঁচটা মিনিট টাইম দাও, চট করে স্নানটা সেরে নিই।"

সাড়ে আটটার মধ্যে তিনজনই তৈরি। টুপুর পরেছে লংস্কার্ট আর টপ। মিতিন ঘিয়ে রং সালোয়ার কামিজ। পার্থ জিন্‌স টিশার্ট। চোখে একটা সানগ্লাসও চড়াল পার্থ, কাঁধে ক্যামেরা। ভ্যানিটি ব্যাগে মিনি টেপরেকর্ডারটা ভরে নিতে ভুলল না মিতিন। বুমবুম এখনও পোচ আর টোস্ট নিয়ে নাড়াঘাঁটা করছে, তাকে ভারতীর জিম্মায় সমর্পণ করে বেরিয়ে পড়ল তিন মূর্তি।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে পার্থ বলল, "উৎপলকে একটা ফোন করে দিলে হত না?"

"কী দরকার! একটু ফাঁকায় ফাঁকায় গিয়ে দেখি না বাড়িটা। উৎপলবাবু তো কাছেই থাকেন, প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করে নেব।"

"উৎপলকে তো লাগবেই। মিসেস জোন্‌স কি পিৎজা আনতে দৌড়বেন?"

"তোমার শুধু খাই খাই।" মিতিন কড়া চোখে তাকাল, "ও বাড়িতে এখন অশান্তি চলছে। গিয়ে একদম হ্যাংলামি করবে না।"

পার্থ হাত ওলটাল, "যো হুকুম মহারানি।"

পথেঘাটে অফিসের ভিড় সবে শুরু হয়েছে। তবে এখনও তেমন জ্যাম নেই কোথাও। ন'টার মধ্যেই ইলিয়ট রোড পৌঁছে গেল টুপুররা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে জোনাথনের বাড়ির সামনে এসে মিতিন দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। বুঝি বা খানিক দূর থেকে বুঝে নিতে চাইল

অন্দরের হালচাল। সামনের তিনটে দরজাই বন্ধ, তবে জানলাগুলো সব খোলা। জনমনিষ্যির সাড়া নেই। জোনাথন কি এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি?

বারান্দায় উঠে বারকয়েক ডাকাডাকির পর মাঝের দরজা খুলে গেল। জোনাথন নয়, বেরিয়ে এসেছেন মিসেস জোনস। চুল চুড়ো করে বাঁধা, মুখময় ঘাম, গলা থেকে অ্যাপ্রন ঝুলছে, হাতে সবজি কাটার ছুরি। মিতিনদের আগমনে চমকেছেন জোর। বললেন, "তোমরা হঠাৎ?"

মিতিন হেসে বলল, "চলে এলাম। শুনলাম এ বাড়িতে নাকি আরও কী সব আজগুবি কাণ্ড ঘটছে?"

"আর বোলো না।" মিসেস জোন্‌স প্রায় হাউমাউ করে উঠলেন। বুকে ক্রস আঁকছেন ঘন ঘন। ড্রয়িংরুমে মিতিনদের বসাতে বসাতে বললেন, "হোলি স্পিরিট ভয়ানক অশান্ত হয়ে গেছেন। এ বাড়ির একটা কাচও তিনি বুঝি আস্ত রাখবেন না। জানো, কাল রাতে কী হয়েছে? ডাইনিং প্লেসের ক্রকারি কেসটাও উনি ভেঙে দিয়েছেন।"

পার্থ সোফার গদিটা পরখ করছিল। গ্রাম্ভারি স্বরে বলল, "ওই ভূতটির সন্ধানেই তো আমাদের আসা।"

মিসেস জোন্‌সের ভুরু কুঁচকে গেল, "এঁকে তো চিনলাম না?

মিতিন ঝুঁকে ডিসপ্লে ক্যাবিনেটের ভাঙা কাচ দেখছে। ঘুরে বলল, "উনি আমার হাজব্যান্ড। পার্থ। উৎপলবাবুর কলেজের বন্ধু।"

"ও। মিসেস জোন্‌সের গলায় অসন্তোষ, "শোনো বাছা, তোমাদের ভূত আর আমাদের হোলি স্পিরিট এক নয়। বড়সড় কিছু না ঘটলে হোলি স্পিরিট কক্ষনও নিজেকে জানান দেন না।"

মিতিন বলল, "বড়সড় ঘটনা তো একটাই। ও ঘরে এক্সট্রা ফার্নিচার ঢোকানো। তাই না মিসেস জোন্‌স? "

"আমার তো তাই মনে হয়। তবে আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমার কথার কী দাম আছে! আমি শুধু ভয় পাচ্ছি এর পর আরও বড় কিছু না ঘটে।"

মিতিনের পাশ থেকে টুপুর বলল, "এখনই তো যথেষ্ট তুলকালাম চলছে। এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কী হবে?"

"আমি মিস্টার মাইকেলের কথা বলছি। ওঁর ওপর দিয়ে যা ঝড় যাচ্ছে। কদ্দিন আর ধাক্কা সামলাতে পারবেন কে জানে!"

"মিস্টার মাইকেল এখন কোথায়?"

"কালও তাও হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন। আজ তো বিছানা ছেড়ে উঠতেই চাইছেন না, এত শক্‌ড।" মিসেস জোন্‌স আপনমনে গজগজ করছেন, "কোন আক্কেলে যে মির্না উৎপল মানুষটাকে একা ফেলে চলে গেল! ডিকেরও বলিহারি যাই। দেখল এসে বাপের এই অবস্থা, কোথায় খানিক সান্ত্বনা দেবে বাপকে, পাশে গিয়ে বসবে, তা নয়, আজেবাজে কথা শুনিয়ে সটান শুতে চলে গেল!"

"ডিক ডিউটি থেকে ফিরে এসেছে?"

"এই তো, পৌনে ন'টা নাগাদ। এখন সেই টানা দুটো অবধি ঘুমোবে। তারপর খেয়েদেয়ে বেরোবে চরকি মারতে। মাঝখান থেকে আমারই হয়েছে যত জ্বালা। বারবার বলছি, আমায় রেহাই দাও, ছেড়ে দাও... মির্না, উৎপল কানেই তুলছে না।" মিসেস জোন্‌স লম্বা নিশ্বাস ফেললেন, "আমার মনের অবস্থাটা কেউ বোঝে না।"

"হুম্, আপনার ওপরও বড্ড চাপ যাচ্ছে।"

"বাদ দাও। তোমরা একটু চা খাবে তো?"

"থ্যাংকস মিসেস জোন্‌স। সত্যিই আপনার হাতের চা খেতে খুব ইচ্ছে করছিল।"

"আমি এক্ষুনি বানিয়ে আনছি।"

"মিস্টার মাইকেলের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে যে।"

"খবর দিচ্ছি। উনি আসতে পারেন তো ভাল, নইলে আমি ওঁর কাছে তোমাদের নিয়ে যাব।"

"সো কাইন্ড অফ ইউ।"

মিসেস জোন্‌স অন্তর্হিত হতেই মিতিন চাপা গলায় বলল, "কাচ ভাঙার নেচারটা নোট কর। পাল্লার পুরো কাচ খসেনি, কাঠের সঙ্গে খানিকটা করে লেগে আছে। ভেঙেছেও প্রায় স্ট্রেট লাইনে, এবড়োখেবড়ো ভাবে নয়।"

"হোলি স্পিরিট বোধহয় পবিত্র স্কেল নিয়ে এসেছিলেন। মাপ করে কেটেছেন।" টিপ্পনী ছুড়েই পার্থ ক্যামেরা বার করে পটাপট ছবি তুলতে শুরু করেছে। দেওয়ালে ঝোলানো ঢাল তলোয়ার ফোকাস করতে করতে বলল, "তলোয়ারের কী সাইজ, বাপ্‌স। এক ঘায়েই তিনটে মানুষ ঘ্যাচাং। এরকম তলোয়ার আগেও কোথায় যেন দেখেছি।"

মিতিন চোখ ঘোরাল, "কোথায় বলো তো?"

"কোনও মিউজিয়ামটিউজিয়ামে বোধ হয়। মনে পড়ছে না।"

টুপুর বলল, "শিরস্ত্রাণটাও কী জমকালো দেখেছ? ওটা মাথায় চাপিয়ে মানুষ যে কী করে যুদ্ধ করত!"

"তখনকার লোকজনের তাকত অনেক বেশি ছিল। খেতও বেশি। জানিস, রাজা রামমোহনের কী আহার ছিল? মাংস খেলে আস্ত পাঁঠা। দিনে বারো সের দুধ। তাও তো উনি সোলজার ছিলেন না।"

মিতিন ফুট কাটল, "সৈনিক হলে হয়তো আস্ত হাতিই খেতেন।"

ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না পার্থ, ঘরের সমস্ত সুইচ অন করছে। খোলা জানলা দিয়ে আলো আসছিল ভালই, নতুন বাল্‌ব টিউবের দ্যুতিতে ঘর যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘড়ি দেখছে টুপুর,

পার্থর সন্দিগ্ধ চোখ বাল্ব টিউবে স্থির। এক মিনিট...দু' মিনিট...তিন মিনিট...!

মিতিন বলে উঠল, "মিছিমিছি কেন কারেন্ট পোড়াচ্ছ? দিনের বেলা কিস্যু হবে না।"

সত্যিই কিছু হল না। হতাশ পার্থ সুইচ অফ করে ফের ক্যামেরায় মনোযোগী, ফোকাস করছে হরিণের শিং-এ, জোনাথনের বেডরুমের ভেজানো দরজা খুলে গেল। পরদা সরিয়ে ঈষৎ নড়বড়ে পায়ে ঘরে ঢুকলেন জোনাথন।

একটু যেন অবসন্ন দেখাচ্ছে জোনাথনকে। মুখে দু'-তিন দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, চুল উসকোখুসকো, দৃষ্টিতে একটা বিহ্বল ভাব। গলাখাঁকারি দিয়ে জোনাথন বললেন, "তোমরা সকালেই এসে গেলে?"

পার্থর সঙ্গে জোনাথনের আলাপ করিয়ে দিয়ে মিতিন নরম করে বলল, "আমার আর তর সইছিল না মিস্টার মাইকেল। কাল রাত থেকে আপনার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।"

"লাভ নেই। হোলি স্পিরিট আমায় ডাকছেন! যাওয়ার সময় বুঝি হয়ে এল।"

"এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আমরা তো আছি। সবাই মিলে আপনাকে রক্ষা করব।"

জোনাথন খুব একটা আশ্বস্ত হলেন না। সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন, "কাল কী হয়েছে শুনেছ তো?"

"মিসেস জোন্‌স বললেন। ক'টা নাগাদ ঘটেছে?"

"সময় তো সঠিক বলতে পারব না। ওই ধরো রাত দু'টো-তিনটে হবে। মোটামুটি ওই সময়ে আমি একবার বাথরুমে যাই। কাল আমায় দু'খানা স্লিপিং পিল দিয়েছিল মির্ণা, মাথাটা কেমন টলমল করছিল। ঘর থেকে বেরোতেই চক্কর মতো একটা এসে গেল।

সামলাতে গিয়ে ক্রকারি কেসটা ধরেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে কাচ খুলে পড়ে গেল। কপাল ভাল, পায়ের ওপর পড়েনি।”

“কী করলেন তখন? বারান্দার আলো জ্বাললেন? ”

“বারান্দার আলো তো জ্বলছিলই। রাতে এখন ওটা আর নেবাচ্ছি না। কোনও রকমে কাচের টুকরো বাঁচিয়ে, বাথরুম সেরে ঘরে চলে এলাম। তারপর থেকে আর চোখ বুজতে পারিনি।”

পার্থ বলল, “এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন? আপনার ধাক্কাতেও তো কাচ ভাঙতে পারে।”

“ইমপসিবল। ওটা অত্যন্ত মজবুত জিনিস। বিখ্যাত ফার্নিচার কাপ ল্যাজারাসের মাল। কতবার টানাহেঁচড়া হয়েছে, এদিক থেকে ওদিক সরেছে, ধাক্কাটাক্কাও কম খায়নি...। তা ছাড়া শুধু ক্রকারি কেসই নয়, মাত্র তিন রাতে কত কী যে গেল!”

“এই সেন্টার টেবিলটাও তো গেছে।”

“ওটা তো বিচ্ছিরিভাবে ভাঙল। মোটা মোমবাতি জ্বেলে মির্না ওটার ওপর বসানোর চেষ্টা করছিল, খস করে ঝরে গেল। চারপাশে কাচ, মধ্যিখানটা ফাঁকা, কী ভয়ংকর বলো!”

“কাল বন্ধ ঘর থেকে কোনও আওয়াজ পেয়েছিলেন?”

“না। হোলি স্পিরিট বোধ হয় কাল সারারাত বাইরেই ছিলেন। ও ঘরে তো তিনি ক্রোধ দেখিয়েছেন পরশু।”

“আপনার ঘরের দেওয়াল-আলমারিও তো পরশু রাতেই ভেঙেছিল। তাই না?”

“রাত্তিরে নয়, সন্ধেবেলা।” জোনাথনের চোখ বিস্ফারিত হল। যেন কল্পচোখে সন্ধেটাকে দেখতে পাচ্ছেন এমনভাবে বললেন, “গরমে গায়ে র‍্যাশ বেরোচ্ছে, তাই মলম বার করতে গেছিলাম। যেই না পাল্লা ধরে টেনেছি, অমনি দুটো ফ্রেমেরই কাচ খসে গেল। একশো চল্লিশ বছরের পুরনো আলমারির কাচ কি করে

আপনাআপনি খসতে পারে?”

“তখন বাড়িতে আপনারা কে কে ছিলেন?”

“সবাই। আমি মির্না ডিক উৎপল।”

“মিসেস জোন্‌স?”

“উনি তখন চলে গেছেন।”

“এ ঘরের বাল্‌ব টিউব ফেটেছিল কখন?”

“সে তো সন্ধে হতে-না-হতেই। বিকেলে আমার হাঁটতে বেরোনোর অভ্যেস আছে। টুকটুক করে রয়েড স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড ধরে, পার্ক স্ট্রিটের মোড় পেরিয়ে, থিয়েটার রোড হয়ে, ম্যাকফারসান স্কোয়ার পর্যন্ত যাই। পাক্কা এক মাইল। ওখানে একটু জিরিয়ে সন্ধের মুখে মুখে ফিরে আসি। আমি এলে তবে মিসেস জোন্‌স বাড়ি যান। পরশু বেড়িয়ে ফিরেছি, মিসেস জোন্‌স যাব যাব করছেন, তখনই গেল।”

“তখন বাড়িতে আর কে ছিলেন?”

“উৎপল ছিল কি?” জোনাথান একটু চিন্তা করলেন, “হ্যাঁ, উৎপল ছিল। ডিকও ছিল। ডিক তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দৌড়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকতে ছুটল। কিন্তু রোববার কি মিস্ত্রি পাওয়া যায়?” জোনাথান অনেকক্ষণ পর মৃদু হাসলেন, “জীবনে এই প্রথম দেখলাম ডিক বেশ নার্ভাস হয়েছে। এবং বিশ্বাস করছে হোলি স্পিরিটের কী শক্তি। কাল ইলেকট্রিক লাইন চেক করানোর পর ও তো একেবারে নিঃসন্দেহ।”

“হোলি স্পিরিটে ফেথ এলেও ডিক কিন্তু বদলায়নি মিস্টার মাইকেল।” ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে মিসেস জোন্‌স ঢুকলেন। গোমড়া মুখে বললেন, “হি ইজ স্টিল দা সেম অ্যারোগেন্ট গাই। ড্যাডির জন্য সামান্যতম ফিলিং নেই। নইলে কোনও ছেলে বাবাকে বলতে পারে, এর পর বাড়িতে একা মরে পড়ে থাকবে... সকালবেলা

কোনদিন এসে আমি তোমার লাশ আবিষ্কার করব... তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা তোমার ছেলেমেয়ের কম্মো নয়!”

পার্থ দাঁত কিড়মিড় করল, “মহা পাজি ছেলে তো! ওকে একটু ডাকা যায় না? কড়কে দিয়ে যেতাম।”

মিতিন চোখের ইশারায় চুপ করতে বলল পার্থকে। মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে মিসেস জোন্‌সকে বলল, “আপনি তো অনেক দিন আছেন, আপনি একটু বকতে পারেন না?”

“ও কারুর কথাই কানে তোলে না।” মিসেস জোন্‌স চায়ের কাপ ডিশ তুলে দিলেন পার্থ মিতিনের হাতে। বেশ কিছু মুচমুচে স্যান্ডুইচও বানিয়ে এনেছেন টোস্টারে। ট্রলি সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “নাও, গরম গরম খেয়ে নাও।”

“এত কেন? আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি।”

“খাবে না? তোমাদের জন্য করলাম?”

পার্থ বলল, “মন খারাপ করবেন না। আমি একটা খাচ্ছি।”

একটা নয়, পর পর তিনখানা স্যান্ডুইচ নিমেষে সাবাড়। মিতিন চায়েই সন্তুষ্ট। টুপুর শরবত নিল এক গ্লাস।

কাপ ট্রলিতে নামিয়ে রেখে মিতিন বলল, “আচ্ছা, ডিকের সঙ্গে মির্নার রিলেশান কেমন?”

“খুব খারাপ। মির্না তো ডিককে সহ্যই করতে পারে না। উৎপলের সঙ্গে তাও গল্পটল্প করে, মির্নার সঙ্গে কথাই হয় না।”

“তা উৎপলবাবু তো ডিককে একটু বোঝাতে পারেন।”

জোনাথন বিষণ্নভাবে ঘাড় নাড়লেন, “ডিকের টাইপটাই আলাদা। ছোট থেকেই। মতের অমিল হল, তো অমনি ফাটাফাটি। কালই তো তোমার বাড়ি থেকে ফিরে উৎপল বলছিল, তুমি নাকি সাসপেক্ট করছ সুরজমল কোনও নোংরা খেলা খেললেও খেলতে পারে। আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে একমত নই। তাও আমি চুপচাপ শুনলাম,

কোনও কমেন্ট করিনি। ভাবলাম ও যদি ইনভেস্টিগেট করাতে চায় তো করাক, ওর মনের অবিশ্বাসটা তো ঘুচবে। ডিক তো শুনেই ফায়ার। কী চোটপাটটাই না করল উৎপলের ওপর! তুমি অত্যন্ত মীন, প্রোমোটার মাত্রই খারাপ হয় না, কোনও লোকের টাকা আছে দেখলেই তোমার চোখ টাটায়, এরকম অজস্র আকথা-কুকথা। উৎপলকে গালাগাল করতে করতেই নাইট ডিউটিতে বেরিয়ে গেল।"

মিতিনের দৃষ্টি জোনাথনে স্থির হল, "ডিকের কথা থাক মিস্টার মাইকেল। আপনারও কি সত্যিই সন্দেহ হয় না, এসব কীর্তিকলাপের পেছনে সুরজমল থাকলেও থাকতে পারে?"

"সন্দেহের তো কারণ থাকবে?"

"লোকটা সকালে এল, সন্ধে থেকে আপনার কাচ ভাঙতে শুরু করল। আগের বারও লোকটা ফোন করার পরেই আপনার ফার্নিচার রুমে হট্টগোল শুরু হল। যোগাযোগগুলো কি নেহাতই কাকতালীয়?"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

"সুরজমল সম্পর্কে আপনার কী অ্যাসেসমেন্ট?"

"মহা ঘুঘু। এই শনিবারই তো এসে আমায় একটা প্যাঁচ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সক্কালবেলা, আমি তখন গোলাপগাছে জল দিচ্ছি, কোথ্থেকে এক পাংক চুল সাধু নিয়ে হাজির। দু'জনেরই কপালে ঘটা করে রক্তচন্দনের টিকা। এসে কী বিনয়! গদগদ সুরে বলছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ মিস্টার মাইকেল। আপনি যে শেষ পর্যন্ত বাড়িটা আমায় সেল করতে রাজি হয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দিনটাও ভাল বেছেছেন, রাতে মায়ের পুজো। চলুন, সইসাবুদ সেরে আজই অ্যাডভান্স দিয়ে দিই। আমি তো তাজ্জব! আমি কবে বললাম বাড়ি বেচব? কথাটা বলতেই সুরজমল অ্যাক্টিং

শুরু করে দিল। ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, আমিই নাকি ওকে ফোন করে ডেকেছি, এখন পিছিয়ে যাওয়াটা আমার অনৈতিক কাজ হবে...! শুনে তদ্দণ্ডেই আমি বললাম, ঝুট মত কহো। ভাগো হিঁয়াসে।"

"সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল?"

"বেজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল একটুক্ষণ। তারপর এক গ্লাস জল চাইল। ওইটুকু ভদ্রতা আমি করেছি।"

পার্থ চোখ সরু করে প্রশ্ন করল, "জল আনতে আপনিই নিশ্চয়ই ভেতরে গিয়েছিলেন?"

"তো?" জোনাথন হোঁচট খেলেন, "কী হয়েছে তাতে?"

"ভাবছি ওই গ্যাপটাতে সুরজমল না কিছু করে দিয়ে থাকে।"

"অসম্ভব। আমি মাত্র মিনিট তিনেকের জন্য ভেতরে গিয়েছিলাম।"

"তিন মিনিট কম সময় নয়।" পার্থ মাথা দোলাল, "মাত্র দেড় সেকেন্ডেরও কম সময়ে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসে। ...আচ্ছা, ওই গুরুদেবটির হাবভাব কেমন ছিল? মানে হোয়াট হি ওয়াজ ডুয়িং হিয়ার?"

"আমার গোলাপগাছগুলো দেখছিলেন মন দিয়ে।"

"কোনও ফুল ছিঁড়েছিলেন কি? কারণ ওঁরা ফুল দিয়েই অনেক সময়ে...।"

"তুমি থামবে?" পার্থকে হালকা ধমক দিল মিতিন। জোনাথনকে বলল, "আপনার হোলি স্পিরিটের সমস্যা তো মিটতে চলেছে। আমি উৎপলবাবুকে বলেছি এক্সট্রা ফার্নিচার বের করে দেওয়ার জন্য। উনি রাজিও হয়েছেন।"

"জানি। সম্ভবত আজ দুপুরেই উৎপল সরিয়ে দেবে।"

মিসেস জোন্স চলে গিয়েছিলেন, মাঝে ফিরে এসে কথাবার্তা শুনছিলেন। খুশি খুশি মুখে বললেন, "থ্যাংক গড। উৎপলের তা

হলে সুমতি হল! সুখবরটা এতক্ষণ জানাননি কেন মিস্টার মাইকেল?” মিসেস জোন্‌স বুকে ক্রশ আঁকলেন, “প্রভু যিশুর কৃপায় এবার আশা করি সব মিটে যাবে।”

অবসাদ কাটিয়ে ওঠা জোনাথন আবার যেন একটু ঝিমিয়েছেন। নিচু গলায় বললেন, “কিন্তু ডিক তো তা মানতে চাইছে না। এই নিয়েই তো কাল মির্না উৎপলের সঙ্গে ওর বেধে গেল।”

“কী বলছিল ডিক?”

“মির্নাদের অ্যাকিউজ করছিল। বলছিল তোমরাই ঘরটায় উটকো জিনিস ঢুকিয়ে হোলি স্পিরিটকে ডিসটার্ব করে দিয়েছ। এখন ওই জঞ্জাল বার করলেই বুঝি প্রবলেম মিটবে? উনি আর কখনও শান্ত হবেন না। এ বাড়ি পারমানেন্টলি হন্টেড হাউস হয়ে গেল।”

“ডিকের কথা শুনেই বুঝি আপনি বেশি আপসেট হয়ে পড়েছেন?”

“বিচলিত হয়েছি তো বটেই। কাল ওই ক্রকারি কেস ভাঙার পর থেকে শুধুই ভাবছি। ভেবেই চলেছি। একবার মনে হচ্ছে, যা হবে হোক, সবই আমি তাঁর হাতে ছেড়ে দিলাম। আবার ভাবছি, এই দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি আর কোনও উপায় নেই? তিনি কি আর কোনও ভাবেই ঠাণ্ডা হবেন না? ”

“চিন্তা করবেন না। দেখুন না কী হয়।” মিতিন উঠে দাঁড়াল, “চলুন, ভাঙচুরগুলো একবার প্রত্যক্ষ করে আসি।”

পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই দেখা শেষ। ফার্নিচাররুমটা খুলিয়েও মিতিন দেখে নিল এক বার। জোনাথন গেলেনই না, মিসেস জোন্‌সও দাঁড়িয়ে রইলেন দরজায়। দুটো চেয়ার গড়াগড়ি খাচ্ছিল মেঝেয়, সেগুলোকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল মিতিন। পার্থ পটাপট কয়েকটা ছবি তুলে নিল ঘরের। পেন্টিংটার, ফার্নিচারের

কড়িবরগার। মিসেস জোন্‌স হাঁ হাঁ করছিলেন, পার্থ শুনলই না।

ঘর থেকে বেরিয়ে মিতিন বলল, "আজ তা হলে আসি?"

মিসেস জোন্‌স বললেন, "ডিকের ঘরে যাবে? ডিককে ডাকব?"

"থাক। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। বরং চলুন, আপনি আমাদের একটু এগিয়ে দেবেন।"

হাঁটতে হাঁটতে মিসেস জোন্‌সকে তাঁর ঘরগেরস্থালির কথা জিজ্ঞেস করছিল মিতিন। বড় দুঃখের জীবন বেচারির। মিস্টার জোন্‌স ছবি বাঁধাইয়ের কাজ করতেন, বাস থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে জোর চোট পেয়েছিলেন, প্রায় বছর তিনেক তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী। একটিমাত্র ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে, বাবা-মার খবর রাখে না, একা মিসেস জোন্‌সকেই সংসারের ঘানি টানতে হয়। এ বাড়ির লোকজনের ওপর মিসেস জোন্‌সের অসীম মায়া।

টুপুরের বেশ কষ্ট হচ্ছিল মিসেস জোন্‌সের জন্য। সত্যি, কত মানুষের কত যন্ত্রণা।

গলির মুখ অবধি এসে ফিরে গেলেন মিসেস জোন্‌স। ক্যামেরা টুপুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি প্রেসে দৌড়ল পার্থ। ভূতের বাড়ি, কাচ ভাঙা, স্যান্ডুইচ, সব মিলিয়ে আজকের অভিযান নিয়ে সে মোটামুটি সন্তুষ্ট। শুধু একটাই আফশোস, উৎপলদের জিমনাসিয়ামটা দেখা হল না। নাদিয়া এখনও ঝাঁপ খোলেনি।

অলস পায়ে হাঁটছিল মিতিন। অপ্রশস্ত ফুটপাথ ধরে।

পাশাপাশি তাল মিলিয়ে চলতে চলতে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী মনে হয় মিতিনমাসি? চেয়ার টেবিল বার করে দিলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে?"

"মোটেই না। কাচ ভাঙার নেচার বলে দিচ্ছে সমস্যাটা সরল নয়। ভূত বাবাজি ক্রমেই মরিয়া হচ্ছেন।"

"মানে?"

"জিনিস বেরোনোর পরেও কাচ ভাঙবে। আর আমি সেটাই চাই।"

টুপুরের বুক ধুক ধুক করে উঠল। কেস মনে হয় জমছে!

বিকেলে লালবাজারে পৌঁছে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল টুপুরদের। কাল ভরদুপুরে শ্যামবাজারে একটা রোমহর্ষক ব্যাংক-ডাকাতি হয়েছে, তাই নিয়ে প্রশ্নবাণ হানতে ডিসি ডিডির ঘরে হাজির হয়েছে সাংবাদিককুল, তাঁদের সামাল দিতে গোয়েন্দা-প্রধান এখন মহা ব্যস্ত।

সাংবাদিকরা কাগজ কলম গুটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল মিতিনদের। ঢুকে টুপুর থ। পুলিশের অফিস বলে মনেই হয় না! ব্রিটিশ আমলের কী বিশাল ঘর। কী চমৎকার সাজানোগোছানো। ভেলভেট মোড়া কাচ বসানো প্রকাণ্ড টেবিলে খানচারেক রংবেরঙের টেলিফোন। পাশে আর একটা টেবিলে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্সমেশিন। ঘিয়েরং দেওয়াল ঝকঝক করছে। শ্যাওলারং ভারী ভারী পরদা ঝুলছে জানলায় জানলায়। দেওয়ালে অজস্র ফোটোগ্রাফ এক লাইনে সাজানো। সম্ভবত পূর্বতন অফিসারদের ছবি। বিদেশি, এদেশি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষটির মেজাজই যেন আলাদা।

মিনি সিংহাসনের মতো ঘুরনচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন অনিশ্চয়। মিতিনদের দেখেই গাল এঁটো করা হাসি। বললেন, "কী সৌভাগ্য! আজ আমার ঘরে দেখি একের পর এক ভি আই পি!"

"ভুল বললেন।" মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "প্রথমত, আমি নন্-ভি আই পি। দ্বিতীয়ত, জার্নালিস্টদেরও আপনি মোটেও কেউকেটা ভাবেন না।"

টেবিলের পেপারওয়েটটা ঘোরালেন অনিশ্চয়, "আপনি সবসময়ে পয়েন্ট সাজিয়ে কথা বলেন কেন বলুন তো? প্রথমত...? দ্বিতীয়ত...?"

"এ তো আপনার কাছ থেকেই শেখা দাদা।"

শুনে বেশ খুশি হলেন অনিশ্চয়। প্রসন্ন মুখে বললেন, "বলুন কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি? এসিটা আর একটু বাড়িয়ে দেব?"

"না, না, ঠিক আছে।"

তবু শুনলেন না অনিশ্চয়। বেয়ারাকে ডেকে ঘরের ঠাণ্ডা আরও জোরদার করালেন। টুপুরের সঙ্গে যেচে সেরে নিলেন আলাপটা। তারপর কোল্ডড্রিংকসের অর্ডার দিয়ে গুছিয়ে বসেছেন, "এবার শুনি কী হেতু আগমন?"

"যেজন্য আসি আপনার কাছে। কিছু ইনফরমেশান চাই।"

"কী ব্যাপারে?"

"আপনাদের লেবুতলার কেসটা সল্‌ভ হয়েছে? সেই যে-বাড়ি ভেঙে পড়ল?"

"একটা ফাউলপ্লে যে আছে, এটা প্রমাণিত হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্টও বলছে, একটা এক্সপ্লোশান হয়েছিল। আর তার এফেক্টেই বাড়িটা...। আমরা অনেক ক্লু পেয়ে গেছি। আর দু'টো দিন, দুষ্টুটাকে ঠিক পাকড়ে ফেলব।"

কোনও পুলিশ অফিসার ক্রিমিনালকে 'দুষ্টু' বলছে, এই প্রথম শুনল টুপুর। মিতিনমাসি ঠিকই বলে, অনিশ্চয় মজুমদার মানুষটা ভারী মজাদার। নিপাট গোবেচারা চেহারা, একটা জাঁদরেলি পুলিশি গোঁফ পর্যন্ত নেই। মাথাজোড়া টাক, ফোলা ফোলা গাল অনিশ্চয় মজুমদারকে তার বাবার মতন কলেজের প্রফেসর হলেই যেন মানাত বেশি। ভদ্রলোকের একটা মুদ্রাদোষও আছে। হাতের আঙুলগুলো নড়াচড়া করছেন সর্বক্ষণ। পেন তুলে নামিয়ে রাখছেন, ফাইল খুলে বন্ধ করছেন, কিছু না হলে টরেটক্কা বাজাচ্ছেন টেবিলে।

মিতিনের অবশ্য ওসব নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, "যদি বলতে আপত্তি না থাকে, জানতে পারি কাকে সাসপেক্ট করছেন? কোনও প্রোমোটার?"

"অবশ্যই।...কিন্তু আপনার এ-ব্যাপারে কৌতূহল কেন? কেসটায় নেমেছেন নাকি?" টকাটক ডটপেন খোলা-বন্ধ করতে করতে অনিশ্চয় বললেন, "আপনি যেভাবে খুশি ডিটেকশান করুন, রাজনাথ সিং আমার মুঠো থেকে ছাড়া পাবে না।"

"কে রাজনাথ সিং?"

"সিং প্রপারটিজের মালিক। সুলতানগঞ্জের লোক। বিহারের নামকরা মাফিয়া। এখন কলকাতায় এসেও ছড়ি ঘোরাচ্ছে।"

"সুরজমল অগ্নিদেব কোনওভাবে কেসটায় জড়িত নেই তো? রিগাল প্রপারটিজের মালিক?"

"না, না। লেবুতলার কেসে সুরজমল পিকচারে নেই। অন্তত আমার যা ফাইন্ডিং।" বলেই অনিশ্চয়ের ভুরুতে সেকেন্ড ব্র্যাকেট, "আপনি কি সুরজমলকে সাসপেক্ট করছেন?"

"আমি কাউকে সন্দেহ করছি না দাদা। আমি ওই কেসেই নেই। সম্প্রতি অন্য একটা ব্যাপারে সুরজমলের সঙ্গে আমার মুখোমুখি হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার আগে লোকটার

সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম আর কী।"

"তাই বলুন।" অনিশ্চয় ডটপেন ছেড়ে আবার পেপারওয়েট ধরলেন, "কী জানতে চান সূরজমল সম্পর্কে?"

"লোক কেমন?"

"প্রোমোটাররা ইউজুয়ালি যেমন হয়। ধূর্ত, কেজো এবং প্রয়োজন হলে রুথলেস। টাইপ মূলত রাজনাথ সিং-এরই, তবে পাক্কা সাহেব। স্যুট টাই পরে, ক্লাবটাবে যায়, তুখোড় ইংরিজি বলে। আবার গুরুদেবও রয়েছে।"

টুপুর বলে উঠল, "মুক্তকেশানন্দ?"

"ইয়েস মিস ওয়াটসন। মুক্তকেশানন্দই সুরজমলের মূল মন্ত্রণাদাতা। লোকটার মাথায় জিলিপির প্যাঁচ। নিউ আলিপুরে একটা জমি হাতাতে গিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে সুরজমল প্রায় ফেঁসে যাচ্ছিল, মুক্তকেশানন্দই তাকে বাঁচার রাস্তা বাতলে দেয়। লোকটা আদতে ছিল একটা ছোট্ট চায়ের দোকানের মালিক। হঠাৎ রাতারাতি চায়ের দোকানের পাশে চালা বেঁধে স্বপ্নে পাওয়া কালীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, এবং তখন থেকেই সে এক মহান কালীভক্ত। উদ্দেশ্য অবশ্য একটাই ছিল। অন্যের জমি গ্রাস। ওই মন্দির এখন রমরমিয়ে চলছে, প্রতি শনি মঙ্গলবার গাড়ির ভিড় দেখলে তাক লেগে যাবে। ইদানীং প্রতি অমাবস্যায় আমাদের তো পুলিশ পোস্টিং করতে হয়। লোকটার একটাই প্লাস পয়েন্ট। নিজেরও মাথা ঠাণ্ডা, ভক্তদেরও মাথা গরম করতে দেয় না। সূরজমল তো ওর চ্যালা বনার পর থেকে গুণ্ডাবাজি অনেক কমিয়ে দিয়েছে।"

মিতিন বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দেখা হলেই লোকটা তেড়ে আসবে না।"

"আপনাকে চোখ রাঙায়, সাধ্য কার? আমি আছি না!" অনিশ্চয়

সোজা হয়ে বসলেন, "তা আপনার কেসটা কী?"

"খিচুড়ি কেস।"

"মানে?"

"এক দিক দিয়ে অগ্নিদেব উঁকি দিচ্ছেন ঠিকই, তবে আর এক দিকে আছেন এক পবিত্র আত্মা।"

"কীরকম? কীরকম?"

সংক্ষেপে জোনাথন মাইকেলের বাড়ির ঘটনাবলি অনিশ্চয়কে শোনাল মিতিন। শুনে হাস্যমুখ অনিশ্চয়কে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল। বলে দিলেন যেন সামান্যতম প্রয়োজনে মিতিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে মিতিন বলল, "কী রে, টায়ার্ড লাগছে?"

আজ টুপুরের শ্রান্ত হওয়ারই কথা। জোনাথন মাইকেলের বাড়ি থেকে ফিরেছিল প্রায় বারোটায়। স্নান খাওয়ার পর কতটুকুই বা জিরোনোর অবকাশ পেয়েছে, তিনটে বাজতে-না-বাজতেই তো আবার বেরিয়ে পড়া। তবু মিতিনমাসির সঙ্গে থাকা মানে ক্লান্তি ফ্লান্তি সব ভ্যানিশ।

টুপুর বলল, "কেন? আর কোথাও যাবে?"

"ভাবছি।"

"কোথায়? উৎপলবাবুদের বাড়ি?"

"আজ ওখানে গিয়ে লাভ নেই।"

"বা রে, দুপুরে উৎপলবাবু ফোন করে বললেন চেয়ারটেয়ার সব সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর কী হয়, বিকেল সন্ধেয় সরেজমিন করে এলে হত না?"

"তার মানে তুই মাইকেলের বাড়ি যাওয়ার কথা বলছিস?"

"হ্যাঁ।... উৎপলবাবুদের বাড়ির কথাও বলছি। তুমিই তো

বলছিলে ওখানেও এক বার যাওয়া দরকার!”

“কিন্তু উৎপলরা তো এখন জিমনাশিয়ামে।”

“তবু বাড়িতে তো কেউ-না-কেউ আছে। অন্তত কুকুরটার জন্যে।”

“বলা যায় না। অনেকে তো কুকুরকে একা-থাকা অভ্যেসও করিয়ে দেয়।”

“তবু চান্স নিতে দোষ কী! যদি কেউ থাকে! ফাঁকায় ফাঁকায় উৎপলবাবুদের বাড়িটা ঘুরে নেওয়া যাবে।”

“দুটো মাইনাস পয়েন্ট আছে। প্রথমত, যে থাকবে সে অচেনা লোককে ঢুকতে দেবে, এ সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, যে-কারণে তুই যেতে চাইছিস, অর্থাৎ উৎপল-মির্না সম্পর্কে নিশ্চয়ই সামান্য হলেও তোর সংশয় জেগেছে, সেই উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ বারবার না জানিয়ে গেলে ওরা আমাদের মনোভাব টের পেয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ওদের বলেকয়েই না হয় একসময়ে...”

“যা ভাল বোঝো। কিন্তু যাবেটা কোথায় এখন?”

“এদিকের কাজগুলো সব মিটিয়ে ফেলি। সুরজমলের বুড়িটাই ছুঁয়ে যাই। রোজ রোজ তো আর কম্পিউটার ক্লাস ডুব মারতে পারব না।” কাছেই বি-বা-দি বাগের মিনিবাস স্ট্যান্ড। কথা বলতে বলতে দু'জনে এসে দাঁড়িয়েছে যাত্রীদের লাইনে। সবে ভেঙেছে অফিসপাড়া, জনস্রোত গাঢ় ক্রমশ। শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মাথায়। লালদিঘির টলটলে জলে নীল আকাশের ছায়া। আলো আর ছায়ায় মাখামাখি হয়ে ডালহাউসি পাড়া এখন ভারী মায়াবী। ভিড় আর কলরোল সত্ত্বেও।

মিতিন কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল। বলল, “আজ সময় নেই। থাকলে আমিও তোকে কলকাতার একটা দুটো অ্যান্টিক পিস দেখিয়ে দিতে পারতাম।”

টুপুর বলল, "কী গো?"

"এখান থেকে একশো গজ দূরে ব্রিটিশদের তৈরি প্রথম কেল্লাটার নিদর্শন আছে। জিপিও'-র সামনের ফুটপাথেই লোহার পাত আছে একটা। ওটাই ছিল কেল্লার সীমানা। সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্টটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপর ধর, এখান থেকে হাইকোর্ট যেতে হলে পথে পড়বে সেন্ট জোন্‌স চার্চ......

"জানি। ওখানেই তো আছে জোব চার্নকের সমাধি।"

"ভেতরে গিয়ে কখনও দেখেছিস সমাধিটা?"

"নাহ্‌।"

"খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। জোব চার্নকের কবরের ওপর একটা সমাধিসৌধ আছে। তৈরি করে দিয়েছিলেন জোব চার্নকের বড় জামাই চার্লস আয়ার। জোব চার্নকের তিন মেয়ে ছিল। মেরি, এলিজাবেথ, আর ক্যাথরিন। তিন মেয়েই মারা গিয়েছিল কলকাতায়। তার মধ্যে বড় আর ছোটকে কবর দেওয়া হয়েছিল বাবার পাশে। শুধু তাই নয়, ওই গির্জারই এক কোনায় পড়ে আছে হলওয়েল মনুমেন্ট। সিরাজদ্দৌলা নাকি একরাশ সাহেব-মেমকে অন্ধকূপে পুরে মেরে ফেলেছিলেন, এমন একটা অপবাদ দিয়ে হলওয়েল তৈরি করেছিলেন ওই মনুমেন্ট। সুভাষ বোসের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশরা মনুমেন্টটা সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এখনও ওই মনুমেন্টের গায়ে সাহেবদের লেখা মিথ্যেগুলো জ্বলজ্বল করছে।"

আরও বোধ হয় কিছু বলার ইচ্ছে ছিল মিতিনের, তার আগেই পর পর দুটো বাস এসে গেছে। প্রথমটায় জায়গা হল না, পরেরটায় জানলার ধারে সিট পেয়ে গেল টুপুর। এবং যাত্রীঠাসা বাস মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে পৌঁছে গেছে ক্যামাক স্ট্রিটের মুখে।

রিগাল প্রপার্টিজের অফিস খুঁজে পেতে সময় লাগল না বিশেষ। শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-এর কাছেই একটা বাড়ির তিনতলায়। ছোট্ট অফিস, কিন্তু ছিমছাম। ফিটফাট। সন্ধে নেমে গেছে, তবু অফিসে এখনও অনেক কর্মী আছে। কেউ বা করছে ড্রয়িং, কেউ বা হিসেবপত্র। সুরজমল অগ্নিদেবকেও পাওয়া গেল। ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়েছিল মিতিন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আহ্বান।

সুরজমলের বয়স খুব বেশি নয়, বছর চল্লিশ। সাফারি স্যুট পরে আছে, চোখে রিমলেস চশমা, টেবিলে গড়াগড়ি খাচ্ছে মোবাইল। দাঁতে পাইপ চেপে আছে সুরজমল, মিঠে তামাকের গন্ধে ভরে আছে কাচঘেরা চেম্বারটা। সুরজমল ছাড়াও আর একজন আছেন ঘরে। বয়স্ক মানুষ। দু'হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছিলেন সুরজমলকে, চোখ অর্ধেক বুজে মাথা দোলাচ্ছিল সুরজমল। মাথার পিছনেই পাশাপাশি দুটো ছবি। মা কালী, আর মুক্তকেশানন্দ।

মিতিন টুপুরকে সামনের চেয়ারে বসতে বলল সুরজমল। স্মিত মুখে বলল, "ইয়েস ম্যাম? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?"

মিতিন ভদ্রভাবে বলল, "আপনার সঙ্গে কিছু পারসোনাল কথা ছিল।"

"প্লিজ, বলুন।"

"আমি একটু প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই।"

সুরজমল কী বুঝল কে জানে, এক ঝলক দেখল মিতিনকে। তারপর বয়স্ক মানুষটিকে বলল, "সো মিস্টার সানিয়াল, উই উইল বি মিটিং টুমরো। লেট মি স্টাডি ইওর প্রবলেম, অ্যান্ড দেন উই উইল ডিসাইড ইট। ও কে?"

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন।

মিতিনের চোখে চোখ রেখে সুরজমল বলল, "ইয়েস....?"

কোনও ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি মিতিন বলল, "আমি মিস্টার

জোনাথন মাইকেলের কাছ থেকে আসছি। নামটা নিশ্চয়ই আপনার অপরিচিত নয়?”

“হ্যাঁ, আমি চিনি।” সুরজমলেরও মুখের পেশিতে কোনও ভাঙচুর হল না, “রেসপেক্টেবল জেন্টলম্যান, বাট উইথ ফেডিং মেমারি।”

“আপনার সম্পর্কে মিস্টার মাইকেলের কিছু অভিযোগ আছে। বাড়ি ভাঙার প্রস্তাবে তিনি সম্মত নন জেনেও আপনি অন্যায় ভাবে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন।”

“উনি বলেছেন আমি ওঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি?”

“ব্যবহারটা বড় কথা নয় মিস্টার অগ্নিদেব। আপনি তাঁকে মিথ্যে করে বলেছেন তিনি আপনাকে বাড়ি বেচতে সম্মত হয়েছেন।”

সুরজমল দু’-এক মুহূর্ত থেমে থেকে শান্তভাবেই বলল, “দেখুন ম্যাডাম, আপনার কার্ড বলছে আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না। আপনার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণা নেই।। সবচেয়ে বড় কথা, আমি আপনাকে আদৌ কোনও কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। তবু একজন ভদ্রলোক হিসেবে আপনাকে বলছি, আমি মিথ্যে বলিনি। আমার কাছে সত্যিই একটা ফোন এসেছিল। সেই ফোনে স্পষ্টভাবেই মিস্টার মাইকেল জানান তিনি বাড়ি বিক্রি করতে প্রস্তুত। আমি যেন শনিবারই ডিডের কাগজপত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।”

“আমি যদি বলি আপনি কোনও ফোন পাননি? বানিয়ে বলছেন?”

“বলতে পারেন। আমার কাছে তো কোনও প্রমাণ নেই। আমি তো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার নই যে প্রতিটি কল টেপ করে রাখব। তা ছাড়া আপনার কাছে প্রমাণ দেওয়ার আমার কোনও বাধ্যবাধকতাও নেই। আমি যা বলছি, তা অফ মাই ওউন। আপনার

ব্যাগে নিশ্চয়ই টেপরেকর্ডার আছে, আপনি স্বচ্ছন্দে টেপ করে রাখতে পারেন।"

টুপুর দেখল মিতিনমাসির মুখ লাল হয়ে গেছে। মিতিনমাসির হয়ে সে-ই জিজ্ঞেস করল, "আপনি কবে পেয়েছিলেন ফোনটা?"

"গত বৃহস্পতিবার। দুপুরে। এই অফিসেই।"

"আপনি শিওর, ওটা মিস্টার মাইকেলের গলা ছিল?"

"আমি স্বরবিশেষজ্ঞ নই। তবে গলাটা ছিল বয়স্ক মানুষের। সামান্য কাঁপা কাঁপা। তিনি জোনাথন মাইকেল বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন।"

মিতিন নিজেকে সামলে নিয়েছে। সহজ গলায় বলল, "সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মিস্টার মাইকেল রাজি নন দেখে আপনি তাঁর ওপর নানারকম উৎপাত শুরু করে দিলেন।"

"আমি? কী উৎপাত?"

"আপনি জানেন না?"

"অবশ্যই না।"

"ভূতের ভয় তৈরি করছেন না ও বাড়িতে?"

সুরজমলের ভুরুতে ভাঁজ পড়েও মিলিয়ে গেল। মৃদু হেসে বলল, "শুনুন ম্যাডাম, কাউকে বাড়িছাড়া করতে হলে ভূতটুতের ভয় দেখানোর আমার প্রয়োজন হয় না। ওই কাজটা ভূতের চেয়ে মানুষ আরও বেশি ভাল পারে। তবে ওই জমি আমার কাছে এমন কিছু লোভনীয় নয় যে তার জন্য আমি অত ঝঞ্ঝাট পোয়াব। সত্যি বলতে কী, আমি মিস্টার মাইকেলকে যা অফার করেছি তার পরে আমার বিরাট কিছু লাভ থাকবে না। মনে রাখবেন, যতটাই জমি থাক, ওটা ব্যাক প্লট, সামনের রাস্তা সরু। ওখানে আমি চারতলার বেশি তুলতে পারব না। তুললেও সামনে অনেকটা জমি ছাড়তে হবে। আমার ইন্টারেস্ট ছিল পুরনো বাড়ি ভাঙলে ভাল কাঠ বিম

পাওয়া যায়..... ভেবেছিলাম তাই দিয়ে সামান্য কিছু মেকআপ করতে পারব।"

"শুধু মূল্যবান কাঠের কথাই ভেবেছেন, নাকি আরও মূল্যবান কিছুর আশা ছিল?"

"বুঝলাম না।"

টুপুর উৎসাহের চোটে গুপ্ত সম্পদের কথাটা বলে ফেলতে যাচ্ছিল, মিতিন পা চিপে দিল। সুরজমলকে বলল, "আমিও তো অনেক কিছু বুঝছি না। যেমন, লাভ হবে না জেনেও বাড়িটার ওপর আপনার আদৌ আগ্রহ জন্মাল কেন?"

"কারণটা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? জোনাথন মাইকেলের বাড়িতে গিয়েই উত্তর খুঁজুন না। আমি তো যেচে ইলিয়ট রোডের বাড়িতে যাইনি, ওখান থেকে প্রস্তাব এসেছে বলেই.... "

"কে দিয়েছে প্রস্তাব? আপনি কি মিস্টার মাইকেলের ওই কাল্পনিক ফোনটার কথা বলছেন? "

"ও তো অনেক পরের কথা। তার ঢের আগেই সামওয়ান আমার অফিসে এসেছিলেন।"

"আপনি কার কথা বলছেন?"

"প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার হয়েছেন, মিস্টার মাইকেল নিশ্চয়ই আপনার পেছনে পয়সাও ঢালছেন, আপনি নিজেই খুঁজে বার করুন। অনুগ্রহ করে আমাকে বা আমার কোম্পানিকে বদনামের ভাগী করবেন না। আফটার অল রিগাল প্রপার্টিজের একটা গুডউইল আছে।" বলতে বলতে পিছন ঘুরে ছবি দু'টোকে নমস্কার করল সুরজমল। মিতিনদের বলল, "কিছু মনে করবেন না। আমায় এবার উঠতে হবে।"

নীচে নেমে টুপুর বলল, "ব্যাপারটা যে আরও গুলিয়ে গেল গো

মিতিনমাসি।"

"হুম্।"

"সত্যিই কি মিস্টার মাইকেলের বাড়ির কেউ সুরজমলের কাছে এসেছিল?"

"আসতেও পারে। কিংবা সুরজমল মিথ্যেও বলতে পারে।"

"যদি এসে থাকে, সে কে? ডিক, না মির্না? নাকি উৎপল?"

"কম্পিউটারের ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল্‌টা জানিস? সিগনাল পাঠানো হয়, সেগুলো যায় লজিক গেটের মধ্যে দিয়ে। সিগনালগুলো জুড়ে গেলে হয় অ্যান্ড। আর দু'টো সিগনালের একটা যদি ঢোকে, তবে হয় অর। কোনওটাই না ঢুকতে পারলে হয় নর। এখন সবার স্টেটমেন্টকেই সিগনালের মতো করে মগজে ঢোকাতে হবে। দেখা যাক মস্তিষ্কের লজিক গেট কী বলে।"

টুপুর কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। মিতিনমাসি কী যে হেঁয়ালি করে এক-একসময়ে!

সন্ধে থেকে মেঘ করেছিল কাল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। গভীর রাতে তুমুল বৃষ্টি নামল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের হঠাৎ ধেয়ে আসা বারিধারা নয়, আষাঢ় শ্রাবণের ঝমঝমাঝম। সেই যে শুরু হয়েছে রাত্রে, সকাল হওয়ার পরেও বিরাম নেই। তবে এখন তেজটা কমেছে, চলছে রিমঝিম রিমঝিমের পালা।

বৃষ্টির মধ্যে পাজামা গুটিয়ে ছাতা মাথায় বাজারে ছুটল পার্থ। নিয়ে এসেছে একটা আস্ত ইলিশ মাছ। আজ খুব সরল মেনু। খিচুড়ি,

আর সঙ্গে যত ইচ্ছে মাছভাজা। পার্থ স্থির করে ফেলেছে আজ নো প্রেস। শুধু খাওয়া আর ঘুম। যতই কাজের পাহাড় মাথায় চেপে থাকুক, সে আজ নিজেই নিজেকে একটা রেনি ডে'র ছুটি দিতে চায়।

এমতো সকালে হঠাৎ উৎপলের ফোন। মিতিন আলুপরোটা ভাজছিল, দৌড়ে গিয়ে ফোনটা নিল টুপুরের হাত থেকে। কথা শেষ করে যখন রিসিভার নামাল তখন তার মুখ বেশ গম্ভীর।

টুপুর উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গো?"

"আবার কাচ ভেঙেছে। ড্রয়িংরুমের শো কেসের। তবে এবার শুধু পাল্লা নয়, ভেতরের পুতুলগুলোও গেছে।"

পার্থ সবে শব্দজব্দ খুলে বসেছিল, মিতিনের কথা কানে যেতেই তারও কপালে ভাঁজ, "সে কী! বেশ তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!"

"সে আর ক'টা দিন, মঙ্গল আর বুধ।" মিতিনের গোমড়া মুখে একচিলতে হাসি উঁকি দিল, "ভূতবাবাজি বোধ হয় দু'দিন একটু সমঝে বুঝে নিচ্ছিলেন।"

"কী করবে এখন? যাবে?"

"অগত্যা।"

"এই বৃষ্টি মাথায় করে?"

"উপায় কী, অ্যাডভান্স যখন গিলেছি।" মিতিন টুপুরকে দেখল, "কী রে, তুই আছিস তো সঙ্গে?"

শুধু মুখের কথা খসার অপেক্ষা, টুপুর পাঁচ মিনিটে তৈরি। মিতিনও বেরিয়ে পড়ল ব্যাগ গুছিয়ে। ট্যাক্সি নিয়ে সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছে গেছে জোনাথনের বাড়ি।

বছরের প্রথম বড় বৃষ্টি বলে পথেঘাটে তেমন জল জমেনি, এই একটা বাঁচোয়া।

উৎপল বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছিল। বর্ষাতি পরা মিতিন

টুপুরকে দেখতে পেয়ে প্রায় দৌড়ে এল, "ওফ্ হরিবল্ ব্যাপার! কাল যা হয়েছে তাতে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়।"

মিতিন বলল, "চলুন, দেখছি।"

বর্ষাতি দুটো হ্যাটস্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে মাঝের প্যাসেজ দিয়ে ড্রয়িংরুমে এল টুপুররা। দেখল বড় সোফায় মুহ্যমান মুখে বসে আছেন জোনাথন, পাশের সোফায় ডিক। ডিকের পরনে ট্রাউজার আর ফুলশার্ট, পায়ে জুতো মোজা। নাইট ডিউটি থেকে ফিরে এখনও ডিক পোশাক বদলায়নি।

কথা না বলে কাজে নেমে পড়ল মিতিন। উবু হয়ে বসে দেখছে ভাঙচুর। সত্যি ভারী বিশ্রীভাবে ভেঙেছে শোকেসের কাচ। ফ্রেমে যৎসামান্য কাচ লেগে আছে কোথাও কোথাও, কিন্তু একান্তই এবড়োখেবড়ো ভাবে। পোর্সিলিনের পুতুলগুলোর গুঁড়ো গুঁড়ো দশা, মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। দুটো মাত্র বড় পুতুল আধভাঙা, বাকিগুলোকে এখন আর পুতুল বলে শনাক্ত করা কঠিন।

উৎপল বলল, "আপনার জন্যই এখনও সাফ করিনি ম্যাডাম। এবার মিসেস জোন্সকে বলি ঘর ক্লিন করে দিতে?"

"ও শিওর। আমার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে।"

মিতিন আর টুপুর সোফায় এসে বসল। জোনাথন দু'আঙুলে কপাল চেপে রয়েছেন। মিতিন নরম গলায় ডাকল, "মিস্টার মাইকেল?"

জোনাথন অন্যমনস্ক ভাবে সাড়া দিলেন, "উঁ?"

"কাল ঠিক কখন হয়েছে ঘটনাটা?"

"বেশ রাত্তিরে। আমার তখন ঘুম এসে গিয়েছিল।"

"স্লিপিং পিল খেয়েছিলেন?"

"না। আমার ইউজুয়ালি ঘুমের ট্যাবলেট লাগে না।" জোনাথন মুখ তুললেন, "হঠাৎ এ ঘরে প্রচণ্ড জোরে ঝনঝন শব্দ। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে এসে দেখি এই কাণ্ড।"

উৎপল বলল, "সরি ম্যাডাম, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কাল সন্ধেবেলা এ ঘরের বাল্‌ব টিউবও ফেটে গেছিল।"

"আগে দু'দিন তো লাইট যায়নি?"

জোনাথন বললেন, "দুটো দিন তো সবই ঠিক ছিল। বাল্‌ব টিউব কাচ...। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম চেয়ার টেবিলগুলো বার করার পর আবার সব নরমাল হয়ে গেল। কিন্তু তিনি যে এত ক্রুদ্ধ, এত ভংকর হয়ে আছেন এ আমার ইমাজিনেশানেও ছিল না।"

মিসেস জোন্‌স থমথমে মুখে ঝাঁট দিচ্ছেন মেঝেটা। কাচের টুকরো এক জায়গায় জড়ো করতে করতে অস্ফুটে বলে উঠলেন, "কী হচ্ছে...! কেন যে হচ্ছে...! পুতুলগুলোর কী দাম, এখন সেগুলোকে পর্যন্ত...!"

মিতিন মৃদু গলায় বলল, "হুঁ। এবার কাচের ভেতরকার জিনিসেও হোলি স্পিরিটের নজর পড়েছে।"

গুম হয়ে বসে থাকা ডিক আচমকা ফুঁসে উঠল, "সব যাবে। সব যাবে। একটা একটা করে জিনিস চলে যাবে। কিচ্ছু বাঁচবে না। কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

উৎপল তাড়াতাড়ি ডিকের কাঁধে হাত রেখেছে, "শান্ত হও ডিক। শান্ত হও।"

"শান্ত থাকার উপায় রেখেছ তোমরা? সর্বনাশ যা করার সে তো করেই দিয়েছ। আমি বলিনি, হোলি স্পিরিট আর শান্ত হবে না? ফলল আমার কথা?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধরো।"

"কে ঠিক করবে? তুমি? না তোমার এই ডিটেকটিভ? কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি কতবার বলছি, একটা যা হোক কিছু হেস্তনেস্ত করে ফ্যালো, আমার কথা কেউ গ্রাহ্য করছ না। এখন এই

হন্টেড হাউস বেচতে গেলেও আর কেউ কিনবে? দাম পাবে?"

"বেচার প্রশ্ন উঠছে কেন? তুমি তো জানো ড্যাডি মোটেই বিক্রি করতে চাইছেন না।"

"ড্যাডি চাইছেন না? নাকি তোমরা চাইছ না? তোমাদের কী ইন্টারেস্ট আছে, আমি বুঝি না ভেবেছ?"

"যাহ্ বাবা, আমাদের আবার কী স্বার্থ? ড্যাডির সেন্টিমেন্টটাকে আমরা তো জাস্ট অনার করতে চাইছি।"

"হুঁহ্, ড্যাডির চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না! সারা বছরে একবার ড্যাডিকে দেখতে আসার সময় পেতে না, আর এখন ড্যাডির সেন্টিমেন্ট নিয়ে বিগলিত! এই সব গুলগপ্পো আমায় ঝেড়ো না। তোমাদের আসল ইন্টারেস্ট তো বাড়িটাকে জিইয়ে রাখা। তোমরা লোভে পড়ে গেছ। ভাবছ গুপ্তধন খুঁজে বার করে ফেলবে। কিচ্ছু পাবে না, তোমরা মরবে। তোমাদের কবরে গিয়ে আমি ফুল মালা ছড়িয়ে আসব।"

"আহ্, ডিক।" জোনাথন ধমকে উঠলেন, "বিহেভ ইওরসেল্ফ। মির্না-উৎপল সম্পর্কে তুমি এভাবে কথা বলবে না।"

"প্লিজ ড্যাডি, মির্না উৎপলকে তুমি অনেক মাথায় তুলেছ, আর নয়। ওদের এবার নিজের চরকায় তেল দিতে বলো। এ বাড়িতে ভূত লাফাচ্ছে, না মানুষ, এ নিয়ে ওদের গবেষণা করার দরকার নেই।"

বলেই ডিক উঠে গটগট করে ভেতরে চলে গেল। গোটা ঘর নিস্তব্ধ, যেন পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। মিসেস জোন্সের ঝাড়ু থেমে গেছে, জোনাথনের ঘাড় ঝুলে পড়েছে, উৎপল দাঁড়িয়ে নিথর।

নীরবতা ভঙ্গ করল উৎপলই। পাংশু মুখে বলল, "সরি মিসেস মুখার্জি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

"না, না, ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি," মিতিন আলগা

হাসল, "আমি কি গিয়ে ডিককে একটু ঠাণ্ডা করে আসব?"

"আপনি? যাবেন? এর পরেও?"

"কোনও অসুবিধে নেই। ডিকের মাথা বড্ড তেতে আছে, ওকে একটু বোঝানো দরকার।"

জোনাথন বড় করে একটা শ্বাস ফেললেন। উৎপলও আর আপত্তি জুড়ল না। টুপুরকে ল্যাংবোট করে ডিকের দরজায় এল মিতিন, "ভেতরে আসতে পারি?"

কোনও উত্তর নেই।

সামান্য অপেক্ষা করে মিতিনরা ঢুকেই পড়ল। ডিক চিতপটাং হয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়, ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। রুক্ষ গলায় বলল, "আমি কি আপনাদের আসতে বলেছি?"

মিতিন একটুও থমকাল না। কড়া গলায় বলল, "আপনি না চাইলেও আমাদের আসতে হবে। প্রয়োজন আছে।"

"আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য নই।"

"আপনিও যে দেখি সুরজমলের ভাষায় কথা বলেন।"

ডিক কটমট করে তাকাল।

মিতিনের গলা আরও কঠোর হল, "চোখ পাকিয়ে লাভ নেই। আপনিও এমন কিছু ভালমানুষ নন। আপনার ড্যাডিকে হ্যারাস করার মূলে তো আপনিই।"

"কী বলতে চাইছেন?"

"আপনিই তো এই বাড়ি বিক্রির জন্য যেচে সুরজমলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।"

থতমত মুখে ডিক বলল, "কে বলেছে?"

ঢিল ঠিক জায়গাতেই পড়েছে। ডিকের চোখে চোখ রেখে সামান্য গলা নামাল মিতিন, "সুরজমলই বলেছে। তবে আপনার বাড়ির লোক এখনও জানেন না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, শুনলে

আপনার বাবা, আই মিন ড্যাডি খুব প্রীত হবেন না!"

একটু চুপ থেকে ফের গরগর করে উঠেছে ডিক, "অন্যায়টা কী করেছি ? এ বাড়ি রেখে হবেটা কী? বরং বেচলে ড্যাডির হাতে কিছু ক্যাশ আসে। শেষ জীবনটা ড্যাডি আরও ল্যাভিশলি কাটাতে পারে।"

"ড্যাডির ভাল চাইতে তো আপনি যাননি। গেছেন নিজের ধান্দায়।"

"সে টাকা কার না দরকার? উৎপল মির্না টাকার জন্য ছোঁক ছোঁক করে না? ড্যাডির ব্রেনওয়াশ করে ভাগলপুরের বাড়িদু'টো বেচাল কে? উৎপলই তো।"

"তার ভাগ তো আপনিও পেয়েছেন।" মিতিন আর একটা ঢিল ছুড়ল।

"ভাগই বটে। চোদ্দো লাখ টাকা থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার। বুড়ো কিপটের জাশু। হাত দিয়ে টাকা গলে না। তাও নেহাত মির্নাকে দিয়েছিল বলে আমাকেও দিতে বাধ্য হল।"

"তা হলে এ বাড়ি হাতবদল হলেই যে আপনি মোটা টাকা পাবেন এমন আশা করলেন কেন?"

"কিছু তো আদায় করতামই। লাখ, দেড় লাখ যা হোক। পারমানেন্টলি ঘাড় থেকে নেমে যাব, এই আনন্দেই ড্যাডি দিয়ে দিতেন টাকাটা।"

"ঘাড় থেকে নামা মানে? আপনি আলাদা হতে চান?"

"আমি এ দেশ থেকেই চলে যেতে চাই। এ শহর আমার আর এক মুহূর্ত ভাল লাগে না। আমার বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই সেট্‌ল করেছে অস্ট্রেলিয়ায়, কিছু টাকা হাতে এলে আমিও ওখানেই পাড়ি দেব।

"বুঝলাম।" মিতিন ঢক ঢক ঘাড় নাড়ল। এবং তার সঙ্গে তৃতীয়

ঢিলটাও ছুড়ল, "কিন্তু ডিক, তার জন্য এত ছলাকলার আশ্রয় কেন?"

"কীসের ছলাকলা?"

"আপনার ড্যাডির গলা নকল করে সুরজমলকে টেলিফোন করার কোনও প্রয়োজন ছিল কি?"

ভীষণ চমকেছে ডিক। হতবুদ্ধি মুখে বলল, "আমি...? ড্যাডির গলা নকল করেছি? কবে?"

"ভান করবেন না। সুরজমল আমায় সব বলেছে।"

"মিথ্যে বলেছে। মিথ্যে বলেছে।" ডিক আবার পুরনো মেজাজে। প্রায় গর্জে উঠল; "আমি তো তাকে নিজের গলাতেই ফোন করেছিলাম। রবিবার রাত্তিরে। সুরজমল আমায় স্ট্রেট কাট জানিয়ে দেয় এই বাড়ি কেনার ব্যাপারে তার আর কোনও আগ্রহ নেই।"

"কিন্তু কারুর একটা ফোন পেয়ে শনিবার সুরজমল আপনার ড্যাডির কাছে এসেছিল, এ খবর নিশ্চয়ই আপনার অজানা ছিল না?"

"জানব না কেন? কিন্তু ড্যাডি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।"

"তারপরেও ফোন করলেন?"

"ড্যাডির সঙ্গে সুরজমলের ঠিক কী কথা হয়েছে একটু বুঝে নিতে চাইছিলাম।"

"কী বুঝলেন?"

"বললাম তো। সুরজমল কোনও হন্টেড হাউস কিনতে আর ইচ্ছুক নয়।"

"সুরজমল কোত্থেকে জানল বাড়ি'তে ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা হচ্ছে? আপনি বলেছেন?"

"আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? ড্রাম পিটিয়ে সবাইকে

বলে বেড়াই, আর হু হু করে বাড়ির দাম পড়ে যাক... আমি কি এতই বোকা? ”

“তার মানে আপনি মিস্টার মাইকেলের নাম করে ফোন করেননি?”

“রিচার্ড মাইকেল অকারণে মিথ্যে কথা বলে না।”

“অর্থাৎ কারণ থাকলে বলে, তাই তো?”

“সে আপনি যা ইচ্ছে ভেবে নিতে পারেন।”

“বেশ। আর একটা প্রশ্ন করি?” মিতিন শেষ ঢিলটা ছুড়ল, “বাড়িটাকে ভূতুড়ে বানানোর এ খেলায় আপনি নামলেন কেন?”

“খেলা? বলছেন কী আপনি?” ডিকের মুখচোখ আমূল বদলে গেল। হাত মুঠো করে বলল, “আমি নিজের চোখে হোলি স্পিরিটকে দেখেছি। গত সপ্তাহে বুধবার আমার ডিউটি ছিল না। সন্ধেবেলা এক বন্ধুর বাড়িতে ডিনারে গিয়েছিলাম, ফিরতে রাত হয়েছিল। খাওয়াদাওয়া খুব রিচ হয়েছিল সেদিন। আমার বেশি তেলমশলা সয় না, ঘুম আসছিল না রাতে, জলতেষ্টা পাচ্ছিল বারবার। রাত দেড়টা-দুটো নাগাদ ডাইনিং প্লেসে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বার করছি, তখনই স্পষ্ট দেখতে পেলাম উঠোনের ওপারে একটা ছায়ামূর্তি। ডাইনিং প্লেস আর উঠোনের মধ্যিখানে কাচের দরজাটা রাতে বন্ধ থাকে। পা টিপে টিপে গিয়ে দরজার ছিটকিনি নামাতে-না-নামাতে ভুস্ করে মাটিতে মিশে গেলেন তিনি।”

মিতিন চোখ কুঁচকে শুনছিল কাহিনীটা। জিজ্ঞেস করল, “গত সপ্তাহের বুধবার? মানে তখনও আপনাদের বাড়িতে কাচভাঙা এপিসোড শুরু হয়নি?”

“না। হোলি স্পিরিটের বিরক্তি তো শনিবার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।”

"আপনি আর কখনও হোলি স্পিরিটকে দেখেননি?"

"নাহ্। এক দিনই সে সৌভাগ্য হয়েছিল। আর দেখার বাসনাও নেই। এবার আমি মানে মানে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি।"

"ড্যাডিকে একা ফেলে চলে যাবেন?"

"কীসের একা? এখন তো ড্যাডির পেয়ারের লোকজনরা এসে গেছে। তারাই তো দিব্যি ঘিরে আছে ড্যাডিকে। আমার মতো কম রোজগেরে অপদার্থ সন্তান নয় দূরেই রইল।"

মিতিন নিশ্চুপ। একদৃষ্টে দেখছে ডিককে।

ডিক ফের বলল, "শুনুন ম্যাডাম, আপনি যদি সত্যিই ড্যাডির ভাল চান তা হলে ড্যাডিকে বোঝান। দাম থাকতে থাকতে বাড়ি না বেচলে পরে পস্তাতে হবে। ...অবশ্য আপনাকে বলে কী লাভ। আপনি তো উৎপলেরই লোক।"

প্রতিবাদ না করে মিতিন হাসল একটু। বলল, "ওকে ডিক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

ডিকের ঘরের বাইরে পা রেখেই মিতিন ফিসফিস করে টুপুরকে বলল, "তুই ও ঘরে গিয়ে বোস। আমি একটু আসছি।"

ড্রয়িংরুমে ফিরে টুপুর দেখল জোনাথন এখনও বিমর্ষ মুখে সোফায় আসীন। উৎপল পায়চারি করছে বারান্দায়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উৎপলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এ কী ম্যাডাম আপনি এদিক দিয়ে যে?"

"আর একবার বাড়িটা ঘুরে দেখলাম।" মিতিন উত্তর দিল, "বার করে দেওয়া টেবিল-চেয়ারগুলোর সত্যিই খুব বুরা হাল। মিছিমিছি বৃষ্টিতে ভিজছে।"

"আমি আর কিচ্ছুটি বলব না। খুব শিক্ষা হয়েছে।" মিতিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ড্রয়িংরুমে এল উৎপল। চোরা চোখে জোনাথনকে দেখতে দেখতে বলল, "যাদের জিনিস তারাই বুঝুক।

ভাল করতে গিয়ে আমি কেন দোষী হই! ”

জোনাথন অসহায় মুখে বললেন, “ডিকের কথা কেন এত গায়ে মাখছ উৎপল?”

মিতিন জোনাথনের সামনে গিয়ে বসল, “মিস্টার মাইকেল, আপনাকে একটা কথা বলব?”

“বলো।”

“দেখলেন তো, চেয়ারটেবিল বার করে দিয়েও হোলি স্পিরিট শান্ত হলেন না।”

“হুম। এখন যে কী হবে!”

“কিচ্ছু হবে না। শুনুন মিস্টার মাইকেল, এ বাড়িতে অশান্তিগুলো হোলি স্পিরিট ঘটাচ্ছেন না। এর পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত আছে। আপনি আমায় দু'-চারটে দিন সময় দিন, আপনার কাছে সমস্ত ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।”

“বলছ?”

“বলছি না, গ্যারান্টি দিচ্ছি। এ বাড়িতে হোলি স্পিরিট নিয়েও আর কোনও অশান্তি থাকবে না।”

জোনাথন চোখ পিটপিট করলেন, “যদি সত্যিই তা পারো, তুমি যা চাইবে তাই দেব।”

উৎপল বলল, “আমি তো প্রথম থেকেই ড্যাডিকে বলছি একটা চক্রান্ত চলছে। ড্যাডি মানতেই চান না।”

“এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।” মিতিন ঘড়ি দেখল, “আপনি কি এখন এ বাড়িতেই থাকবেন উৎপলবাবু?”

“না না, বাড়ি ফিরতে হবে। মির্না সকালে ফোন পাওয়ার পর থেকে ছটফট করছে। আমি গেলে তবে ও আসতে পারবে।”

“আটকে আছেন কেন? আপনারা তো দু'জনে একসঙ্গে বেরোন।”

"আর বলবেন না, কাল দুপুরে একটা কেলেঙ্কারি হয়েছে। টিপসি ফিনাইল খেয়ে ফেলেছে। তারপর থেকে কী বমি... একদম নেতিয়ে পড়েছে বেচারা। অসুস্থ প্রাণীটার কাছে আমাদের একজনকে তো থাকতেই হয়।মির্না কাল ক্লাস পর্যন্ত নেয়নি।"

মিতিন দু'-এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "চলুন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাই। টিপসিকে দেখে আসি।"

উৎপল বলল, "সত্যি যাবেন? চলুন।"

ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হল টুপুরদের। ঢুকেই দেখে পার্থ হাঁড়িমুখ করে সোফায় বসে, বাড়িময় ছড়িয়ে আছে ইলিশমাছ ভাজার অপরূপ সুঘ্রাণ।

মিতিন হালকা ভাবে জিজ্ঞেস করল, "সাহেবের এখনও খাওয়া হয়নি মনে হচ্ছে?"

পার্থ গুমগুমে গলায় বলল, "আমি তোমাদের মতো বেআক্কেলে নই। সবাই একসঙ্গে জমিয়ে খাব বলে বাজার করলাম, আর তোমরা আসি বলে কাশী!"

টুপুর কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "কী করব, অনেকগুলো জায়গায় যেতে হল যে। প্রথমে মিস্টার মাইকেলের বাড়ি, সেখান থেকে উৎপলবাবুদের বাড়ি, সেখান থেকে রিপন লেনে মিসেস জোন্‌সের ডেরা...। মিস্টার জোন্‌সের কী হাল গো, বেচারা হুইল চেয়ার ছাড়া মুভই করতে পারেন না।"

"গপ্পো পরে ফাঁদবে। ইলিশমাছ কিন্তু বরফ হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো আগে বসে যাই।" মিতিন বলল, "বুমবুমের খাওয়া হয়েছে তো?"

"তার বোধ হয় এতক্ষণে হজম হয়ে গেল। আমি আর ভারতী পেটে কিল মেরে বসে আছি।"

এক থালা খিচুড়ি আর গোটাচারেক ইলিশভাজা পাকস্থলীতে যাওয়ার পর চিত্ত প্রফুল্ল হয়েছে পার্থর। হাত চাটতে চাটতে বলল, "তা তোমাদের কেস কত দূর এগোল?"

"নৌকো প্রায় পাড়ে এসে গেছে। এখন নোঙর ফেললেই হয়।"

"কীরকম? ·;বিত্র আত্মাকে ঘায়েল করার প্যাঁচ পেয়ে গেছ বুঝি?"

"হচ্ছে ব্যবস্থা। সময় হলেই জানতে পারবে।"

পার্থ অবশ্য জানার তেমন কৌতূহলও দেখাল না। আহার শেষ হতেই হাই তুলছে বড় বড়। বৃষ্টি একদমই থেমে গেছে, আকাশ এখন প্রায় নির্মেঘ, রোদ্দুরে ঝলমল করছে বাইরেটা। পার্থর তবু বেরোনোর কণামাত্র বাসনা নেই, সটান গিয়ে শুয়ে পড়েছে ঘুমন্ত বুমবুমের পাশে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। ফরর ফর, ফরর ফর।

রান্নাঘরে বসে খাচ্ছে ভারতী। টুপুরকে নিয়ে নিজের গলতায় চলে এল মিতিন। দু'-কামরার ভাড়াবাড়ির পিছনের চওড়া বারান্দাটায়। নিজেই বারান্দাটা ঘিরে নিয়েছে মিতিন। অফিস কাম ডিটেকশান চেম্বার। খুপরি জায়গাটুকুতে আছে চেয়ারটেবিল, খুদে সোফা, একখানা ফাইল ক্যাবিনেট, বেঁটে একটা স্টিল আলমারি, আর বইটই। গোপন নথিপত্র থাকে আলমারিতে। নিজের পেশার প্রয়োজনীয় জিনিসও।

টুপুরকে চেয়ারে বসিয়ে টেবিলফ্যান চালিয়ে দিল মিতিন।

বলল, "এবার তোর আসল কাজ স্টার্ট।"

টুপুর টান টান, "কী করতে হবে?"

"রাইটিং প্যাডটা নে। সেই প্রথম দিন থেকে শুরু করে যাকে যাকে দেখেছিস তাদের সম্পর্কে ডিটেলে লিখে ফ্যাল। যেখানে যেখানে গেছিস, যা যা শুনেছিস তাও নোট করবি। তারপর রিমার্কস কলামে লিখবি কার কার কোন কোন ব্যাপারটা তোর সন্দেহজনক লেগেছে। দু'ঘণ্টা টাইম দিলাম। ও কে?"

"তুমি কী করবে এতক্ষণ?"

"আমিও যাই একটু গড়িয়ে নিই। খিচুড়ি খেয়ে চোখটা বড় টানছে।"

ঘন্টাদেড়েকের মধ্যে টুপুরের কাজ শেষ। উঠে মিতিনমাসিকে ডাকতে গিয়ে টুপুর বেজায় অবাক। ওমা, ঘুমোচ্ছে কোথায়, মিতিনমাসি তো দিব্যি জাগ্রত। পায়চারি করছে ড্রয়িংরুমে। হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ছে হঠাৎ, বিড় বিড় করে কী যেন বলছে, কুঁচকোচ্ছে কপাল। চিন্তা করার সময়ে মিতিনমাসি কেমন খ্যাপাটে হয়ে যায়, সারান্ডাতেও দেখেছে টুপুর। এই সময়ে ডাকাডাকি করলে মিতিনমাসির চিন্তার সুতো নাকি ছিঁড়ে যায়।

টুপুর চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। মিতিনেরই হঠাৎ চোখ পড়েছে টুপুরের দিকে।

ভুরু জড়ো করে বলল, "হয়ে গেছে?"

টুপুর ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"এখানেই বোস। পড়ে শোনা। থেমে থেমে পড়বি। হড়বড় করবি না।"

টুপুর গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করল:

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। বয়স একাত্তর। হাইট জোর পাঁচ পাঁচ। গায়ের রং ফরর্সা নয়। বাবা বাঙালি হিন্দু, মা আইরিশ। গত জানুয়ারি মাসে ভাগলপুরের, দু'খানা বাড়ি বেচে চোদ্দো লক্ষ টাকা পেয়েছেন। তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার পেয়েছে ডিক, পঞ্চাশ হাজার মির্না। কথাবার্তা ভাল। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন। ইলিয়ট রোডের বাড়ির ওপর বড্ড মায়া, কিন্তু বাড়িটাকে তেমন যত্ন করেন না। ছেলের ওপর দুর্বলতা নেই যে তা নয়, তবে মেয়ের ওপর টান বেশি। জামাইয়ের ওপর অনেকটাই নির্ভর করেন। আজ উৎপলের মুখ থেকে জানা গেল, ভাগলপুরের বেকারি বেচে এসে জোনাথনের মা কলকাতায় একটা বেকারি খুলেছিলেন। পরে জোনাথনই দেখতেন ব্যবসাটা। তবে জোনাথন কোনওকালেই তেমন উদ্যোগী মানুষ নন, বেকারি চলত টিকিয়ে টিকিয়ে। বেকারিটা ছিল তালতলায়। ভাগলপুরের বেকারির নামেই নাম ছিল মাইকেল্‌স বেকারি। বছর কুড়ি আগে আগুন লেগে বেকারিটি পুরো পুড়ে যায়। তারপর আর ব্যবসায় নামেননি জোনাথন। বেকারি পুড়ে যাওয়ায় ইনসিওরেন্স থেকে কিছু টাকা পেয়েছিলেন। ভাগলপুরের বাড়ির ভাড়া, আর ইনসিওরেন্সের টাকার সুদেই সংসার চলত। জোনাথনের স্ত্রী মারা গেছেন আট বছর আগে। ক্যানসারে। সম্ভবত ওই সময়ে স্ত্রীর চিকিৎসা করতে গিয়ে বেশ কিছু জমানো টাকা খরচ হয়ে যায়।

মাতৃসূত্রে পাওয়া পুরনো বাড়িটার পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে জোনাথনের। গুপ্তধনের আশায় বিচিত্র একটা নোট যত্ন করে পুষে রেখেছেন। বাড়িতে ভূতুড়ে উপদ্রব শুরু হওয়ার পর প্রথমে তেমন একটা নার্ভাস হননি। তবে কাচ ভাঙার ঘটনাগুলোর পর এখন প্রায় বিধ্বস্ত দশা। বাড়ি বেচার ব্যাপারে মন

থেকে এতটুকু সায় নেই, সুরজমলকে বার বার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে বাড়ি বেচতে রাজি হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

দুটো কাচ ভাঙার ঘটনার সঙ্গে জোনাথন সরাসরি যুক্ত। প্রথমে নিজের ঘরের দেওয়াল-আলমারি, দ্বিতীয় বার ডাইনিং প্লেসের বড় ক্রকারিকেস। প্রথমটি ভাঙে সন্ধেবেলা, ওষুধ বার করতে গিয়ে। দ্বিতীয়টি গভীর রাত্রে, হাতের চাপ লাগার পর। কোনও ঘটনারই কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই।

গোলাপবাগানের শখ আছে, কিন্তু গোলাপগাছের অবস্থা দেখে করুণা হয়। মানুষটিকে দেখেও। বিকেলে নিয়মিত হাঁটার অভ্যেস আছে ভদ্রলোকের। ফেরেন সন্ধে নাগাদ। খানিকটা একাকিত্বে ভোগেন বলে মনে হয়।

মিসেস মারিয়া জোন্‌স

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বয়স বছর পঞ্চাশ। কালো মোটাসোটা চেহারা। গোলগাল মুখে একটা মা মা ভাব আছে। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। হোলি স্পিরিটে শুধু বিশ্বাসই নেই, আত্মাকে অনুভবও করেছেন। জোনাথন মাইকেলের বাড়ি কাজ করছেন জোনাথনের স্ত্রীর অসুখের সময় থেকে। প্রায় বাড়ির লোকের মতো হয়ে গেছেন। স্বামী অসুস্থ বলে রাতে জোনাথনের বাড়িতে থাকা সম্ভব হয় না। ফার্নিচার রুমে রাতের উৎপাত দেখেননি একদিনও, তবে গল্প শুনেই ভয়ে জবুথবু। দু'টো-চারটে বাল্‌ব, টিউব ভাঙার সময়ে উপস্থিত থাকলেও একটিও কাচের আসবাব ভাঙার সাক্ষী নন। উৎপল-মির্নার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। ডিকের ওপর কিঞ্চিৎ বিরাগ আছে। শনিবার সকালে

সুরজমল যখন জোনাথনের কাছে এসেছিল, তখনও উপস্থিত ছিলেন না। বাড়ি বেচা, না বেচার ব্যাপারে তাঁর কোনও মন্তব্যই নেই। ভূতের উপদ্রব চলতে থাকলে হয়তো চাকরি ছেড়েও দিতে পারেন। যথাসম্ভব দেখভাল করেন অসুস্থ স্বামীর। সম্প্রতি কালোসাদা টিভি বেচে একটি রঙিন টেলিভিশন কিনে দিয়েছেন স্বামীকে। ইনস্টলমেন্টে দাম দেন। মাসে তিনশো নিরানব্বই। দু' বছরে টাকা শোধ হবে। মাত্র সতেরোশো টাকা মাইনে পান, খুব কষ্ট করে চালান সংসার।

উৎপল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস

বাঙালি ক্রিশ্চান। বয়স বছর বত্রিশ তেত্রিশ। স্বাস্থ্যটি দেখার মতো। কলেজের পরীক্ষা না দিয়েই সার্কাসে চাকরি নেন। তিনটে সার্কাস কোম্পানি মিলিয়ে চাকরি করেছেন এগারো বছর। শেষ ছিলেন জুপিটার সার্কাসে। বলছেন সার্কাসের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, তবে যুক্তিটা খুব জোরালো নয়। বিয়ে করেছেন জোনাথনকন্যা মির্নাকে। বছর ছয়েক আগে। সার্কাসেই মির্নার সঙ্গে পরিচয়। বাচ্চাকাচ্চা এখনও হয়নি। কুকুর পোষেন।

উৎপল যথেষ্ট করিৎকর্মা। জোগাড়যন্ত্র করে দিব্যি বড়সড় একটা জিমনাসিয়াম বানিয়ে ফেলেছেন। শ্বশুরকে জপিয়ে জাপিয়ে ভাগলপুরের বাড়ি বেচিয়েও পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আছে, শ্বশুরের নিয়মিত দেখাশুনো করেন। শ্বশুরের কাছাকাছি থাকার জন্যেই ঠাকুরপুকুরের বাড়ি ছেড়ে মুজফ্‌ফর আহমেদ স্ট্রিটে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। ফ্ল্যাট ছোট হলেও সুসজ্জিত। শ্বশুরবাড়িতে প্রচুর অ্যান্টিক ফার্নিচার

থাকলেও উৎপলের ফ্ল্যাটে সব আধুনিক আসবাব। খাট আলমারি ড্রেসিংটেবিল সোফা ক্যাবিনেট শোকেস সবই প্রায় নতুন। টিভি ফ্রিজও। ওয়াশিংমেশিনটাও নতুন। সেমি অটোমেটিক। বাড়ির রাতদিনের কাজের মেয়ে সেলিমার বয়স বছর কুড়ি। মেয়েটি বদ্ধ কালা। চারবার চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পায়। টিপসিটা খুব কিউট। লাফিয়ে কোলে উঠে পড়ে। আগের দিন ফিনাইল গিলে ফেললেও আজ যথেষ্ট নাচানাচি করছিল। ব্যাগে একটা চকোলেট ছিল, দেওয়া মাত্র কচর কচর খেয়ে নিল।

উৎপল একাধিক দিন ভূতের উৎপাতের সময়ে জোনাথনের বাড়িতে ছিলেন। ভূত বা আত্মা সম্পর্কে তাঁর তেমন বিশ্বাস নেই, কিন্তু এখন যেন একটু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছেন। যদিও এখনও উৎপলের আঙুল সুরজমলের দিকেই। বাল্‌ব-টিউব বা কাচের আসবাব ভাঙার সময়ে অনেকবারই উৎপল জোনাথনের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য তিনি কোনও আসবাবে হাত দেওয়ার সময়ে কাচ ভাঙেনি।

ফার্নিচাররুমের ফাঁক দিয়ে বাচ্চা গলার আইডিয়াটা উৎপলের মাথায় কেন এসেছিল বলা দায়। বেড়াল ঢোকার থিয়োরিটাও সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। তবে উৎপল গোড়া থেকেই বাড়ি বেচার বিরোধী। শ্বশুরবাড়ির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবশ্য বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। বাড়ির কোথাও মহামূল্য জিনিস লুকোনো আছে এমন ধারণাকে গুলগপ্প বলে উড়িয়ে দিলেও সেই অজানা জিনিসটির প্রতি চোরা লোভ আছে বলে মনে হয়।

শখশৌখিনতা নেই। কেজো লোক। ডিকের সঙ্গে সম্পর্কটা এখন ভাল নয়।

মির্না বিশ্বাস

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বয়স বছর তিরিশ। হাইট পাঁচ সাত তো হবেই। হুবহু মেমদের মতো দেখতে, মাথার চুলটি যদিও কুচকুচে কালো। সার্কাসে প্রথম দিকে জিমনাসটিক্সের খেলা দেখাতেন, বিয়ের পর থেকে ট্রাপিজে। ফ্ল্যাটের দেওয়ালে মির্নার জিমনাসটিক্স করার ছবি আছে।

মির্না বেশ নার্ভাস টাইপ। জোনাথনের ক্ষতি হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকেন। ভূতপ্রেতে অবিশ্বাসী নন। উৎপলের ওপর কন্ট্রোল আছে। মির্না চান না বলেই উৎপলও সম্ভবত বাড়ি বেচার ব্যাপারে তাঁর মতেই মত দিয়ে যান। মির্নার উপস্থিতিতে অনেকগুলো কাচের জিনিস ভেঙেছে। প্রথমে মোমবাতি বার করতে গিয়ে ভাঙে ওয়ালক্যাবিনেটের কাচের ড্রয়ার। তারপর মোমবাতি রাখতে গিয়ে সেন্টারটেবিলের কাচ। মির্নার নিজের ঘরের দেওয়াল-আলমারির কাচও মির্নার হাত লেগেই ভাঙে। বেশ কয়েকটি বাল্‌ব-টিউব ভাঙারও সাক্ষী মির্না।

ডিকের সঙ্গে মির্নার সম্পর্ক খুবই তিক্ত। ভায়ের সম্পর্কে ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে ডিক অত্যন্ত স্বার্থপর, নিজেরটুকু ছাড়া কিছু বোঝে না, সংসারে একটা পয়সা ঠেকায় না, দিদিকে হিংসে করে, বাবার খেয়াল তো রাখেই না। তবে ডিক যে অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়ার প্ল্যান ভাঁজছে সেটা মির্না জানেন না বলেই মনে হল।

রিচার্ড মাইকেল (ডিক)

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বয়স সাতাশ-আটাশ। গায়ের রং পোড়া পোড়া, মুখের আদলে মির্নার সঙ্গে সামান্য মিল আছে। ভীষণ হড়বড় করে

ইংরিজি বলে, বাংলা জানেই না প্রায়। স্বভাবটা ভারী রুক্ষ, বাড়ির কারও সঙ্গেই বনে না। অবিরাম নাইট ডিউটি করে, আর সকালে এসে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। প্রয়োজনীয় টাকা হাতে এলে দেশ ছাড়ার মতলবে আছে। রাতে থাকে না বলে ফার্নিচার রুমের ভূতুড়ে আওয়াজ কোনওদিন শোনেনি। তবে একদিন স্বচক্ষে হোলি স্পিরিটকে দেখেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, উৎপল কিছু চেয়ার-টেবিল ফার্নিচার রুমে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যই হোলি স্পিরিট কুপিত হয়েছেন। এবং তিনি আর কখনওই ঠাণ্ডা হবেন না, বাড়ি এখনই বেচে ফেলাই শ্রেয়।

অবশ্য ডিক গোড়া থেকেই বাড়ি বেচায় আগ্রহী। সুরজমলের সঙ্গে সেই গোপনে যোগাযোগ করেছিল। এখনও সুরজমলের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। ভূতুড়ে আওয়াজ না শুনলেও বাল্‌ব ফাটা, কাচ ভাঙার সেও অন্যতম সাক্ষী। তার ঘরেই প্রথম কাচ ভাঙার ঘটনা ঘটে। কোনও কিছুতে না থাকতে চাইলেও বাড়ির ইলেক্‌ট্রিক লাইন ডিকই চেক করিয়েছিল।

ডিকের ঘর দেখে বোঝা যায় সে খুব শৌখিন। গোছানো স্বভাবের। মোটেই উড়নচণ্ডী নয়। গান শোনার নেশা আছে, ক্যাসেটের কালেকশান ভালই। সিলিন ডিয়নের ভক্ত। ঘরে সিলিনের পোস্টার আছে।

সুরজমল অগ্নিদেব

অবাঙালি। হয় উত্তর প্রদেশের, নয় রাজস্থানের। বয়স বছর চল্লিশ। সুদর্শন। কেতাদুরস্ত। মুখে দামি পাইপ ঝোলে। ধনী এবং ধুরন্ধর ব্যবসায়ী। নিজেকে অতি ধর্মভীরু বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। মা

কালীর ভক্ত। মুক্তকেশানন্দ নামের এক গুরুদেবের ছত্রছায়ায় থাকে। এদিকে আবার গুণ্ডাও পোষে। জ্যোতিষেও প্রবল বিশ্বাস। হিরে ছাড়াও তিন আঙুলে তিনটে পাথর বসানো আংটি। একটি সম্ভবত নীলকান্তমণি।

সুরজমল কথাবার্তাতেও অতি দড়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও ছুড়তে জানে। বলছে বটে জোনাথনের জমি বাড়ি নিয়ে তত আগ্রহ নেই, কিন্তু কেনার ধান্দায় ডিডের কাগজপত্রসহ অ্যাডভান্স নিয়ে চলেও এসেছিল। জোনাথনের ধ্যাতানি খেয়ে এখন অপমানে গরগর করছে।

জোনাথনের বাড়ির গুপ্তধনটির খবর সুরজমল সম্ভবত জানে না।

মিস্টার জোন্‌স

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। পুরো নাম জানা হয়নি। ষাটের মতন বয়স। দড়িপাকানো চেহারা। গায়ের রং তামাটে। মাথার কোঁকড়া চুল বেশির ভাগই পাকা। অপরিচ্ছন্ন রিপন লেনের পলেস্তরাখসা মান্ধাতা আমলের এক বাড়ির দমচাপা অন্ধকার অন্ধকার একতলার একটা ঘরে বাস। সারাদিন একলাই কাটান। টিভি দেখে। একসময়ে ধর্মতলার নামী ছবি বাঁধাইয়ের দোকান রয়্যাল বাইন্ডার্সে চাকরি করতেন। সাড়ে চার বছর আগে বাস থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছিলেন। থোরাসিক ভার্টিব্রায়। প্যারাপ্লেজিয়া মতন হয়ে গেছে। হাঁটতে-চলতে পারেন না, ঘরে রাখা হুইলচেয়ারটাই এখন ভরসা। হুইলচেয়ার করে মাঝে মাঝে বেরোন কাছে পিঠে। মিসেস জোন্‌স হুইলচেয়ার ঠেলে নিয়ে গেলে চার্চেও যান। খুপরি ঘরটার দেওয়াল যিশু আর মা মেরির ছবিতে ছয়লাপ। ধূমপানের নেশা

আছে, হাতে পাকানো সিগারেট খান।

ব্যবহারটি মধুর। উৎপলের সঙ্গে ভালই পরিচয়। জোনাথনের বাড়ির ভূতুড়ে কাণ্ডর খবরাখবর রাখেন। তবে মিসেস জোন্‌সের মতো হোলি স্পিরিটের ব্যাপারে সিরিয়াস নন, বরং মিসেস জোন্‌সের আতঙ্ক দেখে মজাই পান।

মন্তব্য

এক—- ডিকের ভূত দেখার কাহিনীটা কি আষাঢ়ে নয়?

দুই— উৎপল সব সত্যি বলছে বলে মনে হয় না কেন?

তিন— সুরজমলের সত্যি মিথ্যে কি পৃথক করা সম্ভব?

চার— ডিককে সন্দেহের তালিকার বাইরে কোনওভাবেই রাখা যায় না।

পাঁচ— কাচ ভাঙছে বাড়িরই কেউ। কিন্তু কীভাবে? বাল্‌ব-টিউবই বা ওভাবে ফাটে কী করে?

ছয়— ফার্নিচারঘরের শব্দটা কি কোনও টেপের আওয়াজ? কোথায় লুকোনো থাকতে পারে টেপটা? কেই বা তাকে চালু করে? কীভাবে করে?

টুপুরের পাঠ শেষ।

মিতিন চোখ বুজে শুনছিল। বলল, "কী রে, আর কিছু নেই?"

"আর কী থাকবে?"

"প্রত্যেকের বাড়ির ডেস্‌ক্রিপশান? কাচ ভাঙাভাঙির ডিটেল? ফার্নিচাররুমের বর্ণনা?"

"ওগুলোও লিখতে হবে? লিখব?"

"থাক।" মিতিন ঝুঁকে টুপুরের চুল ঘেঁটে দিল, "নোটটা ভালই

বানিয়েছিস। ভাষাও বেশ ঝরঝরে হয়েছে। তবে অবজারভেশান আরও তীক্ষ্ম করতে হবে। দু'-চারটে ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট মিস করে গেছিস।"

"যেমন?"

"ভাগলপুরের বাড়ি বিক্রি করতে গিয়ে কী একটা ঝামেলা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। মিস্টার মাইকেল নাকি নিজেদের বাড়ি পর্যন্ত যেতেই পারেননি। হোটেলে বসেই তাঁকে নাকি সইসাবুদ করে দিতে হয়েছিল। ন্যায্য দামও পাননি, জলের দরে বেচতে হয়েছে। যে কিনেছে সে নাকি উৎপলবাবুকেও খুব ভয় দেখিয়েছিল।" টুপুর বলতে বলতে থমকাল, "কিন্তু মিতিনমিসি, ওসবের সঙ্গে ইলিয়ট রোডের বাড়ির ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার কী সম্পর্ক?"

"হয়তো নেই। আবার হয়তো বা আছেও। একটা কথা মাথায় রাখিস, ভাগলপুরের বাড়ি বিক্রি করে আসার আগে পর্যন্ত ইলিয়ট রোডের বাড়িতে কিন্তু কোনও সমস্যা ছিল না।"

"তা বটে।" টুপুরের চোখ সরু হল, "তুমি কি উৎপলবাবুকে সন্দেহ করছ? কিন্তু তিনি কেন তা হলে যেচে তোমার কাছে....?"

"সেই মোটিভটাই তো খুঁজে বার করতে হবে। অবশ্য আমি উৎপলবাবুকেই দোষী বলে দিচ্ছি তা কিন্তু নয়। তবে হ্যাঁ, সেও সন্দেহের তালিকার বাইরে নেই। মুখে সে যাই বলুক, শ্বশুর যদি ভয় পেয়ে বাড়ি বিক্রি করেন, তারও কিন্তু মোটা লাভের সম্ভাবনা।"

"হুম, এটাও একটা ভাবার বিষয় বটে।"

"তারপর ধর, কাচ ভাঙার ব্যাপারটা। লক্ষ করেছিস কি কাচ ভাঙার নেচারটা দু'রকমের? লাস্ট কাচটা ভেঙেছে টুকরো টুকরো হয়ে। নট ইন রেগুলার জিওমেট্রিকাল প্যাটার্ন। অন্য দিনের মতো হাত লেগে খসেও পড়েনি, কোনও কিছুর আঘাতে ভেঙেছে। প্লাস

পুতুল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়াটাও একেবারেই নতুন ধরনের ইন্সিডেন্ট। তারপর ধর, আমরা প্রথমবার ও-বাড়ি ভিজিট করার পর ফার্নিচার রুমে আওয়াজ হওয়া ঝপ করে কমে গেল। কিন্তু সুরজমল ফের ঘুরে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হল বাল্‌ব-টিউব আর কাচ ভাঙার উপদ্রব। এই পিরিয়ডে ফার্নিচাররুমে মাত্র এক দিনই আওয়াজ হয়েছে। এখন বাল্‌ব-টিউবও আর রোজ ফাটছে না। এবং চেয়ার-টেবিল বার করে দেওয়ার একদিন পরই লাস্ট ইন্সিডেন্টটা ঘটল।.... এগুলো তো তুই লিখিসনি! এইসব ঘটনাই তো সুতোয় গাঁথতে হবে। নয় কি?"

টুপুর মাথা চুলকোল, "ভুল হয়ে গেছে। দেব নোট করে?"

"আর লাগবে না। তবে তোর আর একটা ব্যাপারও আমায় একটু হতাশ করেছে রে।"

"কী?"

"তোর নাকটা এখনও পাকেনি।"

"মানে?"

"পরে শুনিস। এখন আয়, সব ইনফরমেশানগুলোকে ছেঁকেছুঁকে তাদের একটা যুক্তির শিকড়ে গেঁথে ফেলি। তারপর মেথড অফ এলিমিনেশান দিয়ে ধাপে ধাপে বুল্‌স আইতে পৌঁছোই।" মিতিন ঝপ করে থেমে গিয়ে মুচকি হাসল, "তবে তারও আগে আর একটা কাজ যে আছে মিস ওয়াটসন।"

"কী?"

"জিভটা যে বড় চা চা করছে।"

দৌড়ে ভারতীকে চা করতে বলে ফিরেছে টুপুর, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে পার্থর আবির্ভাব। মুখব্যাদান করে প্রকাণ্ড এক জৃম্ভণ সারল। ঢুলুঢুলু চোখে বলল, "মাসি-বোনঝিতে জোর গুলতানি চলছে দেখি!"

"তাতে কি মহাশয়ের এক ডজন দিবাস্বপ্ন দেখার কোনও ব্যাঘাত ঘটল?"

'ডাঁহা ভুল বললেন প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী।" পার্থ সোফায় বাবু হয়ে বসল, "শোনো, মানুষ প্রথম স্বপ্ন দেখে ঘুমোনোর সাতষট্টি মিনিট পর। তারপর প্রতিটি স্বপ্ন দেখার মাঝে ব্যবধান থাকে সিক্সটিওয়ান টু সিক্সটিসেভেন মিনিটস। সুতরাং পৌনে তিন ঘণ্টার ঘুমে আমার পক্ষে একজোড়ার বেশি স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়।"

"ও তো গড় হিসেব। তুমি তো ব্যতিক্রম।"

পার্থর ঘাড়ের রোঁয়া যেন ফুলে উঠল, "তা হলে স্বীকার করছ আমি একটু ডিফারেন্ট?"

"অবশ্যই।" মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "তা ব্যতিক্রমী মানুষ, তোমাকে যে তিনটে কাজের ভার নিতে হবে।"

"আমি প্রস্তুত। কাজকে এ শর্মা ডরায় না।"

"বটেই তো। তুমি তো কাজপাগল। নইলে কি নিজেই নিজেকে ছুটি দিয়ে আজ ভোঁস ভোঁস ঘুমোতে!" কুট্‌স করে একটা হুল ফুটিয়ে নিয়ে মিতিন সিরিয়াস হল, "মন দিয়ে শোনো। প্রথম কাজ, যে কবরখানায় মাইকেল মধুসূদনের সমাধি আছে, সেখানে গিয়ে রবার্ট ম্যাকগ্রেগরের সমাধি খুঁজে বের করা। মৃত্যু-সাল আঠেরোশো চৌষট্টি।"

"কেন?"

"প্রশ্ন নয়, যা বলছি তাই করবে।"

"কিন্তু পাব কী করে? অত বড় একটা কবরখানায়...?"

"খুঁজবে সারাদিন। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাসও আরও ঝালাই হয়ে যাবে।"

পার্থ বেজার মুখে প্রশ্ন করল, "দু' নম্বর কাজটা কী?"

"পরশু এখান থেকে একজন ইলেক্‌ট্রিশিয়ান ধরে নিয়ে গিয়ে

মিস্টার জোনাথন মাইকেলের ফার্নিচার রুমে একটা টিউবলাইট ফিট করে দিয়ে আসতে হবে। কাল সকালে আমি টিউবটা তোমায় এনে দেব। মিস্টার মাইকেলকে ফোন করে বলে দেব টিউবটা মন্ত্রঃপূত, হোলি স্পিরিটও ওই টিউব ভাঙতে পারবে না। উলটে ওই টিউবের কল্যাণেই ও বাড়ির সমস্ত উপদ্রব বন্ধ হয়ে যাবে। টিউবলাইটটি জ্বালিয়ে দরজায় তালা দেবেন মিস্টার মাইকেল, তুমি বলে আসবে আমি না যাওয়া পর্যন্ত কোনওভাবেই ওই ঘরের দরজা যেন না খোলা হয়। ভেতরে তুলকালাম হয়ে গেলেও না।"

"এটা কোনও কাজই নয়। হয়ে যাবে।"

"অত সোজা ভেবো না। টিউবলাইট লাগানোর সময়ে লাইকোপোডিয়াম পাউডার ছড়িয়ে দিতে হবে ফার্নিচার রুমের কার্পেটে। খুব সাবধান, কেউ যেন পাউডার ছড়ানো দেখতে না পায়। মিস্টার মাইকেল, উৎপল, মিসেস জোন্‌স, মির্না, ডিক কেউ না।"

"মন্ত্রঃপূত টিউবলাইট, পাউডার.... ব্যাপারটা কী বলো তো?"

"উঁহু, প্রশ্ন নয়।"

"ও কে। ও কে। কী বিটকেল বিটকেল কাজ যে চাপাচ্ছ! তিন নম্বরটা কী?"

"ওটাই সিম্প্‌ল। কাল জামালপুর এক্সপ্রেসের দু'টো টিকিট চাই। আমার আর টুপুরের। আপটু ভাগলপুর।"

ট্রেন ছাড়ল সাড়ে ন'টায়।

কামরা প্রায় ফাঁকাই ছিল, শেষ মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল একদঙ্গল কলেজের মেয়ে। সঙ্গে এক মধ্যবয়সী গোলগাল চেহারার অধ্যাপিকা। টুপুরদের কুপেই অধ্যাপিকার বার্থ, স্যুটকেস সিটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েই ছাত্রীদের উদ্দেশে কড়া গলায় চোস্ত হিন্দিতে হাঁক ছুড়তে শুরু করেছেন তিনি। এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাত্রীদের উচ্ছ্বাস নিবে যাচ্ছে পলকের জন্য, পরক্ষণে আবার কলকল করে উঠছে তারা।

ডানকুনি পেরোনোর পর খানিকটা সুস্থিত হলেন অধ্যাপিকা। ওয়াটার বট্‌ল থেকে ঢকঢক জল খেয়ে মিতিনের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললেন, "আপলোগ কেয়া বাঙালি হ্যাঁয়?"

মিতিন ঘাড় নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় প্রশ্ন, "যাচ্ছেন কদ্দূর?"

"ভাগলপুর।"

"আম্মিও। ভালই হল, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

"আপনারা কি চেন্নাই থেকে করমন্ডলে এলেন? না ম্যাড্রাস মেলে?"

ভদ্রমহিলা জোর চমকেছেন, "বুঝলেন কী করে চেন্নাই থেকে আসছি?"

মিতিন মুচকি হাসল, "আপনার প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ দুটোয় চেন্নাই-এর দোকানের নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে যে।"

“বাহ্, আপনার দৃষ্টি তো দারুণ!”

দু’মিনিটেই আলাপ জমে গেল। মহিলার নাম শর্মিলা মৈত্র, ভাগলপুরেই বাস, স্থানীয় সুন্দরবতী কলেজে ইতিহাস পড়ান, ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন চেন্নাই-এ, বাড়ি ফিরছেন প্রায় দিন কুড়ি পর। এতদিন ধরে ছাত্রীদের সামলাতে সামলাতে তাঁর হাড়মাস কালি হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরে এবার গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন। চেন্নাই-এ ছাত্রীদের কীর্তিকাহিনী শোনাতে শোনাতে হঠাৎ থমকালেন শর্মিলা, চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, “ভাগলপুরে কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? কোনও রিলেটিভের বাড়ি?”

“নাহ্। যাচ্ছি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। খরমনচকে।”

“ওমা, খরমনচকে তো আমার বাপের বাড়ি। ওখানে কার কাছে যাবেন?”

“গণপতি চৌধুরী। চেনেন?”

“কেকজেঠুকে চিনব না? বিলকুল চিনি। তা তাঁর কাছে যে হঠাৎ?”

“বিশেষ প্রয়োজনে।”

“ও।” শর্মিলা একটু থেমে থেকে বললেন, “কেকজেঠুর শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। গত মাসে দেখলাম বেশ নুয়ে পড়েছেন। বললেন কী সব জ্বরজারি হয়েছিল, তারপর থেকেই হাঁটাহাঁটি করলে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। প্রায় নব্বই বছর বয়স হল, চিরকাল দেখেছি টানটান হয়ে হাঁটছেন, এই প্রথম দেখলাম কেকজেঠুর হাতে লাঠি।”

মিতিন প্রশ্ন করল, “কেকজেঠু বলে ডাকেন কেন? গণপতিবাবুর বেকারি আছে বলে?”

“ঠিক ধরেছেন। ছোটবেলায় কেকজেঠু আমাদের কত কেক যে

খাইয়েছেন।" শর্মিলাকে সামান্য উদাস দেখাল, "জানেন তো, কেকজেঠুর মাইকেল্‌স বেকারি একসময়ে আমাদের ছিল। মানে আমাদের ঠিক নয়, আমার এক দাদুর।"

টুপুরের সঙ্গে চোখাচোখি হল মিতিনের। নড়েচড়ে বসেছে মিতিন। কৌতূহলী গলায় বলল, "সুরেন মাইকেল আপনার...?"

"বাবার আপন জ্যাঠা।"

"কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো শুনেছি আপনাদের পরিবারের কোনও সম্পর্ক ছিল না?"

"না, না, তা কেন, সম্পর্ক একটা ছিল। আমি অবশ্য তাঁকে দেখিনি। তিনি আমার জন্মের বহুকাল আগেই গত হয়েছেন। তবে বাবার মুখে শুনেছি তিনি ভাইপো-ভাইঝিদের যথেষ্ট ভালবাসতেন। বাবারা তো প্রায়ই যেতেন তাঁর বাড়িতে। তবে আমাদের মেমসাহেব ঠাকুমা নাকি ওই মেলামেশা বিশেষ পছন্দ করতেন না। পাছে ভাগলপুরে থাকলে ছেলেটাও নেটিভ বনে যায় তাই সুরেনদাদুর মৃত্যুর পর পরই তিনি ভাগলপুর ছেড়ে চলে যান।"

"সুরেনদাদুর ছেলেকে আপনি দেখেছেন? কিংবা তাঁর বংশধরদের?"

"সুরেনদাদুর ছেলেকে এক বার দেখেছি। প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে। কেকজেঠুরই বাড়িতে। আলাপও হয়েছিল সামান্য। শুনেছিলাম তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। সেই মেয়ে নাকি একবার এসেছিল ভাগলপুরে। গত ডিসেম্বরে। বরের সঙ্গে।"

"ডিসেম্বরে? আপনি শিওর? জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নয়?"

"না, না, ডিসেম্বরেই। ক্রিসমাসের আগে। কেকজেঠুর বাড়িতে এখনও ক্রিসমাসের সময়ে ঢালাও কেক বানিয়ে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর প্রথা আছে। ওই দিনই কেকজেঠুর মুখে শুনেছিলাম। কেকজেঠু দুঃখ করে বলছিলেন, সুরেন মাইকেলের ছেলে নাকি

বাড়ি বিক্রি করার জন্য মেয়ে জামাইকে পাঠিয়েছিলেন।"

"সে তো বিক্রিও হয়ে গেছে।"

"তাও শুনেছি।" শর্মিলার চোখে এতক্ষণে প্রশ্ন ঘনাল, "তা আপনি এই সব খবরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত?"

"সরাসরি কোনও যোগ নেই। জোনাথন মাইকেলের সঙ্গে আমার সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে, ওঁর মুখেই যা শুনেছি।" মিতিন আড়চোখে টুপুরকে দেখে নিয়ে গলা ঝাড়ল, "আমি ফার্স্ট জেনারেশান অ্যাংলোইন্ডিয়ানদের নিয়ে একটা সোশিওলজিকাল স্টাডি করছি। জোনাথন মাইকেলের পরিবারটা আমার কাছে একটা আইডিয়াল স্টাডি মেটিরিয়াল। মিস্টার মাইকেলের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে ডিটেল জানার জন্যই আমার এই ভাগলপুর পাড়ি দেওয়া। আশা করছি গণপতিবাবু আমায় এ ব্যাপারে বেশ খানিকটা সাহায্য করতে পারবেন।"

"আমিও আপনাকে কিছু বলে দিতে পারি। যেমন সুরেনদাদুর বাবা ছিলেন...।"

"না না, ওঁদের সম্পর্কে আমি মোটামুটি জানি। আমার আগ্রহ এখন সুরেনবাবুর স্ত্রীর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে। মানে ইউরোপিয়ান পাস্ট অফ অ্যান অ্যাংলোইন্ডিয়ান ফ্যামিলি। মিস্টার মাইকেল বলেছেন গণপতিবাবু নাকি আমায় কিছু নতুন তথ্য দিতে পারেন।"

"কী আর বলবেন কেকজেঠু! বড় জোর বলবেন সুরেনদাদু এক অভিশপ্ত ইউরোপিয়ান বংশের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন...।"

"অভিশপ্ত বলছেন কেন?"

"কারণ আমাদের মার্গারেট ঠাকুমার দিদিমার বাবাটি একটি ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছিলেন যে।"

"কীরকম?"

"মহারাজা কানোয়ার সিং-এর নাম শুনেছেন? সিপাই বিদ্রোহের

অন্যতম নায়ক?"

"যিনি তাঁতিয়া টোপির খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন?"

"হ্যাঁ, সেই কানোয়ার সিং। বিহারের জগদীশপুরে ছিল তাঁর এস্টেট। আঠেরোশো সাতান্নর তেসরা নভেম্বর তিনি কানপুরে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ হেনেছিলেন। গোয়লিয়ারের বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে নিয়ে পরাস্ত করেছিলেন জেনারেল উইন্ডহ্যামকে। পরে অবশ্য জেনারেল ক্যাম্পবেল এসে যাওয়ার ফলে তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হন। পরের বছর আজিমগড়ের যুদ্ধেও কানোয়ার সিং ব্রিটিশদের কাছে হেরে যান। আঠেরোশো আটান্নর এপ্রিলে কানোয়ার সিংকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডটি ঘটানোর মূল হোতা ছিলেন ওই রবার্ট ম্যাকগ্রেগর। আমাদের মেমঠাকুমার দিদিমার সেই বাবাটি। কীভাবে তিনি কানোয়ার সিংকে মেরেছিলেন জানেন? আজিমগড়ের কাছে মন্নুহার বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে নৌকোয় চড়ে গঙ্গা পার হচ্ছিলেন মহারাজা কানোয়ার সিং, ব্রিটিশরা তাঁকে অভয়ও দিয়েছিল তিনি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন, কোনওভাবেই তাঁকে আক্রমণ করা হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কথা রাখেনি। মন্নুহারের শেউপুরা ঘাট পার হওয়ার সময়ে কানোয়ার সিংকে আওতার মধ্যে পেয়ে মেগ্না নামের এক গানবোট থেকে শুরু হল গোলাবর্ষণ। নৌকোতেই মারাত্মকভাবে জখম হলেন কানোয়ার সিং। মারা গেলেন দু'দিন পর। তারিখটা ছিল তেইশে এপ্রিল। প্রচুর ধনরত্ন ছিল মহারাজা কানোয়ার সিং-এর সঙ্গে। সব সাফ করে দিয়েছিলেন ম্যাকগ্রেগর আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। তবে অন্যায়ভাবে লুঠ করা মাল হজম করা তো কঠিন, বছর ছয়েক পরে অপঘাতে মারা যান ম্যাকগ্রেগর। ওই তেইশে এপ্রিলই। ম্যাকগ্রেগরের দুই ছেলেও বাঁচেনি, বাপের আগেই তারাও...।"

মিতিন আর টুপুর মন দিয়ে শর্মিলার কথা শুনছিল। মিতিন দুম করে জিজ্ঞেস করল, "এত গল্প আপনিই বা জানলেন কী করে?"

"হিস্টোরিকাল পোরশানটা বই ঘেঁটে ঘেঁটে। আর ম্যাকগ্রেগরের কাহিনী তো আমাদের ফ্যামিলিতে মুখে মুখে ঘোরে। সুরেনদাদুই কিছু কিছু গল্প করেছিলেন তার ভাইদের। তা ছাড়া মার্গারেট ঠাকুমার মা বাবা তো আমাদের ওখানে ভিখানপুরেই থাকতেন, ওই সাহেবপাড়া থেকেও গল্প ছড়িয়েছে কিছু। একটা গুজব তো এখনও জোর চালু। ম্যাকগ্রেগরের কলকাতার যে-বাড়িটা মার্গারেট ঠাকুমা পেয়েছিলেন, সে-বাড়িতে নাকি এখনও কানোয়ার সিং-এর অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে। কানোয়ার সিং-এর অভিশাপে ম্যাকগ্রেগর সে সব তো ভোগ করতে পারেনইনি, আজ পর্যন্ত তাঁর পরিবারের কেউও সেই ধনরত্নের হদিস পায়নি। গুপ্তধন ও বাড়িতে যখের ধন বনে গেছে।"

"হুম।" মিতিন মাথা নাড়ল, "আমিও ওরকমটা শুনেছি। কিন্তু সত্যিই কি আছে কিছু?"

"যা রটে তার কিছুটা তো অন্তত সত্যি। নিশ্চয়ই কিছু আছে। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে ও ব্যাপারে কোনও কৌতূহল নেই। আমার শুধু ভাবতে খারাপ লাগে সুরেনদাদুর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আমাদের কখনও কোনও পরিচয়ই ঘটল না। অথচ সম্পর্কে তারা তো আমার ভাই বোনই হয়। কী বলেন?"

টুপুর বলে উঠল, "সত্যি কী অদ্ভুত, তাই না? একই বংশের হয়েও তারা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। পশ্চিমবাংলায় বাস করেও অবাঙালি। আর আপনার আজীবন বিহারে বসবাস করেও বাঙালি।"

"মন্দ বলোনি।" শর্মিলা মাথা নাড়লেন, "তবে কী জানো, আমরা কোনওকালেই ভাগলপুরকে আলাদা করে বিহার বলে ভাবিনি।

ভাবতাম ওটা আমাদের বাঙালিদেরই শহর। কত বাঙালি যে ছিল ভাগলপুরে। নামকরা ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক... সব লাইনেই বাঙালিরা ছিল লিডিং পজিশানে।"

মিতিন বলল, "কালচারাল দিকটাই বা বাদ দিচ্ছেন কেন? সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও কি ভাগলপুরের অবদান কম? শরৎচন্দ্র থাকতেন ভাগলপুরে, বনফুল ছিলেন, কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণও ছিলেন বেশ কিছুদিন। রবীন্দ্রনাথও তো বাস করে গেছেন ভাগলপুরে। রাজা রামমোহনও। এ ছাড়া আরও কত নামীদামি মানুষ..."

"ঠিক।" শর্মিলা স্মিত মুখে বললেন, "ভাগলপুরের বাঙালিরা কী বলে জানেন তো? বেড়াল যেমন বাঘের মাসি, ভাগলপুর তেমনি সংস্কৃতিতে বাংলার মামা।"

"মানে?"

"ওখানে কত বিখ্যাত বাঙালির মামার বাড়ি আছে, ভাবুন তো। অশোককুমার-কিশোরকুমারদের মামার বাড়ি ভাগলপুর। অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জির মামার বাড়ি ভাগলপুর। সঙ্গে সবার মাথার ওপর শরৎচন্দ্র তো আছেনই।" বলতে বলতে শর্মিলার মুখে যেন একটা ছায়া পড়ল, "কিন্তু সেই মামার বাড়ির দেশ থেকে বাঙালিরা এখন ঘটিবাটি বেচে পালাচ্ছে। লাস্ট তিরিশ-চল্লিশ বছরে কত বাঙালি যে ওখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল। জানেন, এখন ইউনিভার্সিটিতে এম-এ ক্লাসে বাংলার স্টুডেন্ট পাওয়া যায় না।"

গল্পে গল্পে রাত হয়েছে অনেক। ট্রেন রামপুরহাট ছাড়িয়ে প্রায় বাংলা-বিহারের সীমানায়। শর্মিলার ছাত্রীদেরও হইহল্লা থেমে গেছে, যে যার বার্থে শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। অন্যান্য যাত্রীরাও ঘুমে প্রায় অচেতন।

পাকুড় পার হওয়ার পর শর্মিলাও চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মিতিনও উঠে গেল আপার বাংকে। শুধু টুপুরের চোখে ঘুম নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে। আজ বেশ চাঁদের আলো আছে, মনোরম জ্যোৎস্নায় ছেয়ে আছে চরাচর। বাংলার সমতলভূমি পার হয়ে এখন শুরু হয়েছে এবড়োখেবড়ো বিহার। মাঝে-মাঝেই দেখা যায় ছোট বড় টিলা। চাঁদের কিরণ মাখা টিলাগুলোকে কী মায়াবী যে লাগছে এখন। সরু একটা রুপোলি নদী পার হয়ে গেল ট্রেন। ঝুঁঝকো অন্ধকারের মতো এবার দু'পাশে ছোট্ট জঙ্গল...

নিসর্গশোভা দেখতে দেখতে কখন যেন চোখ দু'টো জুড়ে গিয়েছিল টুপুরের, জেগে উঠল মিতিনমাসির ধাক্কায়, "এই ওঠ ওঠ, সাবর পেরিয়ে গেছে। এর পরই ভাগলপুর।"

শর্মিলাও উঠে বসে চাদর ভাঁজ করছিলেন। হাই তুলতে তুলতে বললেন, "আপনারা উঠছেন কোথায়? কেকজেঠুর বাড়ি?"

"না। হোটেলেই উঠব।...স্যান্ডিস কম্পাউন্ডের কাছে ভাল হোটেল আছে শুনেছি?"

"স্যান্ডিস নয়, স্যান্ড্স কম্পাউন্ড। মুখে মুখে যদিও স্যান্ডিসটাই চালু হয়ে গেছে। স্যান্ড নামে একজন ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর প্রকাণ্ড মাঠটাকে উপবন বানিয়েছিলেন। সাহেব-মেমদের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য।" সুযোগ পেয়েই একটু জ্ঞান বিতরণ করে নিলেন শর্মিলা। হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ওইদিকটায় থাকাই ভাল। শহরের ওই সাইডটা এখনও যা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাকি গোটা টাউনটাই যা নোংরা হয়ে গেছে।"

শর্মিলার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। পুরনো শহরটা সত্যিই বেশ অপরিচ্ছন্ন। অসম্ভব ধুলো, রাস্তাঘাটে অজস্র খানাখন্দ, যত্রতত্র ষাঁড় গোরু গাধা চরে বেড়াচ্ছে, রাশি রাশি রিক্শার আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়।

কালেক্টরেটের দিকটায় এসে বুকভরে নিশ্বাস নিতে পারল টুপুর।

স্যান্ড্‌স কম্পাউন্ড দেখে সত্যিই চোখ জুড়োল। কী প্রকাণ্ড মাঠ! শাল-সেগুন গাছে ভরা মাঠের বুকে হালকা জঙ্গলের আভাস। দেখতে বেশ লাগে।

কম্পাউন্ডের কাছেই হোটেল অমরে উঠল টুপুররা। ছিমছাম সাজানোগোছানো হোটেল। রুমে ঢুকেই টুপুর বিছানায় শরীর ছেড়ে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মিতিন তাড়া লাগিয়েছে, "এই, একদম শুবি না। চটপট স্নান সেরে নে। ব্রেকফাস্ট করেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

টুপুর মৃদু প্রতিবাদ জুড়ল, "এক্ষুনি? এই সাতসকালে?"

"হ্যাঁ, সাতসকালেই। এখানকার গরম তো জানো না! বেলা বাড়লেই লু বইবে, চামড়ায় ফোসকা পড়ে যাবে।"

অগত্যা কী আর করা, টুপুরকে উঠতেই হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে তরতাজা হয়ে টোস্ট ওমলেট কফি সাঁটিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। সাইকেল রিকশা ধরে মিনিট দশেকের মধ্যে খরমনচক।

গণপতি চৌধুরীর বাড়ি খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না। মাইকেল্‌স বেকারির চৌধুরীবাবুকে অঞ্চলের প্রায় সবাই চেনে। লোহার গেটঅলা বড়সড় দোতলা বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন একজন স্থানীয় বাসিন্দা।

গেট ঠেলে ঢুকতেই এক প্রৌঢ়ের মুখোমুখি। মিতিন টুপুরকে দেখেই তাঁর ভুরুতে ভাঁজ, "কাকে খুঁজছেন?"

"গণপতি চৌধুরী।"

"বাবাকে? কিন্তু বাবার তো শরীরটা ভাল নেই।"

"আমরা অনেকদূর থেকে আসছি। কলকাতার জোনাথন মাইকেলের কাছ থেকে। ওঁর সঙ্গে খুব জরুরি প্রয়োজন।"

ভদ্রলোক ভীষণ অবাক হয়েছেন, "কার কাছ থেকে? জোনাথন আঙ্কল?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন আসুন।"

একতলার একটা ছোট মতন বসার ঘরে মিতিনদের অপেক্ষা করতে বলে দোতলায় উঠে গেলেন ভদ্রলোক। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নেমে এসেছেন এক বৃদ্ধ। পরনে লুঙ্গি, ফতুয়া, হাতে বাঁধানো ছড়ি। দীর্ঘদেহী মানুষটির চামড়া এখনও কুঁচকোয়নি তেমন, মাথা ভরতি ধবধবে সাদা চুল, ইয়া মোটা শুভ্র গুম্ফ শোভা পাচ্ছে মুখমণ্ডলে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কাশছেন অল্প অল্প।

মিতিন উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করল, "আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার।"

গণপতিবাবুর কাশি থেমে গেল। চোখ বড় বড় করে জরিপ করলেন মিতিনকে। সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, "ডিটেকটিভ?"

"হ্যাঁ।"

একটু সময় নিয়ে ধাতস্থ হলেন গণপতিবাবু। তবু চোখ থেকে বিস্ময় যেন কাটেনি। সোফায় বসে বললেন, "কলকাতার জোনাথনের কাছ থেকে আসছ? কী ব্যাপার বলো তো? কিছু অঘটন ঘটেছে কি?"

"না। ঘটার উপক্রম হয়েছে। জোনাথন মাইকেলের জীবন বিপন্ন। কে একজন তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে।"

"ও। তা আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমার বিশ্বাস ওঁকে ভয় দেখানোর সঙ্গে এখানে ওঁর বাড়ি বিক্রি করার একটা কানেকশান আছে।"

"বুঝলাম না।"

"জোনাথন মাইকেলের তো এখানে দু'টো বাড়ি ছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ, একটা চার্চ রোডে, আর একটা গঙ্গার ধারে।"

"মানে বুড়ানাথের মন্দিরের কাছে?"

"বলতে পারো।"

"ওই বাড়ি দু'টো বিক্রি করার পর থেকেই মিস্টার মাইকেলের ওপর নানা ধরনের হামলা শুরু হয়েছে। তাই আমি বিক্রির ডিটেলটা একটু জানতে চাই। মানে কাকে বিক্রি করেছেন, কত দামে..."

"সে তো তুমি জোনাথনের কাছ থেকেই জানতে পারবে। আমার কাছে আসার দরকার কী?"

"উনি তো বলছেন ওঁকে নাকি নিজের বাড়ি পর্যন্ত আসতেই দেওয়া হয়নি। স্টেশনের কাছে এক হোটেলে উঠেছিলেন, সেখানেই সইসাবুদ হয়েছে।"

"আসতে দেওয়া হয়নি কথাটা ডাহা মিথ্যে। গণপতি চৌধুরীকে আগে খবর দিয়ে রাখলে ভাগলপুর শহরে কোন শর্মার সাহস আছে তাকে হোটেলে আটকে রাখত?" গণপতিবাবুকে হঠাৎই বেশ উত্তেজিত দেখাল, "আদতে জোনাথন আমার কাছে আসতেই চায়নি।"

"কিন্তু কেন?"

"পাছে আমার ঠিক করা পার্টিকে বাড়ি বিক্রি করতে হয়। অথচ জোনাথন প্রথমে আমারই দ্বারস্থ হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে মেয়ে-জামাইকে পাঠিয়েছিল খদ্দের খুঁজে দেওয়ার জন্যে। এই নব্বই বছর বয়সে আমি ঘুরে ঘুরে লোকও ঠিক করলাম। প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়ে গেল। ওই মেয়ে-জামাইয়ের সামনেই। বুড়ানাথ মন্দিরের বাড়িটা কিনবেন ডক্টর সতীশ ঝা, এগারো লাখ টাকায়। আর চার্চ রোডের বাড়িটা নিতে রাজি হয়েছিলেন প্রফেসার সহায়। চোদ্দো লাখ টাকায়।"

"মানে দুটো মিলিয়ে পঁচিশ লাখ?"

"তাই তো দাঁড়ায়। পরে শুনলাম সুলতানগঞ্জের এক পার্টির কাছ থেকে বেশি টাকার অফার পেয়ে...।" গণপতিবাবুর চোয়াল শক্ত হল, "আমার কাছে কথাটা সোজাসুজি এসে বললে আমি কি বাধা দিতাম? না বেশি টাকায় বেচছে বলে আমি অখুশি হতাম? কতকাল ধরে ওই বাড়ি দুটো আমি বুক দিয়ে আগলে রেখেছি...নাহ্, সুরেনকাকার ছেলের কাছ থেকে আমি ওই ব্যবহার আশা করিনি।"

"কিন্তু...।" মিতিন অবাক মুখে বলল, "জোনাথন মাইকেল যে বলেন দু'টো বাড়ি বিক্রি হয়েছে মোট চোদ্দো লাখে?"

"অসম্ভব। হতেই পারে না। পঁচিশ লাখ টাকা দাম পাচ্ছে জেনেও আমাকে খবর না দিয়ে এসে চুপি চুপি কেউ চোদ্দো লাখ টাকায় বাড়ি সেল করে যায়?"

"তাই তো। মনে হচ্ছে একটা ফাউল প্লে আছে।"

"সে কী আছে জোনাথনই জানে। তবে তুমি জোনাথনকে বলে দিয়ো, আমি যথেষ্ট আহত হয়েছি। গুণ্ডা প্রোমোটারকে না বেচে ভদ্রলোকদের বাড়ি বিক্রি করলে তার এমন কিছু লোকসান হত না।"

"যিনি কিনেছেন তাকে আপনি চেনেন?"

"গোটা ভাগলপুর ডিস্ট্রিক্ট তাকে চেনে। পাজির পা-ঝাড়া এক বজ্জাত। সে তো এখন শুনি কলকাতাতেও ব্যবসা ফেঁদেছে।"

"কী নাম বলুন তো?"

"রাজনাথ। রাজনাথ সিং। এখানে তিনি অবশ্য রাজুদাদা নামেই বেশি খ্যাত।"

কলকাতা থেকে এত দূরে এসে ওই নামটা শুনবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি টুপুর। চোখ গোল গোল করে তাকিয়েছে মিতিনমাসির দিকে। তবে মিতিনমাসি যেন তেমন চমকালই না,

শুধু মুখখানা থমথমে হয়ে গেল সহসা। গোমড়া মুখে দু'-চারটে কথা বলে উঠে পড়ল। গণপতিবাবুর চা-জলখাবারের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করল সবিনয়। লোহার গেটের বাইরে এসেই ব্যাগ থেকে বের করেছে মোবাইল। টকটক বোতাম টিপছে।

টুপুর উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, "কাকে ফোন করছ?"

"তোর মেসোকে।" বলেই ফোন কানে চাপল মিতিন, "হ্যালো?...এ কী, তুমি এখনও বেরোওনি?"

"... ..."

"রোববার তো কী আছে, এক্ষুনি ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে চলে যাও। আর হ্যাঁ, মিস্টার জোনাথনকে আড়ালে ডেকে বোলো তিনি যেন আজকের রাতটা একটু সজাগ থাকেন। কবরখানাতেও আজই চরকি মারবে। সমাধিটা কিন্তু আজই লোকেট করে ফেলা চাই।"

"... ..."

"ফিরে বলব। এটুকুই শুধু শুনে রাখ, জার্নি ফ্রুটফুল হয়েছে। কাজ মিটে গেছে। রাতের ট্রেনেই ফিরছি। মিস্টার মাইকেলের বাড়ি থেকে সন্ধের পর কোনও ফোন এলে আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ো।"

"... ..."

"ছাড়ছি।"

ফোন অফ করে নিথর দাঁড়িয়ে আছে মিতিন। ভাবছে কী যেন।

টুপুর অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, "কী গো মিতিনমাসি, সল্যুশান কিছু পেলে? দুম করে রাজনাথ সিং পিকচারে এসে গেল...!"

"হুম। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ।"

টুপুর ফ্যালফ্যাল তাকাল, "মানে?"

"মানেটা কাল বুঝিস'খন। এখন চল, রোদ বেশি বাড়ার আগে এখানকার তীর্থক্ষেত্রগুলো দেখে আসি।"

"তুমি মন্দিরে যাবে?"

"মন্দিরই তো। গঙ্গার ধারে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ি, আদমপুরে বনফুলের বাড়ি, খেলাত ঘোষের যে কাছারিবাড়িতে বসে বিভূতিভূষণ লেখালিখি করতেন সেই বাড়িটা, সবই তো মন্দির। পুণ্য স্থান।"

সামনে দিয়ে একটা রিকশা যাচ্ছিল। মিতিন হাত উঠিয়ে ডাকল, "এই, রোক্‌কে, রোক্‌কে। বাঙালিটোলা যানা হ্যায়।"

পরদিন সকালে কলকাতায় ফিরে পাঁচ মিনিটও হাঁপ জিরোনর অবকাশ পাওয়া গেল না। বাড়ি এসে হাত-মুখ ধুয়ে টুপুর সবে পার্থমেসোকে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ির গল্প শোনাতে শুরু করেছে, তখনই জোনাথন মাইকেলের ফোন। হতাশ সুরে জোনাথন জানাচ্ছেন গতকাল ফার্নিচার রুমে পার্থমেসো যে মন্ত্রপড়া টিউবলাইটটি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছিল সেটি নাকি আপনাআপনি নিবে গেছে। ঘটনাটা জোনাথনের নজরে পড়েছে ভোররাতে। বাথরুমে যাওয়ার সময়ে। অথচ কাল রাত সাড়ে বারোটাতেও আলোটা জ্বলছিল। জোনাথন কাল অনেক রাত অবধি জেগে ছিলেন, শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বার বার এসে দেখে গেছেন চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে কি না।

ঘরটা অবশ্য এখনও খোলেননি জোনাথন। তালাবন্ধই আছে।

তবে মিতিনের ওপর যে তিনি ভরসা হারিয়েছেন এটা তাঁর কথায় স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

পার্থ ধরেছিল ফোনটা। সবিস্তারে জোনাথনের বক্তব্য শুনিয়ে হালকা বিদ্রূপ ছুড়ল মিতিনকে, "কী হল, অ্যাঁ? তোমার টিঁউবও গন? তোমার ঝাড়ফুঁক তা হলে ফেল মারল?"

কাল গণপতি চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই বেশ গম্ভীর হয়ে আছে মিতিন। কথাও বলছে কম। ভাগলপুরের দ্রষ্টব্য বাড়িগুলো দেখার সময়েও তেমন যেন উচ্ছ্বাস ছিল না। রাতে ট্রেনেও টুপুরের সঙ্গে ক'টা কথা বলেছে হাতে গুনে বলা যায়। সারাক্ষণই যেন কী ভাবছে। কী যেন হিসেব কষছে মনে মনে।

প্রায় কুড়ি ঘণ্টা পরে মিতিনের মুখে এই প্রথম নির্মল হাসি ফুটল। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "মোটেই না মশাই। বরং বলতে পারো আমার ঝাড়ফুঁক হোলি স্পিরিটকে পেড়ে ফেলেছে। তড়িঘড়ি করে আমার মন্ত্রের তেজ কাটাতে গিয়ে বেচারা চরম ভুলটা করে ফেলল।"

"মানে?"

"চলো আমার সঙ্গে। দ্যাখো কীভাবে যবনিকা ফেলি। হোলি ঘোস্টকে হাতেনাতে পাকড়াই।"

টুপুর আর পার্থ মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ব্যাপারটা ঠিক মগজে ঢুকছে না।

মিতিন চোখ পাকিয়ে বলল, "তোমরা দু'জনে এরকম ভ্যাবলার মতো মুখ করে থেকো না তো। এটুকু তো তোমাদের বোঝা উচিত হোলি ঘোস্ট ও-বাড়িরই কেউ।"

পার্থ বলল, "কে?"

টুপুর বলল, "আমি বুঝে গেছি। উৎপল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস, আর মির্না বিশ্বাস। ওই দু'জন চিটিংবাজ মিলেই তো কুচুটে প্ল্যান

ভেঁজেছিল। সঙ্গে আছে এক মেঘনাদ। রাজনাথ সিং।”

পার্থ অবাক মুখে বলল, “সে আবার কে? কোত্থেকে হঠাৎ মঞ্চে এল?”

মিতিন বলল, “সব জানতে পারবে। তাড়াতাড়ি খোলস বদলে রেডি হয়ে নাও। আর একটা ফোন করে দাও মিস্টার মাইকেলকে। বলো আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছচ্ছি। এর মধ্যে উনি যেন সবাইকে খবর দিয়ে ডেকে নেন। উৎপল মির্না ডিক মিসেস জোনস সবাই যেন প্রেজেন্ট থাকে। ফার্নিচাররুমের তালা আমি ও বাড়ির সকলের সামনে খুলতে চাই। বাই দা বাই, তুমি লাইকোপোডিয়াম পাউডার ঠিকঠাক ছড়িয়েছিলে তো?”

“ও শিওর। কার্পেট ভরতি করে দিয়েছি।”

“কেউ দেখেনি?”

“নো চান্স।”

“গুড।”

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে স্নানে ঢুকে গেল মিতিন। পাঁচ মিনিটে বাজার সেরে ফেলল পার্থ। স্রেফ ডিম আর আলু। সদ্যজাগ্রত বুমবুমের হাতে দুধের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি লুচি ভেজে ফেলল ভারতী। গপাগপ জলখাবার খেয়ে মিতিনের টিম মাত্র বিয়াল্লিশ মিনিটের মধ্যে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত।

ট্যাক্সিতে উঠে মিতিন পার্থকে জিজ্ঞেস করল, “মাকগ্রেগরের সমাধির হদিস তো মিলেছে বললে!”

“মিলেছে মানে? ঢুঁড়তে গিয়ে জান কয়লা হয়ে গেছে। যা গোরুখোঁজা খুঁজেছি। গোটা সমাধি, আধভাঙা সমাধি, প্রায় ভগ্নস্তূপ বনে যাওয়া সমাধি...। অর্ধেক তো নামই পড়া যায় না। কোথাও কোথাও তো রীতিমত জঙ্গল হয়ে আছে, যে-কোনও সময়ে সাপখোপ বেরিয়ে আসতে পারে...”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত ব্যাখ্যান লাগবে না। এখন আমরা সোজা ওই সমাধিতে যাব।”

“ইলিয়ট রোড যাবে না?”

“আগে সমাধি। তারপর ইলিয়ট রোড।”

“কিন্তু ওখানে যে সবাই ওয়েট করবে।”

“করুক। টেনশান বাড়ুক।”

লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানার সামনে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মিতিন। টুপুর পার্থকে দু’পাশে নিয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। বিশাল সমাধিক্ষেত্রটায় পা রেখেই মনটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেল টুপুরের। কংক্রিটের জঙ্গলের মতো এই শহরটার মধ্যিখানে কী অপরূপ এক সবুজের সমারোহ। আম, জাম, শিরীষ, শিমুল, নিম, কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহরের ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে আছেন কতশত মৃত মানুষ। চিরনিদ্রায় রয়েছেন শান্তিতে। কাঁঠালিচাঁপার গাছগুলো ছেয়ে আছে ফুলে ফুলে। মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে। জ্যৈষ্ঠের মৃদু বাতাসে দোল খাচ্ছে ডালপালা। অলস ভাবে। টুপটাপ খসে পড়ছে শুকনো পাতারা। এমন জায়গায় এলে বাইরের ভিড় হট্টগোল কোনও কিছুই আর টের পাওয়া যায় না।

মাঝের সোজা পথ ধরে খানিকটা গেলে ডাইনে-বাঁয়ে দু’দিকে দু’টো আর্চ। ডানদিকে মধুসূদনের কবরে যাওয়ার রাস্তা, বাঁয়ে বেথুনবীথি। সত্যি, এমন ঘাসে ঢাকা পথকে বীথি বললেই বুঝি মানায় বেশি।

বেথুনবীথি ধরে খানিকটা গিয়ে ডানদিকে ঘুরল পার্থ। আবার বাঁয়ে। আবার ডাইনে। প্রায় কবরখানার পাঁচিলের কাছে এসে আগাছায় ঢাকা একখানা সমাধি দেখিয়ে বলল, “ওই যে তোমাদের রবার্ট ম্যাকগ্রেগর।”

সমাধির ছোট্ট চাতালটা ঝরাপাতায় ঢাকা। চাতালের গা বেয়ে

খাড়া মার্বেল পাথরের ফলক। ম্যাকগ্রেগরের নাম-ধাম ঝাপসা হয়ে এলেও এখনও পড়া যায়। জন্ম সতেরোই মে, আঠেরোশো বাইশ। মৃত্যু তেইশে এপ্রিল, আঠেরোশো চৌষট্টি।

টুপুর ফিসফিস করে বলল, "ট্রেনের আন্টি তো ঠিকই বলেছিলেন! তেইশে এপ্রিলই মারা গিয়েছিলেন ম্যাকগ্রেগর!"

মিতিন যেন শুনতেই পেল না। এক মনে দেখছে সমাধিটা। ঝুঁকে চাতাল থেকে পাতা কাঠিকুটি সরাল। বেশ বড় বড় হরফে একটা এপিটাফ খোদাই করা আছে চাতালে। মাত্র এক লাইনের:

SOMEONE WHO ONCE RULED DESTINY

পার্থ নিচু গলায় বলল, "কী দাম্ভিক সাহেব রে বাবা! নিজেকে নিয়তির হর্তাকর্তা ভাবত!"

"হুম।" মিতিন মাথা দোলাল। অন্যমনস্ক স্বরে বলল, "চলো, যাওয়া যাক।"

"দেখা শেষ? কী দেখলে?"

মিতিন সরাসরি উত্তর দিল না। আপন মনে বিড়বিড় করছে, "এত সহজ একটা ক্লু অ্যাদ্দিনেও কেউ ধরতে পারেনি? আশ্চর্য!"

"কী বকবক করছ?"

"কিছু না। চলো।"

কবরখানা থেকে বেরিয়ে হেঁটেই ইলিয়ট রোড চলে এল মিতিনরা। জোনাথনের গেটে পৌঁছে দেখল, উৎপল উদগ্রীব মুখে অপেক্ষা করছে বারান্দায়। মিতিন সামনে আসতেই বলল, "ব্যাপার কী ম্যাডাম? সবাইকে হঠাৎ একসঙ্গে তলব?"

মিতিন হেসে বলল, "আমার ম্যাজিকটিউবের শেষ খেল্‌টা দেখাব যে।"

"কিন্তু সে তো নিবে গেছে!"

"নেবাটাই তো খেলা। আসুন। ডাকুন সবাইকে।"

বাড়িসুদ্ধ লোক বন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জোনাথন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে তাকালেন টিউবলাইটের দিকে। আলোটা জ্বলছে না বটে, তবে অক্ষতই আছে।

জোনাথন বিহ্বল স্বরে বলে উঠলেন, "দেখেছ, হোলি স্পিরিট এবার শুধু নিবিয়ে দিয়ে গেছেন!"

মিতিন পিছন থেকে বলল, "হুঁ। সুইচ টিপে।"

একসঙ্গে সব ক'টা চোখ ঘুরল সুইচবোর্ডে। সত্যিই তো সুইচ অফ!

জোনাথন ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, "কী কাণ্ড! হোলি স্পিরিট সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে....!"

"এক সেকেন্ড।" মিতিন হাত তুলে সবাইকে ঘরে ঢোকা থেকে নিরস্ত করল। তারপর অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে জ্বালিয়ে দিল টিউবলাইট। আলোকিত ঘরে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "এবার আপনারা লক্ষ করুন কীভাবে হোলি স্পিরিট ঘরে এসেছিলেন। ভাল করে দেখুন কার্পেটের ওপর কী সুন্দর তাঁর পায়ের ছাপ পড়েছে। ওই যুদ্ধজাহাজের ছবি থেকে শুরু হয়েছে পায়ের ছাপ, সুইচবোর্ড অব্দি এসেছে, আবার ফিরে গেছে ছবিতে।"

মির্না কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "তার মানে হোলি স্পিরিট ওই যুদ্ধজাহাজে থাকেন?"

"হ্যাঁ। যুদ্ধজাহাজের ভেতরেই তাঁর আস্তানা।"

উৎপল সন্দিগ্ধ চোখে পাউডারের ওপর ফুটে থাকা স্পষ্ট পায়ের ছাপগুলো দেখছিল। বলল, "এ তো দেখছি মানুষের পায়ের ছাপ!"

"পায়ের ছাপ তো মানুষেরই হবে উৎপলবাবু। হোলি স্পিরিট তো মানুষের মধ্যেই বাস করেন।"

জোনাথন বললেন, "আমি তো তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝতে

পারছি না। হোলি স্পিরিট! মানুষ! যুদ্ধজাহাজ! পায়ের ছাপ!”

“বোঝাচ্ছি।” মিতিন পায়ে পায়ে জোনাথনের কাছে ফিরল। বৃদ্ধ মানুষটার হাত ধরে বলল, “শুনুন মিস্টার মাইকেল। ঠাণ্ডা মাথায় শুনুন। হোলি স্পিরিটটিরিট কিছু নেই। আপনাকে ঘিরে, কিংবা বলা যায়, আপনার এই বাড়িটাকে ঘিরে গভীর চক্রান্তের জাল বোনা হয়েছে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কেউ একজন হোলি স্পিরিট আমদানি করেছেন।”

“কে? কে সে?”

“ধাপে ধাপে বলছি।” মিতিন বড় করে শ্বাস নিল, “আপনি যে আপনার বাড়িঘরদোর বেচার ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহী নন এ-কথা আপনার পরিবারের সবাই জানে। এমনকি মিসেস জোন্‌সও। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, সম্ভবত আপনার কিছু অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল, আপনি ভাগলপুরের বাড়িদু'টো বিক্রি করতে রাজি হন। তারপর থেকে আপনার পরিবারের কারুর কারুর ধারণা জন্মায় আপনি হয়তো এবার ইলিয়ট রোডের বাড়িটা বেচলেও বেচতে পারেন। কেউ ভেবেছে লোভে পড়ে বেচবেন। কেউ ভেবেছে চাপে পড়ে। আপনাকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ-বাড়ির কোনও একজন এক প্রোমোটারের শরণাপন্ন হয়। সেই প্রোমোটারটি যথানিয়মে আপনাকে এসে মোটা টাকার টোপও দেয়, কিন্তু আপনি সরাসরি তাকে হাঁকিয়ে দেন।”

“সুরজমলের কথা বলছ? কে তার সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছিল?”

“আপনার পুত্র। শ্রীমান রিচার্ড মাইকেল।”

“এত বড় সাহস তোর? আমায় না জানিয়ে....?” জোনাথন রাগে গরগর করে উঠলেন, “হোলি স্পিরিটের কারসাজি তবে কি ওরই?”

“বলছি। ধৈর্য ধরুন।” মিতিন গলা ঝাড়ল, “এ-বাড়ি বেচার আগ্রহ কিন্তু আর একজনেরও আছে। কিংবা বলা যায় দু'জনের।

তবে তারা অনেক বুদ্ধিমান। আপনার বাড়ি বিক্রির বাসনা নেই জেনে তারা কিন্তু অনেক বেশি সতর্ক। তারাও যোগাযোগ রেখেছে প্রোমোটারের সঙ্গে।”

“সুরজমলের সঙ্গে?”

“না, অন্য প্রোমোটার। সে সুরজমলের চেয়েও ভয়ংকর। অবলীলায় খুনখারাপি করতে পারে। প্রয়োজন বুঝলে বাড়িতে আগুন লাগায়, আস্ত বাড়ি ধসিয়ে দেয়।”

উৎপল উত্তেজিত মুখে বলল, “এসব কী বলছেন আপনি? আপনি কি আমাদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন?”

“গলা চড়াবেন না মিস্টার বিশ্বাস। আপনি কীভাবে এই বৃদ্ধ মানুষটিকে প্রতারিত করেছেন তা কিন্তু আমি জানি। ভাগলপুরের বাড়িদু'টো চোদ্দো নয়, সাঁইত্রিশ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে। রাজনাথ সিং আমার কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছে।”

মির্না চেঁচিয়ে উঠল, “লাই লাই। টোয়েন্টি সিক্স ল্যাক।”

মিতিন আলগা হাসল, “যাক, সত্যিটা স্বীকার করলেন তা হলে?”

স্থানকালপাত্র ভুলে কথাটা বলে ফেলেই মির্নার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে সবার দিকে। জোনাথনের চোখে চোখ পড়তে একটু যেন কেঁপে উঠল।

জোনাথন স্তম্ভিত। বাক্যহারা। চোখের পলক পড়ছে না তাঁর।

উৎপল মিনমিন করে বলল, “বিশ্বাস করুন ড্যাডি, আপনাকে ঠকানোর আমাদের ইচ্ছে ছিল না। হঠাৎ সার্কাসের চাকরিটা চলে গেল, রোজগারপাতি হচ্ছিল না বিশেষ, ভাবলাম একটা জিমনাসিয়াম তৈরি করি, অথচ হাতে টাকা নেই, আপনিও বললেন আপনার হাত ফাঁকা..... ”

“তাই আপনি আর মির্না মিস্টার মাইকেলের কানের কাছে

ভাগলপুরের বাড়ি বেচার ধুয়ো তুললেন। মিস্টার মাইকেল নিমরাজি হতে আর তর সইল না, বাজার যাচাই করতে ডিসেম্বর মাসে স্বামী-স্ত্রী ছুটলেন ভাগলপুর। মিস্টার মাইকেলকে না জানিয়ে। সেখানে গিয়ে একজন প্রবীণ সজ্জন মানুষকে ছোটাছুটি করিয়ে দু'জন খদ্দেরও জুটিয়ে ফেললেন। দু'টো বাড়ি মিলিয়ে পঁচিশ লাখ। কিন্তু আপনারা তখন লোভে অন্ধ। মিস্টার মাইকেল আপনাদের কত টাকা দেবেন না দেবেন সেই ভরসায় না থেকে গোপনে ডিল করলেন ওই ভয়ংকর প্রোমোটারটির সঙ্গে। এমন লোক যার কলকাতা ভাগলপুর দু'জায়গাতেই ব্যবসা আছে। তারপর মিস্টার মাইকেলকে ভাগলপুর নিয়ে গিয়ে, কাল্পনিক একটা ভয় দেখানোর গল্প খাড়া করে হোটেলে আটকে রেখে, চোদ্দো লাখ টাকার দলিলে সই করতে বাধ্য করলেন। বাকি বারো লাখ আপনাদের পকেটস্থ হল। ওই টাকায় এবার একটা বাড়ির একতলা লিজ নিলেন, যন্ত্রপাতি কিনে ফেঁদে বসলেন জিমনাসিয়ামের ব্যবসা। সঙ্গে নিজেদের ফ্ল্যাটটাও নতুন ফার্নিচারে সাজানো হয়ে গেল।" মিতিন চোখ টেরচা করল, "কী, ভুল বলছি?"

উৎপল গুম।

ডিক চেঁচিয়ে উঠল, "দ্যাখো ড্যাডি, দ্যাখো! চিনে নাও তোমার আদরের মেয়ে জামাইকে। আমায় তো সহ্য করতে পারো না।"

"আপনি চুপ করুন ডিক। আপনিও কিছু সাধুপুরুষ নন। টাকার জন্য ছোঁকছোঁকানিও আপনার কম নেই। টাকা নিয়ে বুড়ো বাপকে ফেলে বিদেশ পালাতে চান। সেটাও কি ন্যায্য কাজ?"

"কিন্তু তার জন্য আমি কোনও চিটিংবাজি করিনি।"

"তার চেয়েও খারাপ কাজ করেছেন। সুরজমলের মতো শেয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়েছেন। একবার নাফার গন্ধ পেলে আর কি তাকে নড়ানো যায়? সুরজমল অতি ধুরন্ধর। একদিন মিস্টার

মাইকেলের সঙ্গে দেখা করেই সে বুঝে গেছিল তাঁকে নড়ানো খুব সহজ কাজ নয়। খানিকটা পিছিয়েও গেছিল। তখনই সুরজমলের কপাল জোরে আকাশ থেকে উড়ে এল এক আশাতীত প্রস্তাব। এই বাড়িরই কেউ একজন সুরজমলকে বলল, বাড়ি আমি বিক্রি করিয়ে ছাড়ব, কিন্তু তার জন্য আমার কমিশান চাই।"

ডিক গোমড়া মুখে বলল, "নিশ্চয়ই এটাও উৎপলেরই কাজ?"

উৎপল ঝেঁঝে উঠল, "কক্ষনও না। তুমি তুমি।"

"একদম উলটোপালটা কথা বোলো না। খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু।"

"এহ্, ধরা পড়ার ভয়ে মুখ ছোটাচ্ছে!"

"আপনারা থামবেন? আপনারা ছাড়াও এ বাড়িতে মানুষ থাকে।"

"কে? ড্যাডি?" ডিক ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বলল, "কী যা তা বলছেন! ড্যাডি নিজের বাড়ি নিজে বিক্রি করে....!"

"আরও একজনকে আপনারা হিসেবে ধরছেন না," বলেই তড়িৎগতিতে দরজায় এসেছে মিতিন। খপ করে চেপে ধরল মিসেস জোন্সের হাত। গম্ভীর স্বরে বলল, "কী মিসেস জোন্স, আপনার হোলি স্পিরিটের খেলাটা আমি ধরে ফেললাম তো? কীভাবে কায়দা করে ফার্নিচার নাড়াতেন, খুলে বলে দিন।"

ঘরে এই মুহূর্তে বজ্রপাত হলেও জোনাথন বুঝি এত চমকাতেন না। কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করেছেন, "ক্‌কী বলছ তুমি? আমাদের মিসেস জোন্স...?"

"ইয়েস। ইনিই কুইন অফ স্পেড। এ বাড়ির যাবতীয় রহস্যময় ঘটনা এঁরই উর্বর মস্তিষ্কের ফসল।"

হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মিসেস জোন্স। ধপ করে বসে পড়েছেন জোনাথন মাইকেলের পায়ের কাছে, "আমাকে ক্ষমা করে

দিন মিস্টার মাইকেল। টাকার প্রয়োজনে আমার মাথার ঠিক ছিল না। ডাক্তার বলেছিলেন লাখ দুয়েক টাকা খরচা করে কোমরে একটা অপারেশন করাতে পারলে হয়তো একদম নরমাল হয়ে যাবে ডেভিড। আবার আগের মতো হাঁটতে চলতে পারবে। সেই আশায় আমি....।" পাগলের মতো কার্পেটে মাথা ঠুকতে লাগলেন মিসেস জোন্‌স, "প্রভু যিশু আমায় ক্ষমা করবেন না। আমার নরকেও ঠাঁই হবে না। মিস্টার মাইকেলের মতো সোজাসিধে মানুষকে আমি ভয় দেখিয়েছি, কতশত মিথ্যে বলেছি...!"

কারও মুখে কোনও কথা নেই। ঘর জুড়ে পাক খাচ্ছে মিসেস জোন্‌সের কান্নার আওয়াজ।

টুপুরের বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। পার্থ পাশ থেকে প্রশ্ন করল, "কিন্তু মিসেস জোন্‌স কী করে বন্ধ ঘরে ঢুকে গভীর রাতে ফার্নিচার নাড়াতেন? উনি তো রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি চলে যেতেন?"

"আবার ফিরে আসতেন গভীর রাতে। সোজা রাস্তায় নয়, বাঁকা পথে।"

"কীরকম?"

"বাড়ির পশ্চিম দিকের পাঁচিলটা অনেকটা ভাঙা। তার ওপারে দুটো বাড়ির ফাঁক দিয়ে একটা সরু গলি আছে। গলিটা এঁকেবেঁকে গিয়ে পড়েছে রিপন লেনে। ওই রাস্তা দিয়ে এলে মিসেস জোন্‌সের বাড়ি থেকে এ-বাড়ি বড়জোর মিনিট পাঁচেক। আমরা যেদিন প্রথম এ-বাড়িতে এলাম, মনে আছে সেদিন একটা ছেলে মির্নাকে দেখে পাঁচিল গলে পালিয়েছিল? ওই পথেই।"

"সে নয় হল। তবে তালা না খুলে ঘরে ঢুকবেন কী করে?"

"মাটি ফুঁড়ে। যুদ্ধজাহাজ ভেদ করে," মিতিন হালকা হাসল, "বুঝলে না তো?"

বলেই মিতিন গটগট করে চলে গেছে যুদ্ধজাহাজের ছবিটার

কাছে। কাঠের চ্যানেলের তলায় হাত রেখে কী যেন পরখ করছে। হাতড়াতে হাতড়াতে হাত এক জায়গায় এসে থামল। ওপর দিকে চাপ দিতেই অভাবনীয় দৃশ্য!

ছবিসুদ্ধ দেওয়াল মঞ্চের পরদার মতো সরে গেল দু'পাশে। বেরিয়ে পড়েছে এক গহ্বর।

মির্না, উৎপল, ডিক দৌড়ে এসেছে। টুপুর, পার্থও। সকলে মিলে ঝুঁকে দেখল ফল্স দেওয়াল আর বাড়ির আসল দেওয়ালের মাঝের ওই ফাঁকটুকু দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভে।

মিতিন ঘুরে জোনাথনকে বলল, "এই গুপ্ত বেসমেন্টের খবর কি আপনার জানা ছিল না মিস্টার মাইকেল?"

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালেন জোনাথন, "না তো। সত্যিই জানতাম না।"

"সেটাই স্বাভাবিক। যিনি এই গোপন বেসমেন্টটি তৈরি করেছিলেন তিনি তো বাড়ি কমপ্লিট হওয়ার তিন বছর পরেই ওপারে। তাঁর স্ত্রী মেয়ে হয়তো বা কথাটা জানতেন, তবে সেভাবে কারুর কাছে চাউর করেননি। তারপর তো মেয়ে বিয়ে হয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, মা'ও মারা গেলেন একসময়ে, ঘরটাও পাকাপাকিভাবে বন্ধ থাকত— ব্যস, বেসমেন্টের খবর মোটামুটি চাপাই পড়ে গেছিল। ন্যান্সি মাইকেলের মৃত্যুর পর কোনও এক সময়ে ঘরটা ঝাড়াঝুড়ি করতে গিয়ে মিসেস জোন্স আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন নীচের ঘরখানা। নেমে দেখুন, নীচে পৌঁছলে ডানদিকে একটা সুড়ঙ্গ পাবেন, তার শেষে আবার সিঁড়ি। ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠলে মাথার ওপর লোহার ঢাকনা। ওই ঢাকনারই উলটো পিঠে লোহার আংটা আছে, যেটা এখন ঢেকে আছে ঘাসে। ওই আংটায় টান দিলেই সিঁড়ি মিলে যাবে নীচে নামার। আর নীচ থেকে ওপর ওঠার জন্য ঢাকনার ক্লিপে চাড় দিতে হবে একটা। ব্যস,

আসা-যাওয়ার রাস্তা মিলে গেল। কী মিসেস জোনস্, ঠিক ঠিক বললাম?”

মিসেস জোন্‌স করুণ চোখে তাকালেন। মুখে রা নেই।

মিতিন বলল, “বুদ্ধিটা কিন্তু আপনি জব্বর বার করেছিলেন মিসেস জোন্‌স। রাত্তির বেলা চুপি চুপি এসে লাঠি ঠুকে আওয়াজ করবেন, আর দিনের বেলা বুকে ক্রস এঁকে হোলি স্পিরিটের গল্পে হাওয়া দেবেন। কদ্দিন আর মনের সঙ্গে যুঝবেন মিস্টার মাইকেল, হোলি স্পিরিটের আতঙ্কে একদিন-না-একদিন তো ভেঙে পড়বেনই। ব্যস, আপনার কেল্লা ফতে, এন্ট্রি পেয়ে যাবে সুরজমল। কিন্তু হঠাৎ আমি এসে পড়ায় সোজা রাস্তাটা ঘোরালো হয়ে গেল। আপনার মনে ভয় ঢুকল বার বার একই কম্মো করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যান! তাই ফার্নিচাররুমে উপদ্রবের ঘটনাটা কমিয়ে দিলেন। এবং সুরজমলকে আর একবার ঘাই মারার জন্য ঠেলে পাঠালেন। লাভ হল না দেখে শুরু করলেন অন্য খেলা। আরও বেশি করে ভয় দেখাতে চাইলেন মিস্টার মাইকেলকে।”

পার্থ বলল, “তার মানে কাচ ভাঙাটাও মিসেস জোন্‌সেরই কাজ?”

“অবশ্যই। দেওয়াল-আলমারি ভাঙা। সেন্টার-টেবিল ভাঙা। শোকেস ভাঙা। বাল্‌ব-টিউব ভাঙা। এসব কাজে অবশ্য অপ্রত্যক্ষভাবে একজন সাহায্যও করেছেন। মিস্টার জোন্‌স।”

“কীভাবে?”

“কাচ ভাঙার পদ্ধতিগুলো বাতলে দিয়েছেন তিনিই। মিস্টার জোন্‌স কাজ করতেন ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে। সেখানে কাচ কাটার জন্য ডগায় হিরে বা কোয়ার্টজের ছোট্ট কুচি লাগানো এক ধরনের কাঠি ব্যবহার করা হয়। হিরে বা কোয়ার্টজ দিয়ে কাচের গায়ে দাগ টেনে দিলে অতি সামান্য চাড়ে ভেঙে যায় কাচ। ওই দাগ

টেনে দেওয়ার জন্যই কাচগুলো ভেঙেছে সরলরেখায়। এবং সবক'টা কাচই ভেঙেছে কেউ-না-কেউ কাচে হাত ছোঁয়ানোর পর। অর্থাৎ সামান্য চাপে। মিসেস জোন্সের পক্ষে বিকেলবেলা কাচগুলোতে ইচ্ছেমতন দাগ টেনে দেওয়ার কোনও অসুবিধেই ছিল না। কারণ ওই সময়টা তিনি একাই থাকেন, মিস্টার মাইকেল বেরোন বৈকালিক ভ্রমণে। এর পর সন্ধেবেলা থেকে শুরু হয়ে যায় কাচ ভাঙার উৎসব। অবশ্য বাল্‌ব-টিউব ফাটানোর জন্য অন্য পন্থা। এর জন্য একটু কষ্ট করতে হয়েছে মিসেস জোন্‌সকে। স্টোররুম থেকে ঘরাঞ্চি বার করে তাতে চড়ে বাথরুমের মিউরেটিক অ্যাসিড মাখাতে হয়েছে বাল্‌ব-টিউবে। এটাও করেছেন উনি বিকেলবেলাই। আর সন্ধের পর যেই না বাল্‌ব-টিউব জ্বালানো হয়েছে অমনি অ্যাসিড মাখানো কাচ তাত লেগে ফটাস। শুধু কালকে লাগানো এই ঘরের টিউবটাতেই উনি অ্যাসিড মাখানোর সুযোগ নেননি, সুইচ অফ করে ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে। ভেবেছিলেন হোলি স্পিরিটই সুইচ অফ করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। ওঁর আরও দুর্ভাগ্য, পার্থর ছড়িয়ে যাওয়া লাইকোপোডিয়াম পাউডারের কল্যাণে কার্পেটের ওপর ফুটে উঠেছে ওঁর পায়ের ছাপ। ইস, কী বিশ্রীভাবে আপনি ধরা পড়ে গেলেন মিসেস মারিয়া জোন্‌স!"

মিসেস জোন্‌স ডুকরে উঠলেন, "আমি ঘোর পাপী। আমায় তুমি শাস্তি দাও।"

মিতিন বলল, "আমি শাস্তি দেওয়ার কে? আপনি তো অপরাধ করেছেন মিস্টার মাইকেলের কাছে। সাজা যা দেওয়ার তিনি দেবেন।"

জোনাথন বড়সড় শ্বাস ফেললেন। ভার গলায় বললেন, "কাকে শাস্তি দেব আমি? শুধু মিসেস জোন্‌সকে? আর আমার ছেলে? আমার মেয়ে-জামাই? তাদের অপরাধের কী হবে? কী সাজা দিলে

আবার আপনজনদের ওপর আমার বিশ্বাস ফিরে আসবে বলতে পারো? ওরা আমায় ভালবাসতে না পারে, আমি তো ওদের ভালবাসি। জীবনের শেষ ক'টা দিন ওদের ছাড়া আমি বাঁচবই বা কী করে?"

জোনাথনের গলা ধরে এল। চোখ জলে ভরে গেছে। তাঁর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ডিক, উৎপল আর মির্না।

জোনাথনের জন্য টুপুরের খুব কষ্ট হচ্ছিল। কী অসহায় পরিস্থিতিতে যে পড়ে গেছেন মানুষটা!

কখন যেন নিঃসাড়ে চলে গেছে মির্না-উৎপল। ডিকও আর বাড়ির ত্রিসীমানায় নেই এখন। মিসেস জোন্‌সও বিদায় নিতে চেয়েছিলেন, জোনাথন ছাড়েননি। মরমে মরে থাকা মহিলাটিকে আর খাঁড়ার ঘা দিতে চাননি জোনাথন। নিঃশব্দে মিতিন, পার্থদের হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিয়ে তিনি এখন রান্নাঘরে।

জোনাথন কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন। এখনও খুবই বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। বিষণ্ণও। মিতিন তাঁকে গণপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার গল্প বলছিল, তিনি যেন সেভাবে শুনছিলেন না ভাল করে।

আচমকাই একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন, "একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না প্রজ্ঞাপারমিতা। উৎপল-মির্না হঠাৎ তোমার কাছে ছুটল কেন?"

মিতিন একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল,

“উৎপল-মির্নার মনে কী ছিল বলা কঠিন। তবে আমার যা অ্যাসেসমেন্ট, ওঁরা গেছিলেন খানিকটা বাধ্য হয়ে। রাজনাথ সিং-এর কাছে ওঁরা ভাগলপুরের বাড়ি দুটো বেচেছিলেন বটে, তবে তখনও উৎপলবাবুরা বুঝতে পারেননি রাজনাথ সিং কতটা বিপজ্জনক। গণপতিবাবুর মাধ্যমে বিক্রি হলে আসল দাম আপনার অজানা থাকবে না, অতএব টাকা মারারও নো চান্স, শুধু এই কারণেই গণপতিবাবুকে এড়িয়ে রাজনাথের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মুফতে বারো লাখ এল বটে, তবে ওঁরা খপ্পরেও পড়ে গেলেন রাজনাথের। এই বাড়িটাও তাকে বিক্রি করার জন্য চাপ তৈরি করতে লাগল রাজনাথ। ব্ল্যাকমেলিং। উপায়ান্তর না দেখে কীভাবে আবার আপনাকে জপানো যায় তাই নিয়ে উৎপল যখন ভাবনাচিন্তা করছেন, তখনই শুরু হল ফার্নিচাররুমে উপদ্রব। তার আগে সুরজমল একবার ঘুরে গেছে এ-বাড়ি থেকে। উৎপলও তো বুদ্ধিমান লোক, তাঁর সিক্সথ সেন্স বলছিল সুরজমলই কোনও ফাউলপ্লে করছে। উটকো ঝামেলায় তাই একটু দিশেহারাই হয়ে গেলেন উৎপল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন ভূতের গল্পটা বাড়িতে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে, আজ নয় কাল আপনি দুর্বল হয়ে পড়তেই পারেন। কিন্তু সুরজমল যদি জমিবাড়ির দখল পায়, রাজনাথ সিং তো উৎপলকে ছেড়ে কথা বলবে না। সুতরাং তাঁকে প্রথমে সুরজমলকে সিন থেকে আউট করতেই হবে।

“এবং তার জন্য প্রয়োজন অলৌকিক ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয়।” পার্থ ফস করে বলে উঠল, “বিকজ়, কীভাবে বন্ধ ঘরে ফার্নিচার নড়ছে তা উৎপলদের ঠিক ঠিক মাথায় ঢুকছিল না।”

“কারেক্ট।” মিতিন ঘাড় নাড়ল, “ইতিমধ্যে হঠাৎ আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। পুরনো একটা বাড়ি ধসে পড়ল লেবুতলায়। মারা গেলেন এক বৃদ্ধ। খবরটা দেখে কাঁটা হয়ে গেলেন উৎপলরা। যদি

এমন কিছু ইলিয়ট রোডেও ঘটে? যদি সুরজমলই ঘটায়? রাজনাথের স্বরূপটাও তদ্দিনে মোটামুটি চিনে গেছেন উৎপলরা। বুঝেছেন রাজনাথের পক্ষেও একটা মারাত্মক কিছু করে ফেলা অসম্ভব নয়।" মিতিন জোনাথনের দিকে ঘুরল, "আপনার মেয়ে-জামাইয়ের খুব টাকার লোভ আছে বটে, তবে আপনার কোনও বড়সড় ক্ষতি হয়ে যাক সেটা মির্না কখনওই চাননি। উৎপলও না।"

"তা ছাড়া আর একটা ভয়ও নিশ্চয়ই ছিল উৎপলের," পার্থ বিজ্ঞের মতো বলল, "যদি কোনও অঘটন ঘটে, যদি মিস্টার মাইকেলের কিছু হয়ে যায়, তবে তো পুলিশকেস হবেই। আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। তারা ঠিক গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আদ্যোপান্ত সব বার করবে। ভাগলপুরের কীর্তিটি প্রকাশ পেলে নির্ঘাত এই কেসেও ওদেরই চক্রান্তকারী ধরে নিয়ে স্ট্রেট পুরে দেবে গারদে।"

"হ্যাঁ। এটাকেও একটা কারণ বলা যায়।" মিতিন শেষ চুমুক দিয়ে কফির কাপ নামিয়ে রাখল, "নিজেদের গা বাঁচানোর তাগিদও তো একটা বড় তাগিদ। পাশাপাশি অবশ্য আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। উৎপলদের আদৌ না ছুঁয়ে যদি আমি সুরজমলের চাতুরিটা ধরে দিই, তা হলে মেয়ে-জামাইয়ের ওপর মিস্টার মাইকেলের আস্থা আরও বাড়বে। কত বড় একটা বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার পেলেন, এই ভেবেই তিনি আর উৎপল-মির্নার অনুরোধ তখন ঠেলতে পারবেন না। বাড়িটাও সহজেই রাজনাথের হাতে তুলে দেওয়া যাবে।"

পার্থ বলল, "তা ছাড়া মিস্টার মাইকেলের এই 'মেগ্‌না' যদি সত্যি সত্যি হানাবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়, উৎপলের তো মেটিরিয়াল লস। রাজনাথ সিং-এর কাছে এ-বাড়ির ভাও কমবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুবরের বখরাও।"

"বটেই তো। এরকম সাত-পাঁচ ভেবে দোনামোনা করতে

করতেই তো উৎপলদের আমার কাছে আসা। ইনিশিয়াল মিশন, ওই যে বললাম, যেন তেন প্রকারেণ সুরজমলকে আউট করা।"

"কিন্তু এটা তো মানবে, আমার বন্ধুর জহুরির চোখ।" পার্থ ঠাট্টা জুড়ল, "মিসেস জোন্‌স যদি ইস্কাবনের বিবি হন তো সুরজমল ইস্কাবনের টেক্কা।"

"ওটা আন্দাজ করা তেমন কঠিন নয়। যে-বাড়িতে কস্মিনকালে ভূত দেখা যায়নি, সেখানে সুরজমল এল আর অমনি ভূতের নৃত্য শুরু হয়ে গেল? তোমার বন্ধু তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না।" মিতিন মাথা দোলাল, "তবে মিসেস জোন্‌সের কথাটা কিন্তু ওঁর মাথাতেই আসেনি।"

"তুমিই বা মিসেস জোন্‌সকে কী করে সন্দেহ করলে প্রজ্ঞাপারমিতা?" জোনাথন অনেকক্ষণ পর কথা বললেন, "আফটার অল শি ইজ সো টেন্ডার, সো অ্যাফেকশনেট, সো লয়াল...!"

"সত্যি কথা বলতে কী, মিসেস জোন্‌স এমন একটা কাজে জড়িত থাকতে পারেন, আমিও ভাবতে পারিনি। তবে আর্চের ফাঁক গলে বাচ্চা ঢুকছে, এমন একটা আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করানোর জন্য তিনি যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাও আমার মোটেই ভাল লাগেনি। বেড়াল থিয়োরি দিয়ে ওঁকে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। যদিও প্রথম থেকেই বুঝেছি, যে ফার্নিচাররুমে আওয়াজ করছে, সে বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি প্রমাণ না করে ছাড়বে না। ঠিক তাই হল। শুরু হল কাচ এপিসোড। আবার সুরজমলকে জড়িয়ে দিতে চাইলেন উৎপল। এদিকে কাচ ভাঙার প্যাটার্ন দেখেই আমি পদ্ধতিটা বুঝে যাই। তখন আমি হিসেব করতে শুরু করি কাজটা কে করতে পারে? উৎপলই কি? সম্ভাবনা কম। প্রতিদিন বিকেলে এসে ঘরগুলোর নির্দিষ্ট আসবাবে দাগ টেনে যাওয়া তো

উৎপলের পক্ষে কঠিন। অন্তত মিসেস জোন্‌সের চোখ এড়িয়ে। তখনই প্রথম মিসেস জোন্‌সের ভাবনাটাও মাথায় আসে। কথায় কথায় জানতেও পারলাম ওঁর স্বামী চাকরি করতেন ফটো বাইন্ডিংয়ের দোকানে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত কাচ কাটাকাটি করে। শুধু ফার্নিচারের কাচ ভাঙলে ব্যাপারটা তেমন ভয়াবহ হবে না ভেবে বালব-টিউবের গায়ে অ্যাসিড মাখানোরও আয়োজন করেন মিসেস জোন্‌স। সম্ভবত এই সায়েন্টিফিক থিয়োরিটাও তিনি জেনেছিলেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। তবে তখনও আমার মিসেস জোন্‌সের মোটিভ নিয়ে সংশয় ছিল। নিজে করলে তিনি কী উদ্দেশ্যে করছেন? নাকি কেউ তাঁকে দিয়ে করাচ্ছে? এবং সে কে?"

"অর্থাৎ তখনও তুমি সুরজমলের সঙ্গে মিসেস জোন্‌সকে যুক্ত করতে পারোনি!"

"করার উপায়ও ছিল না। সুরজমলের কাছে বুঝতে গেলাম, সুরজমল ব্যাপারটা আরও গুলিয়ে দিল। তার কথায় মনে হল, ডিক এর মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ডিকও তো বিকেলে বাড়ি থাকে না! ডিকের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, সে বড় বেশি আবেগে চলে। ঠাণ্ডা মাথায় অত সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং হোলি স্পিরিটের সম্পর্কে তার বিশ্বাসটাও জেনুইন। নইলে সে হোলি স্পিরিটকে দেখার গল্প করে আমাকে সুড়ঙ্গে ঢোকার রাস্তা আবিষ্কারের সূত্রটা জুগিয়ে দিত না। এর পরই আমি যাই মিসেস জোন্‌সের বাড়ি। এবং সেখানেই মিসেস জোন্‌সের সঙ্গে সুরজমলের আঁতাতটা ধরে ফেলি।"

টুপুর বিস্মিত মুখে বলল, "কীভাবে?"

"তামাকের গন্ধে মিস ওয়াটসন।"

"মানে?"

"তোকে সেদিন বললাম না, তোর নাক এখনও পাকেনি! এখনও

বুঝছিস না?"

"না মানে..."

"ওরে বোকা, সুরজমলের পাইপ আর মিস্টার জোন্সের হাতে পাকানো সিগারেট, দুটোরই তামাক এক। এক গন্ধ।"

"বা রে, একই ব্র্যান্ডের তামাক দু'জনে খেতে পারে না?"

"অবশ্যই পারে। কিন্তু ওই অতি দামি বিদেশি তামাক কেনা মিস্টার জোন্সের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব। মিস্টার জোন্সের বিছানার পাশে যে পাউচটা পড়ে ছিল তার ব্র্যান্ডনেম দেখেছিলি? ওই খাঁটি ভার্জিনিয়া টোব্যাকোর পাউচটির দাম অন্তত চারশো টাকা। ডলার থেকে কনভার্ট করলে ওরকমই দাঁড়াবে। কী বুঝলি?"

টুপুর মাথা চুলকোচ্ছে। মিতিন বলল, "অর্থাৎ সুরজমল মিসেস জোন্সের বাড়িতে পদধূলি দেন। তারই বদান্যতায়...। হয়ে গেল দুয়ে দুয়ে চার। এর পর মিসেস জোন্সের মোটিভ অনুমান করতেও অসুবিধে হয় না। মনে আছে, মিস্টার জোন্স বলছিলেন, সেরে ওঠার চান্স আমার নেই... অপারেশান করতে গেলে দু'লাখ খরচা, অত টাকা আমরা পাব কোত্থেকে...? তোর নোটে কিন্তু এই কথাগুলোও মিস করে গেছিস।"

টুপুর অধোবদন।

জোনাথনের ধন্দের ঘোর এখনও কাটেনি। দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু মিসেস জোন্সের ফার্নিচার রুমে যাওয়া-আসা করার রাস্তাটা তুমি খুঁজে পেলে কী করে?"

"ফার্নিচাররুমে যে একটা কোনও রহস্যময় ব্যাপার আছে এটা আমার প্রথম দিনই মনে হয়েছিল। সব আসবাবে থিকথিকে ধুলো, অথচ অয়েলপেন্টিংটার তলার কাঠের চ্যানেল দিব্যি পরিষ্কার। অর্থাৎ ইউজ় হয়। হাত পড়ে। ছবিটারও মধ্যিখানে চুলের মতো সরু

একটা দাগ। তাও আবার লম্বালম্বিভাবে! সরলরেখায়! ক্যানভাস কি ওইভাবে ফাটতে পারে? আগেকার দিনে প্রায় বাড়িতেই গুপ্তকক্ষ তৈরি করা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, এ-কথাটাও আমার মাথায় ছিল। এর পরেই ডিকের একটা স্টেটমেন্ট আমায় অনেকটা গাইড করে দিল। ডিক বলল, হোলি স্পিরিট নাকি পেছনের উঠোনের মাটিতে ভুস করে নেমে গেছিল। শুনেই সঙ্গে-সঙ্গে আমি বাড়ির পেছনে গিয়ে ঘাসে চাপা পড়া সুড়ঙ্গের ঢাকনাটা আবিষ্কার করে ফেলি। এবং লুকিয়ে লুকিয়ে ঢাকনা খুলে দেখেও নিই। ওই সময়েই আংটার পাশ থেকে কুড়িয়ে পাই একটা তামার আংটিও। মিসেস জোন্‌সকে যেটা মাঝের আঙুলে পরতে দেখেছি।" বলতে বলতে মিতিন চোখ ঘোরাল, "একটা প্রশ্ন কিন্তু আপনারা কেউ করলেন না এখনও। লাস্ট যে কাচের শোকেসটা ভাঙল, সেটা অমন ছ্যাতরা ফ্যাতরা হয়ে চুরমার হয়েছিল কেন? আর কেনই বা ওভাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হল পুতুলগুলো?"

"এ তো পাঁচ বছরের শিশুও বোঝে।" পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "মিসেস জোন্‌স কেসটাকে আরও জটিল করে দিতে চেয়েছিলেন।"

"ঘেঁচু বুঝেছ।" মিতিন বুড়ো আঙুল দেখাল, "ওই শোকেসটা মিসেস জোনস ভাঙেনইনি।"

"যাহ্ বাবা, তা হলে ভাঙলটা কী করে?"

"সেকেন্ড একজন ভেঙেছে। যে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চেয়েছিল। যার গুপ্তধনের বাসনা অতি প্রবল। শোকেসের কাচ ভেঙে পুতুলগুলোকে আছড়ে আছড়ে ফেলে সে দেখে নিতে চেয়েছিল পুতুলের মধ্যেই কোনও হিরে মণিমাণিক্য লুকোনো আছে কি না। ভেবেছিল ওই শোকেস ভাঙাটাও অন্য কাচ ভাঙার ঘটনার সঙ্গে চালিয়ে দেওয়া যাবে।"

"কে সে?"

"তোমার বন্ধু। শ্রীমান উৎপল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস। মিস্টার মাইকেল যখন আওয়াজ পেয়ে এ ঘরে এলেন, উৎপলও তখন এ-ঘরে মজুত। মিস্টার মাইকেল ভাবলেন উৎপলও বুঝি আওয়াজ শুনেই ছুটে এসেছেন। অ্যাক্টিংটাও ভালই করেছিলেন উৎপল। তবে তাঁর পরিশ্রম অ্যাক্টিং সবই বৃথা গেল, কিছুই মিলল না।"

"নেই কিছু তো পাবে কোত্থেকে?" জোনাথন সহসা উত্তেজিত, "কী বজ্জাত জামাই! কতদিনকার পুরনো পুতুলগুলোকে শেষ করে দিল!"

"গুপ্তধনটা কিন্তু আছে মিস্টার মাইকেল।"

"আছে?"

"অবশ্যই। এবং তার মূল্য হিরে-জহরতের চেয়ে অনেক বেশি।"

"কী জিনিস সেটা? কোথায় আছে?"

"আপনার চোখের সামনেই আছে মিস্টার মাইকেল।"

জোনাথন তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। এ-শোকেস ও-শোকেস, এ-দেওয়াল, ও-দেওয়াল।"

মিতিন পার্থকে বলল, "ঘরাঞ্চি এনে দেওয়াল থেকে তলোয়ারটা পাড়ো তো।"

পার্থ অবাক। মিতিন মৃদু ধমক দিল, "আঃ, যা বলছি করো না।"

স্টোররুম থেকে ঘরাঞ্চি এনে কষ্ট করে ভারী অস্ত্রখানা নামাল পার্থ। হাতে নিয়ে আলগাভাবে খাপের ধুলো ঝাড়ল মিতিন। তারপর হ্যাঁচকা টানে খাপ থেকে বার করেছে তলোয়ার। ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা ঝলসে উঠল বাতাসে।

দু'হাতের তেলোয় তলোয়ারখানা কায়দা করে রাখল মিতিন। তারপর বাড়িয়ে দিল জোনাথনের দিকে। নাটুকে ভঙ্গিতে বলল, "প্লিজ অ্যাকসেপ্ট দা মোস্ট প্রেশাস পজেশান অফ মিস্টার রবার্ট ম্যাকগ্রেগর। এই তলোয়ার ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ উপহার

পাঠিয়েছিলেন মহারাজা কানোয়ার সিং-কে। এর অ্যান্টিক ভ্যালু এখন আর আপনি টাকায় হিসেব করতে পারবেন না মিস্টার মাইকেল।"

কাঁপা কাঁপা হাতে তলোয়ারখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন জোনাথন। প্রায় দেড়শো বছর হয়ে গেছে, এখনও কোথাও এতটুকু মরচে ধরেনি। চকচক করছে, যেন নতুন।

মিতিন বলল, "আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব মিস্টার মাইকেল?"

জোনাথন অস্ফুটে বললেন, "কী?"

"এই তলোয়ার আপনি মিউজিয়ামকে দান করে দিন।"

"দিয়ে দেব? এত মূল্যবান একটা জিনিস?"

"এ তো আপনার বাড়িতে থাকার কথা নয়। মিউজিয়ামই এর যোগ্য স্থান। তা ছাড়া এই লুঠের মাল যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলে রবার্ট ম্যাকগ্রেগরের পাপের ভার খানিকটা লাঘব হবে।"

জোনাথন থম মারা মুখে একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাই হোক।... কিন্তু তুমি কী করে বুঝলে এটাই গুপ্তধন?"

"গুপ্তধন নয়, মহামূল্য ধন। আপনারাই মিস্টার ম্যাকগ্রেগরের উইলের ভুল অর্থ করেছেন এতদিন। উনি লিখে গেছিলেন, লিভিং বিহাইন্ড দা মোস্ট প্রেশাস পজেশান অফ মাই লাইফ। হুএভার লঙ্স ফর ইট শ্যাল গো টু দা গ্রেভ। তার মানে কিন্তু এই নয়, যে মহামূল্য ধনটা চাইবে তাকে মরতে হবে। আসলে তাকে যেতে হবে রবার্ট ম্যাকগ্রেগরের কবরে। রবার্ট ম্যাকগ্রেগরের সমাধিলিপি থেকে উদ্ধার করতে হবে সম্পত্তিটি কী।"

পার্থ অবিশ্বাসের সুরে বলল, "যাহ্, কী এমন লেখা ছিল ওখানে? এপিটাফে তো শুধু লেখা ছিল, সামওয়ান হু ওয়ান্স রুলড

ডেসটিনি!”

“ওটাই তো ক্লু। প্রতিটি শব্দের ফার্স্ট লেটারগুলো অতিকায়। কী সেই লেটারগুলো? এস ডব্লু ও আর ডি। অর্থাৎ সোর্ড। তলোয়ার। তুমি এই ঘরে প্রথম দিন ঢুকেই বলেছিলে না, ওই রকম তলোয়ার তুমি কোথাও দেখেছ? মনে আছে, গত বছরের আগের বছর আমরা আগ্রা ঝাঁসি গোয়ালিয়র বেড়াতে গেলাম? ওখানে...”

“ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। মনে পড়েছে।” পার্থ মিতিনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল, “ঝাঁসির ফোর্টে দেখেছি। কেল্লার মিউজিয়ামে অবিকল এইরকম হাতলঅলা একটা তলোয়ার রাখা আছে।”

“ইয়েস। স্বয়ং ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ ওই তলোয়ার ব্যবহার করতেন। এ তারই জুড়ি। কারুকাজ করা বাঁটখানা ভাল করে দ্যাখো, ঝাঁসির রাজবাড়ির ছাপ মারা রয়েছে।”

জোনাথনের কাছে গিয়ে তলোয়ারখানা নিরীক্ষণ করল পার্থ। টুপুরও আলতো হাত বোলাল তলোয়ারের গায়ে। সন্তর্পণে। পাছে হাত কেটে যায়। হাতলের সূক্ষ্ম কাজটাও দেখল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। ছাপটাও।

টুপুর মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করছিল এরকমই দু'খানা খোলা তলোয়ার দু'হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ব্রিটিশ সেনাপতি হিউজ রোজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছেন লক্ষ্মীবাঈ। সিংহির বিক্রমে গর্জন করছেন, মেরি ঝান্‌সি নেহি দুংগি...

ভাবনার মাঝেই ঘরে ম্রিয়মাণ মুখ মিসেস জোন্‌স। মৃদু স্বরে মিসেস জোন্‌স জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি লান্চ করে যাবে?”

মিতিন বলল, “না না, আমরা এবার উঠব।”

জোনাথন বললেন, “খেয়ে যাও না। অসুবিধের কী আছে?”

“আজ থাক। অন্য একদিন হবে। আপনি মানসিকভাবে একটু থিতিয়ে নিন।”

"আর থিতোনো!"

"এত মনখারাপ করছেন কেন? আপনার ছেলেমেয়ে, জামাই কেউ তো আদ্যন্ত শয়তান নয়। লোভে পড়ে অন্যায় করেছে..."

"আমি তো সবাইকে ক্ষমা করেই দিয়েছি প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"হুম। জানেন তো, ক্ষমাটাও কখনও কখনও খুব বড় শাস্তি।" মিতিন কাঁধে ভ্যানিটিব্যাগ ঝুলিয়ে নিল, "আজ চলি। দরকার হলে ডাকবেন, অবশ্যই চলে আসব।"

জোনাথন বললেন, "একটু দাঁড়াও।" বলেই পরদা সরিয়ে ঢুকেছেন নিজের ঘরে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন, হাতে একটা চেক। বললেন, "এটা রাখো।"

মিতিন হাতে নিয়ে দেখল চেকটা। বলল, "আমায় কিন্তু উৎপলবাবু আগে সাড়ে সাত হাজার দিয়েছিলেন।"

"দিক। এটা আমি দিলাম।"

মিতিন হেসে বলল, "ভূত তাড়ানোর মজুরি পঁচিশ হাজার? নাকি এতে গুপ্তধন মিস্ট্রি সল্‌ভ করারও ইনাম আছে?"

"দুটোর কোনওটাই নয় মাই ডিয়ার চাইল্ড।" জোনাথনের চোখ ছলছল করে উঠল, "তোমার ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। ধরে নাও, এটা আমার কাছের মানুষদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্য সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার।"

রাস্তায় বেরিয়ে টুপুর ঘুরে একবার দেখল বাড়িটাকে। সিপাই বিদ্রোহের স্মৃতিমাখা এ-বাড়ির আয়ু এবার বোধ হয় ফুরিয়েই এল।

মিতিন ঘড়ি দেখছে। পার্থকে বলল, "পৌনে একটা বাজে, তুমি কি এখান থেকে সোজা প্রেসে যাবে?"

"গোলি মারো প্রেস। এখন আমার এ-পাড়ায় একটা জরুরি কাজ আছে।"

"কাজ? এখানে?"

"ইয়েস ম্যাডাম। এক্ষুনি সিরাজে ঢুকে দু'প্লেট বিরিয়ানি সাঁটাতে হবে। টুপুরকে বলতে হবে কীভাবে কলকাতায় বিরিয়ানি এল।... বুঝলি টুপুর, বিরিয়ানিকে কলকাতায় এনেছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের বাবুর্চি। জানিস নিশ্চয়ই, আঠেরোশো সাতান্ন সালে ব্রিটিশরা ওয়াজিদ আলি শাহকে বন্দি করে ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে আসে? পরে অবশ্য তাঁকে রাখা হয়েছিল খিদিরপুরের ওপাশটায়। সেখানে তিনি একটা মাটির কেল্লা বানিয়েছিলেন। যার থেকে জায়গাটার নাম মেটিয়াবুরুজ। বুরুজ মানে যে কেল্লা সেটা নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না? সেই মেটিয়াবুরুজেই বাবুর্চি নিয়ে বেশ ফুর্তিতেই থাকতেন..."

"ওফ্, আবার তোমার সেই জ্ঞান বিতরণ শুরু হল!" মিতিন ঝেঁঝে উঠল, "কোনও লেকচার নয়, বিরিয়ানি খেয়েই সোজা বউবাজার যাবে। টুপুরকেও এখন বাড়ি গিয়েই হোমটাস্ক শেষ করতে হবে। ওর ছুটি কিন্তু ফুরিয়ে এল।"

ইস, আবার সেই পড়াশুনো! সেই স্কুল! মেজাজটা মিইয়ে গেল টুপুরের। ঠিক এই মুহূর্তে কথাটা না মনে করিয়ে দিলে কি মিতিনমাসির চলছিল না!

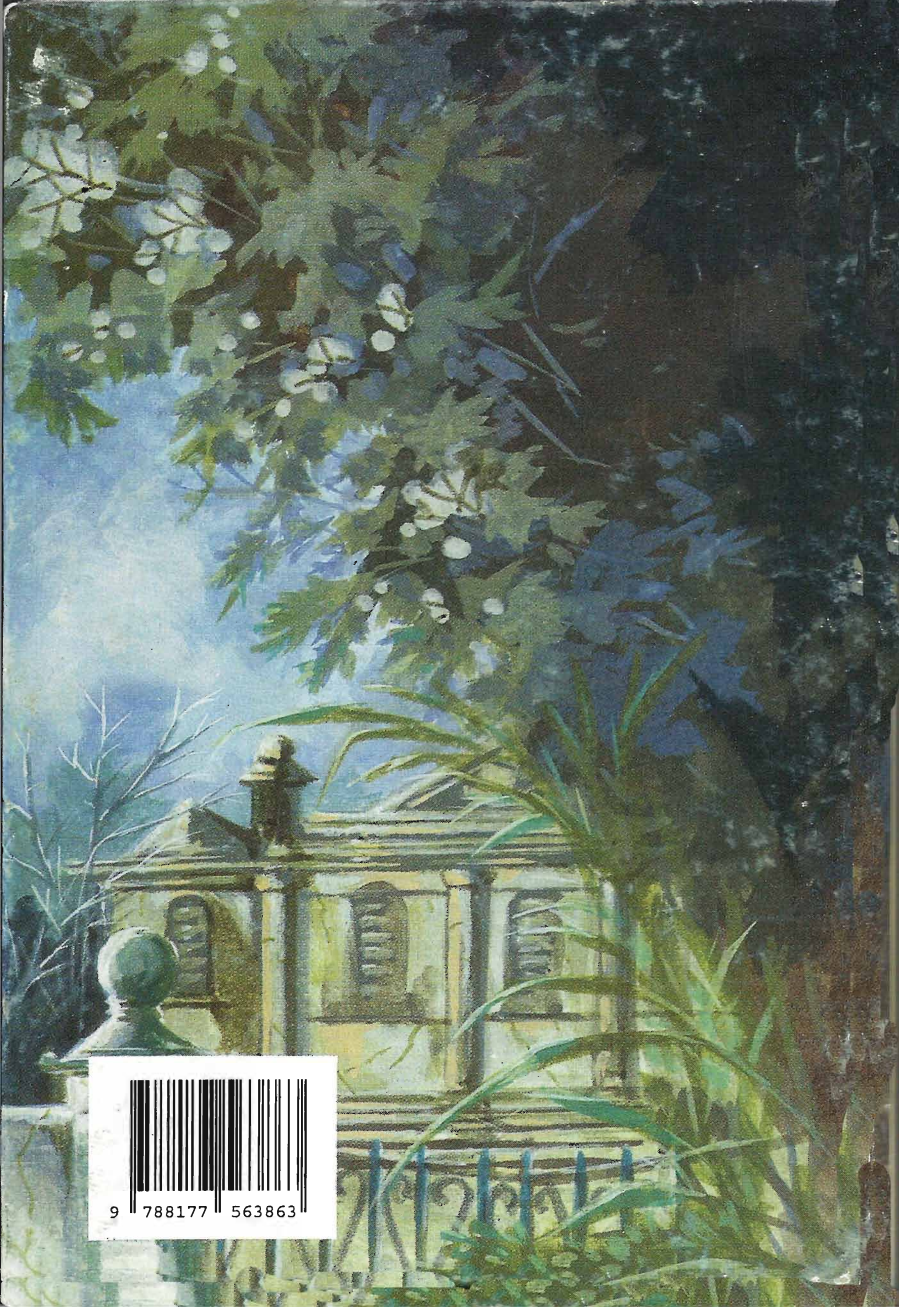

9 788177 563863

কিশোর কাহিনী সিরিজ

কেরালায় কিস্তিমাত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

কেরালায় কিস্তিমাত

কেরালায় কিস্তিমাত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

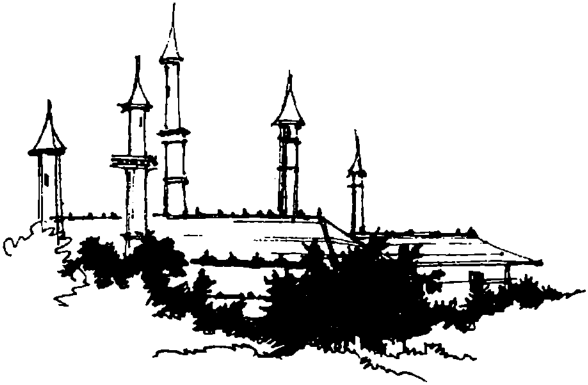

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অমিতাভ চন্দ্র

আ ন ন্দ

অনুজপ্রতিম
সুনীল নালিয়াথকে

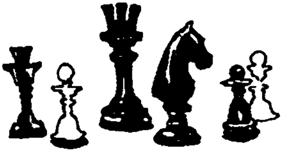

ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস এর্নাকুলাম টাউন পেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নামার তোড়জোড়। পার্থ আর মিতিন সিটের তলা থেকে টেনে-টেনে জিনিস বের করছে। টুপুরও হাত লাগাল মাসি-মেসোর সঙ্গে। গুনছে লাগেজ, মনে-মনে হিসেব রাখছে সুটকেস আর কিট্‌ব্যাগের। বুমবুমও বেজায় ব্যস্ত হঠাৎ। তড়িঘড়ি চিপ্‌স শেষ করছে। যেন স্টেশন এসে গেলে কেউ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে প্যাকেট। টুপুর একবার হাত বাড়াতেই ঝট করে সরে গেল বুমবুম। চিপ্‌সের মতো মহা মূল্যবান খাবার ভাগাভাগিতে সে মোটেই রাজি নয়।

টুপুরের মা বাথরুমে গিয়েছিলেন। ফিরেই বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে বললেন, "কী রে মিতিন, তোর জামাইবাবু যে দেখি এখনও বসে-বসে ঢুলছে! এবার তাকে একটু নড়াচড়া করতে বল।"

একটু আগে বাবাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে জাগিয়েছে টুপুর। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর জব্বর এক ঘুম লাগিয়েছিলেন অবনী। ওপরের বার্থ থেকে অবরোহণ করলেন এইমাত্র, এখনও তাঁর ঘোর কাটেনি। হাই তুলতে তুলতে বললেন, "আবার আমায় নিয়ে পড়লে কেন?"

"না বলে পারছি না, তাই। ট্রেনে ওঠার পর থেকে তো কুটোটি নাড়োনি। রাত্তিরে তোমার চাদর-কম্বল পর্যন্ত পেতে দিতে হয়েছে। এবার অন্তত কিছু করো।"

"আহা, ওরা করছে তো। কেন মিছিমিছি ওদের ডিসটার্ব করব! জানো না, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট!"

"হুঁহ্, আলসে লোকের কত যে বাহানা!" সহেলি ঠোঁট বেঁকালেন, "কুঁড়ের ডিম কোথাকার!"

"উৎসাহ দেখিয়ে কাজ পণ্ড করার চেয়ে কুঁড়ে হওয়া ঢের ভাল।"

লাগসই জবাব দিতে যাচ্ছিলেন সহেলি, মিতিন তাড়াতাড়ি থামাল। সিটে বসে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "অবনীদা, আপনার সেই কেরলাইট ছাত্র আসবে তো স্টেশনে?"

"অবশ্যই।" অবনী মাথা দোলালেন, "আমি বলেছি, আর সুনীল আসবে না এ কি হতে পারে? আমাকে সে অসম্ভব অ্যাডমায়ার করে।"

"দেখব ভক্তিশ্রদ্ধার নমুনা!" সহেলি ফের ফোঁস করে উঠলেন, "আমি কিন্তু তার সঙ্গে সারাক্ষণ হিন্দি-ইংরিজি চালাতে পারব না, আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।"

"আহা, কতবার তোমায় বলব নামে কেরলাইট হলেও সুনীল নালিয়াথ প্রায় বাঙালিই। ওর স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি সবই তো কলকাতায়। কেরলে চলে এসেছে তো মাত্র বছর পাঁচেক। ওর বাংলা শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে।" বলতে-বলতে মিতিনের দিকে ফিরলেন অবনী, "জানো তো, কলেজে সুনীল একবার বাংলা নাটকে অভিনয় করেছিল। এলেবেলে রোল নয়, দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে একেবারে নরক গুলজারের ব্রহ্মা।"

টুপুর হেসে ফেলল। ক'দিন ধরে অবিরাম সুনীল প্রশস্তি শুনছে বাবার মুখে। সুনীল কত গুণী, সুনীল কত নম্র, কত ভদ্র ...। সুনীলের মতো মেধাবী ছাত্র নাকি কালেভদ্রে পাওয়া যায়। ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে, দারুণ চোস্ত ইংরেজি লিখত, তার লেখা একটা ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে নাকি ডেকে চাকরি দিয়েছিল নামী সংবাদপত্র 'মর্নিং হেরাল্ড'। কলকাতা ছেড়ে চলে এলেও এখনও সে কলকাতাকে

ভোলেনি, নিয়মিত যোগাযোগ রাখে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে, অধ্যাপকদের সঙ্গে। বিজয়া-নববর্ষে কার্ড তো পাঠায়ই, ফোনও করে মাঝেমধ্যে।

তা সেই সুনীল নালিয়াথের টুপিতে আর একটা পালক যোগ হল! বাংলা নাটকে অভিনয়! এ হেন সুনীলকে তো তা হলে দেখতেই হয়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়ল এর্নাকুলাম জংশন। প্ল্যাটফর্মে নেমে টুপুররা জিনিসপত্র জড়ো করছে, হাঁপাতে-হাঁপাতে হাজির এক বছর তিরিশের যুবক। অবনীকে প্রণাম করে দু'দিকে দু'হাত মেলে দিল, "ওয়েলকাম স্যার। ভগবানের নিজের দেশ কেরলে আপনাদের সুস্বাগতম।"

অবনী প্রায় বিগলিত। খুশি-খুশি মুখে আলাপ করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে। সহেলিকে প্রণাম করল সুনীল, পার্থর সঙ্গে করমর্দন, মিতিনকে হাত জোড় করে নমস্কার। টুপুরকে 'হাই', বুমবুমকে গাল টিপে 'হ্যালো'। সাত বছর বয়স হয়েছে বুমবুমের, গাল টিপলে সে ভীষণ রেগে যায়, গোমড়া হয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মিতিনের পরিচয় পেয়ে সুনীল বেজায় উচ্ছ্বসিত। কোনও মহিলা গোয়েন্দা সে নাকি এই প্রথম দেখছে। কম করে দশবার বলল, "আমার কী সৌভাগ্য, আমার কী সৌভাগ্য ...!"

সুনীলকেও প্রথম দর্শনে মোটামুটি পছন্দ হয়ে গেল টুপুরের। তবে খানিকটা নিরাশও হয়েছে। নাটকের ব্রহ্মার চেহারা আর একটু জবরদস্ত হবে বলে কল্পনা করেছিল। সুনীল রীতিমতো ছোটখাটো, রোগাসোগা, গায়ের রং শ্যামলাই বলা যায়, গলার স্বরও মোটেই গমগমে নয়, বরং মিহি-মিহি। তবে হ্যাঁ, সুনীলের

মুখ-চোখ ভারী ঝকঝকে। বিশেষ করে চোখ। চশমার আড়ালে কালো মণিদুটো জ্বলজ্বল করছে। কথাবার্তার ধরনও খুব আন্তরিক, যেন তারা সবাই সুনীলের অনেক দিনের চেনা।

সদলবলে স্টেশনের বাইরে এল টুপুররা। সাতটা বাজে, তবে এখানে সন্ধে তেমন গাঢ় হয়নি। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য অনেকটা দেরিতে ডোবে, টুপুর জানে। রাস্তাঘাটের আলো অবশ্য জ্বলে গেছে, হ্যালোজেনের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে চত্বরটা। অক্টোবরের শেষ, তবে সমুদ্রের ধারে বলে বাতাসে আদৌ ঠান্ডা ভাব নেই। একটু যেন গরম-গরমই লাগছে।

সুনীল গাড়ি এনেছে। টাটা সুমো। একটু খেলিয়ে-ছড়িয়েই বসল সকলে। পার্থ আর সুনীল ড্রাইভারের পাশে, পিছনে লটবহরসমেত বুমবুম আর টুপুর, বাকিরা মধ্যিখানে। সুনীলের নির্দেশে গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

সিটে শরীর ছেড়ে দিয়ে অবনী বললেন, "আমাদের জন্য হোটেল দেখে রেখেছ তো সুনীল?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।" সুনীল বাধ্য ছাত্রর মতো ঘাড় নাড়ল, "দু'-তিনটে জায়গায় কথা বলে রেখেছি। আপনাদের যেটা পছন্দ হয় ..."

"কোথায় সেগুলো? কদ্দূর?"

"এর্নাকুলাম টাউন স্টেশনের কাছে। চিতুর রোডে।"

"আমরা কি এর্নাকুলামে থাকব? কোচিতে থাকব না?"

"স্যার, এর্নাকুলাম আর কোচিকে আমরা সেভাবে আলাদা করে দেখি না।" সুনীল মৃদু হাসল, "অবশ্য তফাত যে একেবারেই নেই, তা নয়। আরব সাগরের পাড়ে মেনল্যান্ডটা এর্নাকুলাম, আর খানদশেক দ্বীপ মিলিয়ে কোচি। তার মধ্যে বোলাঘাট্টি আইল্যান্ড আছে, ভাইপিন আছে, গুন্ডুদ্বীপ, নারাক্কাল...। সবচেয়ে বড় অবশ্য মাট্টানচেরি। মেনল্যান্ড-আইল্যান্ড

সব মিলিয়েই এখন কোচি পৌরসভা। ডিস্ট্রিক্টের নাম এর্নাকুলাম।"

মিতিন পিছন থেকে প্রশ্ন করল, "উইলিংডন বলে আর একটা দ্বীপ আছে না? যেখানে কোচি স্টেশন? এয়ারপোর্ট? কোচি বন্দরও তো উইলিংডনে?"

"ওটা তো কৃত্রিম দ্বীপ ম্যাডাম। চারের দশকে কোচি বন্দরের নাব্যতা খুব কমে গিয়েছিল। বড় জাহাজটাহাজ ঢোকা নিয়ে সমস্যা হত। তখন রবার্ট ব্রিস্টো নামে এক সাহেব বন্দরের গভীরতা বাড়ানোর জন্য ড্রেজিং চালান। তাতে যে বিপুল পরিমাণ মাটি উঠেছিল, তাই দিয়েই তৈরি হয় উইলিংডন। সাইজ নেহাত ছোট নয় দ্বীপটার। প্রায় হাজার একর। ওই উইলিংডন তৈরি হয়েছিল বলেই ব্রিজ দিয়ে-দিয়ে মেনল্যান্ড থেকে মাট্টানচেরি পর্যন্ত জুড়ে দেওয়া গেছে। তবে হোটেল বেশিরভাগই মেনল্যান্ডে। উইলিংডনের ওদিকে হোটেল খুব কস্টলি, সংখ্যাতেও তত বেশি নয়। থাকার পক্ষে তাই এদিকটাই ভাল।"

সুনীল কথা বলে বেশ গুছিয়ে। বাংলা বেশ ঝরঝরে বটে, তবে একটা দক্ষিণী টানও রয়েছে। বাঙালিদের সঙ্গে এখন মেলামেশা কমে গেছে, হয়তো বা সেই জন্যই।

সুনীল নালিয়াথের বক্তৃতা শুনতে-শুনতে বাইরেটা দেখছিল টুপুর। শহরটা বেশ পরিচ্ছন্ন। চারদিকে ঝকমক করছে দোকানপাট। রাস্তা তেমন চওড়া নয়, তবে যথেষ্ট মসৃণ। কলকাতার মতো পদে-পদে ঝাঁকুনি খেতে হয় না। সবুজও চোখে পড়ে এদিকওদিক, মাঝে-মাঝেই নজরে আসে নারকোল গাছ, কলা গাছ।

হঠাৎই সুনীল বলল, "আপনারা কিন্তু বড় কম দিনের জন্য কেরলে এলেন স্যার।"

অবনীর বদলে পার্থ উত্তর দিল, "উপায় নেই ভাই। কলকাতায় এই অধমের একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে। প্রেস। এক গাদা কাজ নিয়ে বসে আছি, কালীপুজোর আগে ফিরতে না পারলে কারবারে লাল বাতি জ্বলে যাবে।"

"তা বলে মাত্র এক সপ্তাহ?"

"উঁহু, আট দিন। কাল সানডে টু নেক্সট সানডে তো আছিই। ট্রেনে উঠব আবার সেই সোমবার।"

"মাত্র আট দিনে কী দেখবেন? কেরল ছোট স্টেট ঠিকই, তবে এখানে পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র সবই তো আছে। কতটুকু আপনারা কভার করতে পারবেন?"

"বেশি ঘোরাঘুরির দরকারই বা কী!" অবনী বলে উঠলেন, "দু'-তিনদিন তোমার সঙ্গে কোচিতে থাকব, তারপর সোজা পাড়ি দেব কোভালাম। সেখান থেকে ফের কোচি হয়ে ব্যাক।"

"সে কী স্যার? কেরলে এসে মুন্নার পেরিয়ার কোথাও যাবেন না? নীলগিরি হিলস্ না ঘুরলে তো কেরলে বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দই মাটি। তারপর আলেপ্পি কুইলন

"আলেপ্পিকে 'প্রাচ্যের ভেনিস' বলে না?" পার্থ ফুট কাটল, "আলেপ্পিতে নাকি শহরের মধ্যে দিয়ে নৌকো চলে?"

"চলে তো। আলেপ্পির লেকে নৌকাবিহার একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স। কুইলনেও আছে অষ্টমুড়ি লেক। সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারে তৈরি এরকম ন্যাচারাল লেক কিন্তু আর কোথাও পাবেন না।"

টুপুর পুট করে জিজ্ঞেস করে বসল, "ব্যাকওয়াটারটা কী?"

"যে জলটা সমুদ্র থেকে এসে খাঁড়িতে আটকে থাকে কিম্বা যে জল ল্যান্ডে এসে রয়ে যায়।" মিতিন ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "কেরলে এই ব্যাকওয়াটার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। কোথাও সে লেক,

কোথাও সরু খালের মতো, সেখানে নৌকো বাওয়া হচ্ছে, লঞ্চ চলছে ...।”

“ইনফ্যাক্ট, কোচি থেকে কুইলন তো ব্যাকওয়াটার ধরে-ধরেই চলে যাওয়া যায়।” সুনীল সায় দিল, “বিদেশিরা এই ভ্রমণটা খুব পছন্দ করে। একে বলা হয় ব্যাকওয়াটার ক্রুজ। এই ট্রিপ মিস করলে কিন্তু স্যার আক্ষেপ থেকে যাবে।”

“বলছ?”

“হ্যাঁ স্যার।”

“তারপর ধরুন, আলেপ্পি কুইলনে সুন্দর সি বিচ আছে। ভারকালার বিচ তো দুর্দান্ত, ওরকম সূর্যাস্ত পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় না।”

“তুমি তো ভারী মুশকিলে ফেলে দিলে হে। তুমিই তা হলে একটা টুর প্ল্যান ছকে দাও।”

“এই তো স্যার, এতক্ষণে আপনি লাইনে এসেছেন।” সুনীল হো হো হাসল। উল্লসিত মুখে বলল, “সে আমি করে দেব। আপনারা গাড়ি নিয়ে ঘুরবেন তো?”

“হ্যাঁ, গাড়ি তো লাগবেই। কাঁহাতক বাসে-বাসে ট্যাঙোস-ট্যাঙোস করা যায়! আমার তো অন্তত পোষাবে না। এই বয়সে।”

কথার মাঝেই টাটা সুমো থেমেছে এক হোটেলের দরজায়। চারতলা বাড়ি। মাথার উপর লাল-সবুজ আলোয় ঝিকমিক করছে নাম, ‘রেবতী ইন্টারন্যাশনাল’। লাউঞ্জে পা রেখেই হোটেলটা মনে ধরে গেল সকলের। শ্বেতপাথরের মেঝে, দেওয়ালগুলো আয়নায় মোড়া, মাথার ওপর ঝুলছে পেল্লাই সাইজের ঝাড়বাতি, দামি-দামি বেতের সোফা চমৎকার করে সাজানো, নানান রকম পাতাবাহারের টব শোভা পাচ্ছে চতুর্দিকে। রুম চার্জও খুব একটা বেশি নয়, মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই। পার্থ তবু দরাদরি না করে

থাকতে পারে না, কেতাদুরস্ত রিসেপশন কাউন্টারের সুট-টাই পরা কর্মচারীটির সঙ্গে মিনিট আট-দশ লড়ে আরও খানিকটা কমিয়ে ফেলল ভাড়া। নেওয়া হল দুটো ঘর। একটাতে থাকবে সহেলি, মিতিন আর টুপুর, অন্যটায় বুমবুমকে নিয়ে পার্থ, অবনী।

রুমে ঢুকেই বুমবুমের দম শেষ। গাড়িতেই ঢুলছিল, তাকে টিভি চালিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল কার্টুন চ্যানেলের সামনে, তবু সে ঘুমিয়ে পড়ছে। পার্থ পড়িমরি দৌড়ল তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে। সহেলিও কাহিল, শুয়ে পড়লেন নরম গদিওয়ালা বিছানায়। সুনীলকে নিয়ে অবনীদের ঘরে এসে বসল মিতিন। পায়ে-পায়ে টুপুরও। বেয়ারাকে কফি দিতে বলা হয়েছিল, হুকুম করতে না করতে কফিপট হাজির।

টুপুর সবাইকে কফি ঢেলে দিল। মাপ করে দুধ মেশাল কাপে। চিনিও। তার এখন ক্লাস নাইন, এসব টুকিটাকি কাজ সে ভালই পারে। নিজেও এক কাপ কফি নিয়ে বসেছে বিছানায় আধশোওয়া অবনীর পাশটিতে। মিতিন আর সুনীল সোফায়। কথা বলছে টুকটাক।

কাপে চুমুক দিয়ে সুনীল বলল, "তা হলে একটা কাজ করা যাক ম্যাডাম। কাল-পরশু দু' দিন আপনারা কোচিতে থাকুন। আমি কালকের দিনটা ছুটি নিয়েই রেখেছি, পরশুটা ম্যানেজ করে নেব। যতটা পারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব আপনাদের। তারপর থার্ড ডে ভোরে রওনা হয়ে যান মুন্নার। সেখানে একরাত থাকুন, পেরিয়ারে দু' রাত, আলেপ্পিতে এক, কোভালামে এক। তারপর ফিরে কোচি থেকে ট্রেন ধরবেন।"

মিতিন বলল, "কিন্তু আমার দিদি যে কন্যাকুমারিকাতেও এক রাত থাকতে চায়। কোভালাম থেকে কন্যাকুমারিকা তো কাছেই, তাই না?"

"হুঁ। ঘণ্টা দু'য়েক মতো লাগে।"

"তা হলে কোচিতে দু'দিন না থেকে কন্যাকুমারিকাতেও যদি একটা রাত থাকতে পারি...। কাল সারাদিনে কোচি ঘোরা হয়ে যাবে না?"

"পারবেন কি? বড্ড ধকল পড়বে।"

"কেন?"

"ধরুন, একবেলা কোচির দ্বীপগুলো দেখতে গেলেন...। সকাল ন'টার বোট ধরলেও ফিরতে-ফিরতে একটা-দেড়টা। তক্ষুনি কি আর মিউজিয়াম ছুটতে পারবেন? ভাবছিলাম বিকেলে আবার বোটে করে আপনাদের সূর্যাস্ত দেখাতে নিয়ে যাব। সূর্য আরব সাগরে ডুবে যাচ্ছে, দৃশ্যটা কী অপূর্ব ভাবুন! তারপর সন্ধেবেলা কথাকলি নাচের প্রোগ্রাম দেখতে তো একবার যাওয়াই উচিত। ওটা কোচির অবশ্য-দর্শনীয় বস্তু। এ ছাড়া একটা হিল প্যালেস আছে, যেখানে কোচির রাজারা থাকতেন...। ভাল পাখিরালয়ও আছে। একদিনে এত কিছু কী করে ম্যানেজ করবেন?"

অবনী হাত নেড়ে বললেন, "কাটছাঁট করো, কাটছাঁট করো। ওই দ্বীপটিপগুলো দেখা হলেই তো যথেষ্ট। ওগুলোর একটা হিস্টরিক্যাল ইম্পর্ট্যান্স আছে।"

"নাচটা দেখবেন না স্যার?" সুনীল ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ যেন।

"শরীর আর দিচ্ছে না, বুঝলে। টানা চুয়াল্লিশ ঘণ্টার ট্রেন জার্নি, এ কি মুখের কথা? কালকের দিনটা একটু হালকা-হালকা বেড়ানোই ভাল। এর সঙ্গে মিতিন যা বলছে, তাতে তো আবার পরশু ভোরেই যাত্রা। বডিটাকে তার আগে একটু রেস্ট দিতে হবে না?"

"যা বলবেন স্যার।" সুনীল মাথা নাড়ল, "তা হলে কাল

সকাল আটটার মধ্যে রেডি থাকুন, ন'টার বোটে আমরা সাইটসিয়িং-এ বেরিয়ে পড়ব।"

"আটটা?" অবনীর মুখ কাঁদো-কাঁদো, "তোমাদের এখানে তো সাতটার সময়ে ভোর হয় সুনীল!"

"একটু দেরিতে হয়, তবে সাতটা নয় স্যার। ছ'টা-সাড়ে ছ'টা। আর ন'টার বোটে না গেলে সেই আবার দুটোয়। ফিরে তো আর সানসেট ট্রিপেও যেতে পারবেন না।"

"সুনীল...লক্ষ্মী ছেলে... তোমায় একটা অনুরোধ করব?"

"কী?"

"ওই দুটোর বোটটাই থাক। সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখে কী এমন হাত-পা গজাবে? ও আমি পুরীতে দেখেছি।"

টুপুর আর থাকতে পারল না, বলে উঠল, "পুরীতে সানসেট নয় বাবা, সানরাইজ দেখেছ।"

"ওই হল। দুটোরই তো রং এক।"

"দ্যাখো সিস্টার, আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই।" সুনীল হাত উলটে দিল, "তোমার বাবার জন্যই কিন্তু তোমার সূর্যাস্ত দেখা হবে না।"

"তুমি আর ওকে উসকিয়ো না তো। যদি সময় থাকে, ফেরার পথে যখন কোচি আসব, তখন দেখে নেব।"

পার্থ ঘরে এসেছে। কাঁধে ঘুমন্ত বুমবুম। তাকে খাটে শুইয়ে কালকের প্রোগ্রামটা শুনল পার্থ। সেও অবনীর সঙ্গে একমত। বেড়াতে এসে নাকি বেশি হুটোপাটি করতে নেই, একটু জিরিয়ে ঘোরাই ভাল। তা সে আটদিনের টুরই হোক, কি আশিদিনের।

অগত্যা হাল ছেড়েছে সুনীল। উঠে পড়ে বলল, "বেশ, তাই হোক। আমি দুপুরেই আসব। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আপনাদের রাখতেই হবে।"

"সন্ধেবেলার কথাকলি নাচ?"

"সে গেলেন তো ভাল। না গেলেন, তো না গেলেন। তবে রাতে কিন্তু আমাদের বাড়িতে সবাইকে ডিনার করতেই হবে। আমার মা পইপই করে বলে দিয়েছেন।"

"এটা কি একটু বেশি অত্যাচার হয়ে যাবে না?" অবনী অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "ছ'-ছ'টা লোক মিলে তোমাদের বাড়ি গিয়ে উপদ্রব করব?"

"কী বলছেন অবনীদা?" ভূরিভোজের আমন্ত্রণ পেয়ে পার্থ যথারীতি আহ্লাদিত। চকচকে চোখে বলল, "সুনীলের মা আদর করে খাওয়াতে চাইছেন, যাওয়া তো আমাদের কর্তব্য। আমরা অবশ্যই যাব সুনীল।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ।"

"ধন্যবাদ তো আমাদেরই দেওয়া উচিত। এত দূরে এসে একটা নেমন্তন্ন জুটে গেল...।" পার্থ গুছিয়ে বসল, "তবে ভাই, আমার দুটো জিজ্ঞাস্য আছে।"

"কী দাদা?"

"এক, তোমরা কি নারকোল তেলে রান্না করো?"

"না দাদা, আমরা বাদাম তেল খাই। সত্যি বলতে কী, আমাদের এখানে এখন বাদাম তেলেরই চল বেশি। বিশেষ করে শহরে।"

"গুড। দু' নম্বর প্রশ্ন, তোমরা কি ভেজিটেরিয়ান?"

"পাক্কা ননভেজ।" সুনীল হেসে ফেলল, "আমরা আপনাদের মতোই মৎস্যভুক দাদা। শুধু সমুদ্রের মাছ একটু বেশি খাই, এই যা। তবে কাল আপনাদের জন্য মিঠে জলের মাছই থাকবে।"

"আমার সব চলে। আর চিংড়ি হলে মিঠে জলেরই বা কী, নোনা জলেরই বা কী!"

সুনীলের হাসি আরও চওড়া হল, "আপনার জন্য চিংড়িই থাকবে দাদা।"

"অতি উত্তম। যাও, আজকেই গিয়ে তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে দাও।"

"আমার মা বাঙালি খানাটাও খুব ভাল বানান। কম দিন তো কলকাতায় ছিলাম না আমরা, প্রায় ষোলো বছর। বাবা রিটায়ার করে চলে এসেছেন, কিন্তু এখনও পোস্ত খাওয়াটা ভোলেননি। মাঝে-মাঝেই মা ঝাল-ঝাল আলুপোস্ত রান্না করেন।"

"বাহ, বাহ। কাল তা হলে একটু আলুপোস্তও রেখো।"

"বেশ, তাও থাকবে।" সুনীল হাসতে-হাসতে ঘড়ি দেখল, "আজ তা হলে আসি। আপনারা টায়ার্ড আছেন, বিশ্রাম করুন। কাল ঠিক দুপুর একটায় আমি হাজিরা দেব।"

সুনীল চলে যেতেই টুপুর চোখ পাকিয়েছে, "তুমি কী হেংলু গো পার্থমেসো! এভাবে কেউ খাওয়ার কথা বলে?"

"অন্যায়টা কী আছে? গিয়ে খাবার দেখে নাক সিঁটকোবি, ফিরে এসে নিন্দে করবি, তার চেয়ে আগেই খোলাখুলি কথা হয়ে যাওয়া ভাল নয়? ও বেচারারও আর মেনু নিয়ে কোনও টেনশন থাকল না।"

মিতিনের মুখে চাপা হাসি। বলল, "এক দিক দিয়ে তোর মেসো অবশ্য ঠিকই করেছে। পেটে খিদে মুখে লাজ করে তো আমরা অনেক সময়েই ঠকি। তোর মেসোর মুখে যখন দক্ষিণী খানা রোচেই না..."

"আমার কিন্তু ভালই লাগে।"

"সে তো আমারও। একদিন কেরলিয়ান ডিশ খেলে একটু অন্য রকম স্বাদও পেতাম।"

অবনী বলে উঠলেন, "এবার খাওয়ার গল্প একটু থামাবে? যাও,

মাসি-বোনঝি এখন কেটে পড়ো তো। ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হও। আমি আর পার্থ ততক্ষণ একটু মাথা ছাড়াই।"

"এখন আপনারা দাবা নিয়ে বসবেন?" মিতিন ভুরু কুঁচকোল, "ট্রেনে চুয়াল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত আঠারো ঘণ্টা দাবা খেলেছেন, তাও আশ মিটল না?"

"দানটা শেষ হয়নি যে। এখনও পার্থর একটা গজ, একটা নৌকো, একটা ঘোড়া জীবিত। আমার একটা নৌকো, দুটো গজ।"

পার্থ বলল, "বোড়েও আছে আমাদের তিনটে করে। এখনও যে কেউ জিততে পারি।"

টুপুর মিতিনমাসির দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। সত্যি, বাবা আর পার্থমেসো পারেও বটে। এবার বেড়াতে বেরনোর সময়ে বাবাকে মোটা-মোটা বই নিতে দেওয়া হয়নি, তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই যেন বাবা মেতে আছে ওই চৌষট্টি ঘরের খেলায়। প্রথম গেম শুরু হয়েছিল হাওড়া ছাড়ার পর-পরই, এখনও চলছে সেটাই। খেলার সময়ে দু'জনেরই বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, ডেকে-ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। বাবা তখন ক্রামনিক, তো পার্থমেসো কাসপারভ। একটা চাল দিতে দেড় ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যায়। আবার চাল দেওয়া মাত্রই তা ফেরত নেওয়ার জন্য বায়না জুড়ে দেয় দু'জনে। জোর তর্ক বাধে তখন, দু'জনেই মুঠো পাকায়, গরগর করে—সে এক দৃশ্য বটে। এবার গোটা ভ্রমণে দু'জনে ওই একই গেম চালাবে বলে মনে হয়।

অবনী শয্যা ছেড়েছেন। টেবিলের কাছে গিয়ে লাল কিটব্যাগ খুললেন। হাতড়াচ্ছেন। বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, "কী ব্যাপার, দাবার বোর্ডটা গেল কোথায়? এখানেই তো রেখেছিলাম!"

পার্থ হেসে বলল, "ও অবনীদা, ওটা তো আমার ব্যাগ! আপনারটা তো কাবার্ডে।"

বলতে-বলতে গিয়ে অবনীর কিট্‌সব্যাগখানা বের করেছে পার্থ। দুটো ব্যাগই হুবহু এক। রং, সাইজ, এমনকী মনোগ্রামটাও। দুটো টি-শার্টের সঙ্গে একটা ব্যাগ ফ্রি দিচ্ছিল বলে চার-চারখানা টি-শার্ট কিনে ফেলেছিল পার্থ, একটা ব্যাগ উপহার দিয়েছে অবনীকে। এবং দু'জনেই মাঝে-মাঝে ব্যাগ গুলিয়ে ফেলছে। ক্যামেরা বার করতে গিয়ে অবনীর ছাতা টানছে পার্থ, নিজের টুথব্রাশ ভেবে পার্থর টুথব্রাশে দাঁত মেজে আসছেন অবনী। কেলোর কীর্তি আর কাকে বলে!

ফোল্ডিং বোর্ড বের করে দুই ভায়রাভাই নেমে পড়েছেন রণক্ষেত্রে। মিতিন চলে গেল পাশের ঘরে। টুপুরও উঠল। যেতে গিয়ে আর একবার চোখ পড়ল ব্যাগ দুটোয়।

ফিক করে হেসে ফেলল টুপুর। যমজ ব্যাগ নিয়ে একটা রহস্য কাহিনী ফাঁদলে কেমন হয়? দারুণ জমে যাবে কিন্তু গল্পটা!

সি-লর্ড জেটি থেকে মোটরবোট ছাড়ল দুটো পাঁচে। জনাসত্তর যাত্রী নিয়ে। তিরতির জল কেটে-কেটে চলেছে আরব সাগর অভিমুখে। দেখতে-দেখতে দূরে সরে গেল এর্নাকুলাম।

জলযানটিতে বসার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। ডেকে খানচল্লিশেক চেয়ার, নীচের খোলেও বসতে পারে জনাপঞ্চাশ-ষাট। খোল মানে বদ্ধ কিছু নয়, চতুর্দিকে জানলা, প্রকৃতি দর্শনে কোনও অসুবিধে নেই। হুহু হাওয়া বইলেও রোদ্দুর আজ বড্ড চড়া, তাত এড়াতে বেশিরভাগ যাত্রীই ভিড় করেছে নীচের তলায়। এক কেরলীয় গাইড

হাত-মুখ নেড়ে বর্ণনা দিচ্ছে যাত্রাপথের। ভাষাটা ইংরেজি, তবে উচ্চারণের গুণে তামিল-মলয়ালম বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়।

একটি বর্ণও বোধগম্য হচ্ছিল না টুপুরের। উশখুশ করছিল। টের পেয়ে সুনীল বলল, "কী সিস্টার, ওপরে যাবে নাকি?"

বুমবুম তো একপায়ে খাড়া। শুনেই নাচছে, "চলো না। চলো না, প্লিজ।"

সহেলি জানলার ধারে গুছিয়ে বসেছেন। বললেন, "আমি বাপু ছায়া ছেড়ে নড়ছি না।"

অবনী বললেন, "আমিও এখানে দিব্যি আছি। ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছি।"

"এক কাজ করো। তোমার ছাতাটা ওদের বের করে দাও। একটু তো রোদ আটকাবে।"

অবনীর লাল ব্যাগখানা আনা হয়েছে সঙ্গে। তাতে কী আছে আর কী নেই! চিপ্‌স, চানাচুর, ফ্রুটকেক, বিস্কুট, ডজনখানেক কলা, লাড্ডু, বড় বোতলে জল, ঢাউস কোল্ড ড্রিংক, ঘাম মোছার তোয়ালে, ছাতা, টর্চ, এমনকী পেতে বসার খবরের কাগজও।

মিতিন ব্যাগ খুলে শুধু কোল্ড ড্রিংকের বোতলটা তুলে নিল। বলল, "এই উথালপাথাল হাওয়ায় ছাতা খোলা যাবে না দিদি।"

"বুমবুমকে তা হলে বেতের টুপিটা অন্তত পরিয়ে দে।"

বুমবুমের তর সইছে না। কোনওরকমে টুপি চড়িয়ে টুপুর সুনীলের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে চলে গেল উপরে। প্রখর উত্তাপে জনাদশ-বারো যাত্রী রয়েছে ডেকে। বেশিরভাগই বিদেশি। দামি ক্যামেরায় সাহেব-মেমসাহেব ছবি তুলছে পটাপট। পার্থমেসোও ক্যামেরা কাঁধে উঠে এল দোতলায়। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য ফোকাস করছে। বুমবুম উত্তেজিত মুখে নির্দেশ দিচ্ছে বাবাকে।

মিতিন আর টুপুর দু'জনের পরনেই আজ সালোয়ার-কামিজ। রোদ বাঁচাতে ওড়নায় মাথা ঢাকল টুপুর। মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "ডান দিকে ওটা কী আইল্যান্ড গো?"

"বোলঘাট্টি। সুনীল উত্তর দিল, "ওখানে যে সাদা মতন বাড়িটা দেখছ, ওটা একটা ডাচ প্যালেস। এখন অবশ্য হোটেল। ওই দ্বীপে একটা গল্‌ফ খেলার মাঠও আছে। শীতকালে অনেকে পিকনিক করতে যায় বোলঘাট্টিতে।"

"আমরা কি ওই ডাচ প্যালেসটাই দেখতে যাচ্ছি?"

"না না। সেটা তো মাট্টানচেরিতে। সেই প্যালেসের হিস্ট্রি ভারী অদ্ভুত। ডাচ, মানে ওলন্দাজরা মোটেই ওটা তৈরি করেনি। প্রাসাদটা আদতে পর্তুগিজদের বানানো।"

"এদিকে ডাচ প্যালেস নাম, ওদিকে বানিয়েছে পর্তুগিজ?"

"ইয়েস সিস্টার। যে সব পর্তুগিজ আমাদের দেশে এসেছিল, তারা বেশিরভাগই তো সুবিধের লোক ছিল না। হয় ছিল জলদস্যু, নয় লুঠেরা, খুনে। তা ওইরকমই এক বজ্জাত পর্তুগিজ একটা হিন্দু মন্দিরে লুঠপাট চালিয়েছিল। খবর পেয়ে কোচির রাজা তো চটে লাল। তখন রাজাকে শান্ত করার জন্য পর্তুগিজরা আস্ত একখানা প্রাসাদ তৈরি করে রাজাকে উপহার দেয়। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে। পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে। কোচি তখন ছিল পর্তুগিজদের কলোনি। শ'খানেক বছর পর ডাচরা এসে পর্তুগিজদের হঠিয়ে দেয় এবং সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে আবার তারা ওই প্রাসাদ ভেট দেয় কোচিরাজকে।"

"তার মানে একই প্যালেস দু'বার উপহার দেওয়া হল?"

"হল। রাজাকে সন্তুষ্ট করতে ডাচরাও মরিয়া ছিল যে!"

গল্পে-গল্পে এগোচ্ছে মোটরবোট। বাঁয়ে এবার উইলিংডন দ্বীপ। জলের ধারে অতিকায় এক হোটেল। বিলাসবহুল হোটেলটা দেখে

টুপুরের একটু আপশোশ হল মনে-মনে। ইস, ওই হোটেলেই তো তারা উঠতে পারত! দূরে আরব সাগর দেখা যাচ্ছে, হোটেলে বসে সারাদিন বেশ তাকিয়ে থাকত সমুদ্রের দিকে।

উইলিংডন পেরিয়ে, থইথই ব্যাকওয়াটার ছেড়ে মোটরবোট ঘুরল বাঁয়ে। অপেক্ষাকৃত সরু খাঁড়িতে। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই এসে পড়ল মাট্টানচেরির ফেরিঘাট। এখানেই প্রথম বিরতি, এক ঘণ্টা থামবে বোট।

ঘাট থেকে মাট্টানচেরির ডাচ প্যালেস খুব একটা দূরে নয়। পৌঁছে টুপুর হতাশই হল বেশ। প্রাসাদের চেহারাটা যেন কেমন-কেমন। দেখে মনে হয় নিতান্তই সাধারণ এক দোতলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। যতই বড়সড় হোক, বাড়িটার আভিজাত্যও নেই, জলুসও নেই।

বড় লোহার গেটখানা বন্ধ। লোহার গেটের মধ্যিখানে খুদে একখানা দরজা, সেখান দিয়েই গলে-গলে ঢুকছে টুরিস্টরা। প্রাসাদের একটা অংশ নিয়ে মিউজিয়াম। দেখতে হলে উঠতে হয় দোতলায়, উঁচু-উঁচু সিঁড়ি ভেঙে।

কোনওক্রমে উঠলেন সহেলি। হাঁপাচ্ছেন। জিরোচ্ছেন। টুপুররা দল বেঁধে ঢুকে পড়ল অন্দরে। প্রথম ঘরে দেওয়াল জোড়া প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মিউরাল পেন্টিং। নিপুণ হাতে আঁকা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী। দেওয়ালের গায়ে কাঠের কাজও তারিফ করার মতো। বাকি দু'-তিনটে ঘরে রাজারাজড়াদের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, চোখ ধাঁধানো কারুকাজ করা পালকি, পুরনো আমলের দলিল দস্তাবেজ। অবনী অনেকটা সময় নিয়ে চোখ বোলালেন দলিলগুলোয়। এই প্রাসাদেই নাকি অভিষেক হত কোচিরাজার, ছোট-বড় রাজসিংহাসনও সংরক্ষিত আছে প্রাসাদে। বুমবুম দড়ির বেড়া টপকে সিংহাসনে বসে পড়তে যাচ্ছিল, টুপুর খপ করে ধরে ফেলল

তাকে। মিতিনমাসির সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচের মিউজিয়ামও দেখে এল টুপুর। আলাদা করে বিশেষ কিছু দেখার নেই সেখানে। সেই একই ধরনের রাজপোশাক, ঢাল-তলোয়ার, নয়তো কিছু কাগজপত্র।

প্রথম ঘরটা দেখেই নেমে এসেছিলেন সহেলি। নীচের ধাপিতে বসে জল খাচ্ছেন ঢকঢক। পার্থর মুখও ঈষৎ বেজার। মিউজিয়ামে ফ্ল্যাশগান জ্বালানো মানা বলে একটাও ছবি তুলতে পারেনি বেচারা। একমাত্র অবনীই যা তৃপ্ত। এই ধরনের ঐতিহাসিক স্থান তাঁর বড় প্রিয়।

এবার যাত্রা ইহুদিদের সিনাগগের দিকে। ডাচ প্যালেস থেকেই দেখা যাচ্ছিল সিনাগগের চূড়া, মনে হচ্ছিল যেন পাশেই, কিন্তু যেতে হল বেশ খানিক ঘুরে। রাস্তায় পড়ল কোচির মশলাপট্টি। কেরলের ভুবন বিখ্যাত এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ নাকি নিলাম হয় এই বাজারে। আজ রবিবার, নিলামখানা বন্ধ, পাড়াটাও তাই ফাঁকা-ফাঁকা।

নিলামখানার গায়েই সরু গলি। জু টাউন। দু'ধারটা দেখতে-দেখতে হাঁটছিল টুপুর। ইহুদিপল্লীর বাড়িগুলো অতি প্রাচীন। সুদূর অতীতের গন্ধ যেন লেগে আছে গায়ে। এদিক-ওদিক বেশ কয়েকটা দরজির দোকান, আর কিউরিয়ো শপ। ভ্রমণার্থীদের জন্য খোলা আছে দুর্লভ শিল্পবস্তুর দোকানগুলো, কেনা-বেচা চলছে অল্পবিস্তর।

সহেলি একটা দোকানে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন, "এই মিতিন, দেখবি আয়।"

সুনীলের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে গিয়েছিল মিতিন। ফিরে এল, "কী হল?"

"পেতলের ঘণ্টাটা কী সুন্দর দ্যাখ! নিয়ে নেব নাকি?"

"কী করবে নিয়ে?"

"কেরল টুরের স্মৃতি হিসেবে রাখব। ড্রয়িংরুমের পরদাতেও লাগিয়ে দিতে পারি। পরদা নড়লেই ঢং করে বাজবে। কিম্বা গিফ্টও করা যায় কাউকে।"

টুপুর দু'দিকে মাথা নাড়ল। নাহ্, বেড়াতে বেরিয়ে মা'র বাজার করার বাতিকটা আর গেল না।

সহেলির আগ্রহ টের পেয়ে দোকানদারও উদ্দীপিত। হাত-মুখ নেড়ে বলল, "নিয়ে নিন ম্যাডাম। এ সত্যিই অতি দুষ্প্রাপ্য বস্তু। আপনি নিশ্চয়ই এজেকিয়াল রাহাবির নাম শুনেছেন? ওই যে সিনাগগের মাথায় বড় ঘড়িটা দেখছেন, ওটা যিনি তৈরি করিয়েছিলেন। এই ঘণ্টাও সেই রাহাবিরই সম্পত্তি। আপনি যদি নেন, তো জলের দরে দিয়ে দেব। আড়াইশো বছরের পুরনো ঘণ্টা পাবেন মাত্র আড়াই হাজার টাকায়।"

মিতিন ফিসফিস করে বলল, "কথায় ভুলো না। ঘণ্টাটার বয়স এক বছরও হয়েছে কিনা সন্দেহ। ওটা যেখান থেকে কিনেছে, সেখানকার দামের ট্যাগ সাঁটা ছিল গায়ে। ছিঁড়ে ফেললেও ছাপানো কাগজের কুচি কিন্তু এখনও ঘণ্টায় লেগে আছে।"

সুনীলও নিচু গলায় বলল, "এরা কিন্তু খুব ঠকায় ম্যাডাম। ঠিকঠাক না চিনে কেনা কিন্তু উচিত হবে না।"

অগত্যা সহেলিকে নড়তেই হয়। জুলজুল চোখে বাহারি ঘণ্টাটাকে আর একবার দেখে নিয়ে এগোলেন সহেলি। পঁচিশ-তিরিশ হাত গিয়েই সিনাগগ। ইহুদিদের উপাসনালয়। বহিরঙ্গে তেমন পারিপাট্য নেই বটে, তবে প্রাচীনত্ব বেশ বোঝা যায়। রাহাবির ঘড়িটি ভালই সময় দিচ্ছে। তিনটে কুড়ি।

টিকিট কেটে, জুতো ছেড়ে, সিনাগগে ঢুকেই চক্ষু ছানাবড়া। ভিতরে রঙের কী বাহার! ঝলমল ঝলমল করছে! সহেলি পর্যন্ত ঘণ্টার শোক ভুলে বিমোহিত। দর্শনার্থীদের ভিড়ে এমনিই গিজগিজ

করছিল চারদিক, টুপুরদের মোটরবোটের দলটা ঢুকে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই দশা। তার মধ্যেই সব্বাইকে এক জায়গায় জড়ো করেছে গাইড। গড় গড় আউড়ে চলেছে সিনাগগবৃত্তান্ত। সেই দুর্বোধ্য ইংরেজিতে।

টুপুর, মিতিন সরে এল। সুনীলের মতো গাইড থাকতে তারা ওই লোকটার বকবকানি শুনবে কেন।

গলা ঝেড়ে সুনীল বলল, "এই সিনাগগ আর ওই ডাচ প্যালেস মোটামুটি সমসাময়িক। এটা তৈরি হয়েছে পনেরোশো আটষট্টিতে। আমাদের কোচির রাজা ভাস্কর প্রথম রবি বর্মা জমিটা দান করেছিলেন ইহুদিদের। ওই দেওয়ালে গাঁথা তামার পাত দেখছেন, ওটাই দানপত্র।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু ইহুদিরা কোচিতে এল কী করে?"

"সে এক লম্বা স্টোরি। পরে শুনিস'খন।" মিতিন বলল, "এখন ভাল করে সিনাগগটা দ্যাখ।"

পার্থ প্রাণ ভরে ছবি তুলছিল। কাছে এসে আঙুলে তারিফের মুদ্রা ফুটিয়ে বলল, "দেখার মতো জায়গা বটে। কী ঘ্যামচ্যাক সব ঝাড়লণ্ঠন, বাপ্‌স!"

"আর কত ধরনের ল্যাম্প! গা দিয়ে যেন রামধনুর রং ঠিকরোচ্ছে!"

"মাঝখানে পেতলের রেলিংওয়ালা গোল জায়গাটা কীসের?"

"বুঝতে পারলে না? ওখানে দাঁড়িয়ে রাবি প্রার্থনা করেন।"

"রাবি মানে তো ইহুদিদের পুরোহিত, তাই না মিতিনমাসি?"

"কারেক্ট।" সুনীল হাসল, "আর ওপরে যে ঘেরা ব্যালকনি, ওখানে লাইন দিয়ে দাঁড়ান ভক্তরা।"

বুমবুম বিজ্ঞের মতো মেঝের টাইল্‌স পরিদর্শন করছিল। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, "এই সব রঙিন পাথর কি ইহুদিদের বানানো?"

"উঁহু। এই টাইল্‌স আনা হয়েছিল চিন দেশের ক্যান্টন থেকে। ওই যে রাহাবির কথা হচ্ছিল, উনিই আনিয়েছিলেন। টাইল্‌সের উপর নকশাগুলো হাতে আঁকা। চিনাদেরই।"

অবনী আর সহেলি দক্ষিণী গাইডের বক্তৃতা শুনছিলেন এতক্ষণ। অবনী হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে নাকি একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে সুনীল?"

"কী বলুন তো স্যার?"

"গ্রেট স্ক্রল।"

"ও হ্যাঁ, ওটার কথা তো বলাই হয়নি। ছাগলের চামড়ার ওপর লেখা একটা ওল্ড টেস্টামেন্ট আছে এখানে। হিব্রু লিপিতে।"

"তাই নাকি?" মিতিন অবাক, "পুরো ধর্মগ্রন্থ ছাগলের চামড়ায় লেখা?"

"ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তো তালমাদ। তার গোটাটাই আছে কিনা বলতে পারব না ম্যাডাম। তবে আমার এক জু বন্ধু ছিল, তার মুখে শুনেছি, ওদের পবিত্র টোরা, মানে ধর্মীয় অনুশাসনলিপি নাকি রাখা থাকে সিনাগগের দেওয়ালসিন্দুকে।"

"অনুশাসন মানে কি টেন কমান্ডমেন্টস? অর্থাৎ সিনাই পর্বতে মোজেস যে দৈববাণী পেয়েছিলেন...?"

দৈববাণীর গল্পটা জানে টুপুর। সিসিল বি ডি মিলির তৈরি দারুণ জমকালো টেন কমান্ডমেন্টস সিনেমাটা মাত্র ক'মাস আগে দেখেছে সে। নন্দনে একটা বিশেষ শো হয়েছিল, নিয়ে গিয়েছিল স্কুল থেকে। ছবিতে সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ভাবলে এখনও টুপুরের গায়ে কাঁটা দেয়।

অবনী উৎসুক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই গ্রেট স্ক্রল একবার দেখা যায় না সুনীল?"

"আমি যতদূর জানি, স্যাবাথের দিন ছাড়া ওটা বের করা হয়

না স্যার। মানে শনিবার। যেদিন ওঁরা প্রার্থনা-টার্থনা করেন।”

“দ্যাখো না একবার চেষ্টা করে। তুমি তো প্রেসের লোক, তুমি রিকোয়েস্ট করলে হয়তো...”

“দেখছি।”

গুরুর অনুরোধ রক্ষা করতে কোথায় যেন গেল সুনীল। মিনিট দশেক পর ফিরে এসে বলল, “এমনিতে ওঁরা কাউকে দেখান না। অনেক বলে-কয়ে ম্যানেজ করলাম। তবে...”

“কী তবে?”

“ছ'টার সময়ে আসতে হবে। সিনাগগে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার পর। সিনাগগ দেখাশুনো করে একটা ট্রাস্টি বোর্ড। ওই ট্রাস্টি বোর্ডেরই এক সদস্য সিনাগগের কেয়ারটেকার। পাশেই বাড়ি। তিনি বললেন, রাবিকে বলে তখন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।”

“বাহ। খুব ভাল। এতে সমস্যা কোথায়?”

“আমাদের মোটরবোট যে চলে যাবে স্যার। তা ছাড়া আরও কিছু সাইটসিয়িং আছে...

মিতিন বলল, “আমরা যদি বোটে না ফিরি? এখান থেকে তো ট্যাক্সি নিয়েও যাওয়া যায়? ব্রিজ ক্রস করে?”

“তা অবশ্য যায়। মোটরবোট তো এর পর মাট্টানচেরিরই আর একটা ঘাটে যাবে, ওখানেই না হয় আমরা পাকাপাকি নেমে যাব। কী, তাই করবেন?”

সবাই এক বাক্যে রাজি। একমাত্র সহেলিই যা সামান্য গাঁইগুঁই করছিলেন। হোটেলে ফিরে, সুনীলদের বাড়ি যাওয়ার আগে, তাঁর টুকটাক মার্কেটিং-এর বাসনা ছিল। সন্ধে অবধি মাট্টানচেরিতে পড়ে থাকলে তা কি আর হবে!

তা যাই হোক, দলের সঙ্গে বেরোলে কিছু সমঝোতা তো

করতেই হয়। কেয়ারটেকারকে জানিয়ে মোটরবোটে এল টুপুররা। পরবর্তী ফেরিঘাটে নেমে সাইকেল রিকশা ধরে সোজা সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ। ভারতে ইউরোপিয়ানদের তৈরি প্রথম গির্জা।

জানাই ছিল আজ রবিবার, টুরিস্টদের জন্য গির্জা বন্ধ। তবে এসেছে যখন, জায়গাটা তো দেখতেই হয়। ভাস্কো-দা-গামার সমাধিস্থল বলে কথা!

গির্জায় পৌঁছে টুপুর অবশ্য বেজায় হতাশ। ভাস্কো-দা-গামার সমাধির জায়গাটাও গির্জার ভিতরে। অতএব সেটা দেখারও কোনও সুযোগ নেই।

পার্থ ঠোঁট উলটে বলল, "স্যাবাথ ডে-তে গির্জায় আসার ঠেলা বোঝো। পুরো জার্নিটাই বেকার।"

বুমবুম ভুরু কুঁচকে বলল, "স্যাবাথ ডে মানে কী বাবা?"

"বিশ্রামের দিন। খ্রিস্টান আর ইহুদিরা বিশ্বাস করেন, ভগবান পৃথিবীটাকে গড়েছিলেন ছ'দিনে। ব্যাপক খাটুনি গেছিল তো, তাই সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ভগবানের দেখাদেখি ভক্তরাও তাই সপ্তাহে একটা দিন বিশ্রাম নেয়। সেদিন নো কাজ। একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া। ইহুদিরা শনিবারটাকে স্যাবাথ বলে মানেন, খ্রিস্টানরা রবিবার।"

বুমবুম আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "আমিও খ্রিস্টান হয়ে যাব। তা হলে কেউ আমায় রোববার পড়তে বসতে বলতে পারবে না।"

"হুহ্। বাকি ছ'দিন তুমি পড়ে যেন উলটে যাচ্ছ!"

"আমি উলটোই না। সোজাই থাকি।"

বুমবুমের কথার ভঙ্গিতে হা-হা হেসে উঠল সবাই। কাগজ পেতে একে-একে বসে পড়েছে গির্জার সামনেটায়। বোটে ফেরার তাড়া নেই, এখন মনের সুখে গুলতানি চলতে পারে ঘণ্টাখানেক। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ল খাবারদাবার। একটু-আধটু মুখ চলছে সকলেরই।

টুপুরেরই শুধু মন খারাপটা কাটছিল না। আনমনে দেখছিল গির্জাটাকে। বিকেলের সূর্য এসে পড়েছে গির্জার মাথায়। সোনালি আলোয় কী ঝকঝক করছে ক্রসখানা। আহা, আজ রবিবার না হলে সত্যিই খুব ভাল হত!

বিড়বিড় করে টুপুর বলেই ফেলল, "এত দূর এসেও ভাস্কো-দা-গামার সমাধিটা মিস হয়ে গেল! কোনও মানে হয়?"

"সমাধি আর এখানে কোথায় টুপুর!" মিতিন সান্ত্বনা দিল, "ভাস্কো-দা-গামা মারা গিয়েছিলেন পনেরোশো চব্বিশে। তার চোদ্দো বছর পরেই তো কফিন এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লিসবনের বেলেম কনভেন্টে।"

সুনীল বলল, "ইয়েস সিস্টার। এখানে শুধু জায়গাটাকে ঘিরে রাখা আছে। ভেতরে কিছু নেই।"

"তা হোক, এক সময়ে তো ছিল। ভাস্কো-দা-গামার মতো একজন বিখ্যাত ভূপর্যটক

"ভুল বললি টুপুর। ভাস্কো-দা-গামা মোটেই ভূপর্যটক নন।" অবনী মেয়েকে শুধরে দিলেন, "ভাস্কো-দা-গামা ছিলেন পাক্কা বিজনেসম্যান। কোচিতে এসে তিনি একটা ফ্যাক্টরিও করেছিলেন। জাহাজ-জাহাজ মশলা চালান দিতেন এখান থেকে।"

দেখতে-দেখতে কেটে গেল সময়। ফাঁকে-ফাঁকে লাল ব্যাগের খাবারও শেষ। পাঁচটা নাগাদ উঠে পড়ল সবাই। এবার গুটিগুটি যাওয়া যাক সিনাগগে।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সাইমন পেরেজ বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন। বছর ষাটেকের মানুষটার চেহারাটা দেখার মতো। পেটা স্বাস্থ্য, হাইট প্রায় ছ'ফুট, কাটা-কাটা নাক, চোখ, গায়ের রং দেখে বোঝার উপায় নেই ভারতীয় না বিদেশি। রোদে পুড়ে ঈষৎ তামাটে ভাব এসেছে বটে, তাও দারুণ ফরসা।

সুনীলকে দেখে সাইমন বললেন, "তাড়াতাড়ি এসে ভালই করেছ। তোমাদের কাজটা সেরে আমি একবার মেনল্যান্ডে যাব। কোট্টায়াম থেকে আমার এক বন্ধুর আসার কথা আছে।"

সুনীল জিজ্ঞেস করল, "আপনিই দেখাবেন তা হলে?"

"না না। ওটা তো রাবির দায়িত্ব। আমি সঙ্গে থাকব। চলো, আমরা আগে রাবির কাছে যাই।"

সিনাগগের রাবি জোস হ্যালেগুয়া থাকেন জু টাউনে, গলিতে। আদ্যিকালের বাড়িটার সদর খোলাই ছিল, এক স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার-অন্ধকার ঘরে টুপুরদের বসালেন সাইমন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অন্দরমহল থেকে এক বৃদ্ধ দম্পতির আবির্ভাব। বয়স্ক মানুষটি ভারী সৌম্যকান্তি। টকটকে রং, মুখময় সাদা দাড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তুলনায় মহিলা ছোটখাটো। পরনে লং স্কার্ট, পাকা চুল চুড়ো করে বাঁধা।

ঘরে টিউবলাইট জ্বেলে দিয়েছেন জোস। তাতেও অবশ্য ঔজ্জ্বল্য তেমন বাড়ল না ঘরের, মলিন দেওয়াল যেন শুষে নিল আলো। সোফা, সেন্টার টেবিল, কাচের আলমারি সবই আছে, তবে প্রতিটি আসবাবেরই হতশ্রী দশা। কার্পেটটিও যথেষ্ট মলিন। একমাত্র টেলিভিশন সেটটিই যা নতুন।

সুনীলই পরিচয় দিল সকলের। জোস হ্যালেগুয়া রীতিমতো বিস্মিত। বললেন, "তোমরা সেই সুদূর ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছ?"

পার্থ বলল, "হ্যাঁ স্যার। এখানকার সিনাগগ আমাদের মুগ্ধ করেছে।"

"শুনে সম্মানিত বোধ করলাম।" স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরেজি বলছেন জোস, "কিন্তু তোমরা হঠাৎ গ্রেট স্ক্রল দেখতে চাইছ কেন?"

অবনী বললেন, "ইতিহাস আমায় খুব টানে। আর প্রাচীন

ইতিহাসের সঙ্গে আপনারা, ইহুদিরা তো ভীষণভাবে জড়িয়ে আছেন। আপনাদেরই এক উপাসনালয়ে এসে আপনাদের ধর্মীয় অনুশাসনলিপি দর্শন তো এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়।"

"হুম। তা আমাদের এই সিনাগগ সম্পর্কে আপনার কী জানা আছে?"

"এই সিনাগগ তৈরি হয়েছিল পনেরোশো আটষট্টিতে। ষোলোশো বাষট্টিতে পর্তুগিজরা এটিকে পুড়িয়ে দেয়। তার দু'বছর পরে ডাচরা এই সিনাগগ ফের নতুন করে বানিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য আপনাদের এই জু টাউন তৈরি হয়েছে তারও হাজার বছর আগে। ইয়েমেন আর ব্যাবিলন থেকে আসা ইহুদিদের হাতে। আসিরিয়ার সম্রাট নেবুচাদনেজার জেরুজালেম দখল করার পর পালিয়ে এসেছিলেন ওই ইহুদিরা। ঠিক বলছি?"

"মোটামুটি। তবে আমরা কিন্তু ইয়েমেন বা ব্যাবিলনীয় ইহুদি নই।"

"সে আপনার চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। আপনারা সম্ভবত এসেছেন স্পেন থেকে। ফিফ্‌টিনথ সেঞ্চুরিতে।"

এতক্ষণে জোসের ঠোঁটে অনাবিল হাসি, "বাহ, আমাদের অনেক খবরই তো রাখেন দেখছি!"

পাশ থেকে সাইমন বলে উঠলেন, "জানেন তো, এই মাট্টানচেরির অনেকটাই কিন্তু আমাদের হাতে গড়া।"

"সেই আমরাই এখন মাট্টানচেরি থেকে হারিয়ে যাচ্ছি," মিসেস হ্যালেগুয়া এই প্রথম কথা বললেন, "গোটা মাট্টানে আমরা পড়ে আছি মাত্র জনাষাটেক। তাও বেশির ভাগই বুড়োবুড়ি। আমাদের ছেলেমেয়েরা তো আর এ-দেশে থাকতেই চায় না। ভাবতে পারো, এর্নাকুলামের সিনাগগে এখন তালা ঝোলে!"

"দুঃখ কোরো না শ্যারন। ইহুদিদের জীবনটাই তো এরকম।"

জোস হ্যালেগুয়া যেন সামান্য উদাস, "এই বিশাল দুনিয়ায় কোথাও কি আমরা থিতু হতে পেরেছি? হয় তাড়া খেয়ে পালিয়েছি, নয় নিজেরাই ছুটছি। পৃথিবীর সব দেশেই আছি আমরা, কিন্তু কোথাও আমাদের স্থায়ী ঠিকানা থাকে কি?"

সাইমন ঘড়ি দেখছেন। বললেন, "আমরা কি ওঁদের এখন নিয়ে যেতে পারি?"

"চলুন। তবু মনে রাখবেন আমরা কিন্তু পবিত্র টোরা সহজে কাউকে দেখাই না। নেহাত সাইমন আপনাদের কথা দিয়ে ফেলেছে ..."

সাইমন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমি কিন্তু আপনার অনুমতি নিয়ে তবেই হ্যাঁ বলেছি।"

"তুমি বললে আমি কি না করতে পারি সাইমন?"

টুপুরের কেন যেন মনে হল, গ্রেট স্ক্রল দেখানো নিয়ে সাইমন আর জোসে একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব চলছে। জোস কি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

বেশিক্ষণ অবশ্য কথা চালাচালি চলল না। জুতো গলিয়ে টুপুরদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জোস হ্যালেগুয়া।

সিনাগগে আলো জ্বলছে। টিকিট কাউন্টারের ছেলেটি বসে-বসে হিসেব করছে টাকাপয়সার। সাইমন আর জোসকে অসময়ে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, "স্যার, আপনারা ...?"

সাইমন বললেন, "ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এই অতিথিরা এসেছেন। এঁরা আমাদের গ্রেট স্ক্রল দেখবেন। তুমি বোসো, কাজ করো।"

ব্যাগ রেখে জুতো ছেড়ে টুপুররা ঢুকল ভিতরে। বর্ণময় সিনাগগ আলোর ছটায় আরও অপরূপ এখন।

দেওয়ালসিন্দুকটা বেদির ওপারে। পরদায় ঢাকা। পরদা সরিয়ে

সিন্দুকের তালা খুললেন জোস হ্যালেগুয়া। পাল্লায় হাত ছোঁওয়ানোর আগে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

সিন্দুক খোলার সঙ্গে-সঙ্গে সিনাগগে যেন বাজ পড়ল। আর্তনাদ করে উঠেছেন জোস।

মহামূল্যবান গ্রেট স্ক্রলটা নেই!

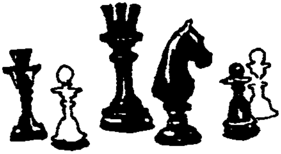

মাট্টানচেরি থানায় ফোন করেছিলেন সাইমন। মিনিট কুড়ির মধ্যে একজন সাব-ইনস্পেক্টর হাজির। সঙ্গে আস্ত এক পুলিশবাহিনী। ভারী বুটের শব্দে থরথর কেঁপে উঠল জু টাউনের সরু গলি।

পুলিশ অফিসারটি বেজায় রাশভারী। যেমন তাগড়াই চেহারা, তেমন বাজখাঁই গলা। গায়ের রং কুচকুচে কালো, নাকের নীচে ইয়া পুরুষ্টু গোঁফ, মাথার কোঁকড়া চুল দক্ষিণী হিরোদের মতো ফাঁপানো। উর্দির বুকপকেটে পেতলের প্লেটে নাম লেখা 'পি ভি জর্জ'।

সুনীল পরিচয় দিয়েছিল মিতিনের, পাত্তাই দিলেন না জর্জ। মানিব্যাগ খুলে নিজের প্রেসকার্ড দেখাল সুনীল, তাতেও জর্জের ভ্রূক্ষেপ নেই। এসেই প্রথমে প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন ঝটাঝট। অবনী আর পার্থকে এমন ক্রূর চোখে দেখতে লাগলেন, যেন চোর ধরেই ফেলেছেন, হাতকড়া পরাতেই যা দেরি। সিনাগগে দাঁড়িয়েই ছুড়তে শুরু করেছেন প্রশ্নবাণ। টুপুররা কলকাতা থেকে কবে এসেছে, কী জন্যে এসেছে, কেন তাদের গ্রেট স্ক্রল দর্শনের সাধ

জাগল, জানলেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। অবনীর মুখ শুকিয়ে আমশি, সহেলিও কাঁপছেন ঠকঠক।

সুনীল চাপা স্বরে সাহস জোগাল, "ঘাবড়াবেন না স্যার। এখানকার ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্তা সম্পর্কে আমার দাদা। কাজিন। আমি এক্ষুনি তাকে মোবাইলে ধরছি।"

এদিকে জর্জ পড়েছেন জোস হ্যালেগুয়াকে নিয়ে। জেরা করছেন কড়া গলায়।

"আপনি গ্রেট স্ক্রল শেষ কখন দেখেছেন?"

"কাল।"

"কাল কখন?"

"সকালে। কাল আমাদের সাপ্তাহিক প্রার্থনাসভা ছিল, তখন।"

"আপনি কি কাল ওটা বের করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমি প্রতি শনিবার টোরা পাঠ করি।"

"নিজের হাতে বের করেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর রেখেও দিয়েছিলেন? নিজের হাতে?"

"অবশ্যই।"

"ওই সিন্দুকের চাবি কি আপনার কাছেই থাকে?"

"রাবির কাছে থাকাটাই নিয়ম।"

"আমি নিয়ম জানতে চাইনি। আপনার কাছে থাকে কিনা প্রশ্ন করেছি।"

প্রবীণ মানুষটিকে এমনিই বড় বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। জর্জের রূঢ় প্রশ্নের ধাক্কায় আরও যেন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছিলেন তিনি। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "চাবি আমার কাছেই ছিল।"

"আপনার বাড়িতে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় রাখেন চাবি?"

"আমার টেবিলের ড্রয়ারে।"

"ড্রয়ার নিশ্চয়ই সব সময়ে তালাবন্ধ থাকে?"

"থাকে। আবার কখনও-কখনও থাকেও না।"

"স্ট্রেঞ্জ! কেয়ারলেস্‌লি চাবিটাকে ফেলে রাখেন?"

"আমার চাবি তো চুরি যায়নি।"

"আসল চাবি থেকে ডুপ্লিকেট তো বানিয়ে নেওয়া যায়? নাকি যায় না?"

থতমত খেয়ে গেলেন জোস। চুপ করে আছেন।

জর্জ ফের তির ছুড়লেন, "আপনি ছাড়া বাড়িতে আর কে কে থাকেন?"

"একজনই আছেন। আমার স্ত্রী শ্যারন।"

"ছেলেমেয়ে?"

"আমার দুটি মেয়ে। দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।"

"বাড়িতে তাদের আসা-যাওয়া আছে নিশ্চয়ই?"

"আমার বড় মেয়ে বস্টনে থাকে। ছোট তেল আভিভ। এক বছরের মধ্যে মেয়ে-জামাইরা কেউই কোচিতে আসেনি।"

"বাড়িতে কাজের লোক আছে তো?"

"না। আমার স্ত্রীই সব করেন।" জোস হঠাৎই ফুঁপিয়ে উঠলেন, "ভাবতে পারছি না... ভাবতে পারছি না। পেন্টা টিউক যে এভাবে চুরি যাবে এ আমার স্বপ্নেরও অতীত।"

"পেন্টা টিউক?" জর্জের ভুরুতে ভাঁজ, "তা হলে যে বললেন গ্রেট স্ক্রল চুরি গেছে?"

"আমরা ইহুদিরা, পবিত্র অনুশাসনলিপিকে পেন্টা টিউক বলি। আর অনুশাসনগুলোকে বলি টোরা। লিপিটাকে গুটিয়ে রাখা হয় বলে পেন্টা টিউককে গ্রেট স্ক্রল নামে ডাকা হয়।"

"জ্ঞান দেবেন না।...বাই দ্য বাই, গ্রেট স্ক্রলের সাইজ কীরকম?"

"ফুটখানেক মতো চওড়া। লম্বায় হাত তিনেক।"

"মানে গোটালে ক্যালেন্ডারের সাইজ?"

"বলতে পারেন।"

"দাম কত হতে পারে?"

"টাকার হিসেবে বলতে পারব না। তবে আমাদের কাছে অমূল্য।"

মিতিনমাসির পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুনছিল টুপুর। চুরির সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন শ্যারন। তিনিও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। জু টাউনের আরও কয়েকজন বাসিন্দা ভিড় করেছেন দরজায়। প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগের ঘন ছায়া। এক প্রবীণা তো ফুঁপিয়ে উঠলেন। পাশের মানুষটি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

সাইমন ধরা-ধরা গলায় বললেন, "পেন্টা টিউক যে কত মূল্যবান, একটা ব্যাপার থেকে আপনি আন্দাজ করতে পারবেন। ওই সিন্দুকে আরও দুটো দামি জিনিস ছিল, চোর কিন্তু দুটোর একটাতেও হাত দেয়নি।"

"দেখলাম তো। একটা সোনার মুকুট। একটা রুপোর বাতিদান।"

"সোনার মুকুটখানা ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বয়ং দিয়েছিলেন। রুপোর বাতিদান কর্নেল মেক্লের উপহার।"

"বুঝেছি, বুঝেছি। চোর আসলি অ্যান্টিক পিসটাই টার্গেট করেছে। এও বুঝতে পারছি গ্রেট স্ক্রল চুরি হওয়ার পেছনে আপনাদের রাবি মহাশয়েরও যথেষ্ট গাফিলতি আছে।"

জোস হ্যালেগুয়া নতমস্তকে দাঁড়িয়ে।

সাইমন তাড়াতাড়ি বললেন, "বৃদ্ধ মানুষটিকে কেন দোষ দিচ্ছেন মিস্টার জর্জ? কুড়ি বছরেরও বেশি উনি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, কখনও তো এরকম ঘটেনি।"

"চুরি একবারই হয়।" জর্জের মুখ গোমড়া। তেরচা চোখে সাইমনকে দেখতে দেখতে বললেন, "আপনি তো সিনাগগের তত্ত্বাবধায়ক, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হলে দায়িত্ব তো আপনার উপরও বর্তায়।" জর্জ গোঁফে মোচড় দিলেন, "আপনাদের রাবি মহাশয় যদি মিথ্যে না বলে থাকেন, তা হলে চুরিটা ঘটেছে কাল সকাল থেকে আজ বিকেলের মধ্যে কোনও এক সময়ে। ঠিক কি না?"

সাইমন আমতা-আমতা করে বললেন, "হ্যাঁ মানে...সেরকমই তো দাঁড়ায়।"

"দাঁড়ায় নয়, সেটাই ঘটেছে।" জর্জ হুঙ্কার ছাড়লেন, "এই দেড় দিন আপনার সিকিউরিটি কি ভেরেণ্ডা ভাজছিল?"

"আমি অবশ্যই তাদের চার্জ করব। তবে স্যার... আমরা নামী কোম্পানির গার্ড রাখি। তাদের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও অভিযোগ নেই।"

"কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন? রক্ষী হোক, আর যে-ই হোক, মতিভ্রম তাদের হতেই পারে। চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকাও মোটেই অসম্ভব নয়।"

"কিন্তু স্যার...?"

"দেখুন মিস্টার পেরেজ, হয় আপনার রক্ষীরা জড়িত, নয় তারা একেবারেই অপদার্থ। নইলে তাদের নাকের ডগা দিয়ে চোর ভিতরে ঢুকে পড়ে? সিন্দুক খুলে বেমালুম একটা জিনিস হাপিস করে দেয়? আমার তো মনে হয় ওদের কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখা যাবে না। আপনি প্রত্যেকের নাম আর বায়োডাটা আমায় দিয়ে দেবেন। আমি সব ক'টাকে থানায় ডেকে পাঠাব।"

"আচ্ছা স্যার।"

"সিনাগগে আর কোন কোন কর্মী আছে?"

"তিনজন ঝাড়পোঁছ করে। আর টিকিট কাউন্টারে বসে দু'জন। পালা করে। তাদের একজন এখনও আছে। ডেকে দেব?"

"থাক। নামগুলো দিয়ে দিন। আর হ্যাঁ, আপনাদের রাবি মহাশয়ের বাড়িতে কারা-কারা যাতায়াত করে তার তালিকাও আমার চাই।"

"সে তো স্যার, এখানকার সব ইহুদি পরিবারই মিস্টার হ্যালেগুয়ার বাড়িতে যায়। আমরা ছোট্ট কমিউনিটি, মিস্টার হ্যালেগুয়া আমাদের সকলেরই অভিভাবকের মতো। বিপদে-আপদে পরামর্শ দেন, সামাজিক অনুষ্ঠানও ওঁর নির্দেশ মতো হয়।"

আবার গর্জে উঠতে যাচ্ছিলেন জর্জ, বাইরে জিপের আওয়াজ।

সুনীল উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, "ওই যে... চেত্তান এসে গেছেন।"

"কে চেত্তান?"

"মানে দাদা। আমরা দাদাকে চেত্তান বলি।"

কথার মাঝেই প্রবেশ করেছেন পুলিশকর্তাটি। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, দোহারা চেহারা, তামাটে রং। উর্দির কাঁধে আই পি এসের ব্যাজ। বুকে নামটাও ঝুলছে—সতীশ মেনন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে সতীশ বললেন, "কী ব্যাপার? কখন হল চুরি?"

জর্জ নয়, সুনীলই এগিয়ে গিয়ে মলয়ালম ভাষায় পুরো ঘটনা বর্ণনা করল সতীশকে। মন দিয়ে শুনলেন সতীশ, আলাপ করলেন মিতিন-অবনীদের সঙ্গে। মিতিন একজন গোয়েন্দা শুনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন।

সতীশ আসামাত্র থমকে গিয়েছিলেন জর্জ। সুনীলের সঙ্গে সতীশের ঘনিষ্ঠতার বহরে তাঁর হম্বিতম্বিও উধাও। সতীশ অবশ্য তাঁকেও আলাদা ডেকে কথা বললেন খানিকক্ষণ। তারপর

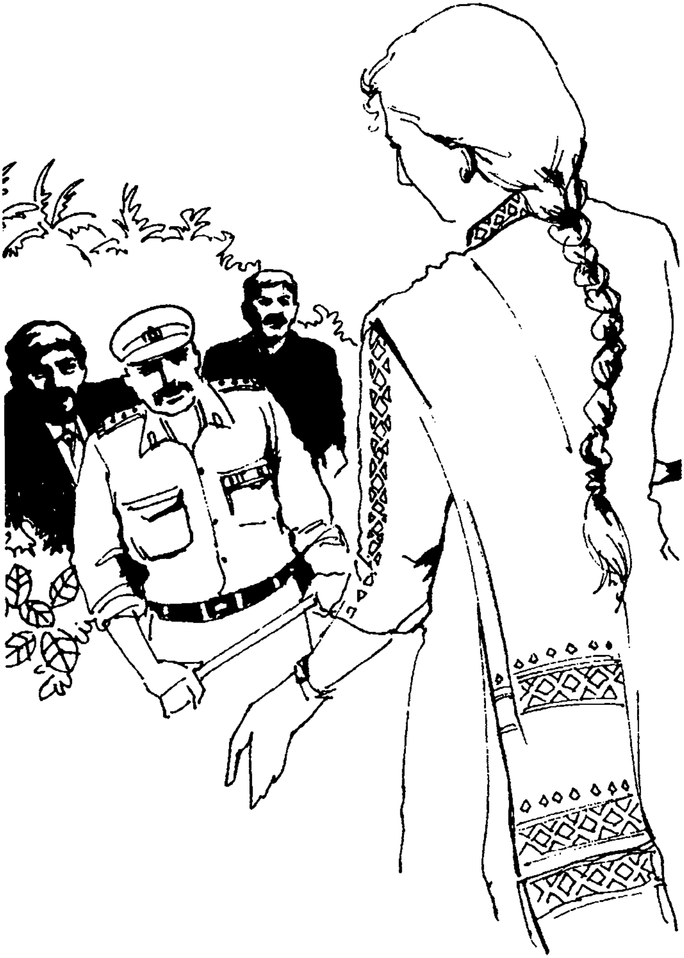

মলয়ালমেই নির্দেশ দিলেন কী সব। বাধ্য অধস্তনের মতো ঘাড় নেড়ে সতীশকে স্যালুট ঠুকলেন জর্জ।

আবার একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদের পালা। এবার শুধু জোস সাইমন নন, প্রশ্ন করা হল শ্যারনকেও। টিকিট কাউন্টারের ছেলেটি আর রক্ষীদের ডেকেও জেরা করলেন সতীশ। কোনও সন্দেহজনক লোককে তারা দু'-চার দিনের মধ্যে দেখেছে কিনা, কে ক'টায় আসে, ক'টায় যায়, কাল ছুটির দিনে কে কোথায় ছিল, কে কত দিন কাজে ঢুকেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাউন্টারের ছেলেটা উত্তর দেবে কী, ভয়েই সে থরহরিকম্পমান।

জর্জ ইতিমধ্যে জোসের কাছ থেকে সিন্দুকের চাবিখানা চেয়ে নিয়েছিলেন। দেখছিলেন উলটেপালটে। আঙুল দিয়ে খুঁটলেন চাবিটাকে। হতাশভাবে মাথা নাড়ছেন।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি চাবির গায়ে সাবান আছে কি না পরখ করছেন?"

"ইয়েস ম্যাডাম। সাধারণত সাবানেই তো চাবির ছাঁচ তোলা হয়।"

"পেলেন কোনও চিহ্ন?"

"বোঝা যাচ্ছে না। ফরেনসিক করালে অবশ্যই ধরা পড়বে।"

"একটা সোজা পদ্ধতিও অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন। চাবিটাকে জলে ডুবিয়ে নাড়ুন। সামান্যতম সাবান থাকলেও ফেনা দেখা দেবে।"

এতক্ষণ পরে হাসির রেখা ফুটল জর্জের মুখে, "ভাল অ্যাডভাইস দিয়েছেন তো ম্যাডাম।"

রিংসুদ্ধ চাবি জলে ফেলা হল। সত্যিই ফুটেছে সাবানের ফেনা। অতি সামান্য হলেও বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

সতীশ বললেন, "যাক, একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত। সিন্দুকের

চাবি কেউ নকল করেছে। নাউ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কালপ্রিট।”

জোস হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, “আমারই দোষ, আমারই দোষ। আপনারা আমাকেই শাস্তি দিন। আমার অসাবধানতার জন্যই...”

সতীশ জোসের পিঠে হাত রাখলেন, “শান্ত হোন মিস্টার হ্যালেগুয়া। গ্রেট স্ক্রল আপনাদের কাছে যতটা পবিত্র, আমাদের কাছেও ঠিক ততটাই মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। গ্রেট স্ক্রল আমরা উদ্ধার করবই।”

সিনাগগে কড়া পুলিশ প্রহরা রাখতে বলে বেরিয়ে এলেন সতীশ মেনন। টুপুররাও এসে দাঁড়িয়েছে জু টাউনের গলিতে।

সতীশ সুনীলকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা এখন যাবে কোথায়?”

“ভেবেছিলাম মেনল্যান্ডে ফিরে স্যারদের নিয়ে একটু সিটিতে ঘুরব। তা তো আর হল না। আটটা বাজে, স্যারদের আজ ডিনারে ডেকেছি...”

“তা হলে তো সোজা বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু যাবে কীসে?”

“ট্যাক্সি ধরে নেব।”

“আমার জিপেও চলে আসতে পারো। আমি তোমাদের ড্রপ করে দিচ্ছি।”

“তোমার অসুবিধে হবে না তো চেত্তান?”

“অসুবিধে তোমার অতিথিদেরই হবে একটু। আমার সঙ্গে দু'জন সেপাই আছে, গাদাগাদি হয়ে যাবে।”

“নো প্রবলেম।” পার্থ তড়িঘড়ি বলে উঠল, “আমরা ম্যানেজ করে নেব। যেতে-যেতে আপনার সঙ্গে জমিয়ে গপ্পোও করা যাবে।”

"দ্যাট্‌স মাই প্লেজার।"

নামে জিপ হলেও মোটামুটি জায়গা আছে গাড়িটায়। চেপেচুপে উঠে পড়ল সবাই।

দীর্ঘক্ষণ চুপ ছিলেন সহেলি, গাড়ি নড়ে উঠতেই গজগজ করে উঠলেন, "একজনের একটা বিদঘুটে শখের জন্য গোটা সন্ধেটাই মাটি হল। কী দরকার ছিল ওই গ্রেট স্কুল দেখতে চাওয়ার?"

অবনী আত্মরক্ষার সুরে বললেন, "আহা, আমি জানব কী করে এত কাণ্ড হবে?"

"ভাগ্যিস মিস্টার মেনন এলেন, নইলে দারোগা তো আমাদেরই হাজতে পুরতেন। আর হাজতে ঢোকালে দু'-চার ঘা কি দিত না?"

সুনীল হেসে উঠল, "অত ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই ম্যাডাম। আমাদের কেরালায় পুলিশ লকআপে যথেচ্ছ মারধোর করা যায় না। জানেন তো, এখানে একটা ছাত্রকে হাজতে পিটিয়ে মারার জন্য সরকারের গদি চলে গিয়েছিল।" বলতে-বলতে পাশে সতীশের দিকে ঘুরল সুনীল। ইংরেজিতে বলল, "আমার স্যারকে কিন্তু তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত চেত্তান। স্যারের জন্যই কিন্তু চুরিটা একদিনের মধ্যে ধরা পড়ল। নইলে নেক্সট শনিবারের আগে তো কিছুই জানা যেত না।"

"ইয়েস। দ্যাটস আ পয়েন্ট।" সতীশ মাথা দোলালেন, "তবে চুরিটা আমায় খুব চিন্তায় ফেলল, বুঝলে। এ নিয়ে মিনিস্ট্রিতে তো হইচই পড়ে যাবে।"

মিতিন বলল, "আমি কিন্তু কালপ্রিটের ব্যাপারে একটা হিন্ট দিতে পারি।"

"কী বলুন তো?"

"সিন্দুক যে খুলেছে সে মোটেই প্রফেশনাল চোর নয়।

নেহাতই আনাড়ি। তাকে টাকার টোপ দিয়ে কাজটা করানো হয়েছে।"

"কী করে বুঝলেন?"

"পেশাদার চোর হলে থোড়াই চাবির গায়ে সাবানের কুচি লেগে থাকত। তবে তার পেছনেও অন্য কোনও পাকা মাথা আছে। যে জিনিসটার দাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সামান্য একটা ছাগলের চামড়া সাধারণ চোর চুরি করতে যাবে কেন?"

"রাইট। যে নিয়েছে সে বুঝেশুনে বড় দাঁও মারার জন্যেই...।" সতীশের চোয়াল শক্ত হল। ফের বলে উঠলেন, "ধরে ফেলব। লোকটাকে আমি ধরবই। গ্রেট স্ক্রলও উদ্ধার হবে।"

অবনী বললেন, "কিন্তু সে জিনিস কি এখন আর কোচির ত্রিসীমানায় আছে? জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, কোন পথে যে পাচার হয়ে গেছে তার ঠিক কী।"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। ওই জিনিস কিনবে কে? কেনই বা কিনবে? প্রকাশ্যে তো রাখতে পারবে না। কাউকে দেখাতেও পারবে না। নিয়ে তার লাভটা কী হবে?"

"দুনিয়ায় অনেক ধরনের খ্যাপা থাকে রে।" মিতিন মৃদু হাসল, "তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কোটিপতি। তারা জিনিসটা নিয়ে নিজের গোপন ভল্টে লুকিয়ে রেখে দেয়। মনে তার একটাই আনন্দ, আজ থেকে সে ওই দুষ্প্রাপ্য জিনিসটার মালিক। ওই আনন্দের লোভে তারা চোরাই মূর্তি কেনে, পেন্টিং চুরি করায়, কোহিনূর-টোহিনুরের মতো বিখ্যাত হিরে পর্যন্ত বাঁকা পথে কিনে নিজের কবজায় রেখে দেয়। চোর কখনও-সখনও হাতেনাতে ধরা পড়ে। কিন্তু এই লোকগুলো চিরকাল আড়ালেই থেকে যায়।"

টুকরো টুকরো আলোচনার মধ্যে সতীশ মেননের জিপ

মাট্টানচেরি বাজার পেরিয়ে, উইলিংডন দ্বীপ ছুঁয়ে, ভেম্বুরুথি ব্রিজ অতিক্রম করে এসে পড়েছে মূল ভূখণ্ডে। ন'টা বাজার আগেই গাড়ি সুনীলের বাড়ির দরজায়।

সুনীলের বাবা-মা আদরযত্ন করলেন খুব। শুধু বাঙালি খানাই নয়, দু'-একটা কেরলীয় পদও রেঁধেছেন সুনীলের মা। হরেকরকম সব্জি দিয়ে অ্যাভিয়ান। ক্যারিমিন পল্লিচাথু বলে এক ধরনের মশলাদার ফ্রাই, সামুদ্রিক মাছের। আর শেষপাতে দুধ, নারকোল আর কলা দিয়ে বানানো কালন। সুনীলের মা-র রান্নার হাত সত্যিই অতুলনীয়। শেষ তিনটে রান্নাই এত সুস্বাদু যে, অবনীর মতো বাতিকগ্রস্ত মানুষও চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কলকাতার খবরাখবর নিলেন সুনীলের বাবা, এখানে অবসরজীবন কেমন কাটছে তাও শোনালেন। সিনাগগের চুরি নিয়েও গবেষণা চলল খানিকক্ষণ। বাড়ি থেকেই চেনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিতে ফোন করল সুনীল, কাল টুপুরদের জন্য গাড়ি ঠিক করে দিল।

সুনীলদের বাড়ি থেকে বেরোতে-বেরোতে প্রায় এগারোটা। ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল বুঝিয়ে দিল সুনীল। বুমবুম ঘুমিয়ে কাদা, তাকে ধরাধরি করে শুইয়ে নেওয়া হল কোলে।

পথ-ঘাট ফাঁকা-ফাঁকা। দোকানপাটের ঝাঁপ পড়ে গেছে বহুক্ষণ, গাড়িঘোড়াও চলছে না বড় একটা। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। পলকের জন্য কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঁকি দিল, পলকে হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

পার্থ একটা জাম্বো হাই তুলে বলল, "আজ খাওয়াটাই যা লাভ, বাকি গোটা দিনটাই তো ফালতু কাটল।"

টুপুর বলল, "সে কী? অমন একটা রোমহর্ষক কাণ্ড ঘটল, তাতেও তোমার মন ভরেনি?"

"টুরিস্ট হিসেবে আমরা কী পেলাম? সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ বন্ধ,

সিনাগগে যাব বলে চাইনিজ ফিশিং নেট দেখা হল না, গ্রেট স্ক্রলের বদলে পড়লাম এক রাগী পুলিশের পাল্লায়...”

সহেলি বললেন, “মার্কেটিংও হল না।”

মিতিন ঘাড় ঘুরিয়ে কী যেন দেখছিল। সোজা হয়ে বলল, “ব্যাক ওয়াটারে মোটরবোট চড়া তো হয়েছে। বাজার আর চাইনিজ নেট নয় ফেরার দিনে হবে।”

“একটা কথা জিজ্ঞেস করব মিতিনমাসি? কোচিতে চাইনিজ মাছ ধরার জাল এল কী করে? এখানে চিনা বসতি আছে নাকি?”

“এখনকার কথা বলতে পারব না। তবে এক সময়ে তো নিশ্চয়ই ছিল। কোচি নামটাই তো নাকি চিনাদের দেওয়া। অবশ্য লোকাল লোকরা অনেকেই তা মানতে চায় না। বলে কোচি নামটা এসেছে মলয়ালম ‘কোছাজি’ শব্দ থেকে। কোছাজি মানে ছোট্ট।”

অবনী বললেন, “আরও একটা মত আছে। মলয়ালমে কোচি মানে ‘বন্দর’। তবে এও ঠিক, ওই মাছের জাল নাকি চিনের বাইরে কোচি ছাড়া আর কোথাও মেলে না। সুতরাং কুবলাই খাঁর আমলে এখানে আসা চিনা বণিকরা যদি কোচি নামটা রেখেও থাকে, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।”

হোটেল এসে গেছে। ভিতরে ট্যাক্সি ঢুকিয়ে ভাড়া মেটালেন অবনী। ঘুমন্ত বুমবুম এখন বেজায় ভারী, তাকে কোলে নিয়ে হাঁটা সত্যিই কষ্টকর। পার্থ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে জাগাল তাকে। *ঠেলে-ঠেলে* নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে দোতলায়। নেশাড়ুর মতো টলছে বুমবুম, দেখে টুপুর হেসে কুটিপাটি।

হাসতে-হাসতেই হঠাৎ নজর গেল মিতিনমাসি হোটেলে ঢোকেনি, নেমেই গেটে গিয়ে ঝুঁকে-ঝুঁকে রাস্তায় কী যেন দেখছে।

দৌড়ে মিতিনমাসির পাশে এল টুপুর, "কী হয়েছে গো?"

"মনে হচ্ছে একটা অটো আমাদের পিছন-পিছন আসছিল।" মিতিন আঙুল তুলল, "ওই যে। ওই চলে যাচ্ছে!"

সেকেন্ডের জন্য অটোটাকে দেখতে পেল টুপুর। তারপরই অটোটা ঘুরে গেল বাঁয়ে। বড় রাস্তা ছেড়ে গলির মধ্যে।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "অটো আমাদের ফলো করছিল? কোচিতে? কেন?"

মিতিন বলল, "বুঝতে পারছি না। অবশ্য আমার মনের ভুলও হতে পারে।"

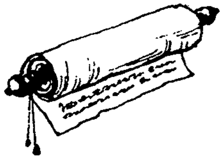

প্রথম থামা হল আলওয়েতে। কোচি শহর ছেড়ে পনেরো-বিশ কিলোমিটার গিয়ে। একটা বাজার মতো অঞ্চলের প্রান্তে প্রকাণ্ড উনুনে অতিকায় কড়ায় কী যেন ভাজাভুজি চলছে। দেখে আর লোভ সামলাতে পারল না পার্থ। হেঁকে উঠল, "হল্ট।"

গাড়ি থেকে নেমে পার্থ পর্যবেক্ষণ করে এল খাদ্যদ্রব্যটি। ঘোষণার ঢঙে বলল, "পাকা কলার বেসনফ্রাই। বেগুনি ভেবে খেতে পারো। অর্ডার দেব?"

"দিতে পারো।" মিতিন বলল, "খিদে তো পেয়েছেই। এখনও পর্যন্ত কফি ছাড়া তো কিছু পেটে পড়েনি।"

সহেলি নাক সিঁটকোলেন, "তা বলে পাকা কলার বড়া? আলুর চপটপ নেই?"

টুপুর বলল, "নতুন জিনিস টেস্ট করো না মা। তা ছাড়া কলা তো

ভাল জিনিস। হাই ভিটামিন। দ্যাখোনি, টেনিস প্লেয়াররা খেলার ফাঁকে গপাগপ কলা খায়!”

যুক্তিতে না পেরে সহেলি অসহায় গলায় বললেন, “ও পার্থ, তুমি যে বলেছিলে ভাল জায়গায় ব্রেকফাস্ট করাবে?”

কথা সেরকমই ছিল বটে। পরিবহন এজেন্সির টয়োটা কোয়ালিস ছ'টা বাজার আগেই চলে এসেছিল হোটেলে। পার্থ অবনীকে ঘুম থেকে তুলে, বুমবুমকে তৈরি করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে সেজেগুজে বেরোতে বেরোতে সাতটা। তখন ব্রেকফাস্টে বসলে আরও কি দেরি হয়ে যেত না!

পার্থ হেসে বলল, “আপাতত এটা দিয়েই শুরু হোক না। পথে নয় আবার দাঁড়ানো যাবে।”

দু' মিনিটে গরমাগরম কলাভাজা হাজির। সঙ্গে কফিও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহেলি কামড় দিলেন কলাভাজায়। পলকে মুখ হাসিতে ভরে গেল। চিবোচ্ছেন কচর-কচর।

অবনীকে বলেন, “খাও না, একটু মুখে দিয়ে দ্যাখো।”

নতুন বস্তুটি চাখতে অবনী একেবারেই রাজি নন। বললেন, “আমার কফিই ঠিক আছে।”

“খালি পেটে বারবার কফি খাবে? তোমার ব্যাগে তো বিস্কুট আছে, বার করে নাও না!'

“আছে বুঝি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমি নিজে কাল রাতে দেখেছি।”

“আমার ব্যাগ কোথায়?”

মিতিন বলল, “টুপুর, পিছনে দ্যাখ তো।”

টুপুর আর বুমবুম ব্যাকসিটে। টুপুরের পায়ের কাছে একটা লাল ব্যাগ। সে নিচু হওয়ার আগেই বুমবুম ঝুঁকে পড়ে চেন খুলেছে, “এটা তো বাবার ব্যাগ! ক্যামেরা আছে।”

"অবনীদার ব্যাগ বোধ হয় তা হলে ছাদে।"

বেরনোর সময়েই জিনিসপত্র সব গাড়ির মাথায় তুলে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল তেরপলে। ঢাকা সরিয়ে ব্যাগটাকে খুঁজল পার্থ। চেঁচিয়ে বলল, "ও অবনীদা, আপনার ব্যাগ তো এখানেও নেই!"

"সে কী? গেল কোথায়? হোটেলে ফেলে এলে নাকি?"

ব্যস, শুরু হয়ে গেল দোষারোপের রিলে রেস। অবনী সহেলিকে দুষছেন, সহেলি মিতিনকে, মিতিন পার্থকে। বেরনোর মুখে ডামাডোলের মাঝে অবনীর লাল ব্যাগ যে কাবার্ডেই রয়ে গেছে এ এখন জলের মতো পরিষ্কার।

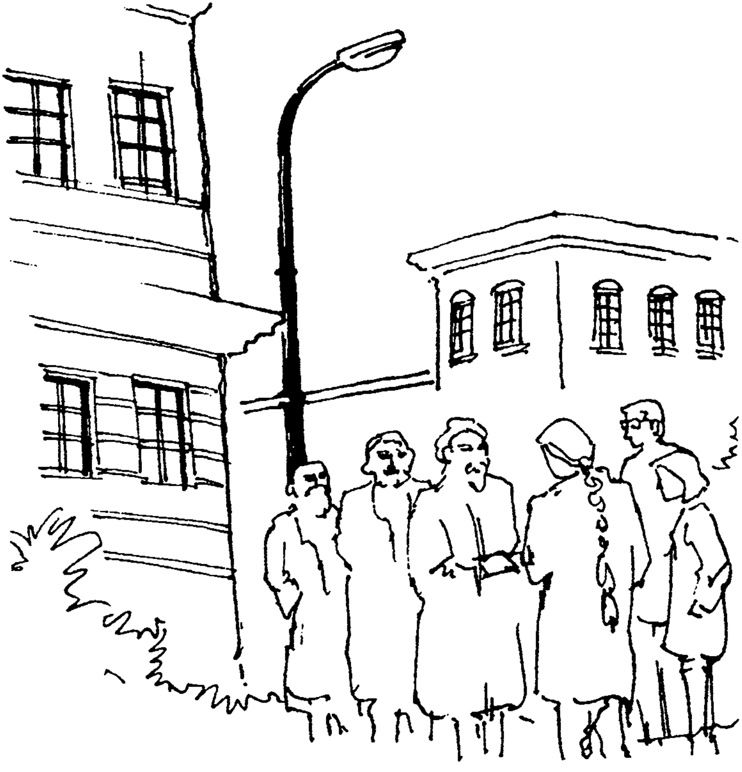

অবনী হায় হায় করে উঠলেন, “কী হবে এখন?”

সহেলি তপ্ত স্বরে বললেন, “ভালই হয়েছে, আপদ গেছে। যে মানুষ নিজের একটা জিনিসও খেয়াল রাখতে পারে না, তার এরকমই হয়।”

“কিন্তু ব্যাগ ছাড়া আমার চলবে কী করে? ওতে আমার ছাতা আছে, পাজামা-পাঞ্জাবি আছে, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আছে...

“ভালই তো হল। রেবতী ইন্টারন্যাশনালের বেয়ারা এখন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, শেভিং সেটে দাড়ি কামিয়ে, ছাতা মাথায় কোচির রাস্তায় হাওয়া খাবে।”

“টিজ় কোরো না। টিজ কোরো না। আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।”

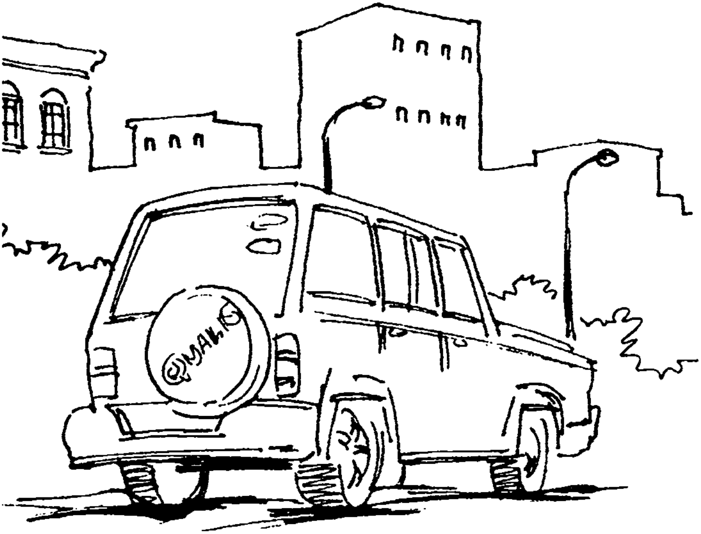

"কুল, কুল।" মিতিন ঝটপট ভ্যানিটিব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন আর রেবতী ইন্টারন্যাশনালের কার্ডটা বের করল। টকটক বোতাম টিপে চলন্ত দূরভাষে ধরল হোটেল ম্যানেজারকে। মিনিট তিনেক কথা বলে হাসিমুখে জানাল, "নো চিন্তা। হোটেলের বেয়ারা কাউন্টারে ব্যাগ জমা করে দিয়েছে। ব্যাগ এখন হোটেলের জিম্মায়। ওরা বলে দিল, উদ্বেগের কিছু নেই, আপনারা তো কোচিতে ফিরবেনই, তখন কালেক্ট করে নেবেন।"

"আমি ততদিন দাড়ি কামাব কী করে?" অবনীর গালে হাত। করুণ স্বরে বললেন, "এই পার্থ, গাড়ি ঘোরানো যায় না?"

"খবরদার না। ওই ক'টা ফালতু জিনিসের জন্য মিছিমিছি তেল পোড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই।" সহেলি কড়া গলায় বললেন, "পার্থ, উঠে এসো।"

কফি কলাভাজার দাম মিটিয়ে গাড়িতে ফিরেছে পার্থ। ছুটল টাটা কোয়ালিস। চলেছে খাড়া পুব মুখে। দেখতে-দেখতে শহরের ছবি মিলিয়ে গিয়ে দু'ধারে গ্রামীণ দৃশ্য। নতুন ধান বোনা হচ্ছে খেতে, চোখ জুড়নো কচি সবুজ রঙে ছেয়ে আছে চারদিক। গোটা রাজ্যটাই কী সবুজ! বাড়িঘরগুলো ভালভাবে লক্ষ না করলে হঠাৎ যেন পশ্চিমবঙ্গ বলে ভুল হয়।

পার্থ ইংরেজিতে ড্রাইভারকে বলল, "একটা ভাল ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করাও তো দেখি।"

হাসিখুশি চেহারার ড্রাইভারটির বয়স বড়জোর সাতাশ-আঠাশ। চকচকে কালো রং, একমাথা ঘন চুল, রোগা হলেও হাড়টাড়গুলো বেশ চওড়া। নাম টমাস ম্যাথু। কেরলীয় ক্রিশ্চান। কোচিতেই বাড়ি। ম্যাথু হিন্দি ইংরেজি দুটোই বলতে পারে, তবে ছাড়া-ছাড়া। পার্থর কথায় সচকিত হয়ে সে প্রশ্ন করল, "হোয়াট স্যার? হোয়্যার স্টপ?"

"ধাবা, আই মিন, রোডসাইড ফুডজয়েন্ট। আমরা ব্রেকফাস্ট করব।"

ব্রেকফাস্ট শব্দটা খুব বুঝেছে ম্যাথু। ঢক করে ঘাড় নাড়ল। গাড়ির গতি বাড়িয়েছে একটু। মিনিট কয়েকের মধ্যে এক জনপদে পৌঁছে ব্রেক কষেছে। ছোটখাটো একখানা রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে বলল, "গুড ফুড স্যার। ইডলি-আপ্পান-বড়া সব মিলে গা।"

তা এখানেও ঠিক প্রাণ ভরে খেতে পারলেন না অবনী-সহেলি। ইডলি চলবে না বলে পুরি-সবজি নিলেন বটে, নতুন ধরনের তরকারির স্বাদ জিভে রুচল না। বিরস মুখে পুরি গিলতে গিলতে আর একবার ব্যাগের শোক উথলে উঠল অবনীর। তাঁর দ্বিতীয় চশমাখানাও নাকি ওই ব্যাগে রাখা ছিল!

শুনে সহেলি বললেন, "তোমাদের দাবার বোর্ডটাও নিশ্চয়ই ওখানে?"

"না দিদি।" পার্থ ফিচেল হাসল, "কালই ওটা আমার ব্যাগে ভরে রেখেছি।"

"উদ্ধার করেছ।" মিতিন তাড়া লাগাল, "এবার চটপট গাত্রোত্থান করো তো। এমন ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে চললে মুন্নার পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে।"

এর পর আর অবশ্য বেশি দাঁড়াল না গাড়ি। ইদুক্কি ডিস্ট্রিক্ট আসা পর্যন্ত বেশ ভাল গতিতেই ছুটল। তারপর শুরু হয়েছে পাহাড়ি রাস্তা। পথ আর মসৃণ নয়, চড়াই-উতরাই পড়ছে অজস্র। দু'পাশে দেখা যায় ছোট-বড় জঙ্গল।

পাহাড় টপকে-টপকে মুন্নার পৌঁছনোর আগে রাস্তার ধারেই জলপ্রপাত পড়ল একটা। ছোট্ট, কিন্তু ঝিমঝিম আওয়াজ তুলে ঝরে পড়ছে ধারা। গাড়ি থামিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল সকলে। জলধারা দেখে বুমবুমের যেন আহ্লাদ আর ধরে না, ম্যাথুর সঙ্গে নেমে গেল

একেবারে সামনেটায়। জামা-প্যান্ট ভেজাল প্রাণের সুখে। পিছল পিছল পাথর বেয়ে মিতিন-টুপুরও গেছে ধারার কাছে। ছিটকে আসা জলকণা মাখছে চোখে-মুখে। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে একটু উপর থেকে পার্থ ছবি তুলছে টপাটপ।

ঠিক তখনই নির্জন রাস্তায় এক অ্যাম্বাসাডার। গাড়িটা জলপ্রপাত পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, ব্যাক করে থামল ঘ্যাচাং। দুটো ষণ্ডা চেহারার লোক বেরিয়ে এসেছে দরজা খুলে। পরনে সাদা লুঙ্গি, সাদা হাফশার্ট। গায়ের রং মেটে-মেটে। একজনের গোঁফ আছে, একজনের মাথায় টাক।

টাকমাথা লোকটা অবনীকে কী যেন বলছে, অবনী জোরে-জোরে মাথা নাড়লেন। গুঁফো সোজা গিয়ে দাঁড়াল ছোট্ট ব্রিজটার ওপর। টুপুরদের খানিক দেখে নিয়ে কোমরে হাত রেখে পায়চারি করছে। টাকমাথা গেল গুঁফোর কাছে, কী যেন বলাবলি করল। তারপর পার্থকে দেখতে-দেখতে গাড়িতে ফিরে গেছে। রমণীয় নিসর্গে একরাশ কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে হুশ করে মিলিয়ে গেল অ্যাম্বাসাডার।

টুপুর এসে অবনীকে জিজ্ঞেস করল, "লোকটা তোমায় কী বলছিল গো বাবা?"

"বুঝলাম না। মলয়ালম।"

মিতিন বলল, "মলয়ালম কেন? তামিল-তেলুগুও তো হতে পারে।"

"নাহ, মলয়ালমই। একটা-দুটো শব্দ চিনতে পেরেছি।"

"কী রকম?"

"যেমন এন্‌থানে। মানে, কী। পয়ভারুকা। মানে, গুড বাই।"

"কার কাছ থেকে শিখলে? সুনীলদাদা?"

অবনী জবাব না দিয়ে হাসলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে সহেলির ধমক, "হেসো না। লোকদুটোকে আমার মোটেই সুবিধের লাগেনি।"

"অসুবিধেটা কী করেছে?"

"ওরা ঘুরে এল কেন? দাঁড়ালই বা কেন? গুঁফো কোমরে হাত দিয়ে কী দেখছিল? দৃষ্টি দেখেছিলে লোকটার? কী রকম ঢুলুঢুলু? ভিলেনদের মতো?"

ব্যস, শুরু হয়ে গেল জল্পনা-কল্পনা। কী মতলব ছিল লোক দুটোর, কেনই বা দেখেশুনে কেটে পড়ল, ছিনতাইয়ের ধান্দা করলে পার্থ ছেড়ে কথা বলত না, খালি হাতেই মোকাবিলা করত, এই সব।

কথাবার্তা চলতে-চলতেই এসে গেছে মুন্নার। সমুদ্রতল থেকে প্রায় পনেরোশো মিটার উঁচুতে মুন্নার সত্যিই এক মনোরম উপত্যকা। চারদিকে ঘন সবুজ পাহাড়, যেদিকে তাকাও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নরম গালিচার মতো নেমে এসেছে চা-বাগান। এই দুপুরেও একটা ঠান্ডা আমেজ ছড়িয়ে আছে মুন্নারের বাতাসে।

সুনীল মুন্নার ক্লাবে থাকার কথা বলে দিয়েছিল। সেইমতো মেন রোড ছেড়ে গাড়ি আরও খানিক উঠল উপরে। আদতে ক্লাব হলেও ভাড়া দেওয়ার জন্য ঘর আছে কয়েকখানা। মূল বিল্ডিং থেকে একটু তফাতে। কটেজের মতো।

ক্লাবের লনে পা রেখে টুপুর উচ্ছ্বসিত, "ওয়াও! দ্যাখো মিতিনমাসি, এখান থেকে চারপাশটা একদম পেন্টিংয়ের মতো লাগছে না?"

"সত্যিই অসাধারণ।" মিতিনও দেখছে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে, "নীচে পুরো মুন্নার টাউনটা দেখা যাচ্ছে, চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে আছে পাহাড়...! আকাশটাও দ্যাখ, মনে হচ্ছে না অনেক নীচে নেমে এসেছে?"

বুমবুম বিজ্ঞের মতো বলল, "এখানেই কিন্তু আমরা থাকব মা। জায়গাটা দার্জিলিংয়ের চেয়েও বিউটিফুল।"

সহেলি সায় দিলেন, "বুমবুম ঠিকই বলেছে। দার্জিলিঙে বড্ড মেঘ এসে পড়ে গায়ে।"

অবনীকে নিয়ে পার্থ ঘর দেখতে গিয়েছিল। ঘুরে এসে বলল, "রুমের কোয়ালিটি কিন্তু সো-সো। বাথরুমও তেমন সুবিধের নয়। অন্য হোটেল দেখব?"

সহেলি বললেন, "আর দেখাদেখিতে যেয়ো না পার্থ। এক-দু'দিনের তো মামলা... স্পটটাও খুব সুন্দর...এখানেই ব্যবস্থা করে ফ্যালো।"

সামনের কটেজটায় পাশাপাশি দুটো ঘর নেওয়া হল। মিতিনদের ঘরটার আবার এদিক নেই ওদিক আছে। খাট বলতে সাধারণ চৌকি, তার উপরে পাতলা তোশক, ড্রেসিংটেবিল-ট্রেসিংটেবিলেরও বালাই নেই, দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, ওদিকে ঘরের সঙ্গে ফাঁকা অ্যান্টিরুম আছে একটি। বাথরুমের সামনেও ছোট্ট একফালি জায়গা।

মুখ-হাত ধুয়ে, জামাকাপড় বদলে তাজা হয়ে নিল সবাই। ক্লাবে আগে থেকে না বলে রাখলে খাবার পাওয়া যায় না, মধ্যাহ্নভোজের জন্য আবার বেরোতে হবে এক্ষুনি। এমন সময়ে অবনী হঠাৎ ভগ্নদূতের মতো মিতিনদের দরজায়। শুকনো মুখে বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেল!"

"কেন? কী হয়েছে?"

"একটা গোখ্‌খুরি করে ফেলেছি। লাল ব্যাগের পকেটে আমার ক্রেডিট কার্ডটা রেখেছিলাম।"

বাক্য শেষ হতে-না-হতে হাউমাউ করে উঠেছেন সহেলি, "কী হবে এখন? কারও হাতে ওই কার্ড পড়লে সে যদি টাকা তুলে নেয়?"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। উত্তেজিত হোয়ো না। প্রথম কথা, অবনীদার সিক্রেট কোড না জানলে কেউ টাকা তুলতে পারবে না। সেকেন্ডলি, ও ব্যাগ তো সেফ কাস্টডিতেই আছে। হোটেল ম্যানেজারের হেফাজতে।"

"তা ঠিক। তবু তুমি আর-একবার হোটেলে ফোন করে দাও না মিতিন।"

টুপুর বলল, "এক কাজ করলে হয় না মিতিনমাসি? তুমি বরং সুনীলদাদাকে জানিয়ে দাও। সুনীলদাদা গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে এলে বাবা-মা'র টেনশন কমে।"

"গুড সাজেশান।" মিতিন মুচকি হেসে খুদে টেলিফোনটা বের করল। স্ক্রিনে চোখ রেখে হাসি মিলিয়ে গেছে, "এই যাহ, নেটওয়ার্ক তো নেই!"

"তা হলে?"

"নো প্রবলেম, ল্যান্ড লাইন তো আছে।" মিতিন কাঁধে ওড়না ঝুলিয়ে নিল, "আয় টুপুর।"

কম্পাউন্ডের মাঝের ক্লাববাড়িটা বেশ বড়সড়। সামনে সুদৃশ্য বাগান। ক্লাবের হলঘরে এই দুপুরেও টেব্‌লটেনিস পেটাচ্ছে দুটো অল্পবয়সি ছেলে, টুং-টাং-টাক আওয়াজ ভাসছে বাতাসে। সরু বারান্দার লাগোয়া অফিসরুমটায় এল মিতিন আর টুপুর। এক মধ্যবয়সি একা বসে ঢুলছিলেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রথমে হোটেলে ফোন। হ্যাঁ, ক্রেডিট কার্ড যথাস্থানেই আছে, ব্যাগ চেক করে বললেন হোটেল ম্যানেজার। মিতিনও তাঁকে জানিয়ে দিল সুনীল এলে ব্যাগটা যেন তার হাতে সমর্পণ করা হয়।

এবার সুনীলের মোবাইল নম্বর। অফিসে ছিল সুনীল, তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মিতিনের ভুরু জড়ো হয়েছে হঠাৎ। কান থেকে ফোন যখন সরাল, কপালে স্পষ্ট বিস্ময়ের ছাপ।

টুপুর উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী হল গো? কী বলল সুনীলদাদা?"

"একটা খুব খারাপ খবর শোনাল।"

"কী?"

"সিনাগগের টিকিট কাউন্টারের ছেলেটাকে মনে আছে?"

"সেই ভিতু-ভিতু মতো? সতীশ মেননের সামনে এসে যে তোতলাচ্ছিল?"

"হ্যাঁ। ছেলেটা কাল রাতে খুন হয়েছে।"

খাবার টেবিলে বিশেষ কথা বলছিল না মিতিন। যেন একটু অন্যমনস্ক। বেয়ারা টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে, তাকাচ্ছেই না সেদিকে।

চিকেন ফ্রায়েড রাইসের ধূমায়িত পাত্রখানা মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়ে পার্থ বলল, "নাও, শুরু করো।"

"হুঁ।"

"তোমাদের জন্য ওই মাছ ভাজাটাও বলে দিয়েছি। ওই যে, কী যেন একটা বিটকেল নাম?"

টুপুর বলল, "ক্যারিমিন পল্লিচাথু?"

"বেড়ে মেমারি তো তোর! এবার টেস্ট করে দ্যাখ বাড়ি আর হোটেলের প্রিপারেশানে কতটা তফাত।... আর কিছু নিবি? চিকেন-মাটনের কোনও সাইড ডিশ?"

"চাইনিজ ফুডের সঙ্গে মোগলাই পাঞ্চ করবে? তা হলে মাটন

কড়াই নেওয়া যেতে পারে। নাকি অন্য কিছু বলব, মিতিনমাসি?"

চামচ করে প্লেটে ফ্রায়েড রাইস নিচ্ছিল মিতিন। মুখ না তুলেই বলল, "তোর মা-বাবাকে জিজ্ঞেস কর।"

"তোর কী হল বল তো?" সহেলি ভুরু কুঁচকোলেন, "কোথায় সিনাগগে একটা মার্ডার হয়েছে, তার জন্য তুই উতলা হবি কেন?"

"উতলা নয়, ভাবছি। ছেলেটা তা হলে গ্রেট স্ক্রল চুরির সঙ্গে জড়িত ছিল?"

"তাতেই বা তোর কী?"

"খানিকটা দায় তো আমাদের আছেই দিদি। আমরা যদি গ্রেট স্ক্রল দেখার জন্য বায়না না জুড়তাম, ছেলেটাকে তা হলে মরতে হত না।"

"এটা তুমি জোর দিয়ে বলতে পারো না।" পার্থ প্রতিবাদ জুড়ল, "কাল না হলেও নেক্সট শনিবার প্রার্থনার সময়ে চুরি তো আবিষ্কার হতই। তখনও তো ছেলেটা খুন হতে পারত। কিম্বা হয়তো সপ্তাহের মাঝখানেই ছেলেটাকে...। পুলিশ তখন চুল ছিঁড়ত, কেন হল, কেন হল...! পরে চুরিটা জানাজানি হলে হয়তো টের পেত কারণটা। মোদ্দা কথা, যারা ছেলেটাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে, তারা ওকে সরিয়ে দিতই। আজ না হোক কাল। যাতে জেরার মুখে দুষ্কর্মের পাণ্ডাটির নাম ফাঁস না হয়ে যায়।

"খলনায়কটি কে হতে পারে মিতিন?" অবনী এক টুকরো শশা মুখে পুরলেন, "নিশ্চয়ই জু টাউনেরই কেউ?"

"আমার তো সাইমন লোকটাকেও সন্দেহ হয়।" সহেলি বললেন, "রক্ষকই হয়তো ভক্ষক।"

"জোস হ্যালেগুয়াকেই বা বাদ দিচ্ছেন কেন?" কাঁটা চামচে চিলি প্রন গাঁথতে-গাঁথতে পার্থ ফুট কাটল, "তাঁর ঘর থেকে চাবির ছাপ তুলে আনা হল, অথচ তিনি কিছুই জানেন না? ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে না?"

"যাই বলো, আমার কিন্তু ধারণা সরষের মধ্যে ভূত যদি থাকেই, সে ওই সাইমন। ভদ্রলোক কাল বলছিলেন না, সন্ধেবেলা কাকে যেন মিট করতে যাবেন? দ্যাখো গে যাও, চোরের দলের সর্দারের সঙ্গেই হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল! সাইমনের পক্ষেই তো জোস হ্যালেগুয়ার চাবি থেকে ছাপ তোলা সবচেয়ে বেশি সহজ কাজ। নয় কী?"

"তোমরা কিন্তু গোড়াতেই ভুল করছ।" এতক্ষণ পর মুখ খুলেছে মিতিন, "জোস বা সাইমন অপকর্মে জড়িত নন, কিম্বা তাঁদের কারও সঙ্গে কোনও কালপ্রিটের আঁতাত নেই, একথা আমি জোর দিয়ে বলব না। তবে কিছু-কিছু খটকা তো থেকেই যায়।"

"যেমন?"

"প্রথম সাইমনকেই ধরো। গ্রেট স্ক্রল হাওয়া হয়ে গেছে জেনেও সাইমন আমাদের গ্রেট স্ক্রল দেখাতে রাজি হলেন কেন? কোনও বাধ্যবাধকতা তো ছিল না, স্বচ্ছন্দে তিনি আমাদের হাঁকিয়ে দিতে পারতেন। আর মিস্টার হ্যালেগুয়া? দেখেছই তো, তিনি কেমন আলাভোলা মানুষ, দরজা সর্বক্ষণই হাট করে খোলা রাখেন। তাঁর বাড়ি থেকে চাবির ছাঁচ তোলা তো নেহাতই ছেলেখেলা। যে কেউ করতে পারে। মিস্টার হ্যালেগুয়ারও যদি চুরির মতলব থাকে, তিনি ডুপ্লিকেট চাবি বানাতে যাবেন কেন? আসল চাবিই তো তাঁর কাছে মজুত।"

টুপুর বলল, "সবাইকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য ওটাই হয়তো মিস্টার হ্যালেগুয়ার চাল?"

"ভুল করছিস। মিস্টার হ্যালেগুয়ার হেফাজতে বহুকাল ধরে দেওয়ালসিন্দুক রয়েছে, গ্রেট স্ক্রল সরানোর হলে তিনি তো কবেই সরাতে পারতেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই বুড়ো বয়সে মিস্টার হ্যালেগুয়ার মতিভ্রম হয়েছিল, মোটা টাকার টোপ খেয়ে

দুষ্কর্মটিতে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন...। তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়। কাউন্টারের ছেলেটার সঙ্গে তিনি সাঁট করবেন কেন? গ্রেট স্ক্রল হাপিশ করার পক্ষে তিনি একাই কি যথেষ্ট নন?"

"এমন তো হতে পারে, ছেলেটা ঘটনাচক্রে মিস্টার হ্যালেগুয়াকে গ্রেট স্ক্রল সরাতে দেখে ফেলেছিল?"

"তা হলে তো তখনই খুন করাতেন। চুরি ধরা পড়া অবধি অপেক্ষা করবেন কেন? অবশ্য যদি ধরেই নিই মিস্টার হ্যালেগুয়া একজন ভয়ংকর মানুষ, যিনি নরহত্যা পর্যন্ত করাতে পারেন। ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, বৃদ্ধ পুরোহিতটিকে দেখে আমার কিন্তু মোটেই সেরকম মনে হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, সাইমনের যুক্তিটা তো মিস্টার হ্যালেগুয়ার ক্ষেত্রেও খাটে। জিনিসটা উধাও জেনেও তিনি আমাদের সিনাগগে নিয়ে গেলেন কেন? তাড়াতাড়ি চুরি ধরা পড়ায় তাঁর কী উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে? একমাত্র তোদের সন্দেহের তির তাঁর দিকে যাওয়া ছাড়া?"

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সাইমন পেরেজ বা জোস হ্যালেগুয়া চুরিতে নেই?"

"সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।" মিতিন একঢোক জল খেল। ভিনিগারে ভেজানো লঙ্কার কুচি মুখে ফেলে বলল, "আগেও বলেছি, এখনও বলছি, নাটের গুরুটি বাইরের কেউ। তবে শুধু যে সাক্ষ্য লোপের জন্য খুনটা হয়েছে, এ আমি পুরোপুরি মানতে পারছি না। চুরি যখন শনিবারই হয়েছে, তখন ছেলেটাকে আরও একটা দিন বাঁচিয়ে রাখার কী অর্থ? নৃশংস লোকটা চোরাই মাল হস্তগত হলেই ছেলেটাকে সাবাড় করবে, এটাই তো স্বাভাবিক ছিল। কেন করেনি সেটাই ভাবছি।"

"অত ভাবাভাবির দরকারটা কী?" সহেলির স্বরে বিরক্তি, "এদিকে আমি যে কত বড় বিপদে পড়লাম সে নিয়ে তো কারও হুঁশ নেই!"

একসঙ্গে সব ক'টা চোখ আছড়ে পড়ল সহেলির ওপর, "বিপদ? তোমার?"

"নয়তো কী। টুপুরের বাবা তো ক্রেডিট কার্ড ফেলে এলেন, এখন আমার চলবে কী করে? ওই কার্ডের ভরসাতেই তো বেশি ক্যাশ টাকা সঙ্গে আনিনি!"

"এই ব্যাপার?" পার্থ হো-হো হাসল, "আমরা তো আছি। কিনুন না যা খুশি।"

"ভরসা দিচ্ছ?"

"সিওর।"

"আমার কিন্তু ভাল দেখে একটা কথাকলির মুখোশ চাই।" সহেলির মুখ হাসিতে ভরে গেল, "যেখানেই দেখতে পাব কিনে নেব।"

"শখের বলিহারি!" অবনী কুটুস ফুট কাটলেন, "মুখোশ পরে নাচবে নাকি?"

"এই তো পণ্ডিতির নমুনা!" অবনীর দিকে আগুনে দৃষ্টি হানলেন সহেলি, "কথাকলি ডান্সাররা মোটেই মুখোশ পরে নাচে না। মাথায় একটা জবরজং মুখোশ চাপায়, আর মুখ এঁকে নেয় মুখোশের ঢঙে। মুখোশ যেটা পাওয়া যায়, সেটা ফর শো। সাজানোর জন্যে।"

"ফ্ল্যাটের দেওয়ালগুলোর ওপর একটু দয়ামায়া তো করো। তোমার সাজের ভারে ওরা যে এবার খসে পড়বে।"

অবনীর বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল গোটা টেবিল। এক লহমায় পরিবেশ ফুরফুরে। ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দেওয়া হল মাটন কড়াই-এর, ক্যারিমিন পল্লিচাথুও এসে গেল, খাচ্ছে সবাই মনোযোগ সহকারে।

মাছভাজা মুখে পুরে বাইরেটা দেখছিল টুপুর। রেস্তোরাঁর কাচের জানলা দিয়ে। ছোট হলেও মুন্নার বেশ জমজমাট শহর। বিশেষত

শহরের এই মধ্যমণি অঞ্চলটা। বাড়িঘর দেখে ঠাহর হয় এলাকাটা পুরনো। এদিকটায় দোকানপাট আছে অজস্র, হোটেলের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সরু একটা নালামতো চলে গেছে শহরের মধ্যিখান দিয়ে। ওটা নালা? না নদী? বর্ষায় ওরই চেহারা হয়তো ফুলে-ফেঁপে ওঠে! অদূরে চা-বাগানও দৃশ্যমান। এত চা হয় নীলগিরি রেঞ্জে?

ভাবনার মাঝেই কনুইয়ের খোঁচা, "অ্যাই দিদিভাই দ্যাখ, সেই দুষ্টু লোকগুলো!"

"কারা?"

"ওই যে ফল্‌সের ধারে এসেছিল!"

ওমা, তাই তো! সেই দুই মূর্তিমানই তো! ঢুকেছে রেস্তোরাঁয়। হেলেদুলে কোনার টেবিলে গিয়ে বসল। তাকাচ্ছে এপাশ-ওপাশে। টুপুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোয়াল ফাঁক করল গুঁফোটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়েছে টুপুর। চাপা গলায় মিতিনকে বলল, "কী বিচ্ছিরি ভিলেনের মতো হাসছে দ্যাখো!"

"আমল দিস না। খা।"

পার্থরও নজর গেছে। বলল, "আশ্চর্য, বেছে বেছে এখানেই এল?"

সহেলি শঙ্কিত মুখে বললেন, "আর এখানে থাকতে হবে না। উঠে পড়ো।"

"আহ, বাড়াবাড়ি কোরো না।" মিতিন মৃদু ধমক দিল, "নির্জন জায়গায় যখন অ্যাটাক করেনি, এত লোকের মাঝে কীসের বিপদ?"

তবু যেন ঠিক আশ্বস্ত হওয়া গেল না। সকলেই আড়ে-আড়ে দেখছে। তন্দুরি চিকেন নিয়েছে লোকদুটো, তামসিক ভঙ্গিতে কচর-কচর চিবোচ্ছে মুরগির ঠ্যাং। টুপুররা যখন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল, তখন নতুন করে কী যেন অর্ডার করছে দু'জনে।

রেস্তোরাঁর উলটো দিকে গাড়ি রেখেছে ম্যাথু। সহেলি সিটে বসে

বললেন, "ওফ, ভয়ে-ভয়ে বেশি খাওয়া হয়ে গেল। এখন একটা পান পেলে ভাল হত।"

"খাবেন পান?" পার্থ বলল, "তবে এখানে বোধ হয় বাংলার পান মিলবে না। দক্ষিণী পান চলবে?"

"চলবে, চলবে। আমি সাউথ ইন্ডিয়ান পান খেয়েছি। কলকাতাতেও পাওয়া যায়। গোল-গোল করে সাজে, ওপরে একটু নারকোল ছড়িয়ে দেয়..."

টুপুর বলল, "আমিও একটা সাউথ ইন্ডিয়ান পান খাব।"

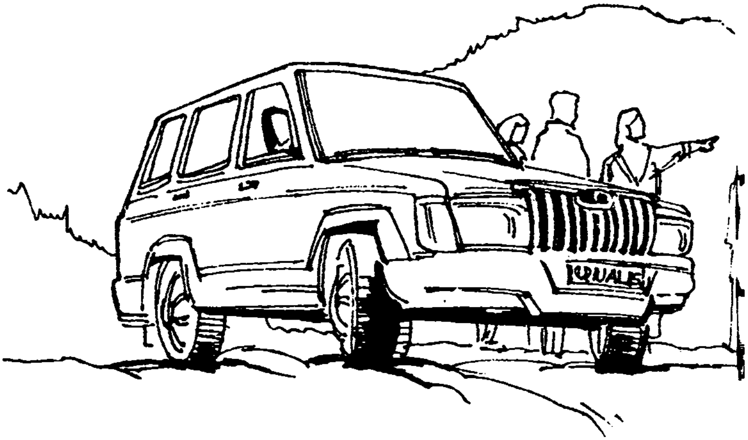

বুমবুম বলল, "আমিও।"

"আয় তবে।"

দোকানে এসে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল পার্থ। পান সাজাই ছিল, ভরে নিয়েছে ঠোঙায়। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "তোদের আর কিছু চাই?"

বুমবুমের একটাই চাহিদা। চিপ্‌স।

টুপুর বলল, "গোটাকতক চিকলেট নিতে পারো।"

"এনিথিং মোর?"

“নাথিং।... আমরা কি এখন হোটেলে ফিরছি, পার্থমেসো?”

“চাইলে খানিক বেড়াতেও পারি। একেবারে সন্ধেবেলা গিয়ে ঢুকব।”

“এখানে কী কী দ্রষ্টব্য আছে?”

“কাছাকাছির মধ্যে সাইট বলতে এরাভিকুলম ন্যাশনাল পার্ক... আনাইমুড়ি পাহাড়... জানিস তো, আনাইমুড়ি সাউথ ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিক। প্রায় দু'হাজার সাতশো মিটার উঁচু।”

“মাত্র? হিমালয়ের চূড়াগুলোর কাছে এ তো নস্যি গো!”

“কী আর করা, এরা যে আর বাড়েনি! তবে মনে রাখিস, আনাইমুড়ির বয়স কিন্তু হিমালয়ের চেয়ে অনেক বেশি।”

“তা ওই বুড়ো পাহাড়ে চড়া যায়?”

“শুনেছি ট্রেক করতে হয়। অনেকটা সময় লাগে। তোর মা থোড়াই পারবে।...আর-একটা সাইটও আছে কাছেপিঠে। মাটুপেট্টি ড্যাম।”

হঠাৎই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, “দ্যাটস আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস। ডোন্ট মিস ইট।”

চমকে ঘাড় ঘোরাল টুপুর। এক ভদ্রলোক হাসছেন মিটিমিটি। পরনে জিন্‌স, ডেনিম জ্যাকেট, কাঁধে বিদেশি ক্যামেরা, পায়ে থ্যাবড়া শু। হাইট খুব বেশি নয়, দোহারা চেহারা, মাথায় আফ্রিকানদের মতো চাপ চাপ কোঁকড়া চুল ও জোড়া ভুরু, গায়ের রং না ফরসা না কালো। দেখে মনে হয় পার্থমেসোরই বয়সি।

হাসি বিস্তৃত করে ভদ্রলোক বললেন, “আমি ওল্পো-ওল্পো বাংলা জানে। সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ। আর ইউ ফ্রম ক্যাল?”

পার্থ ইংরেজিতেই জবাব দিল, “হ্যাঁ, আমরা কলকাতারই বাসিন্দা। আপনি?”

“আমি পি কে জি কুরুপ,” ঝরঝরে ইংরেজিতে বললেন

ভদ্রলোক, “থাকি কাসারগড়। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই কাসারগড়ের?”

“উত্তর কেরলে?”

“একদম ঠিক। এক সময় কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে ছিলাম। তখনই আপনাদের ভাষা সামান্য শিখেছি।”

“চাকরি সূত্রে গিয়েছিলেন?”

“আমি কারও গোলামি করি না মশাই। বাপ-ঠাকুরদার চায়ের ব্যবসা আছে, সেটাই একটু-আধটু দেখাশুনো করি আর কী। তবে আসল কাজ বনে-জঙ্গলে টো-টো করে বেড়ানো।” চোখ টিপলেন পি কে জি কুরুপ, “ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি আমার নেশা। সেই সুবাদেই আপনাদের ডুয়ার্স রেঞ্জে গেছি। সুন্দরবনেও ঘুরেছি। আহা, ওই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এখনও আমার চোখে ভাসে।... আপনারা নিশ্চয়ই টুরিস্ট?”

দু’-পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলাপ জমে গেল। পার্থর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার এপারে এসে অবনী, মিতিন, সহেলির সঙ্গেও পরিচয় করলেন কুরুপ। কাসারগড় থেকে একাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। পালাক্কাড় জেলার সাইলেন্ট ভ্যালিতে নাকি ছিলেন বেশ কয়েক দিন, সবে কালই এসে পৌঁছেছেন মুন্নার। এ জায়গাটা তাঁর ভালই চেনা, বার ছ’-সাত এসেছেন, এবার উঠেছেন হোটেল ক্রিস্টাল প্যালেসে। ইচ্ছে আছে আরও দু’-একটা জঙ্গল ঘুরে ফিরবেন বাড়ি। ব্যাচেলর মানুষ, ঘরের প্রতি তেমন টানও নেই তাঁর। ব্যবসাটাও মূলত দাদা আর ভাই সামলান, তিনি না থাকলেও কারবার ঠিকঠাকই চলে।

কথায়-কথায় কুরুপ জিজ্ঞেস করলেন, “তা আপনারা উঠেছেন কোথায়?”

পার্থই বলল, “মুন্নার ক্লাব।”

"আমিও একবার ওখানে ছিলাম। পজিশনটা খুব সুন্দর। গোটা উপত্যকার চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়। কোন ঘরগুলো নিয়েছেন? উপরের? না নীচের?"

"নীচেই তো পেলাম।"

"উপরেরটা পেলে আরও উপভোগ করতেন। চারপাশে গাছপালা, নির্জন বেশ একটা জঙ্গল-জঙ্গল এফেক্ট আছে।"

"আমার দিদির অসুবিধে হত।" মিতিন বলে উঠল, "ঢাল বেয়ে ওঠানামা করা, তার উপর ভাঙা-ভাঙা পাথরের সিঁড়ি

"আমার গিন্নির একটু ভূতের ভয়ও আছে।" অবনী মন্তব্য জুড়লেন, "বেশি নির্জনতা উনি পছন্দ করেন না।"

"নির্জনতাই তো মুন্নারের আসল সৌন্দর্য। এই নির্জনতার টানেই তো আমার বারবার মুন্নার আসা। পুরনো টাউনটা ছেড়ে ফাঁকা-ফাঁকা জায়গায় থাকি। তা আপনারা থাকছেন ক'দিন?"

"আজকের রাতটাই। কাল এদিকটা ঘুরেফিরে দেখে পেরিয়ার চলে যাব।"

"আমিও তো পেরিয়ার যাচ্ছি। তবে কাল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ব। ইদুক্কির জঙ্গল হয়ে সোজা যাব থেকাডি।" বলে একটু থামলেন কুরুপ। তারপর বললেন, "আজ বিকেলে বেড়ানোর জন্য আপনাদের একটা বিউটিফুল স্পট সাজেস্ট করতে পারি। কাছেই একটা চা-বাগান আছে। দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে লেকের চারপাশ ঘিরে চা-গাছ, দেখে মন ভরে যাবে।"

সহেলি ফস করে বললেন, "এখানে কোনও মন্দির-টন্দির নেই?"

"মুন্নার নামটাই তো হয়েছে মুন্নার দেবীর নাম থেকে। এখানে মন্দির থাকবে না? ওই তো, সামনেই। তবে ওই টেম্পল দেখে সুখ নেই। স্থাপত্য সাদামাঠা, তেমন কারুকাজও নেই, সাইজেও ছোট্ট।"

"তা হোক, তবু একবার মন্দির দর্শন করা উচিত।"

"কুন্দালে চা-বাগানে কিন্তু অবশ্যই যাবেন।" কুরুপ পায়ে-পায়ে এগোলেন খানিক তফাতে রাখা সাদা মারুতির দিকে। গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, "এখন আসি। কপালে থাকলে কাল আবার পেরিয়ারে দেখা হবে। পারলে মুন্নারের গির্জাগুলোও দেখে নেবেন। পুরনো আমলের যা সুন্দর-সুন্দর ঝাড়লণ্ঠন আছে!"

টুপুরদের হাত নেড়ে, নিজেই গাড়ি চালিয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কুরুপ। মারুতির সাদা রং যথেষ্ট ময়লা। বোঝা যায় গাড়ি নিয়ে ভদ্রলোক ঘুরছেন খুব, ধোওয়া-মোছা হচ্ছে না বেশ কিছু দিন।

গাড়িটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়ার পর পার্থ বলল, "ভদ্রলোক কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। পাক্কা বোহেমিয়ান।"

সহেলি বললেন, "জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে মানুষ কী যে আনন্দ পায় কে জানে!"

অবনী বললেন, "মার্কেটিং করেও যে মানুষের কী পুলক জাগে কে জানে!"

"এবার কিন্তু তুমি আমায় টিজ করছ!"

"টিজ কোথায় করলাম? এক-একটা মানুষের কেমন এক-একটা নেচার, তাই বলছি।"

টুকটাক ঠোকাঠুকি চলছে, তার মধ্যেই ম্যাথু গাড়িতে স্টার্ট দিল। পার্থর নির্দেশ মতো চলেছে কুন্দালের পথে। পাহাড়ি রাস্তার দু'ধারে চা-বাগান আর চা-বাগান। বাগিচার মাঝে-মাঝে রেন-ট্রি। সবুজে সবুজে ভারী আরাম হচ্ছিল চোখের।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে টুপুর আপ্লুত স্বরে বলে উঠল, "এখানকার পাহাড়গুলো সত্যিই আমায় অবাক করেছে মিতিনমাসি। দার্জিলিং আর অসম ছাড়া ভারতের আর কোথাও যে এত চা হতে পারে, এ আমার ধারণায় ছিল না।"

"এ হল ব্রিটিশদের হাতযশ, বুঝলি। এই কেরলে প্রাচীনকাল থেকে বিদেশি তো কম আসেনি। চিন, মিশর, গ্রিস, রোম, ফিনিশিয়া, আসিরিয়া কোত্থেকে না এসেছে ব্যবসায়ীরা। বাষ্পযান আবিষ্কার হওয়ার পর ইউরোপিয়ানরা আসতে শুরু করল কেরলে। পর্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসি ...। ব্রিটিশরা এল সবার শেষে। কেরলে প্রথম তারা কলোনি গড়েছিল ষোলোশো চুরাশিতে। ত্রিবান্দ্রাম, মানে যাকে এখন থিরুবনন্তপুরম বলে, তারই কাছে। আত্তিংগলের রানির দেওয়া জমিতে। পরে এসেও তারাই কিন্তু এ দেশের অধীশ্বর বনে গেল। টিপু সুলতানকে হারাল সতেরোশো বিরানব্বইতে, পেয়ে গেল মালাবার আর কোচি। আর তারপর থেকেই এখানকার মাটিকে তারা কাজে লাগাতে শুরু করল। মশলা তো কেরলে চিরকালই হত, ব্রিটিশরা আনল পাহাড়ে চাষ। কোথাও চা, কোথাও কফি, আর পাহাড় সমুদ্রের মাঝামাঝি অঞ্চলে রবার। নীলগিরি রেঞ্জ জুড়ে শুধুই দেখবি প্ল্যানটেশন আর প্ল্যানটেশন। শুধু কেরল নয়, তামিলনাড়ুরও বেশ খানিকটা আছে এর মধ্যে। এ সবই কিন্তু ব্রিটিশদের অবদান।"

অবনী শুনছিলেন মন দিয়ে। বললেন, "কেরলের হিস্ট্রিটাই পিকিউলিয়ার। ভারতের এখানেই প্রথম গির্জা, এখানেই প্রথম মসজিদ, এখানেই প্রথম সিনাগগ

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, যিশুর ডাইরেক্ট শিষ্য সেন্ট টমাস নাকি কেরলে এসেছিলেন?"

"হুঁ। মালাবার উপকূলে। সালটা ছিল বাহান্ন এ ডি। কোচির কাছে ক্রাংগানোর বলে একটা বন্দর আছে, সেখানে।"

"তার মানে খ্রিস্টানরাও এ দেশে দু'হাজার বছরের পুরনো?"

"অবশ্যই। তাই তো বলি এ দেশ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কারও একার নয়, সক্কলের।"

এক পাহাড়ি বাঁকে গাড়ি থামিয়েছে ম্যাথু। বাঁয়ে কুন্দালে টি গার্ডেনের বোর্ড। দূরে, খানিক নীচে দেখা যায় এক স্নিগ্ধ শান্ত হ্রদ। নামতে নামতে হ্রদের পাড় অবধি পৌঁছে গেছে চা-বাগান।

ম্যাথু মাথা দুলিয়ে বলল, "ইউ গো। আই ওয়েট হিয়ার।"

চড়া রঙের শাড়ি জামা নিজস্ব কায়দায় পরে চা-বাগানে কাজ করছে কেরলীয় মেয়েরা। টকাটক দুটো পাতা একটি কুঁড়ি ছিঁড়ছে গাছ থেকে, রাখছে হাতের ঝুড়িতে। টুপুরদের দেখে মিষ্টি করে হাসল তারা। হাত নাড়ছে। তরতরিয়ে হ্রদের পাড় অবধি নেমে গেল বুমবুম আর টুপুর। হ্রদের কাকচক্ষু জলে ছায়া পড়েছে মেঘের, দৃশ্যটা যে কী নয়নাভিরাম। সহেলি পর্যন্ত স্বীকার করলেন কেরলে বেড়াতে আসা তাঁর সার্থক হল।

পাহাড়ে অন্ধকার নামে ঝুপ করে, তাই বেশিক্ষণ আর থাকা হল না কুন্দালে। ফিরছে টয়োটা কোয়ালিস। পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা খাওয়া হল একপ্রস্থ। হোটেলে যাওয়ার আগে টুকুস করে মুন্নার দেবীর মন্দিরেও টুঁ মেরে নিলেন সহেলি। এসবের ফাঁকেই মুন্নারে একটা সুন্দর সন্ধে নেমে গেছে। মুন্নার ক্লাবে যখন পৌঁছল টুপুররা, তখন তো রীতিমতো ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

গাড়ি থেকে নেমে আগে-আগে যাচ্ছিল টুপুর। কেয়ারি করা বাগানের মধ্যিখানের সরু বাঁধানো পথ ধরে। ক্লাবরুমের কাছাকাছি এসে হঠাৎই বুক ধড়াস।

সেই লোকদুটো বসে আছে চেয়ারে। ক্লাবের লম্বা টানা ছায়া-ছায়া বারান্দায়।

টুপুরকে দেখে তড়াং উঠে দাঁড়াল যুগলে। গুঁফো আর টাকমাথা কোরাসে বলে উঠল, "নমস্তে। নমস্তে।"

কী কাণ্ড, লোকদুটো এখানেই উঠেছে নাকি!

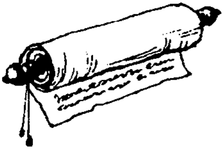

সিঙ্গল চৌকিটায় মিতিন যোগব্যায়াম সারছিল। ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, ময়ূরাসন, মৎস্যাসন করল মিনিট পনেরো, তারপর শবাসন। তারপর প্রাণায়াম। পালা করে পূরক, কুম্ভক, রেচক। কোনটা কতক্ষণ করবে জানে টুপুর। ওয়ান ইজ টু ফোর ইজ টু টু। চেয়ারে বসে টুপুর ঘড়ি দেখছিল। দশ সেকেন্ড ধরে এক নাক চেপে শ্বাস টানা, চল্লিশ সেকেন্ড দম বন্ধ, তার পর অন্য নাক দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে ফুসফুস খালি করা। চেষ্টা করে দেখেছে টুপুর, ওই রেচকটা নিয়েই সমস্যা হয়। অতক্ষণ ধরে একটু-একটু করে শ্বাস ফেলা যে কী কঠিন। আবার এ নাক দিয়ে একবার টানতে হবে, তো পরের বার ও নাক দিয়ে। রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তবে মিতিনমাসি করে ভারী সহজ ভাবে। মনে হয় যেন তার কাছে এসব ছেলেখেলা। এর পর চোখ বন্ধ করে দশ মিনিট ধ্যান। মিতিনমাসি বলে এই ধ্যানটা নাকি মস্তিষ্কের জন্য খুব জরুরি। এতে নাকি মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়ে।

শরীরচর্চা শেষ করে চোখ খুলল মিতিন। হাতের তালু চোখের উপর আলতো বোলাতে-বোলাতে বলল, "কী রে, দিদি ভরসন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?"

"আজ্ঞে না।" বড় চৌকিতে নিশ্চুপ শুয়ে থাকা সহেলি খরখর করে উঠলেন, "আমি শুধু চোখ বুজে ভাবছি তোমাদের আক্কেলের কথা। তুমি এখানে হাত-পা বেঁকাচ্ছ, ওদিকে দু'জন দাবা নিয়ে বসে গেছেন মাথার উপর যে খাঁড়া ঝুলছে, সে খেয়ালটি নেই!"

"কীসের খাঁড়া?"

দরজা-জানলা সব বন্ধ, তবু গলা অস্বাভাবিক নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে সহেলি বললেন, "গুন্ডাদুটো ধাওয়া করে এখানে পর্যন্ত এসে গেল... এখন আমরা কী করব?"

"নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও। অযথা প্যানিক কোরো না। এখনও পর্যন্ত ওরা তোমার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে?"

"দিতে কতক্ষণ?... মিতিন, এখনও সময় আছে, চল, অন্য হোটেলে চলে যাই।"

"এখন? খেপেছ? তুমি আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ো।" মিতিন চৌকি থেকে নেমে গায়ে একখানা শাল জড়িয়ে নিল। দিনেরবেলা টের পাওয়া যায়নি, তবে সূর্য ডোবার পর বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে আবহাওয়া। অ্যান্টিরুমে গিয়ে সুটকেস খুলে বুমবুমের জন্য একটা হাফ সোয়েটার বার করতে-করতে বলল, "তুইও গায়ে একটা কিছু চাপিয়ে নে টুপুর। চোরা ঠান্ডা একবার লেগে গেলে আর রক্ষে নেই।"

টুপুরেরও একটু শীত-শীত করছিল বটে। তবু বলল, "ধুত, শাল তো সুটকেসের তলায়। কে এখন টেনে-টেনে বের করবে?"

"তোদের সুটকেসের চাবি দে। আমি বের করে দিচ্ছি।"

সব জিনিসপত্র রাখা হয়েছে এক জায়গায়। এ ঘরের অ্যান্টিরুমে। টুপুর, সহেলি দু'জনের জন্যই দুটো গরম চাদর বের করল মিতিন। টুপুরকে বলল, "বুমবুমকে ডাক তো। সোয়েটারটা পরিয়ে দিই।"

পাশের ঘরে এসে টুপুর থতমত। নিবিষ্ট মনে দাবা খেলছে দুই মহারথী, বুমবুম নেই!

ভুরু কুঁচকে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ও মেসো, বুমবুম কোথায়?"

পার্থ বিড়বিড় করে বলল, "দাঁড়া, গজটাকে ধরেছে।"

অবনী গর্বিত মুখে বললেন, "ওটা গেছে ভ্লাদিমির। হাতি বাঁচাতে গেলে তোমায় একটা বোড়ে স্যাক্রিফাইস করতে হবে।"

"অত সোজা নয় গ্যারি। এবার আপনি আমার ঘোড়ার কেরামতি দেখবেন। আড়াই পা লাফিয়ে আপনার নৌকোকে অ্যাইসান চাঁট ঝাড়বে..."

টুপুর ব্যাকুল স্বরে বলল, "ও বাবা, ও মেসো, খেলাটা একটু থামাও না।"

অবনী মুখ তুললেন, "কেন?"

"বুমবুমকে দেখছি না যে!"

"এই তো ছিল।" পার্থ চোখ না তুলে বলল, "তোদের ঘরে গেছে বোধ হয়।"

"না। আমি তো ওঘর থেকেই এলাম।"

"তা হলে হয়তো বাথরুমে

দৌড়ে টয়লেটে উঁকি মেরে এল টুপুর। নাহ, বুমবুম সেখানেও নেই!

ব্যস, হুলুস্থুল বেধে গেল। মিতিন দৌড়ে লনে নেমে অন্ধকারে খুঁজছে এদিক-ওদিক। পার্থ ছুটে গাড়ির কাছটা দেখে এল, অবনী ক্লাবঘর। উঁহু, ক্লাবঘর, লন, রসুইখানা, গাড়ি, বুমবুম কোত্থাও নেই। ম্যাথু ক্লাবরুমে বসে টিভি দেখছিল, সেও হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে খুঁজতে। জনাচার-পাঁচ ভদ্রলোক ছিলেন ক্লাবে, তাঁরাও শশব্যস্ত। উলটো দিকের রুমের তামিল পরিবারটিও দরজা খুলে ঘাবড়ানো মুখে উঁকিঝুঁকি মারছে।

একজন বললেন, "বাচ্চা রাস্তায় বেরিয়ে যায়নি তো?"

সহেলি হাউমাউ কেঁদে উঠলেন, "কক্ষনো না। ওই লোকদুটোই ধরে নিয়ে গেছে। আমি জানতাম আমি জানতাম এরকম কিছু একটা ঘটবে!"

"কে লোক?" কেয়ারটেকার প্রশ্ন করল, "কাদের কথা বলছেন?"

"ওই যে, উপরের ঘরে উঠেছে। সারাদিন ধরে ওরা আমাদের ফলো করছে।"

"তাই নাকি? লোকদুটো ছেলেধরা?"

কথা শেষ হতে-না-হতে উপরের কটেজ থেকে দুমদুম দমাদম আওয়াজ। হুড়মুড় করে সবাই ছুটেছে উপরে। গিয়েই চক্ষুস্থির। লোকদুটোর দরজার ল্যাচ বাইরে থেকে টানা, ভিতর থেকে কে যেন ঘা মারছে জোর-জোর।

টুপুর চেঁচিয়ে উঠল, "বুমবুম নিশ্চয়ই বুমবুমকে আটকে রেখে গেছে!"

পার্থ গিয়ে ঘ্যাচাং করে খুলে দিল ল্যাচ। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত দৃশ্য। বোধ হয় দূর থেকে ছুটে এসে দরজায় একটা মরিয়া ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেছে দ্বার। গুঁফো আর টাকমাথা তীব্র গতিতে শাঁ করে বেরিয়ে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। দুটো অতিকায় মিসাইলের মতো।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য লোকদুটো হতভম্ব। তারপর উঠে গায়ের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে তাদের সে কী চিৎকার। তুবড়ি ছুটছে মলয়ালমের। ক্রোধে গরগর করছে, হাত-পা ছুড়ছে ...। অতি কষ্টে তাদের শান্ত করল কেয়ারটেকার। ইংরেজি তর্জমাতে জানা গেল লোকদুটো নাকি খেতে বেরিয়েছিল, ফেরার পর কে যেন তাদের ঘর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। আর বুমবুমকে...? তারা দেখেইনি।

টুপুর নার্ভাস মুখে বলল, "তা হলে বুমবুমের কী হল?"

মিতিন বলল, "দাঁড়া এক সেকেন্ড। দেখছি।"

বলেই ঘরটার পিছনে গিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল বুমবুমকে। বলল, "এই যে বাবু। পিছনের জানলায় দাঁড়িয়ে এঁদের দুর্গতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ল্যাচ টানাটাও এঁরই কীর্তি।"

বুমবুমের ঘাড় হেঁট। পার্থ লজ্জায় লাল। মিতিন বিনীতভাবে ক্ষমা চাইল লোকদুটোর কাছে। গুঁফো আর টাকমাথা গলল না, রক্তবর্ণ চোখে নিরীক্ষণ করছে বুমবুমকে। টুপুররা নেমে আসার পরও ঘরে ঢুকল না, সম্ভবত আবার যদি ঘরবন্দি হয় এই আশঙ্কায়।

রুমের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বুমবুমের ঘেঁটি পাকড়াল মিতিন। জোর ধমক লাগাল, "কেন তুমি ওরকম শয়তানি করলে? কেন?"

বুমবুমের মুখ কাচুমাচু। ঢোক গিলে বলল, "দুষ্টু লোকদুটোকে আমি শাস্তি দিচ্ছিলাম।"

"কীসের শাস্তি?"

"বারে, ওরা যে আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল।"

"কী ভয় দেখিয়েছে?"

মাথা চুলকে বুমবুম বলল, "বারে, তোমরাই তো বলছিলে

"ধন্যি সাহস ছেলের!" সহেলি কপাল চাপড়াচ্ছেন, "হবে না? গোয়েন্দা মাকে দেখে দেখে যা শিখছে ..."

"লোকদুটো কিন্তু বেজায় খেপেছে।" অবনী বললেন, "একটা বাচ্চার হাতে ওইভাবে হেনস্থা হওয়া ...!"

সহেলি বললেন, "একা পেলে ওরা কিন্তু বুমবুমকে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে।"

টুপুর বলল, "যেভাবে ওরা মুরগি ছিঁড়ে খাচ্ছিল?"

টুপুরের বলার ধরনে হেসে ফেলল সবাই।

ঘরের হাওয়া লঘু হতেই গুটিগুটি নৌকো গজ সাজিয়ে বসে পড়লেন অবনী। পার্থকে ডাকলেন, "কী হল, এসো। তোমার গজ সামলাও।"

পার্থও দু'হাতে চুল খামচে চোখ গাঁথল দাবার বোর্ডে। বলল, "হচ্ছে, হচ্ছে। তাড়া কীসের।"

মিতিন চোখ পাকাল, "অ্যাই, এক্ষুনি মজে যেয়ো না। আগে কাজের কথাগুলো শেষ করো।"

"বলো। কান আছে।"

"রাতে খাওয়াদাওয়ার কী হবে?"

"বন্দোবস্ত কমপ্লিট। সন্ধেবেলা ঢোকার সময়েই ক্লাবের ক্যান্টিনে বলে দিয়েছি। প্লেন চাপাটি আর চিকেন। সার্ভ করবে কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। ঠিক আছে?"

"আর কাল সকালে?"

"এখনই সকালের চিন্তা করতে হবে? রাতটুকু কাটতে দাও।"

"সকালে কিন্তু সময় পাবে না। আমরা সাতটার মধ্যে বেরোব। তখন নিশ্চয়ই এখানকার ক্যান্টিন খুলবে না?"

"সম্ভবত না।"

"তা হলে?"

"পথে কোথাও খেয়ে নেব।"

"না। পথে দাঁড়ানো মানে সময় নষ্ট। সব কিছু দেখেটেখে আমাদের কিন্তু বিকেল-বিকেল পেরিয়ার পৌঁছতে হবে। একশো দশ কিলোমিটার রাস্তা, গোটাটাই পাহাড়ি, ঘণ্টা চার-পাঁচ তো লাগবেই।"

"তো?"

"পাউরুটি-টাউরুটি এনে রাখো না। মোটামুটি তা হলে একটা হেভি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়ি।"

"এখন কোথায় পাউরুটি পাবে?"

"না পাওয়ার তো কিছু হয়নি। সবে তো আটটা বাজে।"

"বেরোতেই হবে?" পার্থর মুখ বেজার, "এই বিজন বিভুঁইয়ে রাতের অন্ধকারে

মিতিন রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল। টুপুরকে বলল, "তোর

মেসো ফেভিকলে সেঁটে গেছে। চল, আমরাই যাই। তোর মা সঙ্গে গেলে গাড়ি নেব, নয়তো পায়দল।"

সহেলিও নড়তে ইচ্ছুক নন। টিভি চালিয়েছেন রুমে, এখন কী একটা হিন্দি সিরিয়াল হয়, দেখবেন। অ্যাডভেঞ্চার ক্লান্ত বুমবুমও বসে পড়ল পরদার সামনে। সহেলির গা ঘেঁষে।

আকাশে চাঁদ ওঠেনি এখনও। ঝিকমিক করছে কোটি-কোটি তারা। গাঢ় নীল আকাশের মতো মুন্নার শহরটাও সেজেছে আলোর শলমা চুমকিতে। দূরেও পাহাড়ে-পাহাড়ে দেখা যায় ছোট-ছোট আলোর বিন্দু।

দেখতে-দেখতে বিভোর হয়ে হাঁটছিল টুপুর। পাকদণ্ডী ধরে নেমে এল বড় রাস্তায়। টর্চ মিতিনমাসির হাতে। জ্বলছে, নিভছে।

নীচে প্রায় সব দোকানই খোলা। একটা বড়সড় স্টেশনারি দোকান থেকে কালকের রসদ কিনে ফেলল মিতিন। পাউরুটি, মাখন, জ্যাম, কলা, বিস্কুট, চানাচুর। এবং চিপ্স। ওটি না থাকলে বুমবুম মাথা খেয়ে ফেলবে।

দোকান থেকে বেরিয়েছে দু'জনে, সামনে সকালের সেই সাদা মারুতি। ড্রাইভিং সিট থেকে ঘাড় এগিয়ে হাঁকছেন পি কে জি কুরুপ, "গুড ইভনিং ম্যাডাম।"

মিতিন, টুপুর গাড়ির কাছে গেল।

ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে মিতিন বলল, "ভেরি গুড ইভনিং। আপনি এদিকে কোথায়?"

"এই একটু দানাপানির খোঁজে বেরিয়েছিলাম।" কুরুপ গাড়ি থেকে নেমে এলেন, "আপনারা মাত্র দু'জন কেন? বাকিরা কোথায়?"

"রুমে। আমরা একটু সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি।"

"বাহ্। তা আসুন না, গরম-গরম কফি খাই। আপত্তি আছে?"

“একেবারেই না। চলুন।”

দু’-চার পা দূরেই ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট। তেমন শৌখিন নয়, তবে মোটামুটি ছিমছাম। পরিচ্ছন্ন। কফির অর্ডার দিয়ে কুরুপ বসলেন গুছিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, “গিয়েছিলেন কুন্দালে?”

মিতিনের আগে টুপুরই বলে উঠল, “নিশ্চয়ই। দারুণ এনজয় করেছি।”

“কেরল তো উপভোগ করারই জায়গা। ফ্রম নর্থ টু সাউথ কত যে ঘোরার জায়গা!”

“আপনাদের নর্থ কেরলেও অনেক সুন্দর-সুন্দর জায়গা আছে?”

“আছে তো। আমাদের বাড়ি থেকেই মাইল দশেক দূরে বেকাল ফোর্ট। সমুদ্রের পাড়ে ওরকম দুর্গ রীতিমতো দুর্লভ। বেকাল বিচটাও দেখার মতো। তারপর ধরুন কালিকট, আই মিন কোঝিকোড়। ভাস্কো-দা-গামা যেখানে প্রথম ল্যান্ড করেছিলেন।”

টুপুর বলল, “ভাস্কো-দা-গামা মারা তো গিয়েছিলেন কোচিতে?”

“হ্যাঁ। পনেরোশো চব্বিশ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর। ফোর্ট কোচিতে।”

“কোচিতে দুর্গ আছে নাকি? আমরা তো দেখিনি!”

“মাট্টানচেরি আইল্যান্ডের উত্তর দিকে ছিল দুর্গটা। এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কাঠের দুর্গ তো, কত কালই বা টেঁকে!”

টুপুর আরও অবাক, “কাঠের?”

“ইয়েস মিস। সেই দুর্গের নাম ছিল ম্যানুয়েল কোলাটি। ইংরেজিতে পোর্ট সেন্ট ম্যানুয়েল। তৈরি হয়েছিল পনেরোশো তিন সালে। বানিয়েছিলেন ভাস্কো-দা-গামার বন্ধু পর্তুগিজ অ্যাডমিরাল আলবুকার্ক। এই আলবুকার্কই কোচিতে পর্তুগিজ কলোনির পত্তন করেন। অবশ্য কোচির প্রথম ভাইসরয় হয়েছিলেন আলমিডা, হয়তো আলবুকার্কই ভাইসরয় হতেন, কিন্তু তিনি যে দেশে ফিরে

গিয়েছিলেন। আবার আলবুকার্ক এসেছিলেন বটে, তবে তিনি আর তখন কর্তৃত্ব পাননি।"

এবার মিতিনের আশ্চর্য হওয়ার পালা, "আপনার তো দেখছি ইতিহাসে অগাধ ফান্ডা!"

"ওই একটু-আধটু পড়াশুনো করি আর কি। শখ।" কুরুপ কাঁধ ঝাঁকালেন, "ইতিহাস আর ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি, এই নিয়েই তো আছি।"

স্টিলের গ্লাসে কফি এসে গেছে। চুমুক দিয়ে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফির নেশাটা ধরল কী করে?"

"সে এক গল্প ম্যাডাম। আমার বাবা ছিলেন চ্যাম্পিয়ন শিকারি। ঘুরে-ঘুরে কতরকম শিকার যে তিনি করেছেন। তিন জাতের বেড়াল, চার ধরনের ভাল্লুক, সাত রকম হরিণ, আট রকম ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড় তিনটে করে ভ্যারাইটির। হরিণের মধ্যে অ্যান্টিলোপও আছে, তার চামড়া ঝুলছে আমাদের বাড়ির দেওয়ালে। অসমে তিনি পাগলা হাতি মেরেছেন, রাজস্থানের রণথম্ভোরে কস্তুরী মৃগ। তা জঙ্গল-পাগল বাবার নেশাটা আমার রক্তেও বর্তেছে। তবে এখন তো আর বন্দুক-টন্দুক দিয়ে শিকার করার জো নেই, তাই আমি ট্রিগারের বদলে শাটার চালাই।"

"নিশ্চয়ই প্রচুর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাও হয়েছে?"

"সে আর বলতে। একবার তো বাঘের মুখে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেছি। ওড়িশার সিমলিপালে একরাশ হরিণকে তাক করছি, একটা বাঘ কোত্থেকে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে হাজির। জানেন তো, জীবজন্তুর ঘ্রাণশক্তি প্রখর হয়, আর বাঘের তো সাংঘাতিক। নেহাত কভারড জিপে ছিলাম, নইলে সেদিনই আমার ভবলীলা খতম।"

মিতিন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি একাই জঙ্গলে ছবি তুলতে ঢোকেন?"

"ভাড়াগাড়ি নিলে ড্রাইভার থাকে। তবে কেরলে আমি একা-একাই ঘুরি।"

কফি শেষ করে গ্লাস নামালেন কুরুপ। পার্স বের করে দাম মেটালেন। বাইরে এসে মিতিন প্রশ্ন করল, "কাল তা হলে আপনার ইদুক্কি যাত্রা?"

"ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ব। ওখানে এক ধরনের লঙ্গুর আছে, যদি মিলে যায় তো তাদের স্ন্যাপ নেব কয়েকটা।"

পাকদণ্ডী অবধি মিতিন-টুপুরকে গাড়িতে এগিয়ে দিলেন কুরুপ। তারপর পেরিয়ারে দেখা হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বিদায় নিলেন। সাদা মারুতি মিলিয়ে যাওয়ার পর টুপুর বলল, "ভদ্রলোক একটু পিকিউলিয়ার টাইপ, তাই না মিতিনমাসি?"

"কেন?"

"অনেক কিছু জানেন বটে, তবে ভুলভালও বকেন।"

"যেমন?"

"বাঘের ঘ্রাণশক্তি মোটেই প্রখর নয়। বরং বেশ দুর্বলই। অথচ উনি বললেন..."

"তোড়ের মাথায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে হয়তো। কিম্বা ধরেই নিয়েছেন আমরা অজ্ঞ লোক...।" মিতিন আলগা হাসল, "কস্তুরী মৃগ রাজস্থানে নয়, সিকিমে দেখা যায়। অথচ উনি এমন কনফিডেন্টলি বলছিলেন..."

কুরুপকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে-করতে রুমে ফিরল মাসি-বোনঝি। ঘরে দারুণ উত্তেজনা, এইমাত্র পার্থর ঘোড়া খেয়ে ফেলেছেন অবনী। একটি মাত্র বোড়ে খুইয়ে। নাকের পাটা ফুলছে পার্থর, মুঠো পাকাচ্ছে। আর অবনী গুনগুন গান গাইছেন, "হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে..."

টুপুর বসে পড়ল পার্থমেসোর পাশে। পাউরুটি-টাউরুটিগুলো

রেখে মিতিন আবার বেরোচ্ছিল, টুপুর জিজ্ঞেস করল, "চললে কোথায়?"

"ক্লাবের অফিসরুমে। সুনীলকে একটা ফোন করে আসি।"

"এত রাতে? কেন?"

"হোটেল থেকে ব্যাগটা আনল কি না জানতে হবে না?"

"আমি যাব সঙ্গে?"

"থাক। তুই বসে-বসে গজকচ্ছপের লড়াই দ্যাখ।"

মিতিন ফিরল মিনিট পনেরো পর। পিছন-পিছন রাতের খানা হাতে ক্লাবের কর্মচারী। রান্না অতি অখাদ্য, তবে খিদের মুখে পড়তে পেল না, দ্যাখ না দ্যাখ সব ক'টা প্লেট চেটেপুটে সাফ।

নৈশাহার সাঙ্গ হতেই সকলের মন শুই-শুই করছে। সকাল থেকে ঘোরাঘুরি তো কম হয়নি। ঠান্ডাটাও বাড়ছে ক্রমশ, ঝটপট কম্বলে সেঁধিয়ে গেলে নিদ্রাটাও ভালই জমবে।

ভোররাতে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখছিল টুপুর। আরব সাগরের ঢেউ কেটে-কেটে পালতোলা এক বিশাল নৌকো এসে ভিড়ল নারকোল গাছে ছাওয়া ছোট্ট একটা দ্বীপে। নৌকো থেকে নামলেন ইতিহাস বইয়ে দেখা ভাস্কো-দা-গামা। জোস হ্যালেগুয়ার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে যাচ্ছেন সিনাগগের দিকে। সিনাগগের সামনে থিকথিক করছে পুলিশ, ভাস্কো-দা-গামা থমকে দাঁড়ালেন। কী যেন বলছেন মিস্টার হ্যালেগুয়াকে। কোত্থেকে হঠাৎ পি ভি জর্জ চেঁচিয়ে উঠলেন, "মার্ডার! মার্ডার!"

জর্জের চিৎকারেই টুপুরের ঘুম ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। আচমকা টের পেল কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। কাছেই কোথাও।

অ্যান্টিরুমের দিক থেকে আসছে না আওয়াজটা? একটা সরু আলোও যেন নড়েচড়ে উঠল না?

টুপুর ধড়মড় করে উঠতে যাচ্ছিল, তখনই ফিসফিস মিতিনমাসির গলা, "শব্দ করিস না। আমি দেখছি।"

পা টিপে-টিপে মিতিন অ্যান্টিরুমে পৌঁছয়নি, অমনি ঝনাৎ করে কী যেন একটা পড়ার আওয়াজ! সঙ্গে ধুপ করে কারও লাফ!

মিতিন চেঁচিয়ে উঠল, "যাহ্, পালিয়ে গেল!"

সহেলিও উঠে পড়েছেন। আলো জ্বেলে টুপুরের সঙ্গে তিনিও দৌড়লেন অ্যান্টিরুমে, "কী হল রে?"

মিতিনের হাতে একটা লম্বা লাঠি। লাঠির ডগায় লোহার আঁকশি বাঁধা। সব মিলিয়ে লগি-লগি চেহারা। লাঠিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে মিতিন বলল, "এটা দিয়ে কেউ আমাদের জিনিসপত্র টানার চেষ্টা করছিল। ওই দ্যাখো, পার্থর লাল ব্যাগটা জানলা অবধি নিয়ে গেছে।"

"এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! চোর এসেছিল?"

"তাই তো দেখা যাচ্ছে। পিছনের জানলার হুড়কোটা আগে চাড় দিয়ে খুলেছে, তারপর শিকের ফাঁক দিয়ে লাঠি গলিয়ে দিয়েছিল।"

"কিন্তু ওইটুকু ফাঁক দিয়ে ব্যাগ সুটকেস বের করত কী করে?"

"শিক ভেঙে ফেলত।" সহেলির গলা কাঁপছে, "চোর-ডাকাতের অসাধ্য কিছু আছে!"

"গরাদ না কেটেও জিনিস হাতানো যায় দিদি। ব্যাগ জানলায় তুলে জামাকাপড় বের করে নেওয়া কী এমন কঠিন?"

টুপুর লাঠিটা হাতে নিয়েছে। খানিক নিরীক্ষণ করে বলল, "শেপটা খাটের ছত্রীর মতো না?"

"হুঁ।"

"ছোট-ছোট করে কোনায় কী যেন লেখাও আছে! এন্... না না, এইচ। তারপর সি। তারপর পি। দ্যাখো তো ঠিক দেখছি?"

"রাখ তো এখন গবেষণা।" সহেলি ঝাপটে উঠলেন, "আগে তোর বাবা আর মেসোকে ডাক। এ ঘরে লুঠতরাজ হয়ে যাচ্ছে, আর বাবুরা পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছেন!"

ঠান্ডা-ঠান্ডা ভোরে পার্থ-অবনীকে জাগায় কার সাধ্যি। বাঙালির সুখনিদ্রা বলে কথা। টুপুর-সহেলির গলা প্রায় চিরে গেল দুই ভায়রাভাইকে তুলতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চোখ রগড়াতে-রগড়াতে কম্বল ছেড়ে বেরিয়েছে তারা। সহেলির মুখে বৃত্তান্ত শুনে ঘুমের রেশটুকু উধাও।

মিতিন টর্চ হাতে চলে গেছে ঘরের পিছনটায়। জানলার নীচে একটু জঙ্গল-জঙ্গল মতো, তার পরে বেঁটে পাঁচিল। ওপারে এবড়োখেবড়ো ঢাল নেমে গেছে পাকদণ্ডী পর্যন্ত।

সকলেই গিয়ে মুখ বাড়িয়ে-বাড়িয়ে ঢালটা দেখছিল। টুপুর বলল, "চোরটা এই রাস্তা দিয়ে চম্পট দিয়েছে।"

"সে আর বলতে। মিতিন ঝুঁকে মাটি পর্যবেক্ষণ করছিল। টর্চের আলো এপাশ-ওপাশ করতে-করতে বলল, "পায়ের ছাপ রয়েছে। আই মিন জুতোর। দ্যাখ টুপুর, ছাপটা বেশ স্ট্রেঞ্জ টাইপের!"

"তাই তো! জুতোর ডগা আছে, গোড়ালি নেই। তবে টোয়ের ছাপ কিন্তু বেশ ডিপ।"

সহেলি বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ওই লোকদুটোরই কাজ। ব্যাটারা বুমবুমের হাতে টাইট খেয়েছিল তো, তাই ঝাল মেটাতে শয়তানি করছিল।"

মিতিন বলল, "যাহ, ও বেচারারা কেন হতে যাবে?"

পার্থ সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "হতেও তো পারে। দেখে আসব একবার?"

উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে পা বাড়াল পার্থ। সঙ্গে টুপুরও।

লোকদুটোর দরজায় টর্চ ফেলে দু'জনেই চমকেছে জোর। গুঁফো-টাকমাথা ঘরে নেই! তালা ঝুলছে।

গাড়ি মুন্নার টাউন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর সহেলি দু'হাত কপালে ঠেকালেন, "হে মা রক্ষাকালী, আর যেন এই জায়গায় না আসতে হয়।"

মিতিন হেসে ফেলল, "কেন গো? এত সুন্দর জায়গাটা কী দোষ করল?"

"দুর দুর, যত সব চোর-ডাকাতে ভর্তি!"

"আহা, একটা ছিঁচকে চোরের জন্য গোটা মুন্নারের বদনাম করে দিচ্ছ?"

টুপুর বলল, "একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ মিতিনমাসি, কেরলে আসার পর থেকে চুরি যেন আমাদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। কোচিতে একটা চুরির মধ্যে পড়ে গেলাম, মুন্নারে আমাদের উপরই চুরির অ্যাটেম্প্ট হয়ে গেল...!"

সহেলি বললেন, "যাত্রাটাই এবার আমাদের শুভ হয়নি। দিনক্ষণ দেখে বেরনো উচিত ছিল। নির্ঘাত মঘা কিম্বা অশ্লেষায় রওনা দিয়েছি, তাই পদে-পদে এত হয়রানি।"

অবনী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "ওফ, কুসংস্কারের ডিপো!...

শোনো, তোমার গ্রহ-নক্ষত্র মানলে বলতে হয়, যে ট্রেনে আমরা হাওড়া থেকে কোচি পাড়ি দিয়েছিলাম, তার প্রতিটি যাত্রীই এখন ঝঞ্ঝাটে পড়ছে। কারণ সকলেই তো আমরা মোটামুটি একই সময়ে বাড়ি থেকে স্টার্ট করেছিলাম। অশ্লেষা, মঘা নিশ্চয়ই শুধু আমাদেরই টার্গেট করে রাখেনি! ঠিক কি না? তারপর ধরো, আমরা অশুভ লগ্নে বেরিয়েছিলাম বলেই কি সিনাগগে চুরি হল? যদি আমরা বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে ঠ্যাং নাচতাম, তা হলে কি হাজার-হাজার মাইল দূরের গ্রেট স্ক্রল রক্ষা পেয়ে যেত? কেউ চাবির ডুপ্লিকেট করাতে পারত না? সিন্দুক খুলতে পারত না?"

"বক্তৃতা থামাও তো।" সহেলি গোমড়া, "চুরি হত কি হত না সে পরের কথা। অন্তত আমরা তো জড়াতাম না।"

"এখনই বা কী জড়িয়েছ? ফেঁসে থাকলে ফেঁসেছে তো সিনাগগের কর্তাব্যক্তিরা। তারা আবার ইহুদি, তোমার অশ্লেষা, মঘা, তারা জানেই না। আর এখানেই বা আমাদের কী ক্ষতিটা হল? একমাত্র ভোর রাতের ঘুমটুকু ছাড়া?"

"বার বার টেনশনে তো পড়ছি।"

"একটুআধটু টেনশন থাকা তো ভাল মা।" টুপুর মন্তব্য জুড়ল, "উত্তেজনা না থাকলে বেড়িয়ে সুখ আছে নাকি? পানসে-পানসে লাগবে না?"

পার্থ বলল, "আপনার একটা বড় টেনশন কিন্তু কেটে গেছে দিদি। গুঁফো-টাকমাথাকে আমরা মিছিমিছি আসামি বানাচ্ছিলাম।"

লোকদুটোকে ঘরে না দেখে কাকভোরে জোর হল্লা জুড়েছিল পার্থ। চেঁচামেচির চোটে মুন্নার ক্লাবের কেয়ারটেকারবাবুটির ঘুম চৌপাট। তিনি তো ঘটনা শুনে হাঁ। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে লাগলেন, এমন কাণ্ড মুন্নার ক্লাবের ইতিহাসে নাকি এই

প্রথম। এবং মুন্নারের মতো শান্ত উপত্যকায় এভাবে তস্করের আগমন নাকি একান্তই অভাবনীয়। গুঁফো-টাকমাথা সম্পর্কে অভিযোগ তিনি তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। রাত্তিরে নাকি নিজে অনেকক্ষণ গল্প করেছেন লোকদুটোর সঙ্গে। একজনের নাম বাসবন, অন্যজন উন্নিকৃষ্ণন। দু'জনেই নাকি যথেষ্ট মালদার, পার্টনারশিপে ব্যবসা করে শুঁটকি মাছের, কোচির সম্ভ্রান্ত এম জি রোডে তাদের অফিসও আছে। বিশেষ কাজে কোচি থেকে মাদুরাই যাচ্ছে তারা, পথে মুন্নারে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছিল। রাত তিনটেয় তারা ফের বেরিয়ে পড়বে এ-কথাও নাকি জানিয়ে দিয়েছিল কেয়ারটেকারকে। এর পর সহেলির আর কী বলার থাকতে পারে?

পার্থর কথার পিঠে টুপুর বলল, "কিন্তু মেসো, চোর যে একটা ধাঁধায় ফেলেছে এতে তো কোনও সন্দেহ নেই।"

"কীসের ধাঁধা? কোথায় ধাঁধা?"

"বা রে, স্বচক্ষে তো দেখলে জুতোর ডগা আছে আগা নেই।"

"এ তো জলবৎ তরলং। ব্যাটা নির্ঘাত পা টিপে-টিপে এসেছিল। যাতে কেউ টের না পায়।"

"পা টিপে আসার জায়গা কোথায়? পাঁচিল টপকালেই তো জানলা। মাঝে বড়জোর হাত তিনেক স্পেস।"

"তা হলে...।" পার্থ মাথা চুলকোল, "ব্যাটা বোধ হয় গোটা জুতোর ছাপ রাখতে চায়নি। পাছে জুতো থেকে ধরা পড়ে যায়। এ থিয়োরিটা নিশ্চয়ই ভুল নয় ম্যাডাম শার্লক হোমস?"

"কোথায় শার্লক হোমস, কোথায় আমি! ওই তুচ্ছ ছাপ দেখে শার্লক হোমস কত কী বলে দিতে পারতেন জানো? লোকটা রোগা না মোটা, ফরসা না কালো, মাথায় টুপি ছিল কি ছিল না, দক্ষিণ আফ্রিকার লোক নাকি কানাডার, বাঁ হাতে দেশলাই

জ্বালায় না ডান হাতে, সিগারেট খায় না চুরুট...।" বলতে বলতে মিতিন ফিক-ফিক হাসছে, "আমার অত বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাই নেই। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি, লোকটার হাইট সাড়ে পাঁচ ফিটের বেশি নয়। শরীরে কষ আছে, কিন্তু চেহারাটি ছিপছিপে।"

অবনীর চোখ গোল গোল, "কী করে বুঝলে?"

"ভেরি সিম্পল লজিক। জানলাটা আমার মাথায়-মাথায়। অর্থাৎ মাটি থেকে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। সুতরাং ঘরের ভিতরটা দেখতে গেলে চোরের চোখ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির উপরে থাকতে হয়। তা নয় বলেই লোকটাকে বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে, উঁচু হয়ে ঘরটাকে দেখতে হয়েছিল। চোখ থেকে মাথার মাপ মিনিমাম তিন ইঞ্চি। সওয়া পাঁচ ফুটের সঙ্গে এবার তিন ইঞ্চি যোগ করে নিন। কত হল? আর যে লোক ওই সরু আঁকশি দিয়ে ব্যাগ-সুটকেস তোলার চেষ্টা করে, শরীরে তার তো কষ থাকতেই হবে। আর ছিপছিপে না হলে ওই এবড়োখেবড়ো ঢালু পথ বেয়ে তাড়াতাড়ি সে পালায় কী করে? প্লাস, চার ফুট উঁচু পাঁচিলও তাকে টপকাতে হয়েছে।"

অবনী চমৎকৃত। গদগদ গলায় বললেন, "আমরা কেন এভাবে ভাবি না?"

টুপুর গর্বিত স্বরে বলল, "এই জন্যই তো মিতিনমাসি ইজ গ্রেট।"

মিতিন হেসে বলল, "গ্রেট-ফেট কিছুই নই। শুধু চোখ-কানটা খোলা রাখি। মনের দরজাটাও। ভাবনাচিন্তা তৈরি হওয়াটাও একটা প্রসেস অবনীদা। এর জন্য প্রয়োজন চর্চা, অধ্যবসায়, আর নিষ্ঠা। আর-একটু কমনসেন্স।"

গুণগুলো যে মিতিনমাসির পুরো মাত্রায় আছে সে তো টুপুর জানেই। অধ্যবসায় না থাকলে মাত্র কয়েক বছরে মিতিনমাসি

গোয়েন্দা হিসেবে এতটা নাম করতে পারত! এখন তো পুলিশের উপরমহলের লোকরাও মাঝেমধ্যে মিতিনমাসির পরামর্শ নিতে আসে। অপরাধতত্ত্বের সমস্ত বিভাগ নিয়ে দিন-রাত চর্চা করে মিতিনমাসি। ফরেনসিক সায়েন্স, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, নানারকম অস্ত্রশস্ত্রের খুঁটিনাটি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এই আইন সেই আইন, কী না পড়ে! পুরনো জটিল কেসগুলোকেও স্টাডি করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। আর নিষ্ঠায় তো মিতিনমাসি লা-জবাব। গত এপ্রিলে শ্যামপুকুরে মিত্তিরবাড়ির অষ্টধাতুর বিগ্রহ চুরি হওয়ার কেস নিয়ে যেভাবে খাটল, সে তো দেখার মতো। শেষমেশ প্রমাণ করে ছাড়ল তো পরিবারের প্রবীণা গৃহিণীই আসল খলনায়িকা। মিত্তিরবাড়ির কর্তাব্যক্তিরা তো হাল ছেড়েই দিয়েছিল, পুলিশও বাড়ির চাকরকে হাজতে পুরে নিশ্চিন্ত। একমাত্র মিতিনমাসি আদাজল খেয়ে লেগে না থাকলে থোড়াই জানা যেত প্রকৃত সত্য। মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য টানা তিন মাস পরিশ্রম, ভাবা যায়? সাধে কি টুপুর মিতিনমাসির সঙ্গে সেঁটে থাকে!

টুপুর জানলার বাইরে চোখ রাখল। চা-বাগানের ঢল পেরিয়ে গাড়ি আরও উঁচুতে উঠছে এখন। একটার-পর-একটা পাহাড় টপকাচ্ছে। নীচে তাকালে দেখা যায় ফেলে আসা পথটাকে। অজগরের মতো। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেড় দিয়েছে পাহাড়কে। হলুদ রোদ্দুর মেখে পড়ে আছে নিঝুম।

সামনের সিটে পার্থ এতক্ষণ কেরলের একটা ম্যাপ খুলে বসেছিল। পরশু কিনেছে কোচি থেকে। টুরিস্ট গাইড হিসেবে মানচিত্রখানা ভারী কাজের। রাস্তাঘাট, পাহাড় পর্বত, নদী-লেক-জঙ্গল, সব কিছুরই হদিস মিলে যায়। ম্যাপটা দেখতে-দেখতে পার্থ হঠাৎ বলে উঠল, "তা তোমার কমনসেন্স এবার কি কিছু বলছে ম্যাডাম?"

"কী ব্যাপারে?" মিতিন চোখ ঘোরাল।

"রিগার্ডিং এসব চোরফোর? এমন উপদ্রব কি মাঝে-মাঝেই হবে?"

"হওয়ার কোনও কারণ তো দেখি না। তবে কিনা...।" মিতিন একটু থমকাল, "দিদিকে যাই বলি না কেন, ছিঁচকে চোরটা কিন্তু ভাবাচ্ছেই।"

"কিঁউ?"

"কারণ আমাদের উপর দিয়ে মুন্নার ক্লাবে চুরির উদ্বোধন হচ্ছে, এটা ঠিক আমার হজম হচ্ছে না।"

"কেয়ারটেকার ঢপ মেরেছে বলে মনে হয়?"

"কী জানি। তবে আমাদের উলটো দিকের রুমে কিন্তু চোরের পক্ষে হানা দেওয়া ঢের সহজ ছিল। মনে করে দ্যাখো, ওই ঘরের জানলা রাতে খোলাই ছিল। কষ্ট করে হুড়কো ভেঙে কেন যে লোকটা আমাদের উপর কৃপাদৃষ্টি দিল?"

"ওঘরে ছিল তো বাবা, মা আর মেয়ে। ওদের দেখে চোরের হয়তো মনে হয়েছে তেমন জিনিসপত্র নেই!"

"অর্থাৎ চোর আগে থেকেই দেখে নিয়েছিল কোন ঘরে বেশি জিনিস আছে?"

"হতেই পারে। মুন্নার ক্লাবের কর্মচারীরা তো সব ঘরেই যাতায়াত করছিল। ইনফ্যাক্ট, জিনিসপত্র তো তারাই ঘরে ঢুকিয়েছে। আর কর্মচারীদের কারও সঙ্গে চোরের যোগসাজশ থাকতেই পারে।"

"হুঁ। হতে পারে অনেক কিছুই। কেয়ারটেকারকেও আমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলে ধরে নিচ্ছি না।... তবে আমার সিক্সথ সেন্স বলছে সামথিং ইজ রং সামহোয়্যার।"

"কী রকম?"

“তা আমি কী করে বলব? আগেই তো বলেছি আমি শার্লক হোমস নই। আমার শুধু এটুকুই মনে হচ্ছে বেড়ানোর ক'টা দিন আমাদের বোধ হয় আরও সতর্ক থাকা উচিত।”

“কেন রে মিতিন?” সহেলি বিপন্ন সুরে বললেন, “চোর কি আমাদেরই পিছনে লেগেছে? কী হবে তা হলে?”

“ওফ, দিদি! দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফ্যালো তো! টুরটা এনজয় করো।” বলেই সহেলির মুখটা বাইরে ঘুরিয়ে দিয়েছে মিতিন, “ওই দ্যাখো আনাইমুড়ি পাহাড়।”

একটা উঁচু পাহাড় দেখা দিয়েছে বটে। আকারে মোটেই সুদৃশ্য নয়, বরং বেঢপই বলা যায়। কেমন যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে, খাবলা-খাবলা দাড়ির মতো গাছপালা লেগে আছে গায়ে।

ওই পাহাড়েই উঠতে-উঠতে এক জায়গায় থামতে হল টুপুরদের। এবার এরাভিকুলম ন্যাশনাল পার্কে ঢুকবে গাড়ি, তার আগে টোল ট্যাক্স দিতে হবে। দু'ধারে বড়-বড় হোর্ডিংয়ে লেখা আছে জন্তুজানোয়ারদের নাম। ছবি সহ। লেখা আছে অরণ্যের আচরণবিধি।

দেখেই ঝিমন্ত বুমবুম আচমকা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। জ্বলজ্বলে চোখে বলল, “ওমা, এখানেও হাতি আছে? সারাণ্ডার মতো?”

“অবাক হওয়ার কিছু নেই বুমবুম।” পার্থ বলল, “কেরলে অজস্র হাতি। পেরিয়ার জঙ্গলে গিয়ে দেখবি হাতি থিকথিক করছে। জলে লুটোপুটি খাচ্ছে।”

টুপুর বলল, “আরও কত কী আছে গো মেসো! শম্বর, গাউর, লংগুর... বাঘ, চিতাবাঘও!”

“দ্যাখ, কপালে থাকলে দর্শন মিলে যাবে। সারাণ্ডায় তো প্রায় কিছুই জোটেনি। হরিণ আর খরগোশ ছাড়া।”

টিকিট কেটে আশায়-আশায় টুপুররা ঢুকল বটে, তবে ন্যাশনাল

পার্কের ভিতরে পৌঁছে হতাশও হতে হল যথেষ্ট। রাজামাল্লি বলে একটা জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হয়েছে, হাঁটতে-হাঁটতে পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে অনেকটাই, কিন্তু কোথায় কী! জঙ্গলই তো নেই! পাহাড়ের গায়ে ঘাস আছে, কোথাও কোথাও ঝোপঝাড়ও, তবে তাদের অরণ্য বলে কল্পনা করা কঠিন। হাতি, বাঘ দূরস্থান, পাল পাল ছাগল ছাড়া আর কিছুই তো নজরে এল না! পার্থমেসো অবশ্য বলল, এ নাকি অতি বিরল প্রজাতির ছাগল, এদের নাম নীলগিরি টার। এদের ক্ষুরগুলো নাকি ভারী অদ্ভুত, অবলীলায় পাহাড় বেয়ে তরতরিয়ে উঠতে পারে এরা। তা শুধু ছাগল দেখে কি আর মন ভরে?

গাড়িতে ফিরে সহেলি বিরক্ত মুখে বললেন, "দুর দুর, মিছিমিছি সময় নষ্ট।"

পার্থ বলল, "যা বলেছেন। মাঝখান থেকে চড়াই-উতরাই করে খিদে পেয়ে গেল। লাল ব্যাগে কিছু আছে কি?"

"স্রেফ পাউরুটি আর চানাচুর।"

"তাই দিন। মুখটা তো চলুক।"

ম্যাথু স্টিয়ারিং-এ বসেছে। জিজ্ঞেস করল, "নাউ হোয়্যার? মাটুপেট্টি?"

"আর সেখানে গিয়ে কী হবে?" পার্থ ঠোঁট ওলটাল, "লেক ভেবে যাব, গিয়ে দেখব বড়সড় চৌবাচ্চা।"

সহেলি বললেন, "তা হলে বাদ দাও না। সোজা পেরিয়ার চলো।"

"না না, মাটুপেট্টি যেতেই হবে।" অবনী বাধ সাধলেন, "সুনীল আমায় বারবার করে মাটুপেট্টির কথা বলেছে। ড্যাম থেকে জঙ্গল দেখা নাকি ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স।"

অগত্যা গাড়ি ফিরল আবার মুন্নার অভিমুখে। টাউন ছুঁয়ে বাঁয়ে ঘুরল, মিনিট চল্লিশের মধ্যেই এসে গেল মাটুপেট্টি।

নাহ্, পাম্বিভাসাল নদীর উপর ড্যামটা সত্যিই বিশাল। বাঁধ পেরিয়ে গাছে-গাছে ছাওয়া পথ পাক খেয়ে চলে গেছে জলাধারের কিনারে। উঁহু, শুধু জলাশয় না বলে বড়সড় লেক বলাই শ্রেয়। ওপারে পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে জঙ্গল, প্রায় একদম পাড় থেকেই। কী অপূর্ব যে লাগছে দূর থেকে!

বেলা বেড়েছে। লোকজন তেমন একটা নেই আশপাশে। রোদ বাঁচিয়ে এক ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় বসল সবাই। মোহিত হয়ে দেখছে জল, দেখছে জঙ্গল। লেকে স্পিডবোট চলছে কয়েকটা, প্রকৃতির নির্জনতাকে ভেঙে বিকট শব্দ তুলে শাঁ-শাঁ ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। বোটের ধাক্কায় উত্তাল ঢেউ উঠছে স্থির জলে।

গোটা তিনেক নৌকো ঘাটে দোল খাচ্ছিল। সেখান থেকে একটা লোক চেঁচিয়ে ডাকল, "ওয়ান্ট এ জয়রাইড স্যার?"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী রে, চড়বি নাকি স্পিডবোটে?"

লাজুক-লাজুক মুখে টুপুর বলল, "গেলে হয়।"

সহেলি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "কক্ষনও না। অত জোরে চলছে, একবার যদি গোঁত খেয়ে উলটে যায়!"

"ভয় পাচ্ছেন কেন দিদি? কিছু হবে না, চলুন।"

"না বাপু, আমি ওতে নেই।"

অবনী বললেন, "আমারও অত গতি সহ্য হয় না। মাথা ঘোরে।"

টুপুর বলল, "তা হলে তোমরা এখানে বোসো, আমরা ঘুরে আসি। যাব?"

"বারণ করলে কী তোমরা শুনবে?" সহেলির স্বরে অসন্তোষ, "যাও, তবে বেশি নড়াচড়া কোরো না, মেসোর হাত ধরে বোসো। ...মিতিন, তুইও বুমবুমকে ভাল করে সামলে রাখবি।"

আধ ঘণ্টা ঘোরাবে বোট। মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা। পার্থ খানিক

দরদস্তুরের চেষ্টা করল, জপাতে পারল না লোকটাকে। বুমবুমেরও পুরো ভাড়াই লাগবে।

ক্যামেরা লাল ব্যাগে পুরে নিল পার্থ। যাতে জল ছিটকে এসে লেন্সে না লাগে। ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বুমবুমকে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল স্পিডবোটে। মিতিন আর টুপুরও কোমর বেঁধে চড়ে পড়েছে। সামনে পিছনে মিলিয়ে জনাপাঁচেকই বসতে পারে বোটে। মিতিন আর টুপুর পিছনের আসন দখল করল, পার্থ আর বুমবুম সামনে। নৌকোর লেজে বসেছে চালক, সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করবে ইঞ্জিন আর নৌকোর অভিমুখ। পার্থর সামনে একটা স্টিয়ারিং আছে বটে, তবে সেটি নেহাতই শো-পিস।

গোঁ-গোঁ শব্দ বাজিয়ে ছুটতে শুরু করল স্পিডবোট। পলক ফেলতে না ফেলতে পাড় সরে গেছে দূরে। টুপুর আর বুমবুম হাত নাড়ল অবনী-সহেলিকে, তাঁরা দেখতেও পেলেন না।

লেকের মধ্যিখানে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল চালক। অল্প-অল্প দুলছে নৌকো। খুশি-খুশি মেজাজে চতুর্দিক দেখছিল টুপুর। জলাশয়টা বেশ খানিকটা গিয়ে ডাইনে ঘুরেছে, সেখানে আরএকটা ঘাট থেকে ছাড়ছে স্পিডবোট। তার ওপাশে স্লুইস গেট, জল বেঁধে রাখার জন্যে।

বুমবুম হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "দিদিভাই, ওই দ্যাখ হাতি...হাতি!"

"কই? কোথায়?"

"ওই তো।" তর্জনী তুলে ওপারের জঙ্গলটা দেখাল বুমবুম, "ওই তো, গাছের পাশে দাঁড়িয়ে! একটা... দুটো... না না, তিনটে!"

টুপুর তবু দেখতে পাচ্ছে না। চোখ সরু করে খুঁজছে জঙ্গলময়। সহসা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পেয়েছে দেখতে, পেয়েছে।

মিতিন আঙুল নেড়ে বলল, "ভাল করে দ্যাখ। মনে হচ্ছে না

হাতি তিনটের মাথার ওপর আরও একজোড়া হাতি?"

তাই তো। ঠিকই তো। দুটো হাতি পাহাড়ের একটু উপরে, বাকি তিনটে নীচে। দূর থেকে মনে হয় সত্যিই হাতির মাথায় হাতি!

বুমবুম বলল, "হাতিগুলো পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে কী করে বাবা? গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে না কেন?"

পার্থ বলল, "বুঝতে পারছিস না? পাহাড় হাতিদের টানছে, হাতিরা পাহাড়কে। একে বলে মাধ্যাকর্ষণ।"

"কী কর্ষণ?"

মিতিন হালকা ধমক দিল পার্থকে, "অ্যাই, ভুলভাল শেখাচ্ছ কেন? না রে বুমবুম, একটা হাতিও পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে নেই। ওরা যেখানটায় আছে সে জায়গাটা মোটামুটি প্লেনই। দূর থেকে দেখছি বলে ওরকম লাগছে।"

পার্থ ইঞ্জিন-চালককে বলল, "এই ভাই, আর-একটু কাছে যাওয়া যায় না?"

"যাবেন? চলুন।"

আবার ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ। ভীম বেগে জল চিরে ছুটল স্পিডবোট। জঙ্গলের ধার ঘেঁষে গর্জন করতে-করতে ঘোরাচ্ছে টুপুরদের। পার্থ ক্যামেরা বের করে ফেলল। টেলিলেন্স লাগিয়ে ফোকাস করে ফেলেছে হাতিগুলোকে। বুমবুম আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। টুপুর আর মিতিনও হাতিতে বিভোর।

ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

তীব্র গতিতে হঠাৎই ধেয়ে এল আরএকটা স্পিডবোট। একেবারে কাছে এসে, টুপুরদের স্পিডবোটকে ধাঁই করে ধাক্কা মেরেই পার্থর কাঁধে হ্যাঁচকা টান। পার্থ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল, মিতিন টেনে ধরে নিয়েছে তাকে। কিন্তু ততক্ষণে পার্থর কাঁধের ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে আক্রমণকারী।

ঘটনার আকস্মিকতায় চালক হতভম্ব। থামিয়ে দিয়েছে ইঞ্জিন। নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করল, "ইউ ওকে স্যার?"

পার্থ দম নিতে নিতে বলল, "হুঁ।"

"ক্যামেরা সেভ্‌ড। গুড লাক।"

"নিকুচি করেছে গুড লাকের।" মিতিন চেঁচিয়ে উঠল, "ফলো করুন লোকটাকে। এক্ষুনি।"

মাঝে বড়জোর সময় গেছে পনেরো সেকেন্ড, তার মধ্যেই হানাদার স্পিডবোট আরও দূরে। টুপুররা যখন মাঝ দরিয়ায়, সে তখন পৌঁছে গেছে অন্য ঘাটটায়। নিমেষে লোকটা লাফ দিল বোট থেকে, নিমেষে উবে গেল কর্পূরের মতো। টুপুরদের নৌকো যখন ঘাটে গিয়ে ভিড়ল, তখনও পাড়ের কেউ জানেই না জলে কী ঘটে গেছে এইমাত্র।

নেমেই জব্বর একটা হইচই বাধিয়ে দিল টুপুরদের চালক। হাউমাউ করে ছিনতাই বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে মলয়ালমে। মিতিন অবশ্য নেমেই রাস্তা ধরে দৌড়েছিল, খানিকটা গিয়ে ফিরে এসেছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "নাহ্‌, পাখি উড়ে গেল।"

টুপুর বলল, "এত তাড়াতাড়ি?"

"গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। অ্যাম্বাসাডার।"

"নাম্বার নোট করেছ?"

"পারলাম না। হুশ করে বেরিয়ে গেল। একঝলক চোখে পড়ল নাম্বারপ্লেটটা। ভাড়ার গাড়ি।"

"হলুদের ওপর কালোয় লেখা?"

"হুঁ।"

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া পার্থ আর বুমবুমকে ঘিরে ছোট্ট একটা জটলা। আছে মোটরবোটের চালকরা, দু'-চারজন যাত্রীও। লোকটা যার মোটরবোট নিয়ে গিয়েছিল, সেও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে।

মিতিন তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি লোকটাকে একা ছেড়ে দিয়েছিলেন?"

অল্পবয়সি চালক হাত কচলাচ্ছে, "চাইল যে। অনেকে এরকম নেয় ম্যাডাম। একা বোট চালিয়ে মজা পায়।"

"কখন নিয়েছিল ভাড়া?"

"দশ মিনিটও হয়নি।"

"এই ঘাটে এসেছিল কখন?"

"এসেই তো বোট নিল।"

"একাই ছিল? নাকি সঙ্গে কেউ...?"

"আর কাউকে তো দেখিনি ম্যাডাম।"

চকিতে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় টুপুর ভালভাবে লক্ষ করতে পারেনি লোকটাকে। তাড়াতাড়ি মিতিনকে বলল, "লোকটার চেহারার ডিটেল ডেসক্রিপশন নিয়ে নাও।"

"প্রয়োজন নেই।" মিতিনের মুখ থমথমে, "ওই বসন্তের দাগওয়ালা মুখ আমি জীবনে ভুলব না।"

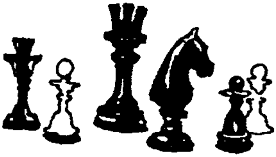

দুপুরের পর থেকে মেঘ জমছিল আকাশে। ছ'টা বাজতে-না-বাজতে নিভে গেল দিনের আলো। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আছড়ে পড়ল বৃষ্টি। দমাদম ড্রাম পেটাচ্ছে গাড়ির চালায়।

ম্যাথু গতি আরও কমিয়ে দিল। এমনিতেই পার্বত্য পথে যথেষ্ট ধীরে চালাচ্ছিল, বর্ষণ শুরু হতে কোয়ালিস এখন কচ্ছপ। প্রতিটি বাঁক অতি সন্তর্পণে ঘুরছে ম্যাথু, পাছে গাড়ির চাকা পিছলে যায়।

মাটুপেট্টির ঘটনায় তার যাত্রীরা থম মেরে গেছে, নতুন আতান্তর ডেকে এনে সে আর তাদের উত্ত্যক্ত করতে চায় না।

সব ক'টা জানলার কাচ বন্ধ। সাত-সাতটা মানুষের নিশ্বাসে গরম হয়ে উঠছে ভিতরের বাতাস। কথাও বিশেষ বলছে না কেউ। সহেলি তো আগাগোড়াই গুম। অন্ধকার পাহাড়ি জংলা-জংলা রাস্তায় আকাশ ভেঙে পড়ার পর তিনি যেন আরও গুটিয়ে গেছেন। মাঝে-মাঝে মেঘ ডাকছে গুড়গুড়, চিকন বিদ্যুতে ফালা-ফালা হচ্ছে চরাচর, কেঁপে-কেঁপে উঠছেন সহেলি। ইষ্ট নাম জপ করাও ভুলে গেছেন বোধ হয়।

ভিতরের গুমোট ভাবটা কাটাতেই যেন অবনী হঠাৎ বলে উঠলেন, "সাউথে বেড়ানোর এই এক ঝামেলা। দুটো করে মনসুন। জুন-জুলাইতেও ভোগান্তি, অক্টোবর-নভেম্বরেও।"

সহেলি ক্ষীণ স্বরে বললেন, "বৃষ্টিকে দুষে কী হবে? আমরা তো এমনিই ভুগছি। এখন ভালয়-ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।"

টুপুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "বাড়ির তো এখন ঢের দেরি মা। পেরিয়ার আলেপ্পি কোভালাম-টোভালাম সেরে কোচি, তারপর তো কলকাতা।"

"খুব হয়েছে, আর কোথাও নয়। পেরিয়ারই শেষ, পেরিয়ার থেকেই ফেরা। ...পার্থ, পেরিয়ার থেকে সোজা ট্রেন ধরা যায় না?"

ম্যাপ ঘেঁটে-ঘেঁটে কেরল সম্পর্কে এখন অনেকটা সড়গড় হয়েছে পার্থ। ব্যাগ হারিয়ে মনমরা থাকলেও সে হেসেই উত্তর দিল, "না দিদি। ট্রেন ধরতে হলে সেই কোট্টায়াম, নয় মাদুরাই, নয় কোচি। সবই হরেদরে সওয়াশো থেকে দেড়শো কিলোমিটারের ধাক্কা।"

"ও।" সহেলি ফের মিইয়ে গেলেন, "তা তোমাদের পেরিয়ার আর কদ্দূর?"

ম্যাথুর ইংরেজিতে ম্যাথুকে প্রশ্ন করল পার্থ, "পেরিয়ার হাউ ফার ম্যাথু?"

উইন্ডস্ক্রিনে ওয়াইপার চলছে, তবু জলীয় বাষ্পে কাচ ঝাপসা। বাঁ হাতে কাচ মুছতে-মুছতে ম্যাথু জবাব দিল, "কুমিলি নিয়ার। ওনলি সেভেন কিলোমিটার। থেক্কাডি থারটিন।"

"থেক্কাডি আর পেরিয়ার তো সেম, তাই না?"

"ইয়েস স্যার। গাঁও কা নাম থেক্কাডি, ফরেস্ট পেরিয়ার।" হিন্দি ইংরেজির জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলল ম্যাথু, "কুমিলি গুড স্যার। হোটেল হ্যায়।"

পার্থ ঘাড় ঘোরাল, "কী গো, দুটো জায়গাই তো কাছাকাছি। কোথায় থাকবে?"

মিতিন অন্যমনস্ক ছিল। বলল, "উঁ?"

"বলছি পেরিয়ার অবধি এগোবে? না কুমিলিতেই বডি ফেলব?"

"আগেই থামো। দিদি কাহিল হয়ে পড়েছে। সাড়ে তিন ঘণ্টা গাড়িতে ঠায় বসে থাকা বলে কথা!"

মাটুপেট্টি ড্যাম থেকে কাছাকাছি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাড়ি। দেবীকুলমে। ছিনতাইয়ের রিপোর্ট লেখানোর পর দেবীকুলমেই কোনওরকমে সারা হয়েছিল মধ্যাহ্নভোজ। তারপর থেকে গাড়ি চলছে তো চলছেই। জলদি-জলদি পেরিয়ার পৌঁছতে হবে বলে চায়ের জন্যও দাঁড়ানো হয়নি কোথাও। টুপুরের তো বসে বসে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে যাচ্ছিল। কতবার যে কানে চিমটি কেটে ছাড়াল অসাড় ভাবটাকে।

বৃষ্টির তেজ কমছে। জানলার কাচ সামান্য ফাঁক করল টুপুর। হাওয়া আসুক। তা শুধু হাওয়া নয়, সঙ্গে একটা আধচেনা মিষ্টি গন্ধও যেন ঝাপটা মারল নাকে।

জোরে নাক টেনে টুপুর বলল, "কীসের গন্ধ আসছে বলো তো মিতিনমাসি?"

"এলাচ। সম্ভবত এলাচ বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছি।"

"দু'ধারে তো কফিগাছের জঙ্গল ছিল, এলাচ বাগান এসে গেল?"

"এই রিজিয়নটাই তো এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনির আর গোলমরিচের। শুনেছি থেক্কাডি থেকে কোট্টায়াম যেতে একটা পাহাড় পড়ে, পাহাড়টার নামই কার্ডামম হিল। এলাচ পাহাড়। সাধে কি কেরলে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল ইউরোপিয়ানরা!"

কথার মাঝেই গাড়ি চলে এসেছে সমতলে। গতিও বেড়েছে খানিক। শুরু হয়েছে জনপদ। দু'দিকে দেখা যায় দোকানপাট, ঘরবাড়ি, মানুষজন। বৃষ্টিও এখন টিপটিপ-টিপটিপ।

ম্যাথু ঘাড় দুলিয়ে বলল, "দিস ইজ কুমিলি স্যার।"

পার্থ বলল, "আমরা এখানেই থাকব। একটা ভাল দেখে হোটেলে নিয়ে চলো।"

"ও কে স্যার।"

এক তেমাথার মোড়ে এসে ডাইনে গাড়ি ঘোরাল ম্যাথু। বাজারমতো জায়গা। একটা চার্চও আছে। দু'-চারটে হোটেলও। সেখান থেকে আর-একটু এগিয়ে থেমেছে।

বাঁয়ে এক ঝকঝকে হোটেল। মাইকেলস ইন।

ম্যাথু বলল, "সেফ প্লেস স্যার। অ্যান্ড দিস রোড অলসো গোজ টু পেরিয়ার।"

নামে সরাইখানা হলেও হোটেলটা বেশ জবরদস্ত। চমৎকার বন্দোবস্ত, নিজস্ব রেস্তোরাঁ আছে। দক্ষিণী খানার পাশাপাশি চাইনিজ, মোগলাইও মেলে।

ব্যস, পার্থর মনমেজাজ খোলতাই হয়ে গেল।

পাওয়া গেছে মুখোমুখি দু'খানা ঘর। দোতলায়। বৃত্তাকার প্যাসেজে ঘরগুলো এমনভাবে সাজানো যে মুখোমুখি না বলে একটু কোনাকুনিও বলা যায়। আবার পাশের পাশেরটাও বলা চলে।

জিনিসপত্র এবার আর এক জায়গায় নয়, রাখা হল ভাগাভাগি করে। ব্যাগ, সুটকেস বয়ে আনা বেয়ারাটিকে খর চোখে জরিপ করে নিলেন সহেলি। লোকটা যেতেই তাড়াতাড়ি লটবহর ঢোকানোর চেষ্টা করলেন খাটের তলায়। কিছুই সেখানে গলল না। বিফল মনোরথ হয়ে মিতিনকে বললেন, "আমার তো মনে হয় সিংগল খাটদুটোকে আলাদা-আলাদা করে ফেলা উচিত। পার্থদেরও বলে আয় সুটকেস-টুটকেস যেন দুটো খাটের মধ্যিখানে রাখে।"

মিতিন বিছানায় আধশোওয়া হয়েছে। বলল, "কেন এত মাথা খারাপ করছ দিদি? দোতলার জানলা দিয়ে লগি গলানো কি সোজা কাজ?"

"অসাধ্য তো নয়। কার্নিসে তো ওঠাই যায়।"

"চিন্তা কোরো না। আমি সারারাত জেগে থাকব।"

"দ্যাখো, যা ভাল বোঝো। দাসীর কথা বাসি হলে মিঠে হয়। তখন অত করে বললাম ওই অলুক্ষুণে স্পিডবোটে উঠো না, বিপদ ঘটার পর শিক্ষা হল তো!"

"আগেই বুঝি টের পেয়েছিলে কেউ একজন ঝাঁপিয়ে পড়বে?"

"কিছু একটা অমঙ্গল হবে, মনে তো হচ্ছিলই। ডান চোখ খুব নাচছিল তখন।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে মা-মাসির চাপান উতোর শুনছিল টুপুর। এবার হেসেই ফেলল।

দেখেই সহেলির চোখ কটমট, "তুমি বসে বসে লেজ নাড়াচ্ছ কেন? রাস্তার জামাকাপড়টা ছাড়ো না। আজ তো স্নানও হল না, ঘাড়ে-মুখে ভাল করে জল দাও।"

তাড়া খেয়ে একসেট সালোয়ার-কামিজ বের করে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকল টুপুর। মুন্নারের মতো না হলেও এখানে একটু শীত-শীত ভাব আছে। সম্ভবত বৃষ্টি হল বলেই। বেসিনের জল ঠান্ডা কনকনে। তবে জলের ছোঁয়ায় আরামই লাগল। পোশাক বদলে বেরিয়ে এসে দেখল মিতিনমাসি নেই, ঘরে এখন বুমবুম আর পার্থমেসো। বুমবুম টিভির সামনে। উদ্দাম কার্টুন চ্যানেল চলছে।

পার্থর হাতে হোটেলের মেনুকার্ড। পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করল, "কী রে টুপুর, কিছু খাবি তো এখন? স্ন্যাক্স-ট্যাক্স?"

"খিদে খানিকটা পেয়েছে বটে।" টুপুর মাথা চুলকোল, "পকোড়া পাওয়া যাবে?"

"সিওর। চিকেন প্রন চিজ ভেজিটেবল... কোনটা নেব?"

"প্রনই বলো।"

অবনী চেয়ারে চোখ বুজে বসেছেন। বলে উঠলেন, "আমার জন্য ভাজাভুজি নয়। স্যান্ডুইচ।"

"সঙ্গে গরমাগরম কফি? চলেগা?"

"চলেগা কী গো?" টুপুর বলল, "দৌড়েগা।"

ফোন তুলে রুম সার্ভিসকে অর্ডার দিল পার্থ। বুমবুমের জন্য দুধ বলার সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জুড়েছে বুমবুম। দুধ নয়, তার আইসক্রিম চাই।

পার্থমেসোর ম্রিয়মাণ ভাব কেটেছে দেখে ভাল লাগছিল টুপুরের। একটা ছিনতাইয়ের জন্য বেড়ানোর আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে এ তার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটা যে রোমহর্ষক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু ক্যামেরার জন্য অত বড় ঝুঁকি নিল লোকটা? বিশ্বাস হয় না। গাড়ি ভাড়া করে এসে, স্পিডবোটের চালককে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত স্রেফ একটা ব্যাগ হাতিয়ে নিয়ে গেল? কী আজব কাণ্ড! নাকি

অন্য কোনও স্পিডবোট নিশানা ছিল লোকটার? ভুল করে অ্যাটাক? ওই সময়ে গোটা পাঁচ-সাত বোট ছোটাছুটি করছিল জলে, হয়তো লোকটা গুলিয়ে ফেলেছে? কথাটা একবার তুলবে নাকি এখন? থাক গে, যা হওয়ার তো হয়েই গেছে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী লাভ!

খাবার এসে গেল। পিছন-পিছন মিতিনমাসিও। টুপুর উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গেছিলে গো?"

"হোটেলের আশপাশটা ঘুরে দেখে এলাম।" মিতিনের ঠোঁটে মৃদু হাসি, "উলটো দিকে একটা আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ সেন্টার আছে। ভাবছি কাল সকালে ভাল করে একটা ম্যাসাজ নিয়ে নেব।"

সহেলি নড়েচড়ে বসলেন, "গায়ের ব্যথা কমবে?"

"একদিনে কী কমে! তবে নিয়ে দেখতে পারো, আরাম হবে। কেরলের এই ম্যাসাজের দুনিয়াজোড়া নাম। অজস্র ধরনের নির্যাস দিয়ে তেল বানায়। বহু ফরেনার এখানে ম্যাসাজ করাতে আসে।" মিতিনের হাসি চওড়া হল, "আর-একটা সংবাদ তোমায় দিতে পারি। পাশে একটা গিফ্‌ট শপও আছে।"

শঙ্কা ভুলে সহেলির চোখ ঝিকঝিক, "কথাকলি নাচের মুখোশ পাওয়া যাবে?"

"ভিতরে থাকতে পারে। সামনাসামনি তো দেখলাম না। তবে কাজের জিনিস যদি কাউকে উপহার দিতে চাও, এখান থেকে ভাল মশলা নিতে পারো। টাটকা এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ প্যাকেট করে করে বিক্রি করছে।"

সহেলি রীতিমতো পুলকিত। পারলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়েন। বুঝিয়েসুঝিয়ে নিরস্ত করা হল তাঁকে। কালকের দিনটা তো থাকাই হচ্ছে, আজ ক্লান্ত হয়ে এসে বেরনোর দরকার কী!

পার্থ বলল, "নিন, এখন পকোড়া খান। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। অবনীদা, আপনার স্যান্ডুইচও তো পড়ে রইল!"

"হুঁ। খাই।"

অবনী স্যান্ডুইচে কামড় বসালেন বটে, কিন্তু মুখখানা কেমন যেন ভেজা বিস্কুটের মতো মিয়োনো।

লক্ষ করে মিতিন বলল, "আপনি এত চুপ করে গেছেন কেন অবনীদা? দুপুরের শকটা কি এখনও সামলাতে পারেননি?"

"আরে, যেতে দিন, যেতে দিন।" পার্থ টম্যাটো সসে পকোড়া ডোবাচ্ছে, "গেছে তো একটা ফাউতে পাওয়া ব্যাগ। এখন থেকে আপনি আমি ইকুয়াল। আপনারও ব্যাগ নেই, আমারটাও গন।"

"উহুঁ, অবনীদারটা আছে।" মিতিন কফিতে চুমুক দিল, "সুনীল নিয়ে গেছে রেবতী ইন্টারন্যাশনাল থেকে। কালই ফোনে জেনে নিয়েছি।"

"সে যাই হোক, এখন তো কাছে নেই।" পার্থ হাসল, "আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম, বুঝলে। যে ব্যাটা ব্যাগটা লুঠ করল, সে নিশ্চয়ই আমায় প্রাণ ভরে গাল পাড়ছে। যা ডাহা ঠকল বেচারা। কী লোকসান, কী লোকসান!"

অবনী ভারী গলায় বললেন, "লোকসানটা তো আমাদেরই হল পার্থ। ওই ব্যাগে তুমি দাবার বোর্ডটাও রেখেছিলে।"

সহেলি বললেন, "তাই বলো। এই জন্যই তোমার মুখ এমন তোলো হাঁড়ি!"

"স্বাভাবিক। আমি বেটার পজিশানে ছিলাম। একবার বসতে পারলেই চেকমেট হয়ে যেত।"

"বললেই হল? চেকমেট অত সোজা?"

"দেখতেই পেতে সোজা কিনা।"

"বেশ তো চলুন, এক্ষুনি একটা বোর্ড কিনে আনি। বাজার তো খোলাই আছে।"

"যাবে? চলো। একটা শেভিং সেটও কিনব সঙ্গে। কাল থেকে দাড়ি কামানো হয়নি, গাল কুটকুট করছে।"

ঢকঢক কফি গিলে দুই ভায়রাভাই বেরনোর জন্য প্রস্তুত, দরজায় বেল।

পার্থই গিয়েছিল খুলতে। বিস্মিত মুখে বলল, "আরে, আপনি?"

দরজার ওপারে পি কে জি কুরুপ হাসছেন মিটিমিটি, "কথা দিয়েছিলাম পেরিয়ারে দেখা করব, এই দেখুন চলে এলাম।"

"কী আশ্চর্য, আপনি জানলেন কী করে আমরা এই হোটেলে আছি?"

"ফিল্মের রোল ওয়াশ করতে দিয়ে ফিরছিলাম, আপনাদের ড্রাইভারকে দেখতে পেয়ে গেলাম হোটেলের সামনে।"

মিতিন ডাকল, "বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভিতরে আসুন।"

স্মিত মুখে ঢুকলেন কুরুপ। চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন, "অসময়ে এসে ডিসটার্ব করলাম না তো?"

"কী যে বলেন! আমরা তো আড্ডাই মারছিলাম। ...কফি খাবেন?"

"নো থ্যাঙ্কস। কতক্ষণ এসেছেন আপনারা?"

"এই তো, ঘণ্টাখানেক। আপনি?"

"জাস্ট বৃষ্টির আগে। কাছেই উঠেছি। হোটেল কুমিলি।"

"লঙ্গুরের ছবি তোলা হল?"

"নিলাম গোটাকতক স্ন্যাপ।"

"আপনি টেলিলেন্স ইউজ করেন? নাকি জুম?"

"ঠিক নেই। যখন যেটা সুবিধে হয়। ...বাই দ্য বাই, আপনাদের মর্নিং ট্রিপ কেমন হল?"

"খুব খারাপ।" পার্থ বলে উঠল, "সেই ভোররাত্তির থেকে যা আরম্ভ হয়েছে!"

"কেন? কী হল?"

মুন্নার মাটুপেট্টি দুটো এপিসোডই সবিস্তারে বর্ণনা করল পার্থ। শুনে কুরুপ তাজ্জব, "এ হেহে, আপনাদের তো দেখছি খুব ট্রাব্ল যাচ্ছে! ...যদি ধরেও নেওয়া যায় মাটুপেট্টিতে গুন্ডাটা ভুল মোটরবোট টার্গেট করেছিল...কিন্তু মুন্নার ক্লাবে তো এরকম হওয়ার কথা নয়! আই মাস্ট সে, মুন্নারেই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

অবনী বললেন, "কিছু তো নিতে পারেনি, তাই ভাবলাম সাতসকালে আর পুলিশের ঝক্কিতে যাই কেন?"

"কিন্তু দুটো লোকের ওপর আপনাদের তো সন্দেহ হয়েছিল। অন্তত সেটুকুও রিপোর্ট করতে পারতেন। ধরে নিচ্ছেন কী করে, কেয়ারটেকারকে তারা প্রকৃত পরিচয় দিয়েছে? কেয়ারটেকারের বক্তব্যও বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়ার কোনও অর্থ হয় না।"

মিতিন বলল, "কিন্তু লোকদুটো হঠাৎ আমাদের টার্গেট করবেই বা কেন?"

"কিচ্ছু বলা যায় না ম্যাডাম। কত লোকের কত রকম উদ্দেশ্য থাকে। ...বাই দ্য বাই, ছিনতাই হওয়া ব্যাগে কোনও দামি জিনিস ছিল না তো?"

"লাকিলি জাস্ট পাঁচ মিনিট আগে আমার ক্যামেরাটা বের করে কাঁধে নিয়েছিলাম। আর যা ছিল, বলার মতো কিছু নয়।"

অবনী আহত মুখে বললেন, "কেন, দাবার বোর্ডটা কি ফ্যালনা? যথেষ্ট প্রেশাস।"

"কোনও স্পেশ্যালিটি ছিল বুঝি? আইভরি-টাইভরির গুটি?"

"সেটটা প্লাস্টিকেরই। তবে দাম অন্য কারণে।" অবনী ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন, "জানেন, আমি একেবারে জেতার মুখে ছিলাম। আর মাত্র তিনটে চাল, তার পরেই পার্থকে হাত তুলে দিতে হত।"

অবনীর গভীর ক্ষতিটাকে কুরুপ সেভাবে অনুধাবন করতে পারলেন না যেন। গম্ভীর মুখে বললেন, "মাটুপেট্টির গুন্ডাটা গাড়ি করে পালিয়েছিল বললেন, তাই না?"

টুপুর বলল, "হ্যাঁ। অ্যাম্বাসাডার।"

"নাম্বার নোট করেছিলেন?"

"চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। তবে লোকটাকে এক ঝলক দেখেছি।" মিতিন আলগা হাসল, "তাতে আর লাভ কী বলুন?"

"আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। কেরলে এসে আপনাদের এসব আজেবাজে ব্যাপার ফেস করতে হচ্ছে...!"

সহেলি ম্লান মুখে বললেন, "ভাগ্যে আরও কী লেখা আছে কে জানে!"

"ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম। মাইকেল্‌স ইন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হোটেল, এখানে মুন্নার ক্লাবের মতো ঘটনা ঘটবে না। আর কাল সারাটাদিন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। দেখি, কে আপনাদের কী ক্ষতি করে!"

মিতিন হাসি হাসি মুখে বলল, "অভয় দিচ্ছেন তা হলে?"

"আপনাদের তো বলেইছি ম্যাডাম, আমার বাবা ছিলেন শিকারি। রাইফেল হয়তো ধরিনি, তবে বুনো রক্ত তো কিছু আমার মধ্যেও আছে। এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি, আমি থাকতে আপনাদের ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারবে না।"

অবনী প্রায় গলে গেলেন, "সো কাইন্ড অফ ইউ, সো কাইন্ড অফ ইউ।"

"নিড নট মেনশন।" কুরুপ ঘড়ি দেখলেন, "এখন চলি। কাল ভোর পাঁচটার মধ্যে রেডি হয়ে যান, আমি এসে পড়ব।"

"অত ভোরে?" পার্থ আঁতকে উঠল, "ঘুম ভাঙবে?"

"জাগতেই হবে। ফার্স্ট ট্রিপ সাড়ে ছটায়, আমরা ফার্স্ট ট্রিপই

অ্যাভেল করব। ভোরবেলা জীবজন্তু দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রোদ উঠে গেলে শুধু জঙ্গল দেখাই সার হবে।"

কুরুপ চলে যাওয়ার পর সহেলি বললেন, "দ্যাখো বাপু, একটা কথা বলি। যে যতই গ্যারান্টি দিক, হোটেলের যতই সুনাম থাক, আমি কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। আমার মনে হয় আজ রাত্তিরে শোওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু বদলানো দরকার। মিতিন, পার্থ আর বুমবুম এই ঘরে শোবে, আমি, টুপুর আর টুপুরের বাবা ওই ঘরে।"

"কেন? তাতে কী সুরাহাটা হবে?"

"দুটো ঘরেই ব্যাটাছেলে রইল। চোর এলে তারা ফেস করতে পারবে।"

টুপুর ঝনঝন করে উঠল, "কী বলছ মা? মিতিনমাসি থাকতে কীসের ভয়?"

মিতিন হাসতে হাসতে বলল, "এক কাজ করা যাক দিদি। পুরুষমানুষ থাকলে যদি তুমি সাহস পাও, আমরা ঘরে বুমবুমকে নিয়ে নিই! সেও তো ব্যাটাছেলে, না কি?"

"ঠাট্টা কোরো না। যা বলছি তাই করো।"

সহেলিকে আরও কিছুক্ষণ খেপানো চলল। জোর হাসাহাসি হচ্ছে ঘরে। তার মধ্যেই উশখুশ করছিলেন অবনী। হঠাৎ বললেন, "এই পার্থ, দোকানে যাবে না?"

পার্থ অলস মেজাজে বলল, "ছাড়ুন না অবনীদা, আজ সকলে মিলে একটু গপ্পো করি। দাবা নয় আজকের মতো থাক।"

"দাড়িও থাকবে?"

"থাকুক না। একদিনে আর ক'ফুট বাড়বে?" বলতে-বলতে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল পার্থ। দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়েছে সিগারেট। কাঠি ফেলার জন্য অ্যাশট্রে খুঁজছে।

উঠে টেবিল থেকে ছাইদান এনে দিল টুপুর। চিনেমাটির সুদৃশ্য বস্তুটি নাড়াচাড়া করতে-করতে পার্থ বলল, "মাইকেল্‌স ইনের তো দেখি খুব কেতা!"

"কেন?"

"অ্যাশট্রের গায়ে পর্যন্ত হোটেলের ইনিশিয়াল! এম আই!"

ভুরু কুঁচকে কথাটা শুনল মিতিন। ভুরুটা তার কুঁচকেই রইল।

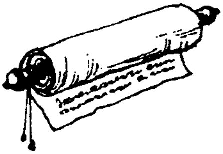

কাঁটায়-কাঁটায় ভোর পাঁচটায় রিসেপশান থেকে ফোন। মিস্টার পি কে জি কুরুপ এসে গেছেন, অপেক্ষা করছেন লাউঞ্জে। বাইরে তখনও ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

সঙ্গে-সঙ্গে ধুমধাড়াক্কা লেগে গেল। ওঠ, ওঠ, ওঠ। সাজ, সাজ, সাজ। রাতে আবার এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, কুমিলিতে তাপমাত্রা বেশ নেমে গেছে, সকলেই হালকা দেখে গরম কিছু চড়িয়ে নিল গায়ে। যথাসম্ভব দ্রুত তৈরি হয়ে টুপুররা যখন নীচে এল, ঘড়িতে তখন পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

কুরুপ সামনেটায় পায়চারি করছিলেন। টুপুরদের দেখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললেন, "উই আর অলরেডি লেট। গিয়ে এই ট্রিপ ধরতে না পারলে দেড়-দু'ঘণ্টা বসে থাকতে হবে।

পার্থ বলল, "সরি, সরি। আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

"সরিটরি পরে হবে। এক্ষুনি চলুন।"

ম্যাথুকে বলাই ছিল। কাল রাস্তায় বিচ্ছিরি কাদা লেগেছিল

গাড়িতে, এই ভোরেও যত্ন করে ধুয়েমুছে ফেলেছে, বসে গেছে স্টিয়ারিংয়ে। অবনী, সহেলি উঠে পড়লেন চটপট।

মিতিন পার্থকে বলল, "তুমি বুমবুমকে নিয়ে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে এসো, আমি আর টুপুর মিস্টার কুরুপের গাড়িতে যাচ্ছি। উনি একা-একা পাইলট কারের মতো সামনে-সামনে যাবেন, এটা মোটেই ভাল দেখায় না।"

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "জো হুকুম।"

টুপুর বসল কুরুপের পাশে, মিতিন পিছনের সিটে। আজ সাফারি-সুট পরেছেন কুরুপ, ঘিয়ে রঙের। এই ভোরেও তিনি দারুণ ফিটফাট।

গাড়ি স্টার্ট করে কুরুপ বললেন, "আশা করি দিনটা আজ ভালই কাটবে।"

টুপুর বলল, "নিশ্চয়ই।"

মিতিন ঝুঁকে কী যেন কুড়োচ্ছিল। রেয়ারভিউ মিররে দেখতে-দেখতে কুরুপ জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু পড়ল ম্যাডাম?"

"আমার একটা হেয়ার ক্লিপ। পেয়ে গেছি।"

একটু একটু করে ফরসা হচ্ছে আকাশ। মেঘ আছে বটে, তবে ভারী কিছু নয়। পাখিরা জাগছে, ভেজা-ভেজা নির্জন রাস্তায় উড়ে বেড়াচ্ছে পিড়িং-পিড়িং। অচেনা জায়গায় এমন স্নিগ্ধ ভোর দেখলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।

টুপুর আনমনে বলে উঠল, "আজ কি আবার বৃষ্টি হবে?"

কুরুপ বললেন, "হতেই পারে। তোমরা ছাতাটাতা নিয়েছ তো?"

"মার ব্যাগে আছে মনে হয়।"

"মাত্র একটা?"

"বাবারও ছাতা ছিল। কোচিতে ফেলে এসেছে।"

"তাই বুঝি? ছাতা কোচিতেই রয়ে গেল?"

টুপুর ব্যাগ ফেলে আসার গল্প শুরু করার আগেই মিতিনের উল্লসিত স্বর, "ওই দ্যাখ টুপুর, ডান দিকের অর্জুন গাছটায় দ্যাখ!"

"কী গো?"

"একঝাঁক টিয়াপাখি। এক সঙ্গে উড়ে এসে বসল। বিউটিফুল।"

"পেরিয়ারে এরকম অনেক বিউটি দেখতে পাবেন ম্যাডাম।" কুরুপ হাসছেন, "কত যে তাদের রং, কত রকম বাহার।"

টুপুর প্রশ্ন করল, "পেরিয়ারে অনেক রকম পাখি আছে বুঝি?"

"অজস্র। অজস্র। কত বার্ডওয়াচার পেরিয়ারে শুধু পাখি দেখতেই আসে। কমন পাখির মধ্যে ভীমরাজ, পাপিয়া, কাঠঠোকরা, ময়না... তারপর ধরো, ডাহুক, মাছরাঙা, সারস, পানকৌড়ি এসব

তো চোখে পড়বেই। এ ছাড়া আছে ইয়া লম্বা ঠোঁট ধনেশ, ছাইরঙা জংলি মুরগি...। তা ছাড়া এখানে নীল রঙের টিয়া দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রজাতির টিয়া এখন প্রায় বিলুপ্ত। তবু পেরিয়ারের জঙ্গলে এখনও চোখে পড়ে। হঠাৎ কোনওদিন হয়তো এখানেও দেখা যাবে না, কে জানে? ”

পাখি প্রসঙ্গ থেকে পেরিয়ার হ্রদের গল্পে ঢুকে পড়লেন কুরুপ। পেরিয়ার লেক নাকি প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, মানুষের তৈরি। কেরলের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী পেরিয়ারে বন্যা হত প্রতি বছর, ঘরবাড়ি ভেসে গিয়ে নাকাল হত লোকজন। তাই নাকি আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে বাঁধ দেওয়া হয়েছে নদীতে। আর সেই বাঁধের জল ধরে রাখার

জন্য কাটা হয়েছে হ্রদ। এই লেককে ঘিরেই ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা গড়ে তুলেছিলেন পেরিয়ার অভয়ারণ্য। সেই অভয়ারণ্যই এখন কেরলের বৃহত্তম জঙ্গল।

কুরুপের গল্প ফুরোতে না ফুরোতে এসে গেছে থেক্কাডি চেকপোস্ট। পেরিয়ার অরণ্যের প্রবেশদ্বার। গেট পেরনোর পর থেকেই দু'পাশে হালকা জঙ্গল। বিশাল উঁচু-উঁচু গাছ, মধ্যিখান দিয়ে পিচরাস্তা। বৃষ্টির জল মেখে কী চকচক করছে গাছগুলো। পাখপাখালির কিচিরমিচির ডাকে শান্ত বনভূমি মুখর এখন।

আরও খানিকটা গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালেন কুরুপ। টয়োটা কোয়ালিসও থেমেছে পিছনে। এই ভোরেও বেশ কয়েকটা জিপ আর প্রাইভেট কার জঙ্গলে হাজির।

টিকিট কেটে বড়-বড় পাথরের চাতাল বেয়ে, উঁচু-উঁচু ধাপি টপকে অনেকটা দূরে দাঁড়ানো জলযানটায় গিয়ে উঠল সবাই। এবার আর কোচির ভুলটা করেনি, গোড়াতেই উঠে গেছে দোতলায়। উপরে ভাড়া একটু বেশি, তা হোক, ভাল করে দেখা তো যাবে।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই ছাড়ল লঞ্চ। আঁকাবাঁকা জলপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের পরিভ্রমণ সেরে লঞ্চ যখন আবার ঘাটে ভিড়ল, টুপুরদের পেটে তখন চনচনে খিদে। লেকের পাড়ে চমৎকার সাজানো-গোছানো রেস্তোরাঁ, নেমেই দুদ্দাড়িয়ে খেতে ছুটল সকলে। ধোসা, ইডলি, পুরি, ব্রেড-ওমলেট সবই মিলবে, যার যা খুশি খাও। কুরুপ নিলেন আপ্পাম, কেরলের নিজস্ব ধোসা। মিতিন আর টুপুর অনিয়ন উত্তাপাম, বাকিরা ডিম-রুটি। গাছে-গাছে ঘেরা রেস্তোরাঁর বাইরে হুপহাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে হনুমানের দল, তাদের দেখতে বারবার ছুটছে বুমবুম। হনুমান কাছাকাছি এলেই পালিয়ে আসছে তড়িঘড়ি। লঞ্চের আরও অনেকে খাচ্ছে রেস্তোরাঁয়, বুমবুমের সাহসের বহর দেখে তারা হেসে খুন।

টুপুর চুপটি করে জঙ্গলটার কথা ভাবছিল। পেরিয়ারের সৌন্দর্যে সে এখনও বিভোর। কী সবুজ, কী সবুজ! সবুজ রং যে এত গাঢ়, এত তীব্র হতে পারে পেরিয়ার না এলে বুঝি জানাই হত না টুপুরের। জঙ্গলকে ঘিরে সহ্যাদ্রি পাহাড়, খানিক সমতল বেয়ে জঙ্গল ছড়িয়ে গেছে পাহাড়ে পাহাড়ে, হ্রদের পাড়ে দুলকি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতির পাল, হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে হরিণ, মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকছে লঞ্চের দিকে, জলে পানকৌড়ির ঝাঁক, মাছরাঙা উড়ে এসে ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ তুলে নিল, পাহাড়ের গায়ে গম্ভীর দাঁড়িয়ে বাইসন, সকালের রোদে ঝকঝক করছে তাদের শরীর, মাথার ওপর ট্যাঁ-ট্যাঁ ডেকে উঠল নাম-না-জানা পাখি— আহা, পেরিয়ার সত্যিই তুলনাহীন। সবচেয়ে বেশি আকর্ষক বুঝি জলে মাথা তুলে থাকা গাছের গুঁড়িগুলো। পার্থমেসো বলছিল, ওগুলো নাকি জঙ্গল কেটে লেক বানানোর স্মৃতিচিহ্ন। একশো বছরেরও উপর গাছের কঙ্কাল জলে রয়ে গেছে, ভাবা যায়?

অবনী কাউন্টার থেকে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ এনে পড়ছিলেন। হঠাৎই উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "এই দ্যাখো, দ্যাখো, কোচির সিনাগগের খবরটা কত বড় করে বেরিয়েছে!"

কুরুপ মুখে আপ্পাম পুরছিলেন। থমকে গিয়ে বললেন, "কোন খবরটা?"

"সিনাগগের চুরি।"

"ওটা তো কালই দেখেছিলাম মুন্নারে।"

"আরও ডিটেলে বেরিয়েছে আজ। সিনাগগের যে ছেলেটি খুন হয়েছে, তার সম্পর্কেও নিউজ আছে। ছোকরার নাম বিক্রমন। খুব নাকি জুয়ার নেশা ছিল ছোকরার, প্রচুর নাকি ধারধোরও করেছে। পুলিশ সাসপেক্ট করছে জুয়ার আড্ডারই কেউ একজন ওকে দিয়ে চুরি করিয়েছিল গ্রেট স্ক্রলটা। জানাজানি হওয়ার পর সেই মেরে

দিয়েছে বিক্রমনকে। রিভলভারের গুলিতে মারা গেছে ছেলেটা। ডেডবডি পড়ে ছিল একটা অটোরিকশার সিটে। চিতুর রোডের লাগোয়া কোন গলিতে।"

সহেলি বিস্মিত স্বরে বললেন, "আমরা চিতুর রোডের হোটেলে ছিলাম না?"

"হুম। ছেলেটারও মনে হয় ওইদিকেই বাড়ি। পুলিশ আরও কিছু ক্লু পেয়েছে। ছেলেটা যে জুয়ার আড্ডায় যেত, ওখানে নাকি এক দাগি ক্রিমিনাল আসত মাঝেমধ্যে। লোকটা নাকি এক সময়ে পেশাদার গাইড ছিল, ফরেনারদের নিয়ে কেরলে টুর করাত। বছর সাত-আট হল প্রফেশান বদলে অ্যান্টিক চোর হয়েছে। একবার চেন্নাইতে ধরাও পড়েছিল, মিউজিয়াম থেকে রেয়ার নটরাজ চুরি করতে গিয়ে। অনেককাল সে কেরলের বাইরে ছিল। সম্প্রতি তাকে কোচিতে দেখা গেছে বলে তাকেই সন্দেহ করছে পুলিশ।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "তা তাকে ধরছে না কেন?"

"নিশ্চয়ই খুঁজে পাচ্ছে না, তাই।"

কুরুপ প্রশ্ন করলেন, "লোকটার নাম দিয়েছে কাগজে?"

"অপরাধ জগতে আসার আগে সে ছিল টি জোসেফ। এখন নাকি তার অষ্টোত্তর শত নাম। তামিলনাড়ুতে তিনি সেলভান, অন্ধ্রে মুথুস্বামী, কর্নাটকে আয়াপ্পান ..."

"সেলভান নামটা যেন শোনা-শোনা লাগছে। কোনও এক মন্দিরের মূর্তি চুরির কেসে সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে নামটা বোধ হয় কাগজে বেরিয়েছিল।" কুরুপের ভুরুতে ভাঁজ, "বছর দু'-আড়াই আগে।"

"তার মানে তিনি তো স্বনামধন্য ব্যক্তি!" মিতিন বলে উঠল, "দু'-আড়াই বছর পরেও নামটা যখন লোকের মনে থাকছে!"

অবনী বললেন, "খবরটা থেকে একটা ইনফরমেশান কিন্তু ক্লিয়ার মিতিন।"

"কী বলুন তো?"

"তোমার ডিডাকশানই ঠিক। সাইমন পেরেজ বা জোস হ্যালেগুয়া কিন্তু এই চুরির সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন। সিনাগগের রাবি বা কেয়ারটেকারকে যে আমরা সন্দেহ করছিলাম তার কোনও ভিত্তি নেই।"

কথাটা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলছিলেন অবনী, মর্মার্থ অনুধাবন করে কুরুপও বেশ আশ্চর্য হয়েছেন। বললেন, "এক্সকিউজ মি, একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। চুরিটা নিয়ে আপনারা এত এক্সাইটেড কেন?"

পার্থ বলল, "কারণ, চুরিটা প্রায় আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে।"

"অ্যাঁ?"

"না, চোর আমাদের দেখিয়ে চুরি করেনি। আমরা পরশু, আই মিন রোববার, সিনাগগের কর্তাব্যক্তিদের জপিয়ে-জাপিয়ে গ্রেট স্ক্রল দেখতে গেছিলাম এবং তখনই চুরিটা প্রথম ডিটেক্টেড হয়।"

"হ্যাঁ, কাগজে কাল দেখছিলাম বটে। একদল বাঙালি টুরিস্ট সিনাগগে গিয়েছিলেন, তখনই ...। আপনারাই তাঁরা?"

"ইয়েস স্যার। শুধু মুন্নার মাটুপেট্টি নয়, কোচিতেও আমাদের একটা খটোমটো অভিজ্ঞতা হয়েছে।" বলতে বলতে পার্থ থেমে গেল আচমকা। চোখ সরু করে ভাবছে কী যেন, কাঁটায় গেঁথেও ওমলেট মুখে পুরছে না। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল, "আচ্ছা মিতিন, এমন কি হতে পারে ...?"

মিতিন খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে দেখছিল। চোখ তুলে বলল, "কী?"

"সেদিন সিনাগগে থাকার কারণেই আমরা কোনওভাবে চুরিটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি তো? হয়তো আমাদের

অজ্ঞাতসারেই? হয়তো তার আফটার এফেক্ট হিসেবেই মুন্নারে চুরির অ্যাটেমপ্ট? মাট্টুপেট্টির ছিনতাই?"

"হতে পারে।" মিতিন ঠোঁট ওলটাল, "না-ও হতে পারে।"

"তোমার লজিক কী বলছে?"

"এখনও ওই অ্যাঙ্গেলে ভাবিনি।"

"ভাবো। ব্রেনটা খাটাও। আমার তো মন বলছে ডালমে কুছ কালা হ্যায়।"

কুরুপ উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "কেন আপনার ওরকম মনে হচ্ছে মিস্টার মুখার্জি?"

"ওর কথা বাদ দিন মিস্টার কুরুপ।" মিতিন হেসে উঠল, "আমার হাজব্যান্ড সবেতেই বিপদের গন্ধ পায়।"

কুরুপ মাথা নাড়লেন, "ম্যাডাম, আমি তবু বলব সাবধানের মার নেই। বিশেষত মিস্টার মুখার্জির মনে যখন একটা খটকা জেগেছে। আমার তো মনে হয় রাস্তাঘাটে আপনাদের ঘোরাফেরা বেশি না করাই ভাল।"

মিতিন আরও জোরে হেসে উঠল, "কেন, আপনি তো আছেন সঙ্গে।"

"তা আছি।" কুরুপও হেসে ফেললেন, "তবে আমি তো আর আজকের পরে থাকছি না। এখান থেকে আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? আলেপ্পি তো?"

"সেরকমই তো প্ল্যান আছে। কাল সকালে রওনা দিয়ে ভায়া কোট্টায়াম আলেপ্পি। তার পরের দিন কোভালাম, তার পরের দিন কন্যাকুমারিকা।"

"যেখানেই যান, একটু অ্যালার্ট থাকবেন।"

সহেলি কাতর স্বরে বললেন, "আপনিও তিনটে দিন আমাদের সঙ্গে থাকুন না মিস্টার কুরুপ। আমার বোন তো মরে গেলেও টুর

ক্যানসেল করবে না, আপনি থাকলে আমি অন্তত মনে একটু জোর পাই।”

“আপনাদের সঙ্গ তো আমার খুব ভালই লাগছে ম্যাডাম। কিন্তু আমাকে যে কাল সকালে পারাম্বিকুলম স্যাংচুয়ারির পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার এক পুরনো বন্ধু, তিনিও একজন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার, পারাম্বিকুলমে আমার জন্য ওয়েট করবেন। আমরা দু'জনে মিলে কোচিতে একটা এগজিবিশানের প্ল্যান করছি, তার থিম নিয়ে জরুরি আলোচনা আছে।”

অতঃপর আর তো অনুরোধ চলে না, সহেলি চুপ মেরে গেলেন। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল সবাই। কুরুপই বিল মেটাতে যাচ্ছিলেন, পার্থ জোর করে আটকাল তাঁকে।

এবার কুরুপের গাড়িতে মিতিনের বদলে পার্থ। মাইকেল্‌স ইনে পৌঁছে আপাতত বিদায় নিলেন কুরুপ। টুপুররা এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম করুক, তিনি আবার চারটে নাগাদ এসে মশলা বাগান দেখাতে নিয়ে যাবেন।

রুমে এসে মিতিন সহেলিকে বলল, “কী দিদি, এখন কী প্ল্যান?”

“কিছুই না। স্নানটান সারব।”

“এমন সুন্দর সকালটা বয়ে যাবে? সবে দশটা বাজে ; একটু মেন মার্কেটের দিকে গেলে হত না?”

“খেপেছিস? শুনলি না, মিস্টার কুরুপ বেরোতে বারণ করলেন! যদি বাজার যেতে হয় তো বিকেলে যাব, যখন ভদ্রলোক সঙ্গে থাকবেন।”

“আহা, ভদ্রলোকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমার সঙ্গে দোকানে দোকানে টো-টো করবেন! দৃষ্টিকটু বলে তো একটা কথা আছে, না কি?”

"মোটেই না। মিস্টার কুরুপ অতি সজ্জন মানুষ, তিনি কিচ্ছু মনে করবেন না।"

টুপুর ফস করে বলল, "আমরা এখন ম্যাসাজ করাতে যেতে পারি।"

মিতিন বলল, "কারেক্ট। সে তো দোরগাড়ায়। ভাল করে ম্যাসাজ নিলে শরীর মন ঝরঝরে হয়ে যাবে। তোর মা-র আশা করি ওখানে যেতে আপত্তি হবে না?"

সহেলি যেন ঈষৎ দোলাচলে। বললেন, "এত কাছাকাছি কোনও বিপদ নেই, কী বল?"

"কোথাও বিপদ নেই দিদি। আমি তো আছি, চলে এসো।"

বেরনোর সময়ে উলটো দিকের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে এল টুপুর। রুমে ঢোকার আগে পার্থমেসো ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে দাবার বোর্ড কিনে এনেছে, দুই মহারথী আবার রণক্ষেত্রে মুখোমুখি। বুমবুম যথারীতি ডুবে আছে কার্টুন চ্যানেলে। হাতে চিপ্‌সের প্যাকেট।

মালিশাগারে এসে টুপুর-সহেলিকে ঢুকিয়ে দিয়ে মিতিন বলল, "তোরা মা-মেয়ে টেবিলে শুয়ে পড়, আমি একটু আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"একটা দরকারি কাজে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে এসে পড়ব।"

"মার্কেটিং করবে?"

"ওটা তো তোর মা-র ডিপার্টমেন্ট। অন্য কাজ। পরে বলব।"

টুপুরের কেমন যেন ধন্দ লাগল। কাল রাত থেকে বেশ রহস্যময়ী হয়ে গেছে মিতিনমাসি। বারবার কেন যেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে! অনেক রাত অবধি কাল দাঁড়িয়েছিল ব্যালকনিতে। আজও লঞ্চে ঘোরার সময়ে উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছিল না বড় একটা। ভাবছে কী যেন!

নতুন কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে নাকি মিতিনমাসি? বলে না কেন? সবাই ভয় পেয়ে যাবে, তাই? হতে পারে। হতেই পারে।

লতানে গাছের নরম ডালটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল টুপুর। বড়-বড় পাতার পাশে থোকা-থোকা দানা ঝুলছে। সবুজ-সবুজ। কাণ্ডটা একেবারেই লিকলিকে। সবুজ দানাগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে গেলেই গোলমরিচ। কেরলের কালো সোনা। সেই কোচি থেকেই রাস্তার দু'ধারে এরকম লতানে গাছ এনতার দেখেছে টুপুর, বড় কোনও গাছের গুঁড়িকে বেড় দিয়ে মাটি থেকে উঠে গেছে। ইস, আগে জানলে এরকম দানাসুদ্ধু লতা আরও কিছু সংগ্রহ করে রাখা যেত!

কুরুপ আজ দু'-দুটো মশলার বাগানে ঘুরিয়েছেন টুপুরদের। একসঙ্গে এত রকম মশলার গাছ দেখা টুপুরের এই প্রথম। শুধু টুপুর কেন, তাদের কে-ই বা দেখেছে আগে! হলুদ লঙ্কা জিরে আদা থেকে শুরু করে সেই ভ্যানিলা গাছ পর্যন্ত! যে গাছের ফল থেকে ভ্যানিলা হয়, তার পাতাতেও কী সুগন্ধ। লম্বা-লম্বা সুচোলো পাতাওয়ালা এলাচ গাছের গোড়ায় ছোট্ট-ছোট্ট এলাচ ফলে আছে, লবঙ্গ ফুটে আছে ডালে-ডালে— দেখতে ভারী মজা লাগে। দারচিনি গাছের শুকনো পাতাই যে তেজপাতা, এ তথ্যও তো আজ টুপুরের জ্ঞানভাণ্ডারে জমা হল।

যাওয়া হয়েছিল কফি বাগানেও। ঝোপ-ঝোপ কফিগাছ থেকে অনেক ক'টা ফল ছিঁড়ে এনেছে টুপুর। ওই ফলের বীজ রোস্ট করে, গুঁড়িয়ে, বাড়িতেই কফি তৈরি হয় কিনা দেখবে।

বুমবুমও পাতা জোগাড় করেছে প্রাণ ভরে। হলুদগাছের পাতা,

আদাপাতা, এলাচপাতা, লবঙ্গপাতা, এমনকী কফি-কোকোর পাতাও। কোনটা কী পাতা গুলিয়ে ফেলছে বারবার। একটা বড়সড় পাতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা যেন কীসের রে দিদিভাই? হলুদ?"

"একটু ছিঁড়ে শুঁকে দ্যাখ না। গন্ধেই মালুম হবে।"

"এএএহ্‌, আমি পাতা ছিঁড়বই না।"

পার্থ বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছিল। মশলা বাগান ঘুরে কুমিলির বাজারে যাওয়া হয়েছিল সন্ধেবেলা। দোকানে-দোকানে চক্কর খেয়ে সে এখন ক্লান্ত। অলস ভঙ্গিতে বলল, "এত পাতা নিয়ে কী করবি র‍্যা?"

"কলকাতায় বন্ধুদের দেখাব।"

"তদ্দিনে তো শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে যাবে!"

"বইয়ের খাঁজে রেখে দেব। রাংতার মতো। ঠিক থাকবে।"

অবনী ব্যালকনিতে চেয়ার নিয়ে জিরোচ্ছিলেন এতক্ষণ। উঠে এসে বললেন, "কেরলের মেন-মেন আইটেম আমাদের তা হলে দেখা হয়ে গেল। পাহাড়, লেক, জঙ্গল, মশলাবাগান, কফিবাগান এখন শুধু কোভালামের সমুদ্রটাই বাকি। আর আলেপ্পিতে নৌকাবিহার।"

টুপুর বলল, "এখনও রবার প্ল্যানটেশান দেখিনি বাবা।"

"সে তো কাল আলেপ্পি যাওয়ার পথে কোট্টায়ামের আগে পড়বে। কুরুপ তো বলছিলেন মাইলের পর মাইল জুড়ে রবার বন।"

বুমবুম চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, রবার কি গাছে ফলের মতো ঝোলে?"

পার্থ বলল, "তা হলে তো আর চিন্তা ছিল না। তুই যা রবার হারাস বাড়িতে একটা রবারগাছ পুঁতে রোজ একটা করে তোকে রবার ছিঁড়ে দিতাম।"

টুপুর বলল, "তুই একটা বুদ্ধু। রবার গাছের গুঁড়ি চিরে একটা প্লাস্টিক বেঁধে দেওয়া হয়। ওই প্লাস্টিকের থলিতে গাছের রস গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ে, সেই রসই প্রসেস করে বানানো হয় রবার। মনে থাকবে?"

সহেলি একগাদা মশলার প্যাকেট কিনেছেন। প্যাকেটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "তোমাদের গালগল্প শেষ হবে না? ন'টা তো বাজল, খেতে যাবে কখন?"

অবনী বললেন, "দাঁড়াও, মিস্টার কুরুপ আসুন। তাঁকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে আমরা আগেভাগে খেতে বসে যাব?"

"ওমা, তাই তো। আমার খেয়ালই ছিল না," সহেলি জিভ কাটলেন, "কখন আসবেন তিনি?"

"এসে তো পড়ার কথা। কেন যে দেরি করছেন?"

বলতে-না-বলতেই দরজা ঠেলে, কুরুপ নয়, মিতিনের প্রবেশ। এতক্ষণ অন্য রুমে যোগব্যায়াম সারছিল। মুখটুখ ধুয়ে তরতাজা হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকে দরজা হাট করে দিল মিতিন। সোজা এসে বসল বিছানায়। ব্যক্তিত্বমাখা স্বরে বলল, "কাল আমাদের ক'টায় রওনা হওয়ার কথা?"

"তুইই তো বলেছিলি আটটা সাড়ে-আটটায় বেরোব।" সহেলি জবাব দিলেন, "আলেপ্পিতে লাঞ্চ হবে।"

"প্রোগ্রামটা একটু বদলে যাচ্ছে। আমরা বেরোব কাল সাতটার মধ্যে। এবং আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল কাল আলেপ্পি নয়, কোচি।"

"কেন?"

"সব কেনর উত্তর সঙ্গে-সঙ্গে হয় না দিদি। কারণটা কাল বিকেলে জানতে পারবে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য গোটা ঘর স্তব্ধ। সহেলি, অবনী চোখ

চাওয়াচাওয়ি করছেন। পার্থর দৃষ্টিতে বিস্ময়। টুপুর হতবাক হয়ে দেখছে মিতিনমাসিকে। চেষ্টা করছে মাসিকে পড়ার।

সহেলি কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আমায় একটা সত্যি কথা বলবি মিতিন? আমাদের সঙ্গে শত্রুতাটা করছে কে? মুন্নারের সেই লোকদুটো?"

"উঁহু, আর কোনও প্রশ্ন নয়। শুধু কয়েকটা কথা মগজে ভরে রাখো। আমি যা বলব, নির্দ্বিধায় তাই করবে। ভয় পেয়ো না, প্যানিক্ড হওয়ার কোনও কারণ নেই। সহজভাবে থাকো। হাসো, কথা বলো। কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?"

বুমবুম বলল, "রবার গাছ। না না, মিস্টার কুরুপ।"

"হ্যাঁ, ভদ্রলোক তো এসে পড়বেন। চলো, নীচে গিয়ে ততক্ষণ অর্ডার-টর্ডার দিই। পার্থ, নামার আগে দুটো রুমের দরজাই ভাল করে লক করে পকেটে চাবিদুটো নিয়ে এসো।"

মিতিনের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না কেউ। ক্ষণে-ক্ষণে বাচনভঙ্গি বদলাচ্ছে মিতিন। এই হাসি-হাসি, তো এই থমথমে। তবে কেউ আর বিশেষ ঘাঁটালও না তাকে। গুটিগুটি নেমে এসেছে রেস্তোরাঁয়।

কুরুপের জন্য বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না। টুপুররা মেনুকার্ড খোলার আগেই পৌঁছে গেছেন কুরুপ। লাউঞ্জে তাঁকে দেখতে পেয়েই হাত নেড়ে ডাকল মিতিন, "চলে আসুন, আমরা এখানে।"

নেভি ব্লু রঙের সুট পরে এসেছেন কুরুপ, গলায় মেরুন টাই। চাপ-চাপ কোঁকড়া চুলে জেল লাগিয়েছেন, ব্যাকব্রাশ করা চুল বেশ পেতে রয়েছে। বসেই রসিকতা করে বললেন, "লাস্ট সাপার টুগেদার। হা হা।"

দুটো টেবিলে ভাগাভাগি করে বসা হয়েছে। একটাতে মিতিন,

টুপুর, পার্থ, আর মিস্টার কুরুপ। হাতপাঁচেক তফাতে বাকি তিনজন। অবনী ওই টেবিল থেকে উত্তর দিলেন, "কিন্তু এখানে জুডাসটি কে? আর আমাদের মধ্যে কেই বা জেসাস ক্রাইস্ট?"

"তোফা বলেছেন তো! এই জন্যই তো আমি বাঙালিদের এত পছন্দ করি। এই সেন্স অফ হিউমারের জন্য।"

পার্থ বলল, "তা হলে বাঙালির রসনার কথাও নিশ্চয়ই জানেন?"

"বিলক্ষণ। বাঙালি খেতে খুব ভালবাসে। কলকাতার মতো এত ভ্যারাইটি খাবারের দোকান আমি আর কোনও মেট্রোপলিসে দেখিনি।"

"তা হলে এবার খানার অর্ডার প্লেস করি?"

"নিশ্চয়ই।"

দক্ষিণ ভারতীয় নয়, উত্তর ভারতীয়ও নয়, কুরুপের আগ্রহ চিনা খাবারে। আইটেম পছন্দ করল টুপুর। অ্যাসপারাগাস সুপ, লেমন চিকেন, গার্লিক প্রন, মিক্সড চাউমিন, সি ফুড ফ্রায়েড রাইস ...।

অর্ডার দানের পর্ব চোকার পর পার্থ আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়েছে। প্যাকেটটা দেখিয়ে কুরুপকে বলল, "আপনি তো এ রসে বঞ্চিত, তাই না?"

"এককালে খেতাম দু'-একটা। ছেড়ে দিয়েছি।"

"ভালই করেছেন। পয়সাও বাঁচছে। ফুসফুসও।"

মন্তব্যটা মিতিনের। পার্থ তেরচা চোখে মিতিনকে একবার দেখে নিয়ে প্যাকেট পকেটে পুরল। অ্যাশট্রেখানা সামনে টেনে নিয়ে কুরুপকে বলল, "আপনার এগেনস্টে আমার কিন্তু একটা অভিযোগ আছে।"

কুরুপের চোখ সরু।

"অত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই।" পার্থ হো-হো হেসে উঠল,

"আপনার ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফির কোনও স্যাম্পল কিন্তু আমাদের দেখালেন না!"

কুরুপ অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "এক্সট্রিমলি সরি। ফিল্ম তো আমি যেখানে-সেখানে প্রিন্ট করাই না, শুধু ওয়াশটা করিয়ে রাখি। তা আপনাদের ঠিকানাটা দিয়ে দিন না, পাঠিয়ে দেব।"

"খেয়ে উঠেই লিখে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, যদি কখনও কলকাতায় আসেন অবশ্যই আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।"

"সে আর বলতে!" কুরুপের ঠোঁটে শিষ্ট হাসি, "বাই দ্য বাই, আপনারা কাল ক'টায় বেরোচ্ছেন?"

"ভেবেছিলাম বেলায় স্টার্ট করব। কিন্তু আমাদের টুর প্রোগ্রামটা সামান্য বদলে গেছে।" মিতিন বলে উঠল, "কাল আমরা স্ট্রেট আলেপ্পি যাচ্ছি না।"

"সে কী?" কুরুপ অবাক, "কোথায় যাবেন তা হলে?"

"আমাদের কাল একবার কোচি ফিরতেই হবে। একটা প্রবলেমে পড়ে গেছি।"

"কী প্রবলেম?"

"আর বলবেন না, আমাদের এবারের টুরে শুধুই হ্যাজার্ড। আমার হাজব্যান্ডের যে ব্যাগটা মাটুপেট্টিতে ছিনতাই হল, হুবহু একইরকম আর-একটা ব্যাগ ছিল আমার জামাইবাবুর। উনি তো একটু আলাভোলা টাইপ, ব্যাগটা কোচিতে ফেলে এসেছেন। রেবতী ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। ওই লাল ব্যাগে অনেক টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে জামাইবাবুর ক্রেডিট কার্ডটাও রয়ে গেছে। বোঝেনই তো, আজকাল বেশি ক্যাশ নিয়ে কেউ বেরোয় না, সুতরাং ক্রেডিট কার্ডটা তো

"কী কাণ্ড! ব্যাগ হোটেলেই রয়ে গেল? ফেরত পাবেন?"

"হ্যাঁ। হোটেলে ফোন করে দিয়েছি।"

"তার মানে সেই রেবতী ইন্টারন্যাশনালে ছুটবেন?"

"না। জামাইবাবুর এক ছাত্র থাকে কোচিতে, তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, সে ব্যাগটা কালেক্ট করে নিজের জিম্মায় রেখে দিয়েছে। আমরা অবশ্য কোচিতে বেশিক্ষণ স্টে করব না, জামাইবাবুর ছাত্রকে বলা আছে, সে ঠিক বিকেল তিনটেয় ব্যাগ নিয়ে দরবার হল গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে থাকবে। ব্যাগ তুলে নিয়েই আমরা চলে যাব আলেপ্পি।"

"কাল তিনটেয়?" কুরুপকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল, "তার মানে কাল আপনাদের গোটা দিনটাই নষ্ট? সন্ধের আগে আলেপ্পি পৌঁছনো হচ্ছে না তা হলে?"

"কী করা যাবে বলুন? ভুলের খেসারত। ভেবেছিলাম এখান থেকে কোট্টায়াম হয়ে বাঁয়ে আলেপ্পি ঘুরে যাব। এখন ডাইনে উজান কোচি গিয়ে আবার ফেরা। মাঝখান থেকে কন্যাকুমারিকা এবার হয়তো আর হল না।"

"হুঁ। টুরে একটা দিন চলে যাওয়া মানেই তো প্রোগ্রামের বারোটা।"

টুপুর অনেক কষ্টে সংযত রাখল ঠেলে ওঠা বিস্ময়টাকে। পার্থমেসোও মুখটাকে ভাবলেশহীন করে রেখেছে। তবে তারও যে ভিতরে চমক জাগছে, এ টুপুর হলপ করে বলতে পারে। কালই মিতিনমাসির কথা শুনে মনে হল ব্যাগ নিয়ে ভাবাভাবির প্রয়োজন নেই, পার্থমেসোও তো টাকাপয়সায় টান পড়বে না বলে অভয় দিয়ে রেখেছে, আজ কেন মিতিনমাসির গলায় অন্য সুর?

নৈশাহারের পরে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলেন কুরুপ। ওঠার সময়ে কুরুপ বললেন, "কোট্টায়াম রুটে একটা ফাইন হিল রিসর্ট পড়বে। পিরমেড। অলটিচিউড বেশি নয়, তিন হাজার ফিট। তবে সিনিক বিউটি তাকিয়ে দেখার মতো। পারলে ওখানে একটু দাঁড়িয়ে যাবেন।"

মিতিন বলল, "সেরকম ইচ্ছে একটা আছে বটে। তাই তো সাতটার মধ্যে বেরোচ্ছি। এক-দু'ঘণ্টা পিরমেডে হল্টও করতে পারি। আপনিও তো সকালেই রওনা দিচ্ছেন?"

"কাকভোরে। আমার অনেকটা রাস্তা। ইদুক্কি ডিস্ট্রিক্ট পার হয়ে ত্রিচুর ছুঁয়ে সেই পালাক্কাড় জেলা। ঘণ্টাদশেক তো লাগবেই।"

"উইশ ইউ এ হ্যাপি জার্নি।"

"সেম টু ইউ। টুরের বাকি দিনগুলো আপনাদের নিশ্চিন্তে কাটুক।"

কুরুপকে বিদায় জানিয়ে ঘরে এসে শুরু হল গোছগাছ। সারাদিনে যা-যা বেরিয়েছে, সহেলি একটা-একটা করে তুলছেন। তিন শিশি মালিশের তেল কিনেছিলেন, যত্ন করে মুড়লেন প্লাস্টিকে, চালান করলেন সুটকেসের তলায়।

মিতিন ব্যালকনিতে। চাপা গলায় পার্থর সঙ্গে কী যেন আলোচনা চলছে। টুপুর ব্যালকনিতে আসামাত্র থেমে গেল কথা।

টুপুর আর কৌতূহল ধরে রাখতে পারল না, "কেসটা কী বলো তো? কী হয়েছে?"

"কীসের কী?"

"মনে হচ্ছে কোনও গড়বড় আছে?"

"আছে।"

"আমরা নিশ্চয়ই শুধু ব্যাগ কালেক্ট করতে কোচি ফিরছি না?"

"অবশ্যই না।"

"তা হলে?"

মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল, "তোর কী মনে হয়?"

"আমার মনে হচ্ছে সামথিং রিলেটেড টু সিনাগগ। তুমি বোধ হয় কেসটার কোনও সলিউশান পেয়েছ!"

"গুড গেস। তোর ব্রেনে গ্রে ম্যাটার বাড়ছে। তা সলিউশানটা যে কী, কিছু আন্দাজ করতে পারছিস?"

টুপুর মাথা চুলকোল, "নাহ্।"

ঘরে গিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগখানা নিয়ে এল মিতিন। চেন খুলে ছোট্ট একটা দাবার ঘুঁটি বের করেছে, "এটা কী?"

"কালো বোড়ে।"

"দাবা খেলায় বোড়ের পাওয়ার সবচেয়ে কম। আবার ওই বোড়েই কখনও-কখনও এগোতে-এগোতে মন্ত্রী বনে যায়। তখন কিন্তু তার ক্ষমতা অসীম, একাই কিস্তি মাত করতে পারে। কী বুঝলি?"

টুপুর অস্থির হল, "কেন হেঁয়ালি করছ মিতিনমাসি? খুলে বলোই না।"

"উঁহু, সারারাত শুয়ে-শুয়ে ভাব। শুধু খেয়াল রাখিস, কাল কিন্তু ছ'টার মধ্যে উঠতে হবে।" বলতে-বলতে পার্থকেও তাগাদা লাগাল মিতিন, "তুমিও আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকো না। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো।"

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পার্থ কী যেন ভাবছিল। দূরমনস্ক স্বরে বলল, "যাই।"

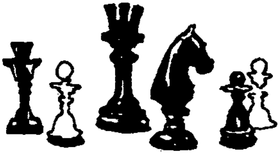

বেরনো হয়েছিল সকাল-সকালই। কিন্তু কোট্টায়ামের দিকে তিন-চার কিলোমিটার গিয়েই চমক। দুম করে ম্যাথুকে গাড়ি ঘোরাতে বলল পার্থ, শাঁইশাঁই কুমিলি ফিরে ধরল মুন্নারের পথ। সেদিকেও গেল না বেশি দূর, পুট্টাডি নামের এক ছোট্ট জনপদ পার হওয়ার

পরই বাঁদিকের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল কোয়ালিস।

পার্থ ঘাড় ঘুরিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "কী, এই রুট ঠিক আছে? চলবে? নো মুন্নার, নো কোট্টায়াম, মধ্যিখান দিয়ে সুড়ুত গলে যাব।"

মিতিন বলল, "পারফেক্টলি অল রাইট। তোমার ম্যাপ মুখস্থ করা সার্থক।"

অনেকক্ষণ ধরেই সন্দিগ্ধ চোখে পার্থ-মিতিনের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিলেন অবনী। বলে উঠলেন, "তোমরা কী চাইছ বলো তো? একবার এ-রাস্তা, একবার ও-রাস্তা ...? আমরা ভায়া কোট্টায়াম যাচ্ছি না কেন?"

"আপনার শ্যালিকা নতুন রাস্তা এক্সপ্লোর করতে চায় অবনীদা। বলছে বাঁধা রুটে বেড়ানো আর ভাল লাগছে না।"

টুপুরের মোটেই বিশ্বাস হল না কথাটা। গাল ফুলিয়ে বলল, "পিরমেডও নিশ্চয়ই এ-রুটে পড়বে না?"

"হয়তো তার চেয়েও বেটার জায়গা দেখতে পাবি। ইদুক্কির জঙ্গল ছুঁয়ে যাব, পেরিয়ার নদী পার হব, পাহাড় অরণ্য কফিবাগান সবই পড়বে পথে এই বা মন্দ কী!"

"কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকছ পার্থ?" অবনী বেশ অপ্রসন্ন, "তোমাদের মতলবটা কী একটু ঝেড়ে কাশো তো।"

"শুনবেনই? ঘাবড়ে যাবেন না তো?"

"না শুনলেই কি টেনশান কমবে?"

"আমি বলছি।" মিতিন পার্থকে থামাল। শান্ত গলায় বলল, "মাটুপেট্টির ঘটনার খলনায়কটিকে আমি পেরিয়ারে দেখেছি অবনীদা।"

"সে কী রে?" সহেলি শিউরে উঠলেন, "এমন সাংঘাতিক একটা খবর তুই চেপে রেখেছিস? পুলিশে জানাসনি কেন?"

"বেড়াতে এসে বারবার ঝুটঝামেলায় যাওয়ার দরকার কী? তার চেয়ে চুপচাপ কেটে পড়াই কি ভাল নয়? তাই বেছেও নিলাম একটা অড রুট, যে-পথে টুরিস্টরা সচরাচর আসে না। কোট্টায়ামের রাস্তায় গিয়েও গাড়ি ঘুরিয়ে দেখে নিলাম লোকটা আমাদের ধাওয়া করছে কিনা। লোকটা যদি কোনওভাবে টের পেয়েও থাকে আমরা আজ সকালে পেরিয়ার ছাড়ছি, তা হলেও আগেভাগে গিয়ে পথে কোথাও ওয়েট করে তার লাভ হবে না। ওদিকে যদি বেচারা হাপিত্যেশ করে বসেও থাকে, আমরা এদিক দিয়ে ধাঁ।"

"ঠিক বলছিস তো রে?"

"হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ।" মিতিন চোখ ঘোরাল, "কী অবনীদা, এবার শাকের আড়ালে মাছ দেখতে পাচ্ছেন তো?"

"হুম।" অবনীর মুখে গালভরা হাসি, "জব্বর ঘোড়ার চালটা দিয়েছ কিন্তু।"

"দাবা খেলা আমিও অল্পস্বল্প জানি অবনীদা।"

"বটেই তো। তোমায় কি আমি হেলাফেলা করেছি কখনও? তা এবার আমায় আজকের প্রোগ্রামটা একটু খুলে বলো তো?"

"জানেনই তো, কোচি গিয়ে তিনটের সময় সুনীলের কাছ থেকে ব্যাগ কালেক্ট করব, তারপর যাত্রা টু আলেপ্পি।"

"জার্নিটা খুব বেশি হয়ে যাবে না? তার চেয়ে আজ রাতটা কোচিতে থেকে কাল সকালে কোভালাম রওনা হতে পারি। আলেপ্পি তো পথেই পড়বে।"

"দেখা যাক। আগে কোচিতে পৌঁছই তো।"

"সুনীল কিন্তু কিছুতেই আজ আমাদের ছাড়তে চাইবে না, তুমি দেখে নিয়ো।"

টুকিটাকি কথা চলছে। গাড়িতে ফিরে এসেছে আমুদে মেজাজ। গোয়েন্দা বোনের বুদ্ধির প্যাঁচে সম্ভাব্য শয়তানকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে

ফেলা গেছে জেনে সহেলিও নিশ্চিন্ত। ম্যাথু টেপ চালিয়ে দিল, বাজছে মলয়ালম গান,তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে সবাই। একমাত্র টুপুরের মনটাই যা একটু খচখচ করছিল। মিতিনমাসির যুক্তিগুলো অকাট্য, তবু সে যেন ঠিক পরিপাক করতে পারছে না। মাটুপেট্টির পাজি লোকটাকে কখন দেখল মিতিনমাসি? সে আর মা যখন মালিশ করাচ্ছিল, সেই সময়েই কি দেখেছে রাস্তায়? লোকটাকে দেখেও ছেড়ে দেবে, এ তো মিতিনমাসির চরিত্রের সঙ্গে মোটেই মেলে না?

যাই হোক, গানে, গল্পে দিব্যি কেটে গেল রাস্তাটা। পথে একবার মাত্র দাঁড়ানো হল পেরিঙ্গলে, তারপর দেড়টার মধ্যে সোজা কোচি। পেরিঙ্গলেই অল্প-অল্প মেঘ ছিল আকাশে, গাড়ি যখন কোচিতে ঢুকল, মেঘবাহিনী সেখানেও হাজির। জলীয় বাষ্পমাখা বাতাস ঝাপটা মারছে মুখে-চোখে। সমুদ্রের মাথায় ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ ঝলক।

সি-লর্ড জেটির সামনে এসে ঝটাপট সারা হল দুপুরের খাওয়াদাওয়া। সুনীলের সঙ্গে মিতিন কথা বলে নিল মোবাইলে। তারপর আড়াইটে নাগাদ সদলবলে দরবার হল গ্রাউন্ড।

পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে ঘন সবুজ মাঠটায় বসেছে টুপুররা। মেঘলা দুপুর, অথচ বৃষ্টি নেই, আবহাওয়া ভারী মনোরম। আজ ছুটির দিন নয়, লোকজনও বড় একটা নেই ময়দানে। দরবার হল সংলগ্ন শিল্প জাদুঘরটিও বন্ধ এখন, খুলবে সেই তিনটের পরে। অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে প্রাণের সুখে ছোটাছুটি শুরু করে দিল বুমবুম।

পার্থ ঘনঘন ঘড়ি দেখছিল। খানিকটা অসহিষ্ণুভাবেই মিতিনকে বলল, "তিনটে তো বাজতে যায়, এখনও সুনীলের দেখা নেই কেন?"

অবনী বললেন, "ব্যস্ত হোয়ো না। সুনীল অত্যন্ত পাংচুয়াল, সে কক্ষনো টাইম ফেল করে না।"

কথাটুকু খসার যা অপেক্ষা, হঠাৎই টুপুর চেঁচিয়ে উঠেছে, "ওই দ্যাখো! ওই দ্যাখো!"

চমকে তাকাল সবাই। গর্জন তুলে একটা মোটরবাইক ঢুকছে গ্রাউন্ডে, আরোহীর কাঁধে অবনীর লাল ব্যাগ! কিন্তু কী আশ্চর্য, আরোহী তো সুনীল নয়!

অবনী উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "কী ব্যাপার? সুনীল অন্য কাউকে পাঠাল নাকি?"

ঠিক তক্ষুনি এক ভয়ংকর কাণ্ড। মোটরবাইকের আরোহী সবে সিট থেকে নেমেছে, অমনিই কোথা থেকে এক সাদা মারুতি তীব্র বেগে প্রবেশ করল চত্বরে, লোকটার সামনে এসে ব্রেক কষল ঘচাং! পলকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে গাট্টাগোট্টা চেহারার একটা লোক, আরোহীর বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ব্যাগটা!

তবে গাড়িতে ফিরতে পারল না। তার আগেই মাঠ ফুঁড়ে উঠে এসেছে জনা চার-পাঁচ লোক। মাঠেই ছড়িয়েছিটিয়ে বসে ছিল তারা, ছুট্টে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছিনতাইকারীর উপর। তাদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত রিভলভার। হাওয়া বেগতিক দেখে সাদা মারুতির চালক বিদ্যুৎবেগে গাড়ি ঘোরাল, কিন্তু গেট অবধি গিয়েই তার যাত্রা শেষ। প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশবাহিনী।

গোটা ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগল বড়জোর কুড়ি সেকেন্ড।

টুপুর থ। চিত্রার্পিত। অবনী ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছেন, সহেলি কাঠ, বুমবুমের চোখ বড়-বড়।

দৌড়ে মারুতির সামনে গেল মিতিন। চালকের জানলায় গিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "ইওর গেম ইজ ওভার মিস্টার পি কে জি

কুরুপ। অ্যালিয়াস মিস্টার সেলভান। অ্যালিয়াস শ্রীমান মুখুস্বামী। কিম্বা মিস্টার আয়াপ্পান। ... হায় রে, এত চালাকি করেও সামান্য একটা টোপে আপনি ধরা পড়ে গেলেন? পিরমেডে আজ ক'টা অবধি ওয়েট করেছিলেন? আমাদের আটকানোর জন্যে? আটটা? ন'টা? দশটা?"

টুপুর আর পার্থও ছুটে এসেছিল। টুপুর দেখল ক্রোধে গনগন করছেন মিস্টার কুরুপ। ভদ্র সভ্য মানুষের মুখোশ-পরা কুরুপের চোখমুখ কী ভীষণ হিংস্র এখন!

পার্থ বলল, "কাল রাতে আমাদের ঘাড় ভেঙে প্রচুর খেয়েছ, এখন জেলে বসে লপ্‌সি খাও।"

"শুধু লপ্‌সি কেন, গলায় ফাঁসির দড়িও পরতে হতে পারে। সঙ্গে বিক্রমনের খুনটা আছে না?"

গেটের বাইরে একটা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে নেমে এসেছেন সতীশ মেনন স্বয়ং। সঙ্গে সুনীল নালিয়াথ।

সতীশ হাত বাড়িয়ে দিলেন মিতিনের দিকে, "থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আপনার জন্যই এরকম এক কুখ্যাত ক্রিমিনাল আজ ধরা পড়ল।"

মিতিন হেসে বলল, "আমি তো নিমিত্ত মাত্র। ওদের ধরিয়ে দিল তো আমার জামাইবাবুর লাল ব্যাগ। এনিওয়ে, গ্রেট স্ক্রলটা ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছেন তো?"

"বিলক্ষণ। ছাতা সমেত।"

"কুরুপ সাহেবের দোসরটির রিভলভারখানাও যত্ন করে রাখবেন কিন্তু। ব্যালিস্টিক রিপোর্টে সম্ভবত প্রমাণ হবে, ওই রিভলভারের গুলিতেই মারা গেছে সিনাগগের কর্মচারীটি।"

"নিশ্চয়ই রাখব। পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।"

মাঠে ঘাপটি মেরে বসে থাকা প্লেন ড্রেসের পুলিশরাই হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে তুলছে কুরুপ আর তার সঙ্গীকে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সাঙাতটিকে ভাল করে দেখল টুপুর। মুখ-ভর্তি বসন্তের দাগ!

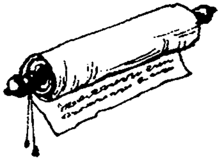

সন্ধে নেমেছে মাট্টানচেরিতে। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির। জু টাউনের রাস্তা জলে-কাদায় মাখামাখি। তারই মধ্যে জোস হ্যালেগুয়ার ঘর আজ উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়ে। টুপুররা ছাড়াও আছে সুনীল, আছেন সতীশ মেনন। মাট্টানচেরি থানা থেকে এসে গেছেন পি ভি জর্জও। বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী ইহুদি পরিবারও উজ্জ্বল মুখে জমা হয়েছে দরজায়। আর এমন একটা দিনে সাইমন পেরেজও যে উপস্থিত থাকবেন এ তো বলাই বাহুল্য।

গ্রেট স্ক্রল ফিরে গেছে সিনাগগের দেওয়ালসিন্দুকে। বিশেষভাবে তৈরি একটি ছাতার বাঁটের গোপন ফাঁকে গোল করে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল গ্রেট স্ক্রল। নেহাতই মামুলি চেহারার কালো ছাতা, তবে ডাঁটির নির্দিষ্ট স্থানে চাপ দিলে লম্বা রডটি খুলে যায়। তখন ওই ফাঁপা রডে ক্যালেন্ডারের মতো কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়।

জোস হ্যালেগুয়া ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলেন অভিনব ছাতাটিকে। সতীশ মেননকে ছাতা ফেরত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু ম্যাডাম, অনুমান করলেন কী করে এমন একটি ছাতার মধ্যে আমাদের পবিত্র পেন্টাটিউক রক্ষিত আছে?"

স্মিত মুখে মিতিন বলল, "সত্যি বলতে কী, আমিও আন্দাজ করতে পারিনি। মিস্টার মেনন যখন এখান থেকে জানালেন ব্যাগে দুটো ছাতা আছে, তখনই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কারণ ব্যাগে দ্বিতীয় ছাতাটি তো থাকার কথা নয়। তবে হ্যাঁ,

পবিত্র লিপিটিকে যে আমাদের ব্যাগেই চালান করা হয়েছিল, এটা আমি কয়েকটা ঘটনা অনুধাবন করে নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম।”

“কী রকম?”

“অনেকগুলো সুতো পরপর জোড়া দিয়ে। যেমন, চুরির দিন রাত্তিরেই আমার সন্দেহ হয় একটা অটোরিকশা হোটেল অবধি আমাদের ধাওয়া করেছে। আপাতভাবে কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও। পরদিন মুন্নারের পথ থেকে হোটেলে ফোন করার সময়ে খবর পেলাম ভোরবেলা আমরা বেরনোর পর-পরই কেউ একজন আমাদের খুঁজতে এসেছিল। কোচিতে সুনীল ছাড়া আর কে-ই বা আমাদের খোঁজ করতে পারে? কেনই বা করবে? মিস্টার মেনন কোনও কারণে এসেছিলেন কী? তা হলে তো তিনি পরিচয় দিতেন। আর দু'জন সদ্যপরিচিত, মিস্টার হ্যালেগুয়া এবং মিস্টার পেরেজেরও তো জানার কথা নয় আমরা কোন হোটেলে উঠেছিলাম! এর পর মুন্নার পৌঁছে সুনীলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মারাত্মক সংবাদটি পেলাম। চুরির রাতেই রেবতী ইন্টারন্যাশনালের কাছাকাছি একটি অটোরিকশায় নাকি খুন হয়েছে সিনাগগের কর্মচারীটি। তখনই আমার মনে কেমন খটকা জাগল। তা হলে কি আমাদের ফলো করার সন্দেহটা অমূলক নয়? কিন্তু তখনও বুঝতে পারছি না কেন ফলো করবে! এর পর দু'বার আমাদের উপর অ্যাটেমপ্ট হল। প্রথমবার মুন্নার ক্লাবে। দ্বিতীয়বার মাট্টুপেট্টি ড্যামে। দু'বারই আক্রমণকারীর টার্গেট লাল ব্যাগ। প্রথমবার চোর আঁকশি দিয়ে লাল ব্যাগটাই টেনেছিল। আর মাট্টুপেট্টিতে একটা লোক গাড়ি ভাড়া করে এসে, স্পিডবোটকে পাঁচশো টাকা দিয়ে, ভরদুপুরে একটা প্রায় ফাঁকা লাল ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল! লোকটা আমার হাজব্যান্ডের ক্যামেরাটা স্বচ্ছন্দে টানতে পারত, কিন্তু নেয়নি। তার মানে, হয় সে ভুল করে ছিনতাই করেছে, নয়তো

সে লাল ব্যাগটাকেই চেয়েছিল। উইথ দ্য এক্সপেক্টেশান লাল ব্যাগে অনেক মূল্যবান একটা কিছু আছে। এবং লোকটা মোটেই সাধারণ ছিনতাইবাজ নয়, তা হলে সে গাড়ি ভাড়া করে আসত না। হ্যাঁ, গাড়িটা যে ভাড়ার তা আমি একঝলক নেমপ্লেট দেখেই বুঝে গেছি। তখনই আমি ভাবতে শুরু করলাম মূল্যবান জিনিসটি কী হতে পারে? মনে পড়ে গেল সিনাগগে দ্বিতীয়বার ঢোকার সময়ে জামাইবাবুর লাল ব্যাগখানা টিকিট কাউন্টারের ছেলেটির সামনেই রাখা ছিল। এবং আমার হাজব্যান্ডের ব্যাগটি আর জামাইবাবুর ওই ব্যাগ হুবহু এক। এর পর তো দুয়ে-দুয়ে চার করা এমন কিছু কঠিন নয়।"

টুপুর বলে উঠল, "তার মানে তুমি বলতে চাও মিস্টার কুরুপ আর তার চ্যালা পার্থমেসোর ব্যাগটাকে বাবার ব্যাগ ভেবেই বারবার হাতানোর চেষ্টা করছিল?"

"অবশ্যই। ওরা তো কেউই কখনও দুটো ব্যাগ এক সঙ্গে দেখেনি। এমনকী সিনাগগের ছেলেটাও না। ওরা জানবে কী করে, তোর বাবা ব্যাগ হোটেলে ফেলে এসে ওদের জন্য একটা বিদঘুটে হেঁয়ালি তৈরি করে দিয়েছে?"

সতীশ মেনন তারিফের সুরে বললেন, "যাই বলুন ম্যাডাম, কুরুপের মতো ক্রিমিনালকে আইডেনটিফাই করাটা কিন্তু একটা মারভেলাস কাজ।"

"মোটেই না। কুরুপমশাই এত ভুল করেছেন, তাঁকে না ধরতে পারাটাই চরম বোকামি হত। শুনবেন তাঁর গলতিগুলো? ভালমানুষ সেজে যেচে আলাপ করার সময়ে নিজের পরিচয় দিলেন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার বলে। জানালেন তিনি নাকি জঙ্গলে-জঙ্গলে ছবি তুলে বেড়াচ্ছেন। অথচ তাঁর পায়ে সব সময়ে শৌখিন জুতো, যা মোটেই বনেবাদাড়ে ঘোরার উপযুক্ত নয়। হতে পারে তাঁর

জঙ্গলের জুতো আর লোকালয়ের জুতো আলাদা, কিন্তু পর পর আরও কয়েকটা গণ্ডগোল যে করে ফেললেন তিনি। মুন্নারে কফির টেবিলে বাঘের ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে যে ভুল মন্তব্য করলেন, তাতেই বোঝা যায় বন্যপ্রাণী সম্পর্কে তাঁর কত জ্ঞান! এর সঙ্গে আবার রাজস্থানে কস্তুরীমৃগ? উফ, হরিবল। এর পর লাঠির ডগায় আঁকশি লাগিয়ে মুন্নার ক্লাবে ব্যাগ চুরি করতে পাঠালেন, অথচ খেয়ালই করলেন না, লাঠির গায়ে হোটেল ক্রিস্টাল প্যালেসের চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে! লাঠিটি নেহাতই হোটেল ক্রিস্টাল প্যালেসের খাটের একটি ছত্রী। পেরিয়ারে তিনি গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গ দিতে রাজি হলেন, তাঁর গাড়িতে পেরিয়ার লেকে যাওয়ার সময়ে স্পষ্ট টের পেয়ে গেলাম তিনি আদৌ ইদুক্কির জঙ্গলে যাননি।"

টুপুর ফের জিজ্ঞেস করে বসল, "কী করে বুঝলে?"

"মুন্নারে লোকটা তোকে আর আমাকে গাড়িতে লিফ্ট দিয়েছিল, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু

"এই জন্যই তো বলি চোখ-কান খোলা রাখ। মুন্নারেই আমি গাড়ির কিলোমিটারটা দেখে নিয়েছিলাম। এমনিই দেখেছিলাম। চোখে পড়ে গিয়েছিল। মুন্নার টু পেরিয়ার একশো ছ' কিলোমিটার মতো রাস্তা। ভায়া ইদুক্কি হলে অন্তত তিরিশ কিলোমিটার বেশি। অথচ পেরিয়ারে দেখলাম কুরুপের গাড়ি চলেছে মাত্র একশো ষোলো কিলোমিটার। এর থেকে কী বোঝা যায়, অ্যাঁ? এত প্রমাণ পাওয়ার পরও লোকটাকে সন্দেহ হবে না? আর পেরিয়ারে ওর গাড়িতে বসে সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণটাও তো আমার মুঠোয় এসে গেল। দাবার ঘুঁটি। যে দাবার সেটটা তোর মেসোর লাল ব্যাগে ছিল তার একটা কালো পন। পেলাম কুরুপের ড্রাইভিং সিটের ঠিক নীচে। সাঙাত ছিনতাই করে আনার পর ব্যাগ হাতড়ে আসল

জিনিসটি না পেয়ে পথেই ব্যাগটিকে পরিত্যাগ করেছিল কুরুপ, কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটির সময়ে ওই বোড়েটি পড়ে যায় গাড়ির ভিতর। গাড়ির ফ্লোর ম্যাটটাও কালো, বোড়েটাও কালো, তাই বেচারার নজরে পড়েনি। ব্যস, তখনই আমার আর বুঝতে বাকি রইল না মাটুপেট্টির ঘটনায় নাটের গুরুটি কে! পেরিয়ারের রেস্টুরেন্টে খবরের কাগজের রিপোর্টটা আরও বেশি নিঃসংশয় করে দিল। কুরুপ যে একজন ভাল গাইড ছিল, সেই পরিচয়ও তো আমরা পদে-পদেই পেয়েছি। পাইনি?"

সতীশ মেনন বললেন, "আপনার ফোন পাওয়ার পর থেকে আমি কিন্তু খুব চিন্তায় ছিলাম ম্যাডাম। যদিও কুমিলি থানায় ইন্টিমেশান পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, তবু লোকটা যা খতরনাক   ভয় ছিল পথে না অ্যাক্সিডেন্ট-ফ্যাক্সিডেন্ট কিছু ঘটিয়ে দেয়।"

"দুশ্চিন্তা আমারও ছিল মিস্টার মেনন।" মিতিন মাথা দোলাল, "লোকটাকে চার এগিয়ে দিয়ে আমিও স্বস্তিতে থাকতে পারিনি। বিশেষ করে লোকটা যখন আমাদের পিরমেডে থামার কথা বলল, তখন আরও বেশি সাবধান হয়ে গেলাম।"

জর্জ গোঁফে মোচড় দিতে-দিতে এতক্ষণ শুনছিলেন সব। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমি তো আগেই বুঝে গিয়েছিলাম চুরিটা কোনও পাকা মাথার কাজ। এখান থেকে যে অটোটা ছিনতাই হয়েছিল, তার ড্রাইভারকে আমি কষে জেরা করেছিলাম। তার বর্ণনা মতোই তো আর্টিস্ট ছবি আঁকল। মেনন সাহেবও বুঝে গেলেন তিন শয়তানের মধ্যে অন্যতমটি হল টি জোসেফ। দ্য নটোরিয়াস অ্যান্টিক স্মাগলার।"

সতীশ বললেন, "ঠিক কথা। আমরা ওকেই খুঁজছিলাম। কিন্তু যাই বলুন, জোসেফ কাম কুরুপকে পাকড়াও করার কৃতিত্বটা কিন্তু পুরোপুরি ম্যাডামেরই।"

জোস হ্যালেগুয়া বললেন, "অবশ্যই। মাট্টানচেরির ইহুদিরা চিরকাল ম্যাডামের কথা স্মরণে রাখবে।"

সাইমন পেরেজ বললেন, "আমার শুধু খারাপ লাগছে বিক্রমনের জন্যে। লোভে পড়ে কী যে করে ফেলল! বেঘোরে প্রাণ গেল ছেলেটার।"

"হুম। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি এখনও ক্লিয়ার হতে পারলাম না সাইমন।" জোস দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন, "শনিবার চুরি করেও কেন গ্রেট স্ক্রল পাক্কা একটি দিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল বিক্রমন? কেন আগেই পাচার করেনি?"

"আপনার ধারণাটা সঠিক নয় মিস্টার হ্যালেগুয়া। চুরিটা শনিবার হয়নি।"

মিতিনের কথায় থতমত খেলেন জোস হ্যালেগুয়া, "তবে?"

"চুরি রবিবারই হয়েছে। আমরা সন্ধেবেলা সিনাগগে ঢোকার জাস্ট আগে। সিনাগগে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার পরে-পরেই সিকিউরিটি গার্ডদের কাজে সামান্য হলেও ঢিলেমি আসে। সেই সুযোগটাই ব্যবহার করেছিল বিক্রমন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আমরা এসে পড়ায়, এবং চুরিটাও আবিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে। যতই হোক পেশাদার অপরাধী তো নয়, তাই ঘাবড়ে গিয়ে ছাতাখানা তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দেয় আমাদের ব্যাগে।"

সাইমন বললেন, "ছাতাখানা হাতে নিয়ে পুলিশের সামনে এলেও তো কেউ বুঝতে পারত না তার ভিতরে কী আছে।"

মিতিন বলল, "সাহস পায়নি। লোভে পড়ে পাপ কাজ করে ফেলেছিল তো।"

জোস বললেন, "জিহ্‌ভা কখনওই অধর্ম বরদাস্ত করেন না। আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সে যে পাপ করেছে তার শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে।"

মিসেস জোস বললেন, "পেন্টাটিউক নিজেই নিজেকে রক্ষা করেছে।"

আরও কয়েকটা খুচখাচ কথার পর সতীশ উঠে দাঁড়িয়েছেন। মিতিনকে বললেন, "এবার যাবেন তো ম্যাডাম?"

"ও সিওর।" মিতিনের চোখ ঘড়িতে, "আটটা বাজে, এবার তো হোটেলের সন্ধানে যেতে হয়।"

অবনী বললেন,"খোঁজাখুঁজির কী দরকার, রেবতী ইন্টারন্যাশনালই তো আছে। কী বলো, সুনীল?"

সুনীলের বাসনা স্যারসমেত টুপুররা আজ তার বাড়িতেই থাকুক। মিতিনের কেরামতিতে সে অভিভূত, খোদ ডিটেকটিভের মুখ থেকে সে আরও তদন্তের গল্প শুনতে চায়। অবনী তাকে কোনও মতে ক্ষান্ত করলেন। সুনীলদের ছোট বাড়িতে এতজন মিলে হামলা করার কোনও মানে হয়?

জু টাউনের গলিতেই গাড়ি রেখেছিল ম্যাথু। জোস হ্যালেগুয়া, সাইমন পেরেজসহ উপস্থিত ইহুদিরা এলেন কোয়ালিস পর্যন্ত। মিতিনকে বিদায় জানাতে। ভারী কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে অনুরোধ করলেন আবার মাট্টানচেরিতে আসার জন্যে।

সতীশ মেননের জিপের পিছু-পিছু রওনা দিল ম্যাথু। মশলাপট্টি পেরিয়ে এসে পার্থ বলে উঠল, "একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? জোস হ্যালেগুয়া কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি একজন সাচ্চা ইহুদি।"

"কীভাবে?"

"দু'-দু'বার ওঁর বাড়িতে এলাম, একবারও চা পর্যন্ত খাওয়ালেন না। কী কিপ্টে, বাপস্। অন্তত এবার তো রাবিমশাই আমাদের একটু আপ্যায়ন করতে পারতেন।"

পার্থর বলার ঢঙে হো-হো হাসির ফোয়ারা উঠল। হাসতে-

দু' নম্বর, বিনি পয়সায় বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেলে নাচতে-নাচতে রাজি হতে নেই। কে যে কীভাবে গাড্ডায় ফেলে দেবে, টেরও পাওয়া যাবে না। তিন নম্বর, অজানা অচেনা কোম্পানির চিঠি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা উচিত। চার নম্বর, যারা শুধু ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে, তারা লোক মোটেই সুবিধের নয়।"

টুপুর হিহি হেসে উঠল, "তুমি তো বেশ লম্বা তালিকা বানিয়ে ফেলেছ!"

"এ তো গেল শিক্ষার ফর্দ। এর পর যদি কৌতূহলের লিস্টটা পেশ করি, তোর মাসি আঁতকে উঠবে।"

"কেন?"

"দুপুরে অপরাধীকে ধরার পর যা সুচারু যুক্তিজাল বিস্তার করে দিল, তারপর আর কি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবে?"

মিতিন হেসে ফেলল, "আহা, শোনাই যাক।"

"হয়তো খুবই বোকার মতো প্রশ্ন ...তবু," পার্থ টেরিয়ে তাকাল, "নারায়ণ আর শঙ্করন যে একই লোক, তুমি বুঝলে কী করে?"

"শাস্ত্রে পড়োনি, সব দেবতাই তো এক। যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু। যিনি নারায়ণ, তিনিই দেবাদিদেব শঙ্কর।"

"মগজে সেঁধোল না। মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাংলা করে বলবে কি?"

"ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে ভাড়া করা গাড়ি কি কেউ নিজে চালায়?"

"দ্যাখো কাণ্ড। এই সরল ব্যাপারটা মাথায় আসেনি!"

"আর কী জিজ্ঞাস্য আছে?"

"অরিজিনাল চিঠিখানা তুমি ঠিক কখন খুঁজে পেয়েছিলে?"

"এই জবাবটা দেওয়া যাবে না।"

"অর্থাৎ সিঙ্গাপুর রওনা হওয়ার আগেই অরিজিনালটা আমার

9 788177 564686

কিশোর কাহিনী সিরিজ

সর্প-রহস্য সুন্দরবনে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

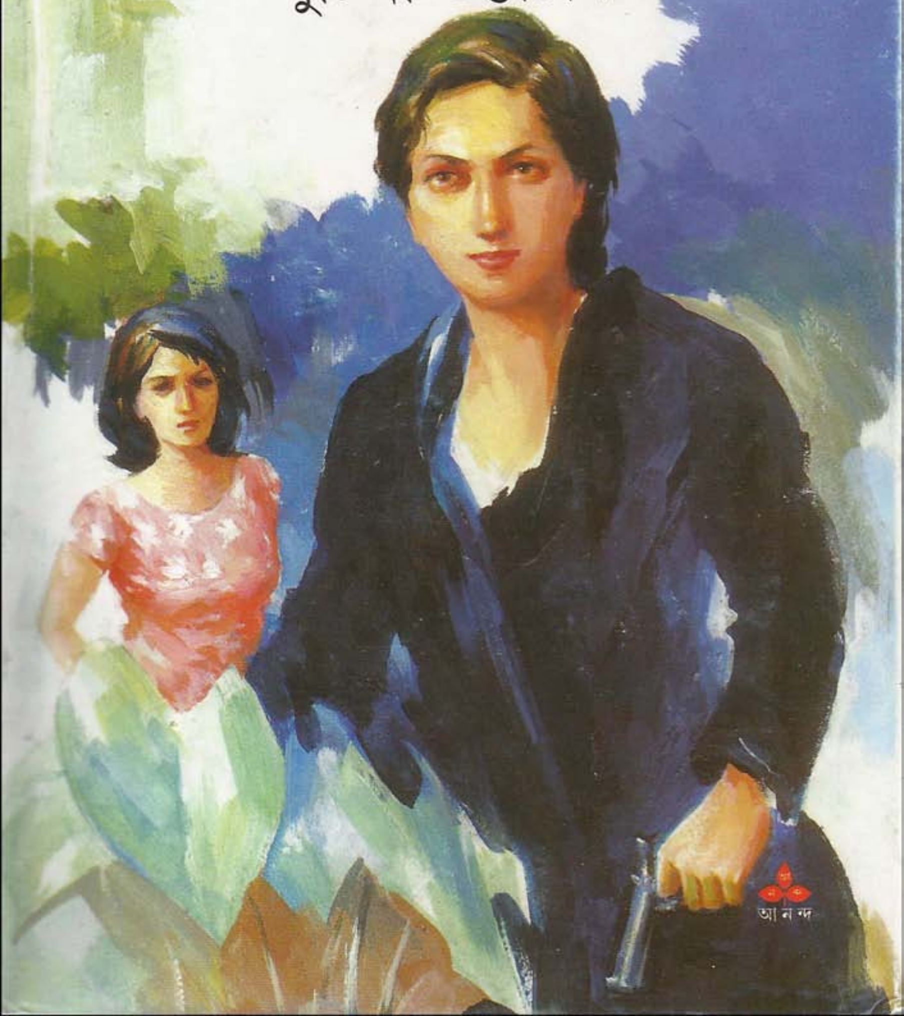

সর্প-রহস্য সুন্দরবনে

সর্প-রহস্য সুন্দরবনে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

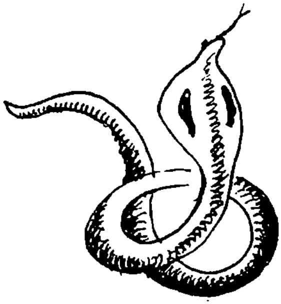

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

টুটান-জয়ন্তীর ছোট্ট মেয়ে

শরণ্যাকে—

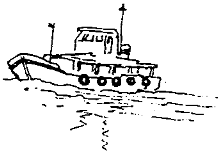

"বুঝলি টুপুর, মানুষ নামের জীবটা এক্কেবারে ট্যাড়স," সোফায় বসে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে পার্থ আলগা মন্তব্য ছুড়ে দিল, "আমাদের এই গ্রহে মানুষের চেয়ে অপদার্থ জীব আর দু'টি মিলবে না!"

টুপুর ফোঁস করে উঠল, "ইস, বললেই হল! মানুষই জগতের সেরা প্রাণী।"

"কচু। মানুষ কী পারে? চিতাবাঘ বা হরিণের মতো দৌড়োনোর ক্ষমতা আছে মানুষের? নিদেনপক্ষে ঘোড়ার সঙ্গেও কি পাল্লা দিতে পারে? কুকুরের মতো ঘ্রাণশক্তি আছে? বাজপাখির মতো চোখ? বা সাইবেরিয়ান হাঁসদের মতো স্মৃতিশক্তি? কম সে-কম ছ'-সাত হাজার মাইল পথ কেমন নিখুঁতভাবে চিনে চিনে ওরা আকাশপথে পাড়ি জমায় ভাব! ঠিক একই জলায় এসে নামে। মানুষ তো দিকই ঠিক রাখতে পারবে না। বাঘ, সিংহ, হাতিদের মতো গায়ে জোর নেই, মাছদের মতো সাঁতার কাটতে পারে না, বিড়ালটিড়ালদের মতো অন্ধকারে দেখতে পায় না ...। পিঁপড়ে যে পিঁপড়ে, ওইটুকু একটা প্রাণী, তারও কিছু স্পেশাল ক্ষমতা আছে। বৃষ্টির গন্ধ টের পায়, ভূমিকম্প আসছে কিনা আগাম বুঝে ফ্যালে। আর মানুষ? সে সব ব্যাপারেই ক্যালাস। এই যে এত বড় একটা সুনামি হয়ে গেল, মানুষ আগে থেকে কিচ্ছুটি টের পেয়েছে?"

"সুনামির ব্যাপারটা কিন্তু পুরো ঠিক বললে না পার্থমেসো। আন্দামানের অনেক আদিবাসীই কিন্তু ভয়ংকর কিছু ঘটবে আন্দাজ করে পাহাড়টাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়েছিল।"

"সে তো সমুদ্র দূরে সরে যাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে। তাদের পূর্বপুরুষরা বলত, সমুদ্র উলটো দিকে ছুটলেই তোরা চোঁ-চাঁ পালাবি। সেটা মনে রেখেই তারা দৌড় লাগিয়েছে। নিজেদের কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে কি তারা সুনামির পূর্বাভাস পেয়েছিল?" পার্থ আয়েশ করে হেলান দিল সোফায়। বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, "মানুষের হয়ে তর্ক করিস না টুপুর। গোরুও ইচ্ছেমতো কান নাড়াতে পারে, মানুষের সেটুকু মুরোদও নেই। মানুষ একটা যাচ্ছেতাই রকমের দুর্বল ক্রিচার।

টুপুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ মেরে গেল। কাঁহাতক আর লড়বে পার্থমেসোর সঙ্গে! গত সোমবার থেকে টুপুরের স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে, পরশু বিকেলে তল্পিতল্পা গুছিয়ে টুপুর চলে এসেছে মিতিনমাসির বাড়ি। আর এ বাড়িতে পা রাখা ইস্তক অবিরাম গুণপনা শুনছে নানা জীবজন্তুর, পার্থমেসোর মুখে। কোত্থেকে একখানা ইয়া ঢাউস অ্যানিম্যাল কিংডমের বই জোগাড় করেছে মেসো, সকাল-সন্ধে সেই বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে, সঙ্গে চলেছে লম্বা লম্বা লেকচার। কাল রাতে কুমিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। কুমির কেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে মড়ার মতো পড়ে থাকে, তারপর একগাদা পোকামাকড় মুখের ভিতর জমা হলে কেমন ঝুপ করে চোয়ালটা নামিয়ে দেয় ...। মানুষের নিন্দে অবশ্য আজই সকালে শুরু হয়েছে, কতক্ষণ চলবে কে জানে!

দু'হাতে দু'খানা জলখাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকেছে মিতিন। থালায় নারকোলের চাটনি আর সম্বর সহযোগে মশলা ধোসা। গত পুজোয় কেরল বেড়িয়ে ফেরার পর থেকে এ-বাড়িতে দক্ষিণী আহার চলছে খুব। মিক্সিতে চাল-ডাল বেটে প্রায়ই ইডলি বানানো হচ্ছে, সুজি দিয়ে উপমা, বাজার থেকে রেডিমেড ঘোল কিনে এনে ধোসা। একমাত্র ইডলিতেই যা একটু নাক সিঁটকোয় পার্থ, তবে

খেয়েও নেয়। আর ধোসা-উপমা-উত্থাপম হলে তো কথাই নেই, লুচির মতো উড়ে যায় ঝটপট।

প্লেট দুটো সেন্টার টেবিলে নামাতে নামাতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তোর মেসো এত হাউহাউ করছিল কেন রে টুপুর?"

"চেঁচাইনি তো।" পার্থ প্লেট টেনে নিল, "মানুষ যে অন্য প্রাণীর তুলনায় কত ইনফিরিয়র, সেটাই টুপুরকে ব্যাখ্যা করছিলাম।"

"কী রকম? আমিও একটু শুনি।"

"এই ধরো হাত-পা, চোখ-নাক-কান অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মানুষ তো অ্যানিম্যালদের মতো করে ব্যবহার করতে পারে না ..."

"রং। পারে না নয়, করে না। প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাদের একটি অঙ্গই বাকি সব অঙ্গের ঘাটতি পুষিয়ে দেয়।" মিতিন মাথায় আঙুল ঠুকল, "মগজ, মগজ। মগজ বলে বস্তুটি যে মানুষের সকলের চেয়ে স্ট্রং, এ কথাটা কি ভুলে গিয়েছ?"

"বোকো না। হাতির মাথায় মানুষের চেয়ে ঢের বেশি ঘিলু থাকে।" পার্থ সুড়ুৎ করে সম্বরে একটুখানি চুমুক মেরে নিল, "একটা বড়সড় হাতির মগজের ওজন জানো? ছ'কেজি। মানুষের সেখানে বড় জোর দেড় কিংবা পৌনে দুই।"

"ওভাবে হিসেব হয় না স্যার। দু'জনের শরীরের ওজনের অনুপাতটা ধরো। মানুষের ক্ষেত্রে বডি আর ঘিলু পঞ্চাশ ইজ় টু এক। অর্থাৎ পঞ্চাশ কেজি মানুষের ঘিলু এক কেজি। আর হাতির বেলায় অনুপাতটা হাজারে এক। তিমি মাছের দশ হাজারে এক। শিম্পাঞ্জির দেড়শোয় এক। গোরিলার পাঁচশোয় এক। তুলনামূলকভাবে কার ঘিলুটা বেশি হল?"

"ঘিলুই কি সব? তোমার কথা মানতে গেলে তো বলতে হয়, মোটা মানুষের বুদ্ধি বেশি, রোগা মানুষের বুদ্ধি কম!"

"তা কেন? প্রোপোরশন তো দু'জনেরই মোটামুটি সমান।

আসলে কে কীভাবে ব্রেনটা ইউজ় করবে, তার উপরই নির্ভর করে কে বোকা আর কে চালাক।”

মিতিন বসে পড়েছে সোফায়। ভারতী আর-একখানা খাবারের প্লেট ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার হাতে। ধোসা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘুরে তাকাল টুপুরের দিকে, “জানিস তো, জীবজগতে একটা প্রাণী আছে, বুদ্ধিতে যে প্রায় মানুষের সমান-সমান।”

“কে?” পার্থ ফুট কাটল, “বাঁদর?”

“আজ্ঞে না। ডলফিন। একটা মানুষের সমান ওজনের কোনও ডলফিনের মস্তিষ্কের গ্রে-ম্যাটার মানুষের চেয়ে কম নয়। বরং সামান্য বেশিই। স্রেফ জলে থাকার অপরাধে বেচারারা আগুনের ব্যবহার শিখল না। ফলে মস্তিষ্কটাও মানুষের মতো কাজে লাগল না। ওরা যদি ডাঙায় বাস করত, তা হলে হয়তো ওরাই আজ রাজত্ব করত দুনিয়ায়। আর আমরা হতাম ডলফিনের আজ্ঞাবহ দাস। মানে ওদের পোষা জীব আর কী।”

টুপুর বলতে যাচ্ছিল, সে ভারী কিম্ভূত ব্যাপার হত তো তা হলে! তার আগেই টেলিফোনের ঝনঝন। পার্থ হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরতে গিয়েও থেমে গেল হঠাৎ। তেরচা চোখে বলল, “অ্যাই টুপুর, দ্যাখ তো কে! যদি আমায় খোঁজে, বলে দিবি মেসো এখনও বাজারে।”

“কেন?” মিতিনের চাউনি বক্র হল, “কাউকে মাল ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল বুঝি?”

“আর বোলো না, তিনটে পাগল লিট্‌ল ম্যাগাজিন বের করছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা। আমায় ম্যাটার দিল পঁচিশে বৈশাখের পর। অথচ এখন চার বেলা করে আমার প্রেসে এসে তাড়া লাগাচ্ছে। ওদের তাগাদার ভয়ে আমি কাল দুপুর থেকে আর প্রেসই মাড়াইনি। সম্ভবত ওরাই এখন ...”

"ছি ছি, এভাবে পার্টিকে ঝোলাচ্ছ?"

"আমি কী করব? আমাকেও যে ডিটিপি-র লোকটা ঝুলিয়ে রেখেছে। কম্পোজ় করা ম্যাটার পেলে আমার আর ছাপতে কতক্ষণ। প্লেট বানাব আর মেশিনে চড়াব।"

"সব তোমার অজুহাত। তুমি মহা কুঁড়ে।"

মাসি-মেসোর বাদানুবাদের মাঝেই রিসিভার উঠিয়েছে টুপুর, "হ্যালো? কে বলছেন?"

ওপারে গমগমে কণ্ঠস্বর, "ম্যাডাম ... আই মিন মিতিন ... আই মিন প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় আছেন কি?"

টুপুরের মুখ হাসিতে ভরে গেল, "আপনি নিশ্চয়ই অনিশ্চয় আঙ্কল?"

"তুমি টুপুর? ... তাই বলি, ম্যাডামের গলা তো এত সরু সরু নয়! ... কেমন আছ? কবে এলে মাসির বাড়ি? গরমের ছুটি পড়ে গেল? এবারও কি ভেকেশনটা মাসির বাড়িই কাটাচ্ছ? নাকি বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানট্যান হচ্ছে?"

জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে পরের-পর প্রশ্ন হেনে চলেছেন অনিশ্চয়। উত্তর দেওয়ার আগেই পিছলে যাচ্ছে কোশ্চেন।

টুপুর ঢোক গিলে কোনওমতে বলল, "দেখি। ঠিক নেই কিছু।"

"তোমার মাসি কোথায়? কী করছেন?"

ধোসা খাচ্ছে, বলতে গিয়েও সামলে নিল টুপুর।

অনিশ্চয় অবশ্য থেমে নেই। পরের প্রশ্ন জুড়েছেন,"মাসিকে জিজ্ঞেস করো তো, উনি আজ হোল ডে ফ্রি আছেন কিনা?"

হাততিনেক দূরে বসেও অনিশ্চয়ের বাজখাঁই গলা কানে গিয়েছে মিতিনের। ইশারায় বলল, আছি।

উত্তর পেয়েই অনিশ্চয়ের ঘোষণা, "মাসিকে ইনফর্ম করে দাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি। দরকার আছে।"

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে টুপুর নামিয়ে রাখল ফোনটা। কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে, অনিশ্চয় মজুমদারের মতো উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার স্বয়ং ছুটে আসছেন মিতিনমাসির কাছে? গোয়েন্দা হিসেবে মিতিনমাসির খ্যাতি অবশ্য এখন কম নয়। এই তো গত মাসে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির এক বড়সড় প্রতারণাচক্রকে পাকড়াও করেছে মিতিনমাসি। ভুয়ো ক্লেম দেখিয়ে বিমাসংস্থার লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করত দলটা। সরষের মধ্যে ভূত, অফিসের কিছু কর্মচারীও তাদের সঙ্গে জড়িত ছিল। একজন ডিভিশনাল ম্যানেজারও। খবরের কাগজে ফলাও করে বেরিয়েছিল সংবাদটা। সঙ্গে মিতিনমাসির নামও। পড়াশোনার চাপে সবসময় মিতিনমাসির শাগরেদি করা টুপুরের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে এই ছুটির সময় একটা কেস এসে গেলে ভালই হয়। অন্তত ছুটিটায় একটা রোমাঞ্চ তো থাকে। কিন্তু পুলিশের হোমরাচোমরারা কি প্রাইভেট ডিটেকটিভের হেল্প নেবেন? মনে হয়, অনিশ্চয় মজুমদার অন্য কোনও কাজে আসছেন।

মিতিনের আহার শেষ। চোখ সরু করে দেখছিল টুপুরকে। হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছিস?"

টুপুর সংবিতে ফিরল, "কিছু না তো।"

"অলস চিন্তায় সময় নষ্ট করিস না। কাজের কাজ কর। যা, চটপট গিয়ে আগে স্নানটা সেরে আয়।"

"এই সাতসকালে স্নান? সবে সওয়া ন'টা বাজে!"

"আমাদের বেরোতে হবে টুপুর।"

"সে কী? অনিশ্চয়বাবু যে আসবেন ...?"

"অনিশ্চয়বাবুর সঙ্গেই বেরোব।" বলেই মিতিনের নজর পার্থর দিকে, "আশা করি, তুমিও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"কোথায়?" পার্থর চোখ বড়বড়।

"সেটা অনিশ্চয়বাবু এলেই জানা যাবে।"

"উনি কি কোথাও যাওয়ার কথা বললেন?"

"মগজ খেলালে এটুকু আন্দাজ করে নেওয়াই যায়। যখন জিজ্ঞেস করেছেন সারাদিন ফ্রি আছি কিনা, তখন তো তার একটাই অর্থ। ওঁর সঙ্গে কোথাও বেরোতে হবে। নিশ্চয়ই একটা ওয়ার্কিং ডে-তে উনি এখানে আড্ডা মারতে আসছেন না!"

"হুম, তা বটে।"

"এবং জায়গাটাও সম্ভবত খুব কাছেপিঠে নয়। নইলে হোল ডে'র কথা বলতেন না।" মিতিন মিটিমিটি হাসছে। চোখ টিপে টুপুরকে বলল, "কী গো ঐন্দ্রিলাদেবী, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ছেলেগুলোর হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার এমন একটা সুযোগ তোমার মেসো কি ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়?"

"বেড়ে বলেছ তো।" পার্থ গাল ছড়িয়ে হাসল, "অন্তত একটা দিন তো রক্ষে পাওয়া যাবে। অবশ্য যদি তোমার অনুমানগুলো অভ্রান্ত হয়।"

"বললাম যে, ব্রেনটাকে খেলাও। যত মস্তিষ্কের এক্সারসাইজ করবে, গ্রে-ম্যাটার তত পরিপুষ্ট হবে।"

"তাও ভাগ্যি বলোনি যে, পরিমাণে বাড়বে," পার্থ টিপ্পনি কাটল।

"উপহাস কোরো না। বাড়তেও পারে। তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, আদিম মানুষের তুলনায় এখন আমাদের মগজ যথেষ্ট ওজনদার। প্রাচীন মানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকার রোডেশিয়ায়। এখন যে দেশটার নাম জ়িম্বাবোয়ে। প্রায় লক্ষ বছর আগেকার মানুষ। তার মগজের ওজন কত ছিল জানো?"

পার্থ ঠোঁট ওলটাল, "জানি। সওয়া কেজি।"

"প্রায় ঠিক বলেছ। টু বি এগ্‌জ্যাক্ট, তেরোশো গ্রাম। অর্থাৎ এখনকার মানুষের ব্রেনের চেয়ে না হোক আড়াইশো-তিনশো গ্রাম

কম। এই তফাতটা কিন্তু ঘটেছে মগজ নিয়ে কসরত করার কারণেই। ভবিষ্যতে এই ওজন যে দু'কিলোতে পৌঁছোবে না, এ-কথা হলফ করে বলা যায় কি?"

"বাপ্স, কী কথা থেকে কী কথা! এখন তোমার মজুমদারসাহেব এলে আমি বাঁচি।"

ভারতী চা এনেছে। টুপুর উঠে পড়ল। পাশের ঘরে এসে দেখল, কম্পিউটার অন করে ভিডিও গেম্স খেলছে বুমবুম। তার শুধু একটাই খেলা, রোড র‍্যাশ। সাত-সাতটা মোটরসাইকেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কী ভয়ংকর গতিতে যে নিজের মোটরসাইকেলটি ছোটায় সে! কি-বোর্ড টিপে-টিপে। শাঁইশুঁই করে একবার বাঁদিকে যায়, তো একবার ডানদিকে। উলটো দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে নিপুণভাবে পাশ কাটায়। সামনে কোনও পথচারী এসে পড়লে, ধাক্কা মেরে বেমালুম শুইয়ে দেয় তাকে। আরও যে কত অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাচ্ছে অহরহ! এই হয়তো কোনও ল্যাম্পপোস্টে গুঁতো মারল, পরক্ষণে গোত্তা খেল পাশের কোনও বাড়িতে। তাতেও এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই বুমবুমের। চাবি টিপে কেতরে যাওয়া মোটরসাইকেলকে খাড়া করে ফের দৌড় শুরু। প্রতিদ্বন্দ্বীরা কাছেপিঠে এসে গেলে তাদের আর রক্ষে নেই। বুমবুমের মোটরসাইকেলের চালক ক্যাঁত ক্যাঁত লাথি চালাবে। সত্যি কথা বলতে কী, রেস জেতার চেয়ে ওই লাথি চালানোতেই বুমবুমের আগ্রহ বেশি। গোটা পথটা যে কী তারস্বরে গর্জন করে আটখানা মোটরবাইক! টুপুরের তো পাগল-পাগল লাগে।

টুপুর হালকা ধমক দিল, "ভলিউমটা কমা না বুমবুম। কালা হয়ে যাবি যে!"

বুমবুম শুনতেই পেল না। এইমাত্র একটা দুর্ঘটনার জন্য পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে তাকে ধাওয়া করেছে, প্রাণপণে

মোটরসাইকেলের গতি বাড়াচ্ছে সে।

টুপুর গলা চড়াল, "কী রে, কথা কানে যাচ্ছে না? খেলা থামিয়ে খেয়ে নে। ধোসা তো চামড়া হয়ে গেল।"

এবারও জবাব নেই। চোখ জ্বলছে বুমবুমের। চোয়ালে চোয়াল কষে আঙুল চাপছে কি-বোর্ডে।

কাঁহাতক আর বুমবুমের পিছনে লেগে থাকা যায়! মিতিনমাসির কাছে ঝাড় না খাওয়া অবধি বুমবুমের চৈতন্য ফিরবে না। দুনিয়ায় একমাত্র মা ছাড়া আর সকলকেই উলটো ট্যাঁকে গোঁজে বুমবুম।

খুদে মাসতুতো ভাইটিকে জিভ ভেংচে টুপুর স্নানে ঢুকে গেল। বেরিয়ে সবে আয়নার সামনে চুল আঁচড়াচ্ছে, ডোর বেলে ডিং ডং।

পার্থমেসোর গলা শুনতে পেল টুপুর, "সুস্বাগতম মজুমদার সাহেব। অধমদের বাড়িতে বহু দিন পর আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।"

সোফার হাতলে দু'বাহু ছড়িয়ে বসেছেন অনিশ্চয়। তাঁর বিপুল দেহটি সিঙ্গল সোফায় আঁটছে না ভালমতো। কেমন যেন হাঁসফাঁস করছেন। পাখার নীচে বসেও ঘামছেন দরদর। আই পি এসের উর্দি নয়, অনিশ্চয়ের পরনে আজ ক্রিমরঙা ট্রাউজ়ার আর লম্বা লম্বা স্ট্রাইপ টানা মেরুন বুশশার্ট। চওড়া কবজিতে বড়সড় ডায়ালের কোয়ার্টজ ঘড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। নিখুঁত কামানো গাল, সযত্নলালিত ঢেউ খেলানো পুরুষ্টু গোঁফটিতে পাক ধরেছে অল্প অল্প।

মিতিন ঠান্ডা জল এনে সামনে রেখেছিল। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে পরিতৃপ্ত মুখে অনিশ্চয় বললেন, "আঃ, প্রাণ জুড়োল।"

মুখোমুখি ছোট সোফায় বসেছে মিতিন। জিজ্ঞেস করল, "কী খাবেন বলুন? চা? না কফি?"

মাঝের লম্বা সোফায় পার্থ আর টুপুর। পার্থ ফোড়ন কাটল, "সঙ্গে নিশ্চয়ই একটু স্ন্যাক্‌সও চলবে? এগ পকোড়া, কিংবা পেঁয়াজি?"

"ওরে বাবা, কিছু না। বাইরে এখনই টেম্পারেচার আটত্রিশ ডিগ্রি চড়ে গিয়েছে। উইথ নাইনটি পারসেন্ট হিউমিডিটি। এখন চাই স্রেফ জল। লিটার-লিটার জল।"

মিতিন হেসে বলল, "সে যত খুশি খান। একটু শরবত অন্তত বানিয়ে দিই?"

"বাজারের সিন্থেটিক স্কোয়াশ দিয়ে? রাম কহো। ঘরে বিশুদ্ধ পাতিলেবু আছে?"

"বেশ তো, নিম্বুপানিই দিচ্ছি। গরমে আপনার যা ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, নুন-চিনি-লেবুটাই আপনাকে সুট করবে।"

"নো চিনি। আমি চিনি ছেড়ে দিয়েছি।"

"বলেন কী? আই-জি সাহেবের সুগার ধরা পড়ল নাকি?"

"উঁহু। বাহান্ন বছর বয়স হল, এবার একটু ক্যালরি কনশাস না হলে চলে? শরীরে একগাদা ফ্যাট জমানো তো কাজের কথা নয়।"

"বটেই তো, বটেই তো," পার্থ মাথা দোলাল। মুচকি হেসে বলল, "তবে কিছু মনে করবেন না সাহেব, চোর-ডাকাতদের মুখে ছাই দিয়ে আপনার শরীরস্বাস্থ্যের আর-একটু শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে!"

"ঠাট্টা করছেন? কী সুখেই যে মুটোচ্ছি!" অনিশ্চয়ের গলায় খেদ ঝরে পড়ল, "রিসেন্টলি প্রোমোশনটা হয়ে কী বাম্বু যে খেলাম! আগে শুধু কলকাতার ক্রিমিনাল নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতাম, এখন পুরো ওয়েস্টবেঙ্গল ঘাড়ে চেপেছে। রাতের ঘুমফুম আমার উবে গেছে

মশাই। কী টেনশন, কী টেনশন! সারারাত বিছানায় শুয়ে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখি। আশ্চর্য ব্যাপার, টেনশন যত বাড়ছে, ভুঁড়িও তত বাড়ছে!"

মিতিন উঠে অন্দরে গিয়েছিল। ভারতীকে শরবত বানানোর নির্দেশ দিয়ে আবার এসে বসেছে।

কেজো গলায় বলল, "আজ টেনশন কী নিয়ে? হঠাৎ এই অভাজনের বাড়ি চড়াও হয়েছেন যে বড়?"

"একটা অড ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছি ম্যাডাম।"

"কীরকম?"

অনিশ্চয় দু'-এক সেকেন্ড চুপ। তারপর চোখ পিটপিট করে বললেন, "ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের নাম শুনেছেন?"

"বৈজ্ঞানিক সুমন্ত্র সান্যাল? বায়োসায়েন্টিস্ট?" মিতিনের ভুরু জড়ো হল, "পরশুর নিউজপেপারে যাঁর নিখোঁজ হওয়ার খবর বেরিয়েছিল?"

"জানতাম আপনার নজর এড়াবে না। ওই সুমন্ত্র সান্যালই আমার জান কয়লা করে দিচ্ছে।"

"তাঁকে খুঁজে বের করবার দায়িত্বটা সরাসরি আপনার ঘাড়েই চেপেছে নাকি?"

অনিশ্চয় আবার একটুক্ষণ নীরব। তারপর গলাঝাড়া দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে একটু ডিটেলে বলি। বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের উবে যাওয়ার ঘটনাটার একটা উপক্রমণিকা আছে। সেটা অবশ্য এ কেসে রেলেভ্যান্ট হতেও পারে। আবার না-ও হতে পারে।" সামান্য দম নিলেন অনিশ্চয়, "ডক্টর সান্যাল নিঃসন্দেহে একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, তাঁকে আমি চিনতামও না, কস্মিনকালে নামও শুনিনি। তবে একটু পিকিউলিয়ারভাবে হপ্তাদুয়েক আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। সরাসরি নয়, ওভার টেলিফোন।"

"সুমন্ত্র সান্যাল আপনাকে ফোন করেছিলেন? কেন?"

"ফর আ ভেরি পেটি রিজ়ন। এত সামান্য কারণে কোনও প্রজ্ঞাবান লোক যে গোয়েন্দা বিভাগের আই জি-কে ফোন করতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। সান্যালমশাইয়ের একটা পোষা ডোবারম্যান ছিল। কুকুরটার দু'দিন ধরে ট্রেস নেই। তাতেই উতলা হয়ে ভদ্রলোক ..."

"স্ট্রেঞ্জ! ভদ্রলোক মিসিং হওয়ার আগে আগে কুকুরটা হারিয়ে গেল?" মিতিন নড়েচড়ে বসল, "আচ্ছা, উনি তো দেখলাম বাসন্তীতে থাকেন? আই মিন, থাকতেন। অত দূর থেকে একটা কুকুরের জন্য আপনাকে ...?"

"পিকিউলিয়ার কি সাধে বলছি। খ্যাপামোরও একটা লিমিট থাকে। ভাবুন আপনি, কোথায় সুন্দরবনের বাসন্তী আইল্যান্ড, আর কোথায় আমার আলিপুরের ভবানী ভবন! বৈজ্ঞানিকমশাই নাকি আগে লোকাল থানায় ডায়েরি করতে গেছিলেন। তারা বোধহয় সেভাবে পাত্তাটাত্তা দেয়নি। ব্যস, অমনই ডিরেক্টরি ঘেঁটে আমার নম্বর বের করে তাঁর সে কী কাকুতিমিনতি! কুকুরটা আমার প্রাণ ... কুকুরটা না থাকলে বড্ড হেল্‌পলেস ফিল করি ... মনে হচ্ছে এর পিছনে কোনও ফাউল-প্লে আছে ... কাইন্ডলি আপনারা আমার রজারকে উদ্ধার করে দিন ...'"

"আপনি কি কোনও স্টেপ নিয়েছিলেন?"

"দুর, কুকুর খুঁজে বেড়ানো কি আমার কাজ! তবে সেদিন মুখের উপর কিছু বলিনি। যতই হোক, পোষা জীবজন্তুর উপর মানুষের তো একটা আলাদা দুর্বলতা থাকেই। তার উপর একজন বিজ্ঞানী মানুষ ... অত করে বলছেন ... টেলিফোনেও ওঁর স্বরটা সেদিন ভারী বিচলিত বলে মনে হচ্ছিল ...। ভদ্রলোককে নরম করেই বলেছিলাম, দেখছি কী করা যায়। ইনফ্যাক্ট, বাসন্তী থানার ও সি-কে এনকোয়্যারি

করার জন্য ইনস্ট্রাকশনও পাঠিয়েছিলাম। তারপর তো হাজার কাজের ভিড়ে ভুলেও গিয়েছি। হঠাৎ এই নতুন বিপত্তি। ডক্টর সান্যাল স্বয়ং হাপিশ। দুপুরে খেয়েদেয়ে কলকাতা যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর নো ট্রেস।"

"মিসিং তো হয়েছেন দেখলাম গত শুক্রবার! তাই না?"

"পুলিশ খবর পেয়েছে সোমবার। আই মিন, থানায় ডায়েরি হওয়ার পর। সেদিনই আমাদের মিসিং পার্সন্স স্কোয়াডে রিপোর্ট এসে যায়। তারাই মিডিয়াকে ঘটনাটা জানিয়েছিল।"

"দু'দিন পর পুলিশে ডায়েরি হল কেন?"

"কে দেবে খবর! ফ্যামিলি তো এখানে নেই, উনি একাই থাকতেন। সঙ্গে শুধু একটি কাজের লোক। তা সে বোধহয় ভেবেছে, সুমন্ত্রবাবু কোথাও আটকা পড়েছেন, তাই এক-দু'দিন দেখে নিয়ে ...। ক্যালাস আর কী। আগে জানালে আরও আগে ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে যেত।"

"আচ্ছা এমন নয় তো, ডক্টর সান্যাল তাঁর ডোবারম্যানটির শোকেই বিবাগী হয়ে গিয়েছেন?" পার্থ পুটুস করে মন্তব্য ছুড়ল, "এতক্ষণে হয়তো তিনি হিমালয়ের পথে ..."

"ফাজলামি কোরো না তো।" মিতিন থামাল পার্থকে। অনিশ্চয়ের দিকে ফিরে বলল, "কিন্তু এর জন্য খোদ আপনি ছোটাছুটি করবেন কেন? আপনার আন্ডারে অফিসারের তো কমতি নেই!"

"দুঃখের কথা আর কী বলব!" অনিশ্চয় ফোঁস করে একটা দেড়মনি শ্বাস ফেললেন, "অ্যাকচুয়ালি এ কেস তো হ্যান্ডল করার কথা মিসিং পার্সন্স স্কোয়াডেরই। ওরা রুটিন-তদন্ত শুরুও করেছিল। কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ হোম মিনিস্টারের ফোন এই কলুর বলদকে। দিল্লির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের

অন্তর্ধানে নাকি ঘোরতর উদ্বিগ্ন। ডক্টর সান্যালের গবেষণার সঙ্গে তাদের নাকি কী সব যোগাযোগও আছে। তারা জানিয়েছে, রাজ্য সরকার ইমিডিয়েটলি ডক্টর সান্যালকে খুঁজে বের করতে না পারলে সি বি আই আসরে নামবে। ব্যস, আঁতে ঘা লেগে গিয়েছে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। এখন তাঁর হুকুম, আমি যেন সশরীরে বাসন্তী ঘুরে এসে তাঁকে রিপোর্ট দিই এবং সেটা আজই।"

"হুম। সুমন্ত্র সান্যাল তো তা হলে দেখছি বেশ উঁচুদরের সায়েন্টিস্ট!" পার্থ গম্ভীর সুরে বলল, "কিন্তু আমরা কখনও এঁর নাম শুনিনি কেন?"

"আমরা ক'টা বিজ্ঞানীর খবর রাখি!" মিতিন বলল, "প্রচারবিমুখ মানুষ হলে তো নাম জানবার সম্ভাবনা আরও কম।"

"তা ঠিক।" পার্থ মাথা দোলাল, "ডক্টর সান্যালের রিসার্চ-টপিকটা কী ছিল আই জি সাহেব?"

"ক্যান্সার।"

"ধ্যাড়ধেড়ে বাসন্তীতে বসে ক্যান্সারের ওপর গবেষণা? স্ট্রেঞ্জ!"

"শুনে আমিও প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। ইনফ্যাক্ট কৌতূহল নিরসন করতে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টরকে ফোনও করি। তিনিও নামী বিজ্ঞানী। ডক্টর রতনলাল চৌধুরী। রতনবাবুও দেখলাম সুমন্ত্র সান্যালকে বিলক্ষণ চেনেন। ওঁর মুখেই শুনলাম, ডক্টর সান্যালের গবেষণার নেচার নাকি একটু অন্য ধরনের। সাপের বিষ থেকে নাকি ক্যান্সারের ওষুধ বের করার চেষ্টা করছেন সুমন্ত্রবাবু। অর্থাৎ তাঁর গবেষণার র মেটিরিয়াল হল সাপ। সম্ভবত সেই কারণেই সুন্দরবনের মতো একটি সর্পসংকুল অঞ্চলকে তিনি বেছে নিয়েছেন।"

"সাপের বিষ থেকে ক্যান্সারের ওষুধ?"

"ডিরেক্টরসাহেব তো সেরকমই বললেন। তবে ডিটেলটা উনি

জানেন না। এবং এ-ও মনে হল, সুমন্ত্রবাবুর গবেষণার ধারায় ডক্টর চৌধুরীর খুব একটা আস্থা নেই। খানিকটা ব্যঙ্গ করেই বললেন, সর্পবিষ থেকে ক্যান্সার ড্রাগ বানানো সম্ভব হলে, ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টরাই নাকি বিশ বছর আগে বের করে ফেলতেন! সঙ্গে আরও অনেক হাবিজাবি কমেন্ট। আমেরিকার নামী ল্যাবরেটরিতে নোবেল লরিয়েটদের সঙ্গে কাজ করে এসে গর্বে নাকি মাটিতে পা পড়ত না ডক্টর সান্যালের! এখানকার বিজ্ঞানীদের নাকি আমল দিতেন না, কারও সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ রাখতেন না ...। রতনবাবুর ধারণা, সুমন্ত্রবাবুর প্রোজেক্টটা বোধহয় ফেল মেরেছে। আর তাই উনি মুখ লুকোতে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছেন! তলেতলে বন্দোবস্ত করে হয়তো ফের আমেরিকাতেই ভাগল্‌বা।"

"এভাবে বলে দিলেন?" পার্থ চোখ কুঁচকোল, "আপনার ওই ডিরেক্টরসাহেবটি তো মনে হচ্ছে মোটেই সুবিধের লোক নন!"

"অত সহজে দুয়ে-দুয়ে চার কোরো না।" মিতিন মাথা নাড়ল, "বিজ্ঞানীমহলে নানা ধরনের আকচাআকচি থাকে। চিন্তাভাবনায় না মিললে একজন অন্যজনকে নস্যাৎ করে দেন।"

"তার মানে প্রফেশনাল জেলাসি?"

"একরকম তাই। আর এই হিংসে তো সব লাইনেই আছে। বিজ্ঞান, খেলাধুলো, নাচ, গান, শিল্প, সাহিত্য ...। এই যে আমি দুটো-চারটে কেস সল্‌ভ করি, তাতে কি মজুমদারসাহেবের বুকে একটুও কাঁটা ফোটে না বলতে চাও?"

অনিশ্চয়ের লেবুর শরবত এসে গিয়েছে। তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছিলেন গ্লাসে। আচমকা বিষম খেয়ে গেলেন। খুকখুক কাশছেন। সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ডিরেক্টর রতনলাল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছি। ডক্টর

সুমন্ত্র সান্যাল খুব একটা মিশুকে লোক নন। এবং নিরিবিলিতে একা-একা কাজ করাই তাঁর পছন্দ। অর্থাৎ গবেষণার ব্যাপারে একটু সিক্রেটিভ টাইপ।"

"আজকাল বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই তাই। কেউ নিজের গোপনীয়তা ফাঁস করতে চান না। ... তা ডক্টর সান্যাল আমেরিকা থেকে ফিরেছেন কবে? কেনই বা চলে এলেন?"

"এটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে ওসব ইনফর্মেশন জোগাড় করা পুলিশের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়," শরবত শেষ করে অনিশ্চয় গোঁফ মুছলেন, "আগে একবার সরেজমিন তো করে আসি।"

"যান। অল দ্য বেস্ট।"

"যদি অসুবিধে না থাকে, আপনিও যেতে পারেন সঙ্গে।"

টুপুরের হৃৎপিণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। মিতিনমাসির ডিডাকশন কী নিখুঁত! ঠিক ধরে নিয়েছে যেতে হবে কোথাও। সুন্দরবনের বাসন্তী দ্বীপে রহস্য-রোমাঞ্চ মোড়া একটা দিন, নিখোঁজ এক বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান ... ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কিন্তু তার মিতিনমাসির মুখ-চোখ হঠাৎ এমন নিস্পৃহ কেন? একটু আগে নিজেই তো বলল ... !

অনিশ্চয় আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী, যাবেন তো?"

মিতিনের স্বর নিরুত্তাপ, "আমি গিয়ে কী করব? আপনি তদন্তে ব্যস্ত থাকবেন, আমার উপস্থিতিতে আপনার অসুবিধেই হবে।"

অনিশ্চয় যেন এরকম জবাব আশা করেননি। থতমত খেয়ে গিয়েছেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "আহা, অত ফর্মাল ব্যাপার ভাবছেন কেন? ধরে নিন না, বেড়াতেই যাচ্ছেন।" বলতে বলতে পার্থ আর টুপুরকে একবার দেখে নিলেন অনিশ্চয়। হাসিহাসি মুখে বললেন, "টুপুরই বা মাসির বাড়ি এসে বসে থাকবে কেন, সেও

চলুক। সঙ্গে পার্থবাবুর মতো একজন উইটি লোকের কম্পানি পেলে তো আরও ভাল।”

মিতিনের স্বর তবু নীরস, “ওরা কি যাবে? দেখুন ওদের জিজ্ঞেস করে। পার্থ তো বলছিল প্রেসে কী সব জরুরি কাজ আছে ...”

“কাজ একদিন তোলা থাক। আজ সকলে আমার সঙ্গে গাড়িতে করে ... কী ফাইন একটা ওয়ান ডে ট্রিপ ...”

মিতিনমাসিটা কী প্যাঁচোয়া রে বাবা! টুপুরের পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল। নিজে থেকে পার্থমেসো আর টুপুরকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব না দিয়ে কেমন কায়দা করে অনিশ্চয়বাবুকে পেড়ে ফেলল! এখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, টুপুরদের সঙ্গে পেলে অনিশ্চয় মজুমদার ধন্য হয়ে যাবেন!

অনিশ্চয় পার্থকে বললেন, “আপনাদের কেন নিয়ে যেতে চাইছি জানেন? স্পেশ্যালি ম্যাডামকে? আরে মশাই, আমাদের পুলিশের চোখ একটা বাঁধাধরা গতে চলে। তাতে সব কিছুই ধরা পড়ে বটে, তবে ছোটখাটো দু'-একটা জিনিস তো নজর এড়িয়েও যায়। আর আমাদের ম্যাডামের অবজারভেশন তো মন্দ নয়, উনি সঙ্গে থাকলে পুলিশি চোখের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে যেতেও পারে। বলুন, ঠিক কিনা?”

“একদম ঠিক। সরকারি কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করাও তো মিতিনের কর্তব্য।”

“তা হলে আর বসে কেন! রেডি হয়ে নিন। পৌনে এগারোটা বাজে, আর বেশি লেট করলে বিকেল বিকেল ফিরতে পারব না।”

স্নান সেরে তৈরি হতে মিনিট পনেরোর বেশি সময় নিল না পার্থ। টুপুরের তো শুধু ড্রেস বদলানোটুকু বাকি ছিল। মিতিনও প্রস্তুত ঝটপট। বুমবুমকেও যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হল, তবে সে মোটেই বেরোতে রাজি নয়। দুপুরে তার প্রাণের বন্ধু কুটুস আসবে, দু'জনে

পাল্লা দিয়ে খেলবে রোড র‍্যাশ। দিনভর বুমবুম কী কী করবে, আর কী করবে না, তার একটা লম্বা তালিকা বুমবুমকে শুনিয়ে মিতিন যখন অনিশ্চয়ের গাড়িতে উঠল, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা সতেরো।

লালবাতি লাগানো চিরাচরিত সাদা অ্যাম্বাসাডর নয়, অনিশ্চয়ের বাহন আজ নেভি-ব্লু টাটা সুমো। নিজে তিনি বসেছেন ড্রাইভারের পাশে, পিছনে টুপুররা ত্রিমূর্তি। বড় রাস্তায় পড়ার মুখে গাড়ির গতি কমাতে হল একটু। সামনে একটা ছোট্ট শোভাযাত্রা। এক বৃদ্ধের মৃতদেহ খাটিয়ায় চাপিয়ে খই ছিটোতে ছিটোতে শ্মশানে চলেছে জনাকয়েক মানুষ।

পার্থ হৃষ্ট স্বরে বলল, "যাক, আজকের জার্নিটা মনে হচ্ছে ভালই হবে।"

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"জানিস না, ডেডবডি দেখে বেরোলে যাত্রা শুভ হয়?"

মিতিন মুখ বাঁকাল, "থামো তো, যত্ত সব কুসংস্কার!"

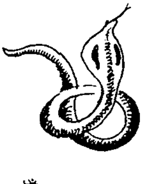

সড়কপথে সরাসরি বাসন্তী পৌঁছোনো যায় না। গাড়ি যায় সোনাখালি পর্যন্ত। বাসন্তীর চারপাশে জল। সোনাখালি আর বাসন্তীর মাঝে খাল আছে একখানা। নাম পুরন্দর। ভোর থেকে রাত, পুরন্দরে ফেরি পারাপার চলে অবিরাম।

সোনাখালি অবধি যেতে প্রায় দুটো বেজে গেল। পথে একবারই মাত্র থেমেছিল গাড়ি, ঘটকপুকুর বাজারে। ডাব

খাওয়ার জন্য। বাদবাকি সময় শাঁই শাঁই ছুটেছে টাটা সুমো। প্রায় গোটা পথই দু'ধারে শুধু মাছের ভেড়ি। মাইলের পর মাইল জলাশয়, চলছে তো চলছেই। এদিকটায় যে এত ভেড়ি আছে টুপুরের জানা ছিল না। মাছের আঁশটে গন্ধে মাঝেমাঝে গা যেন গুলিয়ে ওঠে।

গাড়িতে অনেক জ্ঞানও লাভ হয়েছে টুপুরের। পার্থমেসোর কল্যাণে। সুন্দরবন নিয়ে যা দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিল মেসো! সুন্দরবন নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, সুন্দরবনের বেশিরভাগটাই নাকি পড়েছে বাংলাদেশে, সুন্দরবনের মতো ভয়ংকর অরণ্য নাকি দুনিয়ায় আর দুটো নেই। জঙ্গলের নদীগুলোতে তো কুমির আর কামট থিকথিক করে। জলে নেমেছ কী ওমনি ঘ্যাচাং-ফু, পা একেবারে ছিঁড়ে নেবে। আর ডাঙায় তো ঘুরছেই পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী। দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বিষধর সাপও কিলবিল করছে জঙ্গলে। কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় ...। এদের কেউ কেউ নাকি গাছ থেকেও ঝোলে। এ ছাড়া জোঁক আর বিষাক্ত পোকামাকড় তো আছেই।

তা সোনাখালি সুন্দরবনের অংশ হলেও সোনাখালিতে কিন্তু জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই। বড়সড় এক গঞ্জই বলা যায়। অজস্র দোকানপাট। লোকজনের ভিড়ও নেহাত কম নয়।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়েছিল বাসস্ট্যান্ডের পাশেই। গাড়িতে বসেই অনিশ্চয় হুকুম ছুড়লেন, "মানিক, নেমে ঝটপট একটা ভাল খাওয়ার জায়গা খুঁজে বার করো তো।"

মিতিন বলল, "এখানে কেন? একেবারে বাসন্তী গিয়েই তো লাঞ্চ সারলে হত।"

"ওরে বাবা, না না। ছুঁচোরা পেটে খঞ্জনি বাজাচ্ছে। বেশি খিদে পেলে আমার আবার দৃষ্টিশক্তিটাও কেমন ক্ষীণ হয়ে আসে।"

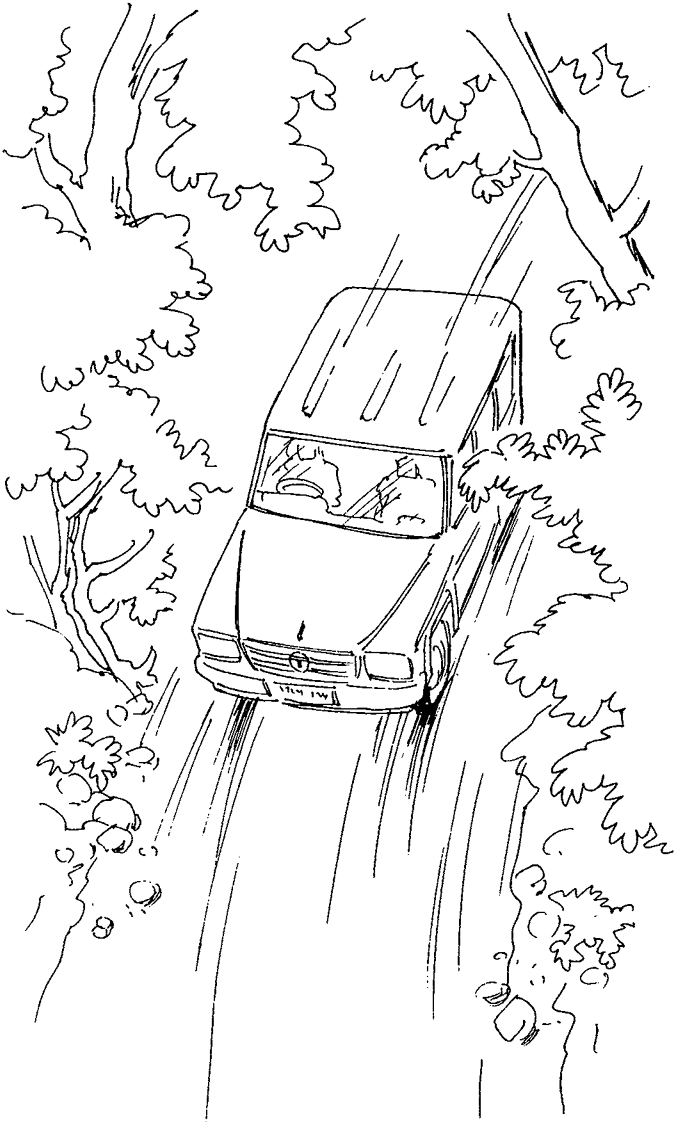

"আমারও।" পার্থও তালে তাল দিল, "শুধু চোখ কেন, আমার হাত-পা-কান-মাথা, সবই কেমন ঢলঢলে হয়ে যায়।"

খিদে টুপুরেরও পেয়েছিল। সকালের দু'খানা মশলা ধোসা কখন হজম। রাস্তাতেও যা ঝাঁকুনি ছিল, বাপ্‌স!

মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই একটা ভদ্রগোছের হোটেলের সন্ধান মিলল। তেমন আহামরি কিছু নয়, তবে পরিবেশ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। এই ভরদুপুরে দোকানটায় তেমন ভিড়ও নেই, শুধু জনা দু'-চার হাটুরে লোক বেঞ্চিতে বসে ভাত খাচ্ছে।

দোকানের মালিকটি মাঝবয়সি। খালি গা, পরনে চেক লুঙ্গি। কাউন্টারে বসে পাখার বাঁট দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল লোকটা। টুপুরদের দলটাকে দেখে সে রীতিমতো শশব্যস্ত। সাদা পোশাকে থাকলেও অনিশ্চয় যে একজন জাঁদরেল কেউ, সেটা বুঝি তাঁর হাবভাব, হাঁটাচলা দেখেই পলকে মালুম করে নিয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়ে গদগদ স্বরে বলল, "আসুন স্যার, বসুন স্যার। অ্যাই ভুতো, তিন নম্বর টেবিলটায় ভাল করে ন্যাতা লাগা তো।"

সঙ্গেসঙ্গে ভুতো নামের কালো-সিড়িঙ্গে ছোকরাটি নেমে পড়েছে কাজে। রাস্তাতেই একগাদা জলের বোতল কিনেছিলেন অনিশ্চয়। তার মধ্যে থেকে ঢাউস বোতল দু'খানা বগলদাবা করে বসলেন বেঞ্চিতে। ভরাট গলায় হাঁক ছাড়লেন, "চারটে গ্লাস দিয়ে যাও তো। গরম জলে ধুয়ে।"

পার্থ ফুট কাটল, "গরম জল লাগবে না। এদের ড্রামের জল এমনিতেই তেতে আছে।"

মালিক নিজেই গ্লাস এনে রাখল টেবিলে। জিজ্ঞেস করল, "বলুন স্যার, কী খাবেন?"

"প্লেন পাঁঠার ঝোল আর ভাত, ব্যস।"

"আজ্ঞে, আজ বেস্পতিবার স্যার। পাঁঠা তো হবে না।"

"তা হলে মুরগি চলুক।"

"মুরগি স্যার ফুরিয়ে গিয়েছে। বাটাম পাখির মাংস পেয়ে যাবেন।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "বাটাম পাখিটা কী?"

মিতিন বলল, "ছোট ছোট পাখি। কাদাখোঁচারই একটা ভ্যারাইটি। ট্রাই নিয়ে দেখতে পারিস, ... বেশ সুস্বাদু।"

পার্থ তো মাংস হলেই খুশি। গন্ডার কিংবা গোরিলা হলেও তার চলত। অনিশ্চয়েরও আপত্তি নেই। তিনি নাকি সর্বভুক। গোরু-শুয়োর-মোষ-হরিণ সবই তাঁর চলে। নাগাল্যান্ডে তিনি নাকি সাপের মাংসও খেয়েছেন! অতএব অর্ডার দিতেও আর দ্বিধা রইল না।

আহার আসার আগে প্রায় হাফ বোতল জল খেয়ে ফেললেন অনিশ্চয়। পার্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "বাসন্তী পৌঁছে আপনি কি সোজা ডক্টর সান্যালের বাড়ি যাবেন? নাকি আগে বাসন্তী থানা?"

"না না, থানায় এখন কিচ্ছুটি জানাব না। সটান সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ি, জেরাটেরা সারব, তারপর থানার খবর নিচ্ছি। আস্ত এক বিজ্ঞানী বেমালুম লোপাট হয়ে যাবে, এ কি মামদোবাজি পায়া হ্যায়?"

"হুম। আশা করি ডক্টর সান্যাল নিজের অজান্তে কিছু ক্লু ছেড়ে গিয়েছেন।"

"সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতেই তো এই শর্মার আগমন।"

কথার ফাঁকেই গরমগরম ভাত হাজির। লাল লাল মোটা মোটা চাল। সম্ভবত ঢেঁকিছাঁটা। সঙ্গে স্টিলের বাটিতে আলু-ঝোলসহ মাংস। অনিশ্চয়ের আর তর সইছিল না, আস্ত বাটিটাই উলটে দিলেন শালপাতার থালায়। খাচ্ছেন হাপুসহুপুস। বড় বড় গ্রাসের ঝোলভাত নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁর মুখগহ্বরে। পার্থও পিছিয়ে নেই, তারও হাত-মুখ বেজায় ব্যস্ত। মিতিন টুপুরও ভাত ভাঙল।

ভাতের স্বাদটা বেশ। কেমন যেন মিষ্টিমিষ্টি। মাংসটাও অন্য রকম। অনেকটা দিশি মুরগির মতো, তবে হাড়গুলো ভারী নরম। তৃপ্তি করে খাচ্ছিল টুপুর। নিঃশব্দে। একটা প্রশ্ন বহুক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছে মাথায়। শেষমেশ জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, সুমন্ত্র সান্যাল একজন বিজ্ঞানী মানুষ...নিশ্চয়ই প্রখর বুদ্ধিমান... তিনি যদি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকেন, তা হলে তাঁকে খুঁজে বের করা কি সহজ হবে?"

অনিশ্চয় আগ বাড়িয়ে বললেন, "স্বেচ্ছায়, না অনিচ্ছায় জানছ কী করে? সুমন্ত্রবাবুকে তো কেউ গুমও করতে পারে।"

"কেন গুম করবে?"

"মোটা মুক্তিপণের আশায়।"

"পণের টাকাটা দেবে কে? উনি তো শুনলাম এখানে একাই থাকেন।"

"এ যুক্তি অবশ্য জজে মানে। হয়তো অন্য কোনও মোটিভ আছে তা হলে," পার্থ এক টুকরো মাংস মুখে পুরে বলল, "অনেক সময় উগ্রপন্থীরাও বিজ্ঞানীদের তুলে নিয়ে যায়। ফর্মুলাটর্মুলা হাতানোর জন্য।"

"কিন্তু ক্যান্সার নিয়ে রিসার্চ করা বিজ্ঞানীকে কি তারা আমল দেবে? সুমন্ত্র সান্যাল অ্যাটম বোমাটোমা নিয়ে কাজ করলেও নয় কথা ছিল। ঠিক কিনা?"

দোকানের মালিকটি পেঁয়াজ-লঙ্কা রাখতে এসেছিল টেবিলে। টুপুরদের কথোপকথন শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমতা আমতা করে বলল, "কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনারা কি ঝুঁকোবাবুর কথা বলছেন?"

অনিশ্চয়ের চোখ তেরচা, "কে ঝুঁকোবাবু?"

"ওই যে, বাসন্তীতে থাকেন। যিনি সাপের বিষ থেকে কী সব

ওষুধপত্র বের করছেন। লম্বা মানুষ তো, অনেকটা ঝুঁকে হাঁটেন, তাই সকলে ঝুঁকোবাবু বলে।”

“অ। আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে?”

“বিলক্ষণ। যখন থেকে উনি নস্করদের বাগানবাড়িটা কিনে বাসন্তীতে বসবাস শুরু করলেন, তখন থেকেই চিনি। সেও না হোক চার-পাঁচ বছর হবে। ভারী সজ্জন ব্যক্তি। অত পণ্ডিত, অথচ এতটুকু দেমাক নেই। বাসন্তী থেকে এপারে এলে আমার দোকানের সামনে দিয়েই তো ওঁকে যেতে হয়। কখনওসখনও আমার এখানে চা-বিস্কুটও খান।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ স্যার। ঝুঁকোবাবুর কাজের লোকটির সঙ্গেও ভাল পরিচয় আছে। নীলাম্বর। বসিরহাটের দিকে বাড়ি। ন্যাজাটে। নীলাম্বরও বলে, বাবুর মতো নাকি মানুষ হয় না।”

অনিশ্চয় সোজা হয়ে বসেছেন। পুলিশি মেজাজে বললেন, “তা এতই যদি জানেন, আপনাদের ঝুঁকোবাবুর হারিয়ে যাওয়ার সংবাদটিও নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই?”

লোকটা সেকেন্ডের জন্য থমকাল। পরক্ষণেই মুখে একগাল হাসি, “ও হরি, আপনারা এখনও লাস্ট নিউজ়টা পাননি? ঝুঁকোবাবু তো ফিরে এসেছেন।”

“অ্যাঁ?” অনিশ্চয়ের গলা দিয়ে শব্দটা বিটকেলভাবে ঠিকরে এল। মুখ হাঁ হয়েই রয়েছে, আর বন্ধ হচ্ছে না।

টুপুরও হতভম্ব। একবার পার্থমেসোকে দেখছে, একবার মিতিনমাসিকে। দু’জনেরই খাওয়া থেমে গিয়েছে, দু’জনেরই চোখে বিস্ময়!

পার্থ বিড়বিড় করে বলল, “যাঃ বাবা! সুমন্ত্র সান্যাল ইজ় ব্যাক? কবে?”

"এই তো, গত কালই, রাতে। তখন বোধহয় সাড়ে আটটা মতো হবে। দোকানে গরম বলে বাইরে টুল নিয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি ঝুঁকোবাবু ঘাড় নামিয়ে লম্বালম্বা পায়ে ফেরিঘাটের দিকে যাচ্ছেন! সোনাখালি বাজারের কেউই আগে খেয়াল করেনি, আমিই প্রথম। আমার মুখ থেকে শুনেই তো দু'-চারজন ঘাটের দিকে দৌড়োল। দেখে এল স্বচক্ষে," লোকটার হাসি আরও চওড়া হল, "তারপর তো হাওয়ায় হাওয়ায় রটে গেল খবরটা। এই তো, এগারোটা নাগাদ টিভির লোকরাও ক্যামেরা কাঁধে হুড়তে-পুড়তে হাজির।"

"টিভির লোক?" অনিশ্চয়ের নাকের পাটা ফুলে উঠল, "আমার আগে তারা খবর পায় কী করে?"

মিতিন বলল, "নিশ্চয়ই বাসন্তীতে ওদের সোর্স আছে এবং ক্যানিংয়ে কোনও করেসপন্ডেন্ট। সোর্স মারফত খবর পেয়েই চ্যানেল হয়তো নিউজ়টা ক্যাচ করতে এসে গিয়েছে। সর্বপ্রথম কভার করতে পারলে চ্যানেলের ইজ্জত বেড়ে যাবে না?"

"তবু... খবরটা তো আমারই আগে পাওয়া উচিত," অনিশ্চয় গজগজ করছেন, "আমার সোর্স এখানে কী করছে? ফ্রায়িং ভ্যারেন্ডা?"

লোকটা চোখ নাচাল, "আপনারা কোথা থেকে স্যার? কোন নিউজ় পেপার?"

"আমরা কাগজের লোক নই।" অনিশ্চয়ের গোমড়া জবাব। পর মুহূর্তেই ভুরু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন, "তা সেই টিভি চ্যানেলের লোকগুলো কি এখনও বাসন্তীতে?"

"গুলো নয় স্যার। মাত্র দু'জন। খানিক আগে তারা ফিরেও গিয়েছে।"

"কেন?"

"ঝুঁকোবাবু নাকি দেখাই করেননি। গেট থেকেই হাঁকিয়ে দিয়েছেন।"

মিতিন চাপা স্বরে অনিশ্চয়কে বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত হলেন তো? আপনাকে আর টিভি ক্যামেরা পাকড়াও করতে পারল না!"

"যা বলেছেন! ব্যাটারা যা উলটোপালটা প্রশ্ন জোড়ে!" অনিশ্চয়ের স্বরও খাদে, "মনে হয় যেন আমরাই আসল অপরাধী!"

"আর কী, এবার তা হলে ঠান্ডা মাথায় সত্যিকারের অপরাধটা সম্পূর্ণ করুন।"

"মানে?"

"আশা করি জানেন, বাটাম-কাদাখোঁচা... আই মিন, স্নাইপ্স জাতীয় পাখি হত্যা আইনত দণ্ডনীয়?" মিতিন ঠোঁট টিপে হাসছে, "আর আপনি আইনের রক্ষক হয়ে এতক্ষণ সেই পাখিরই মাংস...?"

মুখটাকে গম্ভীর রাখতে গিয়েও অনিশ্চয় হেসে ফেললেন, "ঝঞ্ঝাট পাকালেন তো! এখন আর কি শান্তিতে এ পাখি গলা দিয়ে নামবে?"

"আহা, আপনি তো কচি মুরগি ভেবে খাচ্ছেন।" পার্থ চোখ টিপল, "দোকানদার যদি আপনাকে ঠকিয়ে অন্য কিছু খাওয়ায়, তাতে আপনার কী দোষ!"

অনিশ্চয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হালকা মেজাজে সাঙ্গ হল আহারপর্ব। বিল মিটিয়ে পার্থর সঙ্গে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন অনিশ্চয়। টুপুরও মৌরি মুখে দিয়ে মিতিনের সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎই মিতিন কী ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হোটেল মালিকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালকে দেখে আপনারা তো কাল খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?"

"হব না? মানুষটাকে নিয়ে এত তোলপাড় হল। টিভিতে, খবরের কাগজে...!"

"তা আপনারা কেউ গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ ক'দিন তিনি ছিলেন কোথায়?"

"সুযোগ পেলাম কই? যা হনহনিয়ে চলে গেলেন। ভুটভুটিটাও ছেড়ে দিল সঙ্গেসঙ্গে!"

"আর-একটা কথা। ডক্টর সান্যালের কুকুরটাকেও কি পাওয়া গিয়েছে?"

"কই আর! সেটাও তো একটা খবর। গত হপ্তায় সোনাখালির হাটে এসেছিল নীলাম্বর। তখনই বলছিল, কুকুরটার জন্য ঝুঁকোবাবু নাকি বড় বিমর্ষ থাকেন।"

"কীভাবে হারাল কিছু শুনেছেন?"

"কী বলি বলুন তো দিদি? সে কুকুর তো ইদানীং নাকি রাতে

ছাড়াই থাকত। কোনও শেয়ালটেয়াল ঢুকেছিল হয়তো বাগানে। তার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে...। অবশ্য তা হলে তো কুকুরটার বডিই পাওয়া যেত।”

“হুম।”

আনমনা মুখে বেরিয়ে এল মিতিন। পার্থ কানখাড়া করে মিতিনের প্রশ্নগুলো শুনছিল। ঠাট্টার সুরে বলল, “বিজ্ঞানী অন্তর্ধান রহস্য গুবলেট হয়ে গেল বলে তুমি কি এখন ডোবারম্যানটাকে নিয়ে পড়লে?”

“নাহ্। জাস্ট কৌতূহল।”

পার্থ দু'হাত তুলে অনিশ্চয়কে বলল, “তা হলে আর আমাদের বাসন্তী যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না তো? গাড়ি এখানে রেখে আমরা তা হলে একটু নদীবক্ষে ভ্রমণ করে আসি?”

“আপনারা বেড়াতে চাইলে বেড়ান,” অনিশ্চয়ের মুখে গাম্ভীর্য

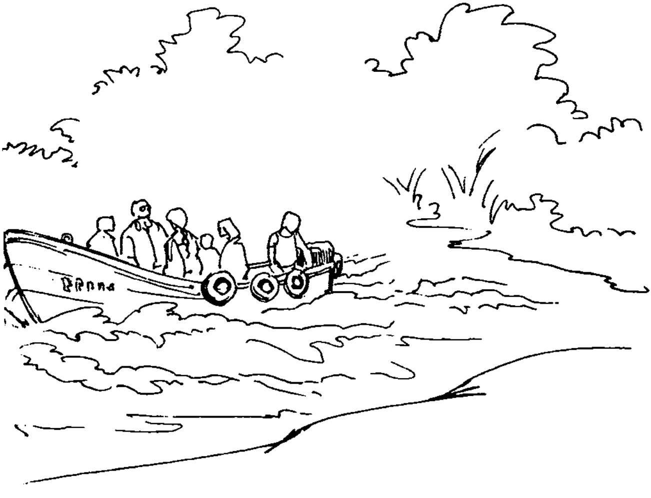

ফিরে এসেছে, "আমি বাসন্তী যাচ্ছি। টু মিট দ্যাট ট্রাবলশুটার। কখনও ফোন করে কুকুর হারিয়েছে বলে জ্বালাতন করবেন, কখনও নিজেই হারিয়ে গিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করবেন, এ তো চলতে পারে না। তা ছাড়া সোনাখালির কোন লোক কী গপ্পো শুনিয়ে দিল, তার উপর বেস করে আমি নাচতে নাচতে ফিরে গেলাম...উঁহু, আমি সে বান্দা নই। ইনফর্মেশনটা ভেরিফাই করতে হবে না?"

মিতিন বলল, "বটেই তো। আমাদের তো একবার চর্মচক্ষে দেখে আসা দরকার।"

পার্থ বলল, "কিন্তু শুনলে তো, উনি কাউকে মিট করছেন না!"

"আলবাত করবেন।" অনিশ্চয় শূন্যে মুঠো পাকালেন, "আমি গিয়ে দাঁড়ালে...," বলতে বলতে অনিশ্চয় আরও উত্তেজিত, "যদি সত্যি সত্যি সুমন্ত্র সান্যাল ফিরে এসে থাকেন, তবে বাসন্তী থানার কপালে খুব দুঃখ আছে। ফর নাথিং আমাকে এত দূর ছুটিয়ে আনা..."

"আহা, এত চটছেন কেন?" মিতিন ঠান্ডা করতে চাইল অনিশ্চয়কে, "ধরে নিন না, এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যই একটা দিন খরচ করলেন।"

"হুঁঃ। যত্তো সব...!"

মানিককে গাড়িতেই থাকতে বলে ঘাটের দিকে এগোলেন অনিশ্চয়, গটমট পায়ে। কাছেই ঘাট। ভাটার টান চলছে এখন পুরন্দরে, জল খানিকটা সরে গিয়েছে, পাড়ে থকথকে এঁটেল মাটি। ভুটভুটিতে ওঠার জন্য সরু কাঠের পাটাতন পেতে দেওয়া হয়েছে একটা। অত সরু কাঠের উপর দিয়েও দিব্যি যাতায়াত করছে স্থানীয় লোকজন। কেউ কেউ আবার কাঁধে সাইকেল নিয়ে। কিংবা মালের বোঝা।

টুপুরের তো দেখেই বুক ঢিপঢিপ করছিল। পাটাতন থেকে পা

পিছলোলেই চিত্তির! ওই তলতলে কাদায় কোমর পর্যন্ত গেঁথে যাবে! নিশ্বাস বন্ধ করে কাঠটা পার হল টুপুর। শেষ কয়েকটা পা তো প্রায় দৌড়ে। ভুটভুটিতে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

লোক ভরতি হতেই মেশিন বসানো নৌকো সশব্দে রওনা দিয়েছে। সোনাখালি থেকে বাসন্তী খুবই সামান্য দূরত্ব। তিন-চার মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। ভাটার জন্য সময় যেন একটু বেশিই লাগছে। সওয়া তিনটে বাজে। সূর্য অনেকটাই পশ্চিমে হেলে গিয়েছে, তবু রোদ্দুরের কী তেজ! হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প। নোনা বাতাস। কেমন যেন একটা গন্ধও আছে বাতাসে। আঁশটেআঁশটে, সোঁদাসোঁদা।

এটাই কি সুন্দরবনের গন্ধ? টুপুর বুঝতে পারছিল না।

বাসন্তীতে ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের ডেরা খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়। প্রতিটি ভ্যান-রিকশাওয়ালাই বাড়িটি চেনে। তবে ভ্যান-রিকশায় চড়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়ের ঘোর আপত্তি। খোলা পাটাতনে অমন বেআব্রুভাবে পা ঝুলিয়ে বসলে আই জি সাহেবের নাকি মানসম্মান খোয়া যাবে!

অগত্যা হন্টন। লোকমুখে শুনে যা বোঝা গেল, মাত্র মিনিট দশ-বারোর পথ। পিচরাস্তা ধরে ফেরিঘাটের লাগোয়া বাজারমতো এলাকাটা পেরোলে একটা গির্জা পড়ে বাঁয়ে। তারপর আরও খানিক এগোলে, ডান হাতে বিজ্ঞানীর বাসভবন। একতলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলে দূর থেকে নজরে আসে না। তবে লম্বালম্বা

লোহার শিকওয়ালা গেটখানার সামনে এলে গোটা বাড়িটাই চোখে পড়ে যায়। অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি। সামনে জমিও নেহাত কম নেই। বাড়ির ছাদে শোভা পাচ্ছে ডিশ অ্যান্টেনা এবং সোলার প্যানেল।

ভিতর থেকে তালা ঝুলছে গেটে। অনিশ্চয় হাঁক পাড়লেন, "অ্যাই, কে আছ? গেট খোলো।"

সাড়াশব্দ নেই।

এক-দু'বার ডাকাডাকি করেই অনিশ্চয়ের মেজাজ টংয়ে। বাজখাঁই হুংকার ছুড়লেন, "হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ? কতক্ষণ গরমে দাঁড়িয়ে থাকব? তালা ভেঙে ঢুকতে হবে নাকি?"

এতক্ষণে কাজ হল। কোত্থেকে এক বছরতিরিশের লোক হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত। ফটকের ওপার থেকে প্রশ্ন করল, "আপনারা...?"

"ডক্টর সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"কিন্তু স্যার তো কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। ওঁর শরীর ভাল নেই।"

পার্থ অনিশ্চয়কে দেখিয়ে বলল, "এঁকে চেনেন? পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আই জি। অনেক উঁচুতলার অফিসার। কলকাতা থেকে এসেছেন। না ঢুকতে দিলে উনি কিন্তু থানা থেকে পুলিশ এনে দরজা ভাঙবেন।"

"ও, আপনারা পুলিশ? আগে বলবেন তো!" লোকটা চটপট গেট খুলে দিল, "সকাল থেকে এত উটকো লোক এসে উৎপাত করছে! এই তো, কারা যেন ক্যামেরাট্যামেরা নিয়ে এসেছিল। যত বলি স্যার ক্লান্ত, আজ বিশ্রাম নেবেন...কিছুতেই শোনে না।"

কম্পাউন্ডে ঢুকতে ঢুকতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম তো নীলাম্বর, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নীলাম্বর বিশ্বাস।"

"ডক্টর সান্যালের আসিস্ট্যান্ট?"

"ওই আর কী।" নীলাম্বর গলে গেল, "স্যারের দেখাশুনো করি। যতটুকু পারি সাহায্যও করি কাজে।"

টুপুর লোকটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছিল। বেশ ঝকঝকে চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, কায়দা করে ছাঁটা চুল, হাতে সোনালি ডায়ালের ঘড়ি, পরনে আধুনিক কেতার থ্রি-কোয়ার্টার শর্ট্‌স, স্যান্ডো গেঞ্জি, পায়ে কেড্‌স। দেখে কাজের লোক বলে আদৌ মনে হয় না। অনুমান করতে অসুবিধে নেই, সুমন্ত্র সান্যালের বাড়িতে বেশ জাঁকিয়েই বাস করে নীলাম্বর।

গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত মোরাম বিছানো সরু পথ। সারসার ইট দিয়ে ঘেরা। দু'পাশে ফুলগাছ আছে কিছু। গোলাপ, জবা, বেল, কামিনী। তবে গাছগুলোর চেহারা ভাল নয়, কেমন মরামরা টাইপ। গোলাপ আর জবা ফুটে আছে, কিন্তু বেশ শুকনো শুকনো। একটা ঝাঁকড়া আমগাছও আছে, তবে তাতে ফল আসেনি। আমগাছের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে খান চার-পাঁচ বাঁশ।

বারান্দায় উঠে সামনের বড় ঘরটা খুলে দিল নীলাম্বর। বলল, "ড্রয়িংরুমে একটু বসুন। আমি স্যারকে খবর দিচ্ছি।"

মিতিন সম্ভ্রমের সুরে জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর সান্যালের কি সত্যিই শরীর খারাপ? মানে শুয়েটুয়ে আছেন?"

"দেখছি। স্যার বোধহয় এখন ল্যাবরেটরিতে। উনিই বলে রেখেছেন, আজেবাজে লোক এলে যেন ভাগিয়ে দেওয়া হয়। তা বলে সব্বাইকে তো আর সে কথা...। এই তো, সকালবেলা থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছিলেন। তিনি তো ভিতরে গিয়ে কথা বলে এলেন।"

অনিশ্চয়ের চোখ সরু, "থানা কখন এসেছিল?"

"এই ধরুন, সাড়ে ন'টা-দশটা। আমি নিজেই স্যারের নিউজ়টা থানায় জানিয়ে আসব বলে সাইকেল বের করছি, তখনই।"

"আপনার কিন্তু আরও আগেই থানায় বলে আসা উচিত ছিল।"

"আমি তো কাল রাতেই যেতে চেয়েছিলাম। স্যার বললেন, তাড়া কীসের! আর তো তোমার টেনশন করার কিছু নেই, সকালে ধীরেসুস্থে যেয়ো।"

"অ।"

নীলাম্বর অন্দরে যেতেই অনিশ্চয় প্রায় গর্জন করে উঠলেন, "দেখেছেন লোকাল পি এসের বেআক্কেলেপনাটা? আগে খবরটা পেয়ে গেলে থোড়াই আমায় কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়!"

"উত্তেজিত হবেন না, ক্রোনোলজিক্যালি ভাবুন।" মিতিন শান্ত করতে চাইল অনিশ্চয়কে, "আপনার দারোগাবাবুটি খোঁজখবর করে হেলতে-দুলতে থানায় ফিরেছেন না হোক সাড়ে দশটায়। তিনি তো মন্ত্রীর হুড়োর খবর জানেনও না, আপনি তাঁকে তাড়াও দেননি। অতএব তিনিও মিসিং পার্সন্স স্কোয়াডে সংবাদটি দিয়েছেন ঢিমেতালে। মিসিং পার্সন্স স্কোয়াড যখন আপনাকে খবরটি দিতে চাইছে, তখন আপনি অন দ্য ওয়ে টু বাসন্তী। সম্ভবত মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের বাইরে। যদি তাঁরা এস এম এসও করে থাকেন, নেটওয়ার্কের আওতায় না এলে তো আপনি সেটিও পাবেন না।"

"হুঁ।" অনিশ্চয় কিঞ্চিৎ শীতল হলেন। গলা নামিয়ে বললেন, "বিজ্ঞানীমশাইটিও যথেষ্ট তিক্‌ড়ম আছেন। কুকুর হারালে এখান থেকে আলিপুরে ফোন মারছেন, অথচ নিজে হারিয়ে ফেরত আসার পর বলেন কিনা টেনশান কোরো না!"

পার্থ চাপা স্বরে বলল, "দেখবেন, চটে গিয়ে ডক্টর সান্যালকে কথা শোনাবেন না যেন। টের পেয়েছেন তো, উনিও যথেষ্ট হেভিওয়েট মানুষ!"

কথাবার্তার মাঝেই ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বোলাচ্ছিল টুপুর। বড় সাইজের ঘরখানার সাজসজ্জা বেশ ছিমছাম। আসবাব সবই রট আয়রনের। সোফা, সেন্টার টেবিল, স্ট্যান্ড ল্যাম্প...। দেওয়ালে গাঁথা কাচের আলমারিতে প্রচুর ইংরেজি বই। টুপুর উঠে বইগুলো একবার দেখে এল। গল্প-উপন্যাস নয়, ভারী ভারী বিজ্ঞানের কিতাব। বাঁধানো বিদেশি জার্নালও আছে কিছু। ঘরের এক কোণে চাকালাগানো ক্যাবিনেটে টিভি, ডিভিডি প্লেয়ার। গোছা করে ভিসিডিও রাখা আছে পাশে।

একদম উপরের ডিস্কে চোখ পড়তেই টুপুর হাঁ। হাতে তুলে দেখাল সবাইকে।

পার্থ বলল, "আইব্বাস! মুঘল-এ-আজম! ডক্টর সান্যাল এসব ফিল্ম দেখেন নাকি?"

মিতিন হেসে বলল, "বিজ্ঞানীর কি অন্য কিছুতে আগ্রহ থাকতে পারে না? মনে রেখো, আইনস্টাইন বেহালা বাজাতেন, সত্যেন বোস এসরাজ, ফেইনম্যান ড্রাম। সুমন্ত্রবাবুকেই বা রসকষহীন ধরে নিচ্ছ কেন? আমার তো বরং ভদ্রলোকের রুচি সম্পর্কে শ্রদ্ধাই জাগছে। সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার, কী মিষ্টি অ্যাপেলহোয়াইট দেওয়ালের রং..."

"হুঁ।" পার্থ নাক টানল, "ঘরটা সদ্য রং করা হয়েছে। মেঝেতে এখনও রঙের ছিটে।"

নীলাম্বর ফিরে এসেছে। ট্রেতে চার গ্লাস শরবত সাজিয়ে। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "স্যার কম্পিউটারে ব্যস্ত এখন। আপনাদের বসতে হবে। ততক্ষণ একটু আমপোড়ার শরবত খান।"

অনিশ্চয়ের মুখে আবার বিরক্তির ছায়া। পার্থ তাঁকে সামাল দিতে বলে উঠল, "আহা, এই আমপোড়ার শরবতেরই দরকার ছিল এখন। খেয়ে নিন মজুমদারসাহেব, শরীর মাথা দুই-ই ঠান্ডা হবে।"

নীলাম্বর নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, "একটু মিষ্টিটিষ্টি খাবেন তো স্যার? দূর থেকে আসছেন..."

"এখন কিচ্ছু লাগবে না।" মিতিন মাথা নাড়ল, "সোনাখালিতে ভাত খেয়েছি। পেট এখন টইটম্বুর। বরং আপনি একটু বসুন তো। আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করি।"

নীলাম্বর বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা মোচড়াচ্ছে, "আমাকে আবার আপনি কেন। তুমিই বলুন দিদি।"

মিতিন নরম গলায় প্রশ্ন করল, "তুমি স্যারের কাছে কত দিন আছ?"

"তা প্রায় চার বছর।"

"এখানে তোমার কাজটা কী?"

"সবই করি। রান্নাবান্না, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, ওয়াশিং মেশিনে স্যারের কাপড়চোপড় কাচা, স্যারের সাপঘরের দেখভাল...। ল্যাবরেটরিতেই হাতেহাতে স্যারকে সাহায্য করি।"

"বাহ, অল ইন ওয়ান! তা তোমার স্যার এ ক'দিন ছিলেন কোথায়?"

"কী জানি! কলকাতাতেই হবে।"

"জিজ্ঞেস করোনি?"

"করেছিলাম। বললেন, 'তোর জেনে কী হবে!' আমি বললাম, 'তা যেখানে খুশি থাকুন, খবর দ্যাননি কেন?' জবাবই দিলেন না কোনও। এমন গোমড়া মুখে আছেন, বেশি ঘাঁটাতে সাহস হচ্ছে না।"

"উনি কি এমনিতে বেশ হাসিখুশি? দিলখোলা?"

"তেমন আমুদে তিনি কোনওদিনই নন। সবসময় চিন্তায় ডুবে থাকেন তো। তবে রজার হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে যেন বড় বেশি মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। খালি বলতেন, 'রজারটাকে বোধহয় মেরেই ফেলেছে রে।' "

"কে মারবে?"

"কী জানি!"

"উনি কি কাউকে সন্দেহ করতেন?"

"তাও তো জানি না দিদি। কখনও তো কারও নাম করেননি।"

"হুম।" মিতিন শরবত শেষ করে ট্রেতে গ্লাস রাখল। রুমালে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, "আচ্ছা নীলাম্বর, তুমি যখন দেখলে শুক্রবার রাতে তোমার স্যার ফিরলেন না, শনিবারই তুমি থানায় গেলে না কেন?"

"স্যার একবার বলেছিলেন, রাতে না ফিরলে পরদিন সকালে আসবেন। তাই ভাবলাম শনিবারটা দেখি। রোববারও সারাদিন ভাবছি, এই বুঝি স্যার এলেন, এই বুঝি এলেন...। সোমবার সকালে আর দেরি করিনি, দারোগাবাবুর কাছে রিপোর্ট লিখিয়ে এসেছি। কিন্তু উনি যে কাজেই আটকে গেছেন, কী করে বুঝব বলুন? বিপদআপদের ভয়টাই তো সবার আগে মাথায় আসে।"

"বটেই তো।... তা তোমার স্যারের আত্মীয়স্বজন সব কোথায়?"

"ম্যাডাম...মানে স্যারের ওয়াইফ আর মেয়ে তো থাকেন আমেরিকায়। আমি তাঁদের একবারই মাত্র দেখেছি। গত শীতের আগের শীতে। বাসন্তীতে এসে তাঁরা তেরাত্তিরের বেশি টিকতে পারেননি, কলকাতা চলে গিয়েছিলেন।"

"ও। তার মানে কলকাতায় ডক্টর সান্যালের আত্মীয়রা আছেন?"

"আমি নিশ্চয় করে বলতে পারব না দিদি। স্যার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনও তো কিছু বলেননি।... তবে হ্যাঁ, স্যারের এক ভাই আছেন। মাঝেমাঝে তিনি ফোনও করেন।"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"সেটাও বলতে পারব না। সম্ভবত কলকাতাতেই। কিন্তু বাসন্তীতে তিনি কখনও আসেননি।"

"এমনি লোকজন নিশ্চয়ই ডক্টর সান্যালের কাছে আসেন? মানে গবেষণা টবেসনার ব্যাপারে? "

"আসেন। কালেভদ্রে। তাঁদের সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে আলোচনাও হয়। বোধহয় তাঁরা গভর্নমেন্টের লোক। এসে দিনভর থাকেন, খাওয়াদাওয়া হয়, মিটিং চলে...। ও হ্যাঁ, মাসদুই আগে তিনজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। বেশিক্ষণ থাকেননি। কী নিয়ে যেন স্যারের সঙ্গে কথাবার্তা হল, তারপর তাঁরা চলেও গেলেন। তবে স্যার তাঁদের খুব পছন্দ করেননি, বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন।"

পার্থ বলল, "হয়তো ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ নিতে এসেছিল। ডক্টর সান্যাল হয়তো ওসব পছন্দ করেন না।"

"হতেও পারে।" পার্থকে ঝলক দেখে নিয়ে মিতিন ফের নীলাম্বরের সঙ্গে গল্পে মেতেছে, "এই বাড়ি তো দেখছি সম্প্রতি রং করা হয়েছে..."

"ওই তো, লোকগুলো যাওয়ার পরপরই স্যারের হঠাৎ ঘরদোরের দিকে নজর পড়ল। সারাইটারাইও করলেন কিছু। ল্যাবরেটরিতে আর একটা এগজ়স্ট লাগালেন। রংটং শেষ হওয়ার পর স্যারের মেজাজ যখন একটু ফুরফুরে, তখনই হঠাৎ রজারের ওই কাণ্ড।"

"মানে, তোমাদের ডোবারম্যানটার হারিয়ে যাওয়া?"

"হারিয়ে নয়, বলুন উবে গেল। ওইরকম একটা বাঘা কুকুর...! রজারের আতঙ্কে এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁসত না। আমি যখন প্রথম কাজে এলাম, রজার তখন এতটুকু। বয়স সবে তিন মাস। সেই কুকুর কেমন ধাঁইধাঁই করে প্রকাণ্ড হয়ে গেল। চেনে বেঁধে নিয়ে বেরোলে ও আমায় টানছে, না আমি ওকে, বুঝতে পারতাম না।"

"রজার তোমারও খুব প্রিয় ছিল নিশ্চয়ই?"

"মায়া তো পড়বেই দিদি। আমরা তিনজনই তো বাস করতাম

বাড়িতে। যদি না অবশ্য স্যারের সাপ আর ইঁদুরগুলোকে গুনতিতে ধরেন," নীলাম্বরের গলা যেন একটু দুলে গেল, "আহা, কী প্রভুভক্তই না ছিল রজার। স্যার হয়তো অনেক রাত অবধি কাজ করছেন... আমি শুয়ে পড়লাম... রজার কিন্তু ঠায় বসে আছে স্যারের পায়ের কাছে। স্যার খেতে বসতে হয়তো দেরি করছেন, গিয়ে স্যারের অ্যাপ্রন ধরে টানাটানি করবে! পুরোপুরি মানুষের মতো বুদ্ধি। সব বুঝত। বুঝিয়েও দিত। শুধু কথাটাই যা বলতে পারত না। একবার মঙ্গলমেসো নাতিকে নিয়ে এসেছিল..."

"মঙ্গলমেসোটা আবার কে?"

"তাও তো বটে। আপনারা তাকে চিনবেন কী করে?" নীলাম্বর দাঁত বের করে হাসল, "আমার মায়ের খুড়তুতো বোনের বর। সুধন্যখালিতে থাকে। মেসোই তো আমাকে এ-বাড়িতে কাজে দিয়েছে। মেসো খুব ভাল সাপ ধরতে পারে। স্যারকে সাপ তো মঙ্গলমেসোই সাপ্লাই দেয়। মাসে একবার এসে বিষও বের করে দিয়ে যায় সাপের। মঙ্গলমেসো এমন সুন্দর সাপ বশ করতে জানে..."

"মঙ্গলমেসোর কথা পরে শুনব। তার নাতির কথা কী বলছিলে?"

"ও হ্যাঁ, গোপাল। তাকে তো রজার আগে কখনও দেখেনি... গেট দিয়ে সে ঢোকামাত্র ঘাঁউ করে তার কবজি কামড়ে ধরেছে...। গোপাল তারস্বরে কাঁদছে, মঙ্গলমেসো চেঁচাচ্ছে, আমি রজারকে ধমকাচ্ছি, টানাটানি করছি,.. রজার ছাড়বেই না। স্যার তখন শুধু দরজায় এসে একবার বললেন, 'রজার, লিভ হিম!' ব্যস, ওমনই রজার সুড়সুড় করে সরে গেল। এমন বাধ্য কুকুর উধাও হয়ে গেলে স্যারের মনখারাপ হবে না, বলুন? স্যার ছাড়া রজারের চলত না, রজার ছাড়া স্যারের। ছোট থেকে তো স্যারের

কাছেই শুত। এই তো, বাড়ি সারাইয়ের সময় থেকে রাতে ঘরের বাইরে থাকা শুরু করল। কম্পাউন্ডে চরকি দিত রাতে। স্যারই হুকুম করেছিলেন, 'যা ব্যাটা, তুই লায়েক হয়ে গিয়েছিস। এবার থেকে নাইট ডিউটি দে।' তা কে জানত, সেই রাতপাহারা দিতে গিয়েই রজার...। সেদিনটা আবার ছিল অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার..."

মিতিনের সঙ্গে বেশ জমে গিয়েছে নীলাম্বর। টুপুর লক্ষ করছিল, পার্থমেসোও শুনছে মন দিয়ে। কিন্তু অনিশ্চয় আঙ্কল অধৈর্য ক্রমশ। বারবার ঘড়িতে চোখ, ঘনঘন ফিরে তাকাচ্ছেন দরজার দিকে। কপালে বিরক্তির ভাঁজ মোটা হচ্ছে।

হঠাৎই নীলাম্বরকে দাবড়ে উঠলেন অনিশ্চয়, "এই যে, তোমাদের রজারের ঝাঁপিটা এবার বন্ধ করো তো। আমরা কাজের মানুষ, বিস্তর দূর ফিরতে হবে। দয়া করে দেখে এসো, তোমার স্যারের দর্শন দেওয়ার অবকাশ হল কিনা!"

হকচকিয়ে দৌড় লাগিয়েছে নীলাম্বর। সঙ্গেসঙ্গে অনিশ্চয়ের কণ্ঠেও বিদ্রুপ ধ্বনি, "হুঁঃ, যত্ত সব। সাধুবাবাদের দরজাতেও এতক্ষণ হত্যে দিতে হয় না।"

মিতিন হেসে ফেলল, "রজার হারানোটা কি আপনার ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না মজুমদারসাহেব?"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী হতে পারে রজারের? কেউ কিডন্যাপ করেছে?"

"আর হাসিও না টুপুর। কে করবে কিডন্যাপ? এক সুন্দরবনের কোনও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যদি পয়সার লোভে কনট্রাক্ট নেয়, তো অন্য কথা," অনিশ্চয় ফেটে পড়লেন, "কোনও মানুষের পক্ষে ওই বাছুরের সাইজের ওয়াচডগকে কবজা করা ইমপসিবল।"

মিতিন বলল, "যদি কেউ ঘুমের ইঞ্জেকশন ঠুসে দেয়? বাঘটাঘকে যেভাবে ঘুম পাড়ানো হয় আর কী।"

"কিন্তু অপহরণ করার তো একটা কারণ থাকবে।" পার্থ বলে উঠল, "কুকুরের জন্য র‍্যানসম দাবি! এখনও তো শুনিনি!"

টুপুর বলল, "তা হলে ডক্টর সান্যালের আশঙ্কাটাই ঠিক। রজারকে কেউ মেরেই ফেলেছে। বিষ ইঞ্জেকশন দূর থেকে শুট করে ..."

"রিভলভারে সাইলেন্সার লাগিয়েও ট্রিগার টেপা যায়।"

"কিন্তু মারলটা কে? বডিটাই বা গেল কোথায়?"

"অনেকেই সন্দেহের তালিকায় আসতে পারে।" পার্থ চোখ নাচাল, "ফার্স্ট সাসপেক্ট, মঙ্গল। মোটিভ, নাতিকে কামড়ানোর বদলা। সাসপেক্ট টু, কোনও চোর বা ডাকাত। পাঁচিল টপকে রজারের মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ব্যাটাকে নিকেশ করে দিয়েছে। তিন নম্বর সাসপেক্ট, এতক্ষণ ধরে কাঁদুনি গাওয়া নীলাম্বর বিশ্বাস স্বয়ং। রজার হয়তো তার কোনও কুকর্মে বাধা সৃষ্টি করছিল। আর বডি পাচার করা এখানে তো কোনও সমস্যাই নয়। বস্তায় পুরে টানতে টানতে নিয়ে পুরন্দরের খালে ফেলে দিলেই কাম ফতে। বিদ্যাধরী বা মাতলা নদীতে বিসর্জন দিলেই বা ঠেকায় কে! কুমির-কামটদেরই পোয়াবারো হবে, ফোকটে নেমন্তন্ন জুটে যাবে একটা।"

"তোমার থিয়োরিতে প্রচুর গলদ আছে। বিশেষ করে মোটিভগুলো নিয়ে," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "মঙ্গল তো একেবারেই অ্যাবসার্ড। দ্বিতীয়ত, চোর-ডাকাত রজারকে মারলে চুরি-ডাকাতির একটা চেষ্টা হতই। হয়েছে কি? তা ছাড়া রজারের মৃতদেহ তারা সরিয়েই বা ফেলবে কেন?"

"ওফ, আপনারা গবেষণা থামাবেন?" অনিশ্চয়ের গলা গমগম

বেজে উঠল, "দেখুন ম্যাডাম, রজার চুরি হোক, কী খুন, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড। যাঁর সন্ধানে আসা, তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে এখন মানেমানে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি।"

অনিশ্চয়ের শেষ বাক্য তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। দরজায় এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল।

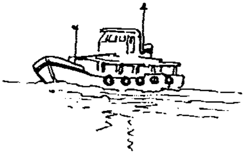

"কুকুরটাকে হারিয়ে আমি বড্ড বেশি আনমাইন্ডফুল হয়ে গিয়েছি আই জি সাহেব। মাথা সবসময় নর্মালি কাজ করছে না।"

"তা বলে একটা ইন্টিমেশন পর্যন্ত না দিয়ে দুম করে ঘাটশিলা চলে যাবেন?"

"এখন টের পাচ্ছি, কাজটা গোখ্‌খুরি হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস করুন, এত শোরগোল পড়ে যাবে ভাবিনি। মিছিমিছি আপনাদেরও হয়রানির একশেষ।"

চিঁড়ে ভিজল না। অনিশ্চয় গাল ফুলিয়ে বললেন, "জানেন, আর-একটু হলে আপনার কেসটা সি বি আই পর্যন্ত গড়াত?"

"আমার মতো একজন নগণ্য মানুষের জন্য সি বি আই?" সুমন্ত্র সান্যালকে কেমন যেন বিহ্বল দেখাল, "আমি এতই সমস্যার সৃষ্টি করে ফেলেছিলাম? ছি ছি ছি, ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে। আমি সত্যিই লজ্জিত আই জি সাহেব। আমার ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।"

টুপুর একদৃষ্টে ডক্টর সান্যালকে দেখছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলতে যে প্রাজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ছবি চোখে ভাসে, সুমন্ত্র যেন ঠিক সেই গোত্রের নন। বয়স

তো বেশ কম, পঁয়তাল্লিশও হবে কিনা সন্দেহ। রোগা, লম্বা দেহযষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাসিকাটিও বেখাপ্পা রকমের খাড়া। অনেকটা ধনেশপাখির ঠোঁটের মতো। ব্যাকব্রাশ চুল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, চোয়াড়ে গাল নিখুঁত কামানো। গাত্রবর্ণ ঈষৎ তামাটে। তবে চোখের মণি দুটো কিন্তু দারুণ উজ্জ্বল। এত কালো মণি খুব কমই দেখা যায়।"

অনিশ্চয় সামান্য ঠান্ডা হয়েছেন। গুছিয়ে বসে বললেন, "তা হঠাৎ ঘাটশিলায় গা ঢাকা দিলেন কেন?"

সুমন্ত্র মৃদু হাসলেন, "লুকোব কেন? একটা গবেষণা সংক্রান্ত কাজেই ..."

"কাইন্ডলি যদি একটু ডিটেলে বলেন! আমাকে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে তো।"

"আমি তো সকালে একবার এখানকার ও সি-কে বলেছি। শুক্রবার আমার একটা সেমিনার ছিল। ওখানেই হঠাৎ খবর পাই, ঘাটশিলা অঞ্চলের এক স্পেসিফিক উপজাতির লোকেরা স্নেক ভেনমের সঙ্গে কয়েকটা জংলি গাছগাছড়ার রস মিশিয়ে একটা পিকিউলিয়ার মেডিসিন তৈরি করে। যে-কোনও ধরনের আলসার সারাতে ওষুধটা নাকি অব্যর্থ। শুনেই কী যে হল, সেমিনার থেকে সোজা হাওড়া স্টেশন।"

"সেমিনারটা কোথায় হচ্ছিল জানতে পারি?"

"ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজির অডিটোরিয়ামে, যাদবপুরে।"

"কতক্ষণ ছিলেন সেখানে? মানে, যদি আপনার বলতে আপত্তি না থাকে!"

"আমি অডিটোরিয়াম ছাড়ি অ্যারাউন্ড ফোর।"

"তার মানে স্টিল এক্সপ্রেস ধরেছিলেন?"

"হুঁ।"

"তার পর বেমালুম ঘাটশিলাতেই রয়ে গেলেন পাঁচ দিন?"

"প্রপার টাউনে নয়। ইন্টিরিয়রে যেতে হয়েছিল। যদুগোড়ার দিকটায়।"

"ও। ওখানে আপনার মিসিং হওয়ার খবরটা পেলেন কবে?"

"পাইনি তো। কাল বাসন্তীতে ফিরে শুনলাম।"

"তো, কালই তো আপনার থানায় ইনফর্মেশনটা দেওয়া উচিত ছিল।"

"বড্ড টায়ার্ড ছিলাম। প্লাস ভাবলাম, এসেই তো পড়েছি। রাতেও খবর দেওয়া যা, সকালেও তাই।"

পার্থ ফস করে জিজ্ঞেস করল, "তা ঘাটশিলাতে আপনার কাজ হল?"

"কই আর। চার-পাঁচ রকম ট্রাইবের সঙ্গে কথা বললাম। তারা কেউ ওসব জানেই না। স্রেফ গুজব ধাওয়া করে আমার চার-পাঁচটা দিন চলে গেল। সময়ের কী অপচয়!"

মিতিন চুপচাপ শুনছিল। অনেকক্ষণ পর কথা বলল, "আপনি তো এখানে একাই থাকেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। আমার স্ত্রী আর মেয়ে স্টেটসেই রয়ে গিয়েছে। বস্টনে। আমার স্ত্রী বস্টন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ান। মেয়ে স্কুলের শেষ ধাপে।"

"একটু ব্যক্তিগত হয়ে যায়, তবু একটা প্রশ্ন করব? ওঁদের রেখে আপনি চলে এলেন কেন?"

"আমার কাজটা আমি আমার দেশের মাটিতেই করতে চাই। পড়াশোনা করতে ওদেশে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার মগজ নিয়ে অন্য একটা দেশ ব্যবসা করবে, এ আমার কখনওই অভিপ্রেত ছিল না। প্রথম সুযোগেই তাই ফিরে এসেছি।"

"আপনি ভারত সরকারের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত, তাই না?"

"উঁহু, যুক্ত নয়। প্রকল্পটা আমারই। প্ল্যান, প্রোগ্রাম, এস্টিমেট করে আমিই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। আমার সৌভাগ্য, আমাকে সামান্যতম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। গভর্নমেন্ট আমায় সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সো, মিশিগান ইউনিভার্সিটি ছেড়ে আমি স্ট্রেট এখানে।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রী আর মেয়ে বোধহয় আসতে রাজি হলেন না?"

"কী আর করা। আমেরিকান লাইফস্টাইলের সঙ্গে ওরা এমনভাবে মিশে গিয়েছে, ওদের পক্ষে আর ইন্ডিয়ায় এসে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। বারদুয়েক ঘুরে গিয়েছে এখানে। তারপর ওই উইকলি ফোন অথবা ই-মেল ...।"

"আপনার লোনলি লাগে না?"

"কাজের মধ্যে থাকলে নিজেকে একা ভাবার ফুরসত কোথায়!"

অনিশ্চয় বললেন, "আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করব? ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে সুন্দরবন আপনার পছন্দ হল কেন? স্নেক-ইনফেস্টেড এলাকা বলে?"

"সেটা একটা মেজর কারণ বটে। আমার পয়জনাস স্নেকের কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই চাই। সেদিক দিয়ে সুন্দরবন তো আইডিয়াল। তা ছাড়া আমি খানিকটা নিরিবিলিও খুঁজছিলাম। নিজের মনে কাজ করব, কেউ ডিস্টার্ব করবে না, কোনওরকম মিডিয়ার উৎপাতও থাকবে না ...। কলকাতা ফিরে বাসন্তীর এই বাড়িটার সন্ধানও পেয়ে গেলাম। ঘেরা বাড়ি, অনেকটা জমি, ঠিক যেমনটা আমি চাই। ইচ্ছে হলে ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে কলকাতাও রিচ করতে পারব, আবার নয়েজ়ি কলকাতা রিচের একটু বাইরেও থাকবে।"

"কলকাতায় তো মাঝেমাঝেই যান, নাকি?"

"যাই। মাসে এক-আধবার। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জার্নালটার্নাল ঘাঁটতে। কিংবা কেমিক্যাল রি-এজেন্টের অর্ডার দিতে।"

"গেলে নিশ্চয়ই আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেই ওঠেন?"

"না। ইউজুয়ালি নাইট হল্ট করি না। স্টে করলে গভর্নমেন্টের গেস্টহাউজেই থাকি। ওই যে, আপনাদের ঢাকুরিয়া লেকের গায়ে।"

"কেন? আত্মীয়স্বজন বুঝি আপনার পছন্দ নয়?"

"ঠিক তা নয়। নিয়ার রিলেটিভ কেউ নেই তেমন কলকাতায়।"

"আপনার ভাই থাকেন না কলকাতায়? নীলাম্বর বলছিল...?"

"বলছিল বুঝি?" সুমন্ত্র আলগা হাসলেন, "আমার ভাই প্রপার কলকাতায় কোনও দিনই থাকেনি। আর এখন তো সে চাকরির সূত্রে বাঙ্গালোরে," বলতে বলতে সুমন্ত্র অনিশ্চয়ের দিকে ফিরেছেন, "মোটামুটি সবরকম ইনফর্মেশন তো দিয়েই দিলাম। আশা করি, আপনার রিপোর্ট তৈরি করতে আর কোনও অসুবিধে নেই?"

অনিশ্চয় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আরে না না, ওগুলো তো জাস্ট ম্যাডামের কৌতূহল। আপনার মতো একজন বিজ্ঞানীর সম্পর্কে ডিটেলে জানতে কার না ইচ্ছে করে, বলুন?"

নীলাম্বর ফের আপ্যায়নে হাজির। এবার চা। সঙ্গে অমলেট, চানাচুর, সন্দেশ।

পার্থ খুশিখুশি মুখে বলে উঠল, "এই দ্যাখো, আবার এসব করতে গেলেন কেন?"

সুমন্ত্র স্মিত স্বরে বললেন, "আমাকে এটুকু প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগও দেবেন না?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অমলেটে চামচ বসাল পার্থ। অনিশ্চয় কাপ তুলে নিলেন হাতে। চায়ে চুমুক দিচ্ছেন।

হাল্‌কা সুরে জিজ্ঞেস করলেন অনিশ্চয়, "আপনার রজারের শেষ পর্যন্ত কী হল কিছু অনুমান করতে পারলেন?"

সুমন্ত্র চোখ থেকে চশমা নামালেন। কাচ ঘষতে ঘষতে বললেন, "আবার কুকুরটার কথা মনে করিয়ে দিলেন তো? ওকে ছেড়ে থাকতে আমার কী যে কষ্ট...?"

"আপনার নাকি সন্দেহ রজারকে মেরে ফেলা হয়েছে?"

"না হলে অ্যাদ্দিনে তো একটা ট্রেস পাওয়া যেত, নয় কি?"

"কে মারতে পারে বলুন তো? লোকাল কোনও রাফিয়ান টাফিয়ান?"

"হতেও পারে। স্পেসিফিক বলতে পারব না। তবে আমি শিয়োর কুকুরটাকে কেউ মেরেই ফেলেছে।"

"আপনার উপর কারও রাগটাগ ছিল কি?"

"আমার উপর?" সুমন্ত্র অবাক, "আমি থাকি আমার কাজকর্ম নিয়ে..."

"বটেই তো। স্যার কারও সাতেপাঁচে থাকেন না...। তা ছাড়া পণ্ডিত মানুষ বলে এখানকার লোকেরা স্যারকে তো খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে।"

মিতিন পেয়ালা-পিরিচ হাতে উঠে পড়েছিল। কাচের আলমারিতে রাখা মোটামোটা বিজ্ঞানের বইগুলো দেখছিল মন দিয়ে। সেখান থেকেই বলল, "আচ্ছা ডক্টর সান্যাল, আমরা কি এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে পারি?"

"কীরকম?"

"আপনার কাজটা তো ক্যান্সারের ওষুধ নিয়ে, তাই না?"

"হুম।"

"আপনি তো সাপের বিষ থেকেই...। ব্যাপারটা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। যদি একটু বুঝিয়ে বলেন..."

"ক্যান্সার রোগটা সম্পর্কে আপনার কোনও পরিষ্কার ধারণা আছে কি?"

"অল্পস্বল্প। যত দূর জানি, কারও কারও শরীরে নাকি অংকোজিন বলে এক ধরনের জিন থাকে। সেই জিনই নাকি, কোনও বিশেষ কারণে, কখনও কখনও শরীরের কোনও একটা অংশের কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। মানে..."

"পার্শিয়ালি ঠিক বললেন। তবে কারও কারও নয়, আমাদের প্রত্যেকের দেহেই থাকে প্রোটো-অংকোজিন। সেই প্রোটো-অংকোজিন যখন অংকোজিনে পরিণত হয়, তখনই ক্যান্সারের আশঙ্কা দেখা দেয়। আমি চাইছি ওই প্রসেসটাকেই আটকাতে। অর্থাৎ আমার ওষুধ হবে ক্যান্সারের প্রতিষেধক। কলেরা বা বসন্তর টিকার মতো।"

"অসাধারণ!" পার্থর স্বরে তারিফ, "তার মানে ক্যান্সারের চান্সটাই আপনি নির্মূল করে দেবেন?"

"চেষ্টা করছি। প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিয়োর।"

"বটেই তো।" মিতিনের চোখেও মুগ্ধতা, "কিন্তু স্যার, সাপের বিষ থেকে সত্যিই কি তা বের করা সম্ভব?"

"কেন নয়?" সুমন্ত্র হাসলেন, "সাপের বিষ আদতে কী? একগাদা এনজাইম, আর খুব ঘন প্রোটিনের মিক্সচার। আমার কাজের ডিটেলে না গিয়েও আমি বলতে পারি, কোনও কোনও এনজাইমকে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারলে প্রোটো-অংকোজিনকে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। অন্তত তার অংকোজিন হওয়ার প্রবণতাটাকে তো বিনষ্ট করা যায়ই। পদ্ধতিটা খুবই জটিল, তবে কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। কী, বোঝাতে পারলাম?"

"কিছুটা তো আইডিয়া হলই। কী মজুমদারসাহেব, হল না?"

অনিশ্চয় চোখ কুঁচকে শুনছিলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "তা তো হল। কিন্তু এবার যে আমাদের উঠতে হয়।"

মিতিন উৎসুক মুখে বলল, "তার আগে একবার স্যারের ল্যাবরেটরিটা দেখব না?"

টুপুরও চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছিল। মিনতির সুরে বলল, "আমি একটু সাপের ঘর দেখব। প্লিজ।"

সুমন্ত্র হাসিটাকে চওড়া করে বললেন, "খুব ইচ্ছে হচ্ছে? যাও তবে, নীলাম্বরের সঙ্গে ঘুরে এসো।"

অনিশ্চয়ের খুব একটা আগ্রহ নেই দেখার। জীবনে বহু সাপ নাকি দ্যাখা হয়ে গিয়েছে তাঁর। একবার পশ্চিমঘাট পর্বতে এক মরাঠি সাপের ছোবল খেয়েছিলেন। সাপটার নাম শুনলেই মনে হয় বেজায় রাগী। গরগর। তবে বিষটিস ছিল না, এই যা রক্ষে। সুমন্ত্র সান্যালের সঙ্গে সেই সর্পদংশনের গল্পে মেতে উঠলেন অনিশ্চয়।

টুপুররা পায়ে পায়ে ল্যাবরেটরিতে এল। বিশাল হলঘর। লম্বা লম্বা টেবিলে অজস্র কাঠের র‍্যাক। টেস্ট টিউব, ব্যুরেট, পিপেট, বিকার, ব্লো-পাইপ, জারে বোঝাই। দেওয়াল জোড়া কাচের আলমারি, ছোট বড় শিশি-বোতল আর পিচবোর্ডের বাক্সে ঠাসা। কত রঙের যে কেমিক্যাল! ঢাউস ঢাউস ফ্রিজ আছে তিনখানা, হাফ ডজন মাইক্রোস্কোপ। কাচে ঢাকা সোনালি বর্ণের ওজনযন্ত্রও আছে সারসার। আরও হরেক কিসিমের যন্ত্রপাতি। কোনওটা কাচের, কোনওটা বা ইস্পাতের, কোনওটা তামার। মিষ্টি আর কটু গন্ধের এক বিচিত্র মিশেল ম ম করছে ঘরের বাতাসে। একধারে ছোট্ট পার্টিশন, তার ওপারে কম্পিউটার। রয়েছে একখানা ঢাউস সেক্রেটারিয়েট টেবিলও। বই, কাগজপত্র আর ফাইলের স্তূপ সেখানে। টেবিলের পিছনে খুদে দরজা, ভিতরে ছোটখাটো একটা গ্যাসপ্ল্যান্টও দ্যাখা যায়। প্ল্যান্ট থেকে পাইপ বেরিয়ে টেবিলের বার্নারগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বোঝাই যায় বড়সড় কর্মযজ্ঞ চলছে গবেষণাগারে।

ঘুরতে ঘুরতে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা নীলাম্বরদাদা, সাপের বিষ কি ফ্রিজে রাখতে হয়?"

নীলাম্বর পার্থকে কী যেন দ্যাখাচ্ছিল। ফিরে বলল, "অবশ্যই। নইলে বেশিদিন গুণ থাকবে না যে! তবে ফ্রিজে ঢোকানোর আগে স্যার বিষটাকে জমিয়ে ছোট ছোট দানা করে নেন।"

"ওষুধ বুঝি ওই দানা থেকেই তৈরি হবে?"

"শুধু কি দানা! কত কী করতে হবে। পরিমাণ মতো জলে দানা গুলতে হবে। তার সঙ্গে নানা কেমিক্যাল মিশবে। তারপর মিক্সচার ফোটাও, ঠান্ডা করো, ঝাঁকাও, সেন্ট্রিফিউজে ঘোরাও, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘড়ি ধরে তাকে থার্মোস্ট্যাটে রাখো... সে ভারী জটিল ব্যাপার।"

"সব কাজ স্যার একাই করেন?"

"আমিও হাত লাগাই। সময় মেপে ফোটানো, এটা-ওটা ওজন করে মেশানো, পি এইচ মাপা...। স্যার যেভাবে বলেন, সেভাবেই সলিউশন বানাই।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তুমি লেখাপড়া কত দূর করেছ, নীলাম্বর?"

"আজ্ঞে, সায়েন্স নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিলাম। সেকেন্ড ডিভিশনে। অভাবের তাড়নায় কলেজে যেতে পারিনি। আমাকে তো স্যার প্রথমে ল্যাবরেটরির জন্যই কাজে নিয়েছিলেন। ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না, ওসব তো এখানকার মেয়েলোকেরাই করত। কিন্তু টিকতে চাইত না কেউ।"

"কেন?"

"প্রথমত, রজার। তার সঙ্গে সাপের ভয়। ঘনঘন লোক পালানো দেখে আমিই একদিন স্যারকে বললাম, 'আপনি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, এই নীলাম্বরই সব সামলে দেবে। ভারী তো দুটো লোকের রান্না আর ঘর ঝাড়পোঁছ! ঘরে অটোমেটিক মেশিন থাকলে ওগুলো আবার কাজ নাকি!' স্যার মিক্সি, মাইক্রোওয়েভ আভেন,

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, বাসন ধোওয়ার যন্ত্র, ইস্ত্রি, হিটার, কী না এনেছেন বিদেশ থেকে। কাজের মেয়েরা থাকতে দামি জিনিসগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল।"

কথা শুনতে শুনতেই টুপুরের চোখ গিয়েছে দেওয়ালে, "ল্যাবরেটরিতে ফোল্ডিং মই কেন? এখানে মই কী কাজে লাগে?"

"ওটা নতুন কেনা হয়েছে। রাজমিস্ত্রিরা যখন সারাইটারাই করছিল, তখন," নীলাম্বর ফিক করে হাসল, "মই বেয়ে উঠে এবার থেকে স্যার নাকি নিজেই এগজস্ট পরিষ্কার করবেন। খেয়াল!"

নীলাম্বরের সঙ্গে বকবক করতে করতে গবেষণাগার ছেড়ে টুপুররা বাড়ির পিছনভাগে। বাঁধানো চাতাল পেরোলে একফালি ঘাসজমি। শুকনো শুকনো মাঠটুকুর প্রান্তে, পাঁচিলের প্রায় লাগোয়া, একখানা পাকা ঘর। মেন বিল্ডিংয়ের মতো পুরনো নয়। সম্ভবত সুমন্ত্র সান্যালেরই বানানো।

ঘরটায় তালা ঝুলছিল। দরজা খুলে নীলাম্বর চাপা স্বরে ডাকল, "আসুন।"

ঢুকেই টুপুরের গা ছমছম। কী স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার রে বাবা। ঘুলঘুলি আর দরজা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, তাতে সবই কেমন আবছা আবছা। ঘরখানা বেশ ঠান্ডাও। দেওয়ালময় সারসার কাচের খাঁচা। সাপদের আস্তানা! একটা অস্পষ্ট আওয়াজও শোনা যায় যেন! হিস্‌স্‌স্‌! হিস্‌স্‌স্‌!

টুপুর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কীসের শব্দ গো মিতিনমাসি?"

"চন্দ্রবোড়া," নীলাম্বরই আগ বাড়িয়ে উত্তর দিল, "ওরা সারাক্ষণই এরকম শব্দ করে।"

"কিন্তু সাপটা কোথায়? এই অন্ধকারে দেখা যাবে?"

নীলাম্বর ঘরের একমাত্র বাতিখানা জ্বেলে দিল। বড় বাল্‌বের

আলোয় চতুর্দিক এখন মোটামুটি দৃশ্যমান। এই তো সাপগুলো! প্রায় প্রতিটি ঘরেই এক জোড়া করে। কেউ বা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে, কেউ শরীর ছেড়ে রেখেছে খড়ের বিছানায়। কোনও কোনও খাঁচায় মাটি লেপা। কোথাও বা বালি। কোনও ঘরে শুধুই পাথর।

মিতিন একখানা কাচের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ওই দ্যাখ টুপুর, ওই তোর চন্দ্রবোড়া।"

টুপুর স্থির। সত্যিই দেখবার মতো চেহারা। হাততিনেকের বেশি লম্বা নয় বটে, তবে বেশ নধরকান্তি। রং সোনালি আর বাদামির মাঝামাঝি। গায়ে বড়বড় কালচে ছোপ, যেন কোনও শিল্পীর তুলিতে আঁকা। একজন ঘুমোচ্ছে, অন্য জন ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্লথ গতিতে। অলস পাহারাদারের মতো। উঁকি দিচ্ছে চেরা জিভ, মিলিয়ে যাচ্ছে পরমুহূর্তে।

নীলাম্বর বলল, "এরা কিন্তু পুরোদস্তুর জোয়ান। বয়স প্রায় আড়াই বছর।"

"সাপ বাঁচে কত দিন?"

"ঝোপেঝাড়ে বনেজঙ্গলে নিজের মতো ঘুরে বেড়াতে পারলে বিশ-পঁচিশ বছর। তবে এই বদ্ধ জায়গায় বছর চার-পাঁচের বেশি টেকে না।"

আহা রে, বন্দি থাকার দুঃখে আয়ু কমে যায়? টুপুরের সাপগুলোর জন্য ভারী মায়া হল। তবে মানুষের উপকারে লাগছে, এও বড় কম কথা নয়!

চন্দ্রবোড়ার পাশে গোখরোর বাড়ি। দৈর্ঘ্যে চন্দ্রবোড়ার মতোই, তবে এরা বেশ ছিপছিপে। চওড়া মাথা, ফণায় দুটো গোল গোল দাগ। দেখে মনে হয় চশমা পরে আছে। শঙ্খচূড় জুটি তো রাজারানির মেজাজে শুয়ে। চমৎকার স্বাস্থ্য, লম্বাতেও কিছু না হোক

ফুটদশেক তো হবে। তুলনায় গেছোবোড়া কিংবা বংকোরাজ নেহাতই খুদে। গেছোবোড়ার রং শ্যামলা। বংকোরাজ বাদামি। চিতিসাপের গাত্রবর্ণ ইস্পাতনীল, সাইজ কেউটে-গোখরোর কাছাকাছি। তবে সবচেয়ে সুন্দর বুঝি শঙ্খিনী। কুচকুচে কালোর উপর চওড়া চওড়া হলদে ডুরে। তেল-চকচক চামড়ায় রং যেন পিছলোচ্ছে। এই গোত্রের সাপ কি আগে চিড়িয়াখানায় দেখেছে টুপুর?

পার্থ আর নীলাম্বরের কথা চলছে টুকটাক। জ্ঞান ভাণ্ডার বাড়াচ্ছে পার্থ।

"কোন সাপের বিষ সবচেয়ে মারাত্মক গো নীলাম্বর?"

"কেউ কারও চেয়ে কম যায় না দাদা। কেউটে, গোখরো, চিতি, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় সবাই তুল্যমূল্য। তবে শঙ্খচূড় সাইজে বড় তো, তাই একবারে বেশি বিষ ঢালতে পারে।"

"কোন বয়স থেকে বিষ আসে সাপের?"

"বিষধর সাপ জন্ম থেকেই বিষধর। ছোট অবস্থায় বিষের পরিমাণটা কম থাকে, এই যা।"

"কেউটে কামড়ালে নাকি ঘুম পায় খুব?"

"হ্যাঁ দাদা। আর চন্দ্রবোড়ার বিষে শরীরে জ্বালাপোড়া ধরে। স্যার যখন ইঁদুরদের চন্দ্রবোড়ার বিষ ইঞ্জেকশন দ্যান, ইঁদুরগুলো যা ছটফট করে না!"

"তোমাদের ইঁদুরগুলো কোথায়?"

"খাঁচায় আছে। ল্যাবরেটরির ওপাশের ঘরটায়। যাবেন দেখতে?"

"থাক গে। আমার বউবাজারের প্রেসে যথেষ্ট ধেড়ে ইঁদুর দেখি রোজ। ...তা তোমাদের সাপেরা খায় কী?"

"দুধ, আরশোলা, টিকটিকি, পোকামাকড়। বর্ষাকালে ব্যাং এনে দিই। চিতিসাপের জন্য হেলে সাপও ধরে আনা হয়।"

"কে দেয় খাবার? তুমি? না স্যার?"

"আমিই দিই।"

"ভয় করে না?"

"প্রথম প্রথম লাগত। তারপর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সাপ যদি ফণা তোলে, তা হলে কীভাবে তাকে ঘায়েল করতে হবে, সে কায়দাও মঙ্গলমেসো আমায় শিখিয়ে দিয়েছে।"

"তোমার মঙ্গলমেসো কদ্দিন পর পর সাপ দিতে আসেন?"

"সাপ আর বছরে ক'টাই বা কেনা হয়! মঙ্গলমেসো তো আসে বিষ বের করতে। মাসে একবার তো বটেই। এ মাসে সময় হয়ে গিয়েছে, আজ-কালের মধ্যেই আসবে।"

"বলো কী? প্রত্যেক মাসে বিষ বের করতে হয়?"

"হ্যাঁ। বেরিয়ে গেলে আবার এক মাসের মধ্যেই সাপের থলিতে বিষ জমে যায়। এই গরমকালে বিষ পাওয়া যায় পরিমাণে বেশি। তবে শীতের বিষ কিন্তু অনেক অনেক কড়া। স্যার বলেন।"

টুপুর হাঁ করে শুনছিল কথাগুলো। মিতিনও। হঠাৎই বাইরে অনিশ্চয়ের গলা, "কী হল, আপনারা যাবেন না? এরপর কিন্তু বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। আমার মানিকচাঁদকে কিন্তু সন্ধের পর তিরিশের বেশি স্পিড তুলতে দেব না!"

সাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সকলে। নীলাম্বর তালা লাগাচ্ছে দরজায়।

পার্থ হালকা সুরে বলল, "দারুণ জিনিস মিস করলেন কিন্তু আই জি সাহেব। এত ভ্যারাইটির বিষধর সাপ চিড়িয়াখানার বাইরে সচরাচর মেলে না।"

"আমাদের লকআপে মশাই অনেক বেশি ভ্যারাইটির সাপ আসে।" অনিশ্চয় পালটা ঠাট্টা জুড়লেন, "আমাকে তো শুধু ফুর্তির

প্রাণ গড়ের মাঠ করলে চলবে না। একটা কাজের কাজ সারতে হল। ঝটাপট রিপোর্ট বানিয়ে, সুমন্ত্রবাবুকে শুনিয়ে, কাউন্টার সাইন করিয়ে, একটা কপি ভদ্রলোকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছি। এবার গিয়ে মিনিস্টারের টেবিলে কাগজটা পাঠিয়ে দেব। ব্যস, আমি দায়মুক্ত। শুধু বাসন্তী থানাটাই যা বাকি। ওদের একটু না রগড়ালে ঠিক সুখ হচ্ছে না, বুঝলেন!"

"চলুন তবে। কেন আর মন খুঁতখুঁত থাকে!"

সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ি থেকে রওনা দেওয়ার আগে মিতিন জনসংযোগ সেরে নিল। ভ্যানিটিব্যাগ থেকে তার 'থার্ড আই'-এর ভিজিটিং কার্ড বার করে ধরিয়ে দিল সুমন্ত্রকে। জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকা নীলাম্বরকেও বঞ্চিত করল না।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে সুমন্ত্র ভদ্রতা করে বললেন, "থাক কাছে। কাজে তো লাগতেও পারে। ... আর আই জি সাহেব, আপনার ফোন নম্বরটা.... ?"

"আপনার কাছে আছে তো। রজারের ব্যাপারে ফোন করেছিলেন না?"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে।"

"তা হলে ওই কথাই রইল? এবার নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে আমাকে একটা ফোন করে যাবেন! হা হা হা।"

বেলা পড়ে গিয়েছে। রোদ্দুরের আর ঝাঁঝ নেই তেমন। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে গাছগাছালি। গেটের বাইরে এসে পার্থ বলল, "বেড়ে কাটল কিন্তু দিনটা।"

"সে আর বলতে!" অনিশ্চয়ের মেজাজও সরেস, "নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, অপহৃত বিজ্ঞানীর সশরীরে প্রত্যাবর্তন, বাসন্তী ভ্রমণ..."

"তারপর ধরুন সর্পদর্শন!" বলেই পার্থ দাঁড়িয়ে পড়েছে। মিতিন

কিছুটা পিছিয়ে, হাতে কী একটা নিয়ে যেন দেখছে চোখ কুঁচকে। পার্থ জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী?"

"একটা লোকাল ট্রেনের টিকিট। মল্লিকপুর থেকে ক্যানিং।"

"কুড়িয়ে পেলে?"

মিতিন জবাব দিল না। অন্যমনস্ক মুখে টিকিটটা রেখে দিল ব্যাগে।

খানিক আগে জোর একটা কালবৈশাখী হয়ে গেল। উথালপাথাল বাতাস, চোখজ্বালানো ধুলোর ঝড়, চিড়িক চিড়িক আকাশচেরা বিদ্যুৎ, কানফাটানো মেঘগর্জন, আর তার পিছুপিছু ঝমঝমাঝম বৃষ্টি। বেশিক্ষণ নয়, বড়জোর আধঘণ্টা। তাতেই দিনমানের গনগনে তাপ বেবাক উধাও।

বৃষ্টি থামার পরপরই প্রেস থেকে ফিরল পার্থ। দরজা খুলেই টুপুর হেসে খুন। এ কী কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি হয়েছে পার্থমেসোর! ছ্যাদরাব্যাদরা চুল, মাথা বেয়ে জল গড়াচ্ছে, শার্ট-প্যান্ট ভিজে লেপটে গেছে গায়ে! পুরো ভেজা কাকের মতো হাল!

টুপুর হাসতে হাসতে বলল, "এ মা, এত ভিজলে কেন? কোথাও দাঁড়িয়ে যেতে পারতে।"

"বলে লাভ নেই টুপুর।" মিতিন পিছন থেকে ফোড়ন কাটল, "তোর মেসো খুব বীরপুরুষ। বৃষ্টি নামলে রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে হাঁটতে ভালবাসে। তারপর বাড়ি ফিরেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো। এবং মুড়িসুড়ি দিয়ে বিছানায়।"

পার্থ হেসে বলল, "আহা, সে সৌভাগ্য কি এবারও হবে? জ্বরে পড়ে সোমবার পর্যন্ত যদি লেটে থাকতে পারি..."

"তা হলে সেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ছেলেগুলোকে তিন দিন আরও ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাই তো?"

"এই যাঃ! টিকটিকির নাক ঠিক মতলবটার গন্ধ পেয়ে গিয়েছে! ...কী করি বলো, কম্পোজিটারবাবুর আজও পাত্তা নেই। সারাদিন তো তার পথ চেয়েই বসে ছিলাম।"

"বুঝেছি। যাও, এখন ভাল করে স্নান সেরে নাও। আর কাদামাখা জামাকাপড়গুলো বাথরুমে ফেলে রেখো না। ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ো দয়া করে।"

মিনিটদশেকের মধ্যে পার্থ ফুলবাবুটি হয়ে ডাইনিং টেবিলে হাজির। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, চুলটুল আঁচড়ে। চেয়ারে বসে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, "বেশ জম্পেশ একটা খাওয়াদাওয়া চলছে মনে হচ্ছে?"

"ইয়েস। গরমাগরম আলুর চপ, পেঁয়াজি, আর পাফ্‌ড রাইস। সাহেবের কি মুড়ি চলবে?"

"সঙ্গে একটা কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যাবে কি? আর দো বুঁদ আচারের তেল?"

"মিল যায়গা।"

ব্যস, সান্ধ্য আসর জমজমাট। এ-কথা ও-কথা থেকে উঠে এল গতকাল বাসন্তী ভ্রমণের প্রসঙ্গ। টুপুর আপশোস করে বলল, "কাল কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মিস হয়ে গেল।"

পার্থ পেঁয়াজিতে কামড় বসিয়ে বলল, "কী রে?"

"বাসন্তীর চার্চটা। সামনে দিয়ে এলাম গেলাম, অথচ একবার ঢোকা হল না।"

"কী আর নতুন দেখতিস? বড়জোর কয়েকটা পেন্টিং, তাও

তেমন কিছু হয়তো দরের হবে না। আর কিছু রঙিন কাচের কারুকাজ। যা কলকাতার গির্জায় আকছার দেখা যায়। আমাদের এখানে সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালে যা আছে, তার তুলনায় ও তো নস্যি।”

মিতিন বলল, “অত হেলাফেলা কোরো না। মনে রেখো, সুন্দরবনের প্রত্যেকটা গির্জারই একটা ইতিহাস আছে। সুন্দরবন একসময় ছিল জলদস্যুদের আড্ডা। পর্তুগিজ হার্মাদরা জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে ওই অঞ্চলের নদীতে-নদীতে চরে বেড়াত। যাত্রীবোঝাই কিংবা কোনও মাল-ভরতি নৌকো তাদের নজরে এলে আর রক্ষে নেই। সর্বস্ব তো কেড়ে নিতই, সামান্যতম বাধা পেলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিত। এই হার্মাদদের বসতির ধ্বংসাবশেষ এখনও সুন্দরবনের দ্বীপগুলোতে পাওয়া যায়। এদের উৎপাত একসময় এত বেড়েছিল, দিল্লির মুঘল বাদশাহরা পর্যন্ত ওদের টিট করতে ফৌজ পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল।”

পার্থ বলল, “তুমি কি বলতে চাও বাসন্তীর চার্চও হার্মাদদের তৈরি?”

“তা ঠিক জানি না। তবে পর্তুগিজ জলদস্যুরা বেঙ্গলে বেশ কিছু গির্জা বানিয়েছিল। তার মধ্যে একটা তো এখনও বেশ দাপটের সঙ্গে টিকে আছে। ব্যান্ডেল চার্চ। হুগলি নামটাও পর্তুগিজদের দেওয়া। হুগলি শব্দটা এসেছে পর্তুগিজ উগোলিম্‌ থেকে।”

“অ্যাই, জ্ঞান মেরো না তো। তার চেয়ে বরং একটা কাজের কাজ করো। চলো, আমরা নেক্সট উইকে একটা সুন্দরবন ট্রিপ মেরে আসি।”

“গ্র্যান্ড আইডিয়া!” টুপুর লাফিয়ে উঠল, “আমরা কি গোটা টুরটাই লঞ্চে ঘুরব?”

“অবশ্যই। সজনেখালিতে রাত্রিবাস, আর দিনভর লঞ্চে টো টো। সুধন্যখালি, বড় চামটা, ছোট চামটা, ভাগবতপুরের কুমির প্রকল্প,

নেতি ধোপানির ঘাট....। একটা নাইট পাখিরালয়ের টুরিস্ট লজেও থাকতে পারি।”

“সুধন্যখালিতে মঙ্গল থাকে না? নীলাম্বর দাদার মেসো?”

“গুড মেমরি।” পার্থ মাথা দোলাল, “সুন্দরবনে মানুষ আর জীবজন্তু প্রায় পাশাপাশি বাস করে। যেতে যেতে দেখবি নদীর পারে কুমির রোদ পোয়াচ্ছে, তার খানিক তফাতেই হয়তো লোকে চিংড়িমাছের মীন, মানে বাচ্চা ধরছে।”

“কপালে থাকলে বাঘও চোখে পড়তে পারে।”

“সুন্দরবনে বাঘ দেখলে নাকি ফিরে এসে গল্প করার আর চান্স পাওয়া যায় না।” পার্থ হ্যা হ্যা হাসল, “সুন্দরবনের আসল অ্যাট্রাকশন কিন্তু বাঘ নয় রে টুপুর। ওই জঙ্গলটাই মেন দ্রষ্টব্য। অমন বেঁটেবেঁটে গাছে ভরা ফরেস্ট খুব কম দেখতে পাবি। গাছগুলোর অ্যাভারেজ হাইট দশ-বারো ফিটের বেশি নয়। ম্যানগ্রোভ ট্রি। জল থেকে উঠে এসেছে ডাঙায়। সুন্দরী, হেঁতাল, গরান...। সুন্দরী গাছের আড়ালে বাঘ লুকিয়ে থাকে। আর হেঁতালের ডাল হাতে থাকলে সাপ নাকি কাছে ঘেঁসে না।”

“সুন্দরী গাছের থেকেই জঙ্গলটার নাম সুন্দরবন হয়েছে, না?”

“এ নিয়ে আরও কিছু মত আছে।” পার্থ বিজ্ঞের মতো বলল, “তোকে তো বলেইছিলাম, সুন্দরবনের মেন পার্ট পড়ে বাংলাদেশে। ওখানে সুন্দরবন হল বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে। ওই বাখরগঞ্জ জেলায় এক নদী আছে, নাম সুঞ্জা। নদীটার নাম থেকেই নাকি...”

“তুমিও তো দেখছি দিব্যি জ্ঞানভাণ্ডার খুলে বসলে!”

“এ তো শুধুই উপক্রমণিকা। ভূরিভোজের আগে শাকপাতা। এরপর তো আস্তে আস্তে মেন কোর্সে ঢুকব। সুন্দরবনের ভূগোল-ইতিহাস, সেখানকার জীবজন্তুদের স্বভাব...”

“থামো। কাল তো ফিরেই ভোঁসভোঁস নাক ডাকালে, কোনও

কথাই হল না," মিতিন গুছিয়ে বসল, "আগে বলো, কাল বিজ্ঞানীর বাড়ি কেমন দেখলে?"

"দারুণ। চমৎকার মডার্ন ল্যাবরেটরি। কোথাও এতটুকু অগোছালো ভাব নেই। চোখ বোলালেই বোঝা যায় ডক্টর সান্যালের কাজকর্ম খুব সিস্টেমেটিক।"

টুপুর ফোড়ন কাটল, "স্নেকরুমটার কথাও বলো।"

"অবশ্যই। এরকম একখানা সাপের আড্ডা বানানো কি মুখের কথা! ভদ্রলোক অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে গবেষণায় নেমেছেন। পাছে লোডশেডিংয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটে তার জন্য সোলার এনার্জির বন্দোবস্তও করা আছে।"

"উম। আর মানুষটাকে লাগল কেমন?"

"কাজপাগল। খুবই ডেডিকেটেড। যাকে বলে বিজ্ঞানে নিবেদিতপ্রাণ। দেশকে সত্যি সত্যিই খুব ভালবাসেন। নইলে কেউ বউ-মেয়ে ফেলে আমেরিকা থেকে এসে ওরকম একটা অগা জায়গায় বছরের পর বছর রিসার্চে ডুবে থাকতে পারেন?"

"যাই বলো পার্থমেসো, ডক্টর সান্যাল একটু খ্যাপাও আছেন। না হলে কাউকে কিছু না বলে ওরকম হুট করে কেউ ঘাটশিলা চলে যায়?"

"প্রকৃত বিজ্ঞানীরা ওরকমই হয় রে টুপুর। নিল্‌স বোরের নাম শুনেছিস? আধুনিক বিজ্ঞানের একটা পিলার। জটিল কোনও সমস্যা মাথায় এলে তিনি রাতদুপুরে আর-এক বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের বাড়িতে হানা দিতেন। তারপর সারারাত ধরে অঙ্ক নিয়ে কুস্তি চলত দু'জনে। ঘর-সংসার, ইহজগৎ সব তখন তাঁদের মাথা থেকে উধাও। পরমাণু বোমা তৈরির সময়..."

"ফের গপ্পো জুড়লে?" মিতিন থামাল পার্থকে, "আমরা সুমন্ত্র সান্যালকে নিয়ে কথা বলছি। নিল্‌স বোরকে নিয়ে নয়।"

"তো?"

"সুমন্ত্র সান্যালের চ্যালাটিকে কেমন লাগল? শ্রীমান নীলাম্বর?"

"ভক্ত হনুমান। স্যারের অত্যন্ত অনুগত। এবং ডক্টর সান্যালের সান্নিধ্যে এসে বেশ কেতাদুরস্ত বনে গিয়েছে। চুলের কায়দাটা দেখেছিলে?"

"বিশ্বাসী বলেই তো মনে হয়। তাই না?"

"কথাবার্তা শুনে তো সেরকমই লাগল। তবে বাড়ির পুরো কন্ট্রোলটাই তো ওর হাতে, স্যারের পয়সাকড়ি সরায় কিনা বলতে পারব না।"

আলোচনায় ছেদ পড়ল। টেলিফোন ঝংকার তুলেছে। ভুরু কুঁচকে উঠে গেল মিতিন। টেবিলে ফিরল মিনিটপাঁচেক পর। ঈষৎ আনমনা হয়ে।

পার্থ কৌতূহলী মুখে জিজ্ঞেস করল, "কার ফোন ছিল?"

ভারতী কফি রেখে গিয়েছে টেবিলে। আলগা চুমুক দিয়ে মিতিন বলল, "অনিশ্চয়বাবু।"

"কী সমাচার?"

"আবার বাসন্তীতে অশান্তি।"

"তাই নাকি? কী হল?"

"কাল রাতে ডক্টর সান্যালের বাড়িতে চোর এসেছিল। আজ সকালে নীলাম্বর গিয়ে পুলিশে রিপোর্ট করেছে। বাসন্তী থানা দুপুরেই আই জি সাহেবকে জানিয়েছিল। উনি আমায় এখন নিউজ়টা কমিউনিকেট করলেন।"

"ও। কী চুরি গেছে?"

"যায়নি কিছু। চোরের পায়ের আওয়াজ পেয়েই নীলাম্বরের নাকি ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে 'কে-কে' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই চোর ভাগলবা।

"তেমন সিরিয়াস কিছু নয় তা হলে?"

"অনিশ্চয়বাবুরও সেই রকমই মত। তবে উনি কোনও চান্সে যেতে চান না। কাল থেকে পুলিশ গার্ডের বন্দোবস্ত করতে বলেছেন থানাকে। অন্তত রাতে যেন ডক্টর সান্যালের বাড়ির নিরাপত্তা কোনওভাবে না বিঘ্নিত হয়।"

"ঠিকই করেছেন। ভি আই পি-টি আই পি'র বাড়িতে একটু পাহারা থাকা ভাল। কোত্থেকে কী ঘটবে, মন্ত্রীমশাই আবার অনিশ্চয়বাবুর প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবেন।"

"হুম!"

বলেই মিতিন পুরোপুরি চুপ। নিঃশব্দে কফি শেষ করে চলে গেল ব্যালকনিতে। ঘুরে এসে অদূরে সোফায় বসেছে। দু'মিনিটও সুস্থির থাকল না, উঠে টিভি চালিয়ে একের পর এক চ্যানেল ঘোরাচ্ছে রিমোটে। ঝুপ করে টিভি অফ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বুমবুম কী একটা বলতে যাচ্ছিল, 'আহ' বলে তাকে থামিয়ে ফের গিয়েছে ব্যালকনিতে।

টুপুরের কেমন যেন লাগছিল। সামান্য একটা খবরে এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন জাগল মিতিনমাসির?

পায়ে পায়ে টুপুর ব্যালকনিতে এল। মিতিনমাসি চিন্তায় ডুবে থাকলে ডাকতে সাহস হয় না, কোনওক্রমে গলা ঝেড়ে বলল, "কী হল গো মিতিনমাসি? এত কী ভাবছ?"

দূরমনস্কভাবে মিতিন বলল, "কয়েকটা ঘটনাকে সুতো দিয়ে গাঁথার চেষ্টা করছি।"

"কীরকম?"

"একটা জলজ্যান্ত ডোবারম্যান ভ্যানিশ হয়ে গেল। তারপর ডক্টর সান্যাল কয়েকদিনের জন্য মিস্টিরিয়াসলি বেপাত্তা হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে আসার পরদিনই চোর এল রাত্তিরে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে

কোনও সম্পর্ক নেই তো? আমরা ধরেই নিতে পারি, ডোবারম্যানটাকে কেউ না-কেউ মেরে ফেলেছে এবং সরিয়েও দিয়েছে। অর্থাৎ যে বা যারা মেরেছে, তারা চায়নি কুকুরের ডেডবডিটা প্রকাশ্যে পড়ে থাকুক। আর তা নিয়ে একটা ব্যাপক শোরগোল উঠুক। কিন্তু কে সে? নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ ছিঁচকে চোর নয়? সে কী চায়?"

টুপুর ধন্দমাখা মুখে বলল, "কী চাইতে পারে?"

"এমন নয় তো, ডক্টর সান্যাল অলরেডি ক্যান্সারের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছেন? বিশেষ কোনও কারণে আপাতত খবরটা গোপন রাখতে চান? যদি সত্যিই ফর্মুলা আবিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকে, তার মূল্য কিন্তু কম নয়। লাখ ছাপিয়ে দাম কোটি টাকাতেও পৌঁছোতে পারে," মিতিন দু'-এক সেকেন্ড নীরব থেকে হঠাৎই বিড়বিড় করে উঠল, "তা হলে কি আর কেউ আবিষ্কারের খবর জেনে ফেলেছে। নীলাম্বর বলছিল তিনটে লোক ডক্টর সান্যালের কাছে এসেছিল। তাদের সঙ্গে ডক্টর সান্যালের ঝগড়াঝাটি হয়। লোক তিনটে কে? তারাই কি কালপ্রিট? লোকগুলো কি লোভ বা ভয় দেখিয়ে ডক্টর সান্যালের কাছ থেকে ফর্মুলা আদায় করতে এসেছিল? সেদিন সুবিধে করতে না পেরে তারপর থেকে কোনও একটা ডেফিনিট ছক কষে এগোচ্ছে তারা? রজারের ইনসিডেন্টটা তাদের ফার্স্ট স্টেপ?"

"তার মানে তারাই রজারকে মেরেছে?"

"অসম্ভব নয়। তারা জানে ফর্মুলা হাতানোর জন্য বাড়িতে লুকিয়েচুরিয়ে ঢুকতে গেলে রজারই প্রথম বাধা। সুতরাং নিঃসাড়ে রজারকে হঠিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। এবং এভাবে ডক্টর সান্যালকে একটা মোক্ষম শাসানিও দেওয়া গেল।"

"কিন্তু আবিষ্কারের কথা বাইরের লোক জানবে কী করে?"

"ঘরের লোক জানালেই জানতে পারে।"

"মানে... তুমি বলছ... নীলাম্বর...!" টুপুর থতমত খেয়ে গেল, "কী করে হয় মিতিনমাসি?"

"সবই হতে পারে রে টুপুর। লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস। লোভের ফাঁদে পা পড়লে মানুষের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়। ভুলে যাস না, নীলাম্বর গরিব ঘরের ছেলে। মোটা টাকার টোপ দিলে তার মাথা বিগড়ে যেতেই পারে।"

"তবু... তবু...," টুপুর তাও মানতে পারছিল না, "নীলাম্বর যদি দলে থাকে, তা হলে রজারকে মারার দরকার কী? নীলাম্বর নিজেই তো ফর্মুলাটা পাচার করতে পারে।"

"নীলাম্বর হয়তো শুধু আবিষ্কারের খবরটুকুই জানে। কিন্তু ফর্মুলাটার হদিশ তার কাছে নেই! কিংবা হয়তো প্রতিষেধক বানানোর প্রসেসটা এমনভাবে কম্পিউটারে ফিড করা আছে, যা উদ্ধার করার বিদ্যে নেই নীলাম্বরের। এবং তার জন্য দরকার অন্য কোনও পাকা মাথা। সেই ধরনের কাউকে বাড়িতে এন্ট্রি দিতেই...," বলেই মিতিন ঘাড় নাড়ছে দু'দিকে, "উঁহু, এ যুক্তিও ধোপে টেকে না। ডক্টর সান্যাল তো মাঝে ক'দিন ছিলেন না, ওই সময়ই তো সব তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজির কাজটা সারা যেত। তা ছাড়া সে নিজে গিয়ে থানায় মিসিং ডায়েরি লিখিয়েছে। আপত্তিকর তিনটে লোক এসেছিল সে গল্পও যেচে করল আমাদের কাছে...। তারপর ধর, আবিষ্কার যদি হয়ে গিয়েই থাকে, ডক্টর সান্যাল কি সেটা বাড়িতে রেখে বেমালুম চলে যাবেন? তাও আবার এমন এক সময়ে, যখন তিনি রজারকে হারিয়ে যথেষ্ট ইনসিকিয়োর ফিল করছেন! তা হলে কি তিনি ফর্মুলাটা সঙ্গে নিয়েই সেমিনারে গিয়েছিলেন? সেখান থেকে ঘাটশিলা? ...উঁহু, এ থিয়োরিটাও যেন কেমন কেমন লাগছে!"

"তা হলে?"

"কোথাও একটা জট পাকিয়ে আছে, বুঝলি।" মিতিন মাথা ঝাঁকাল, "নাঃ, কাল একবার বাসন্তী ঘুরেই আসি। ডক্টর সান্যাল সত্যিই যদি বিপদে পড়ে থাকেন, তাঁর পাশে তো দাঁড়ানো উচিত।"

"ঠিকই তো। চলো, আমিও যাব সঙ্গে।"

"চল, কাল ভোরভোরই বেরিয়ে পড়ি। এবার আর বাসরুট নয়। ভেঙে ভেঙে যাব। ট্রেন ধরে প্রথমে ক্যানিং। সেখান থেকে ভুটভুটিতে ডকের খেয়া। তারপর অটো ধরে সোনাখালি। শেষে পুরন্দর পার হয়ে বাসন্তী। সময়ও কম লাগবে, জার্নিও একটু অন্য রকম হবে।"

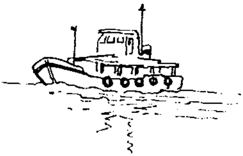

টুপুর আর মিতিন বাসন্তী পৌঁছোল সকাল ন'টা নাগাদ। পথে অনেকবার যান বদল করতে হলেও কষ্ট হয়নি বিশেষ। কাল ঝড়-বৃষ্টি হয়ে সকালটাও আজ বেশ মনোরম। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, যেন বসন্তকাল।

ঘাটে নেমে টাটকা মেজাজে সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল মাসি-বোনঝি, কাছাকাছি এসে হঠাৎই হকচকিয়ে গেছে দু'জনে। গেটের সামনে অত ভিড় কেন? কীসের এত গুলতানি হচ্ছে? কী ঘটল রে বাবা?

জটলার সামনে আসতেই দু'-চারটে বাক্য উড়ে এল টুপুরের কানে।

"আহা, বেঘোরে মারা গেল রে বেচারা!"

"একেই বলে মা মনসার লীলা, বুঝলে! দিনরাত যে সাপের সেবা করে, তাকেই কিনা সাপের ছোবল খেতে হল!"

"বড় ভাল ছিল গো ছেলেটা! কী মিষ্টি ব্যবহার, সদাসর্বদা হাসিমুখ... !"

"নিয়তির লিখন হে, নিয়তির লিখন! কার কপালে কীভাবে যে মৃত্যু থাকে!"

টুপুর আর মিতিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। টুপুর অস্ফুটে বলল, "কাকে সাপে কেটেছে? নীলাম্বরদাদাকে?"

মিতিন নিচু গলায় বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

স্থানীয় মানুষদের কিছু জিজ্ঞেস করল না মিতিন। ভিড় পেরিয়ে, গেট টপকে ঢুকে পড়ল কম্পাউন্ডের ভিতরে। তখনই চোখে পড়ল নীলাম্বরের কাদামাখা দেহটাকে। আমগাছের তলায় শোয়ানো। পরনে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। চার-পাঁচটা অল্পবয়সি ছেলে বসে আছে মৃতদেহের পাশে।

টুপুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আটচল্লিশ ঘণ্টাও হয়নি যার সঙ্গে অত গল্প করে গেল, কালও যার খবর পেয়েছে, আজ আর সে নেই? এই লোকটাকে নিয়েই না কাল রাতে তারা কত জল্পনাকল্পনা করেছে!

ঘোর-লাগা পায়ে মিতিনের সঙ্গে আমগাছের কাছে এগোচ্ছিল টুপুর। একটা কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে নীলাম্বরের পাশ থেকে উঠে এল আচমকা। থমথমে গলায় মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "দিদি, আপনারা তো পরশুই এসেছিলেন, তাই না?"

"হুঁ।" মিতিন আপাদমস্তক জরিপ করল ছেলেটাকে। ভারী গলায় বলল, "কেন বলুন তো?"

"না... আপনাদের সেদিন দেখেছিলাম... সঙ্গে আরও দু'জন ছিলেন..."

"আপনার পরিচয় কিন্তু এখনও পাইনি।"

"আমি রতন। রতন হেনরি মণ্ডল। এই তো, সামনেই চার্চে কাজ করি। নীলাম্বরদা আমাদের চার্চে খুব যেত। ফাদার, ব্রাদার সকলের সঙ্গেই পরিচয় ছিল নীলাম্বরদার। আমরা প্রত্যেকেই এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।"

"ও।" মিতিন স্থির চোখে তাকাল, "তা দুর্ঘটনাটা ঘটল কখন?"

"মনে হয় শেষ রাতে। কিংবা কাকভোরে।" রতনের স্বর ধরাধরা, "চার্চের পিছনভাগে গাঙের পারে পড়ে ছিল দেহটা। প্রথম দেখতে পান ফাদার ম্যাথু। তখন সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছ'টা হবে। রোজকার মতো মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন, তখনই...। ঘাবড়ে গিয়ে ফাদার চেঁচামিচি শুরু করে দেন। আমরাও পড়িমরি করে গিয়ে দেখি, উপুড় হয়ে পড়ে আছে নীলাম্বরদা।"

"তখনও কি প্রাণ ছিল?"

"না দিদি। শরীর তখনই বরফের মতো ঠান্ডা। মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে।"

"তা সাপে কেটেছে বুঝলেন কী করে?"

"ডান গোড়ালিতে দাঁতের দাগ আছে দিদি। নীলাম্বরদার স্যার তো দেখে বললেন চন্দ্রবোড়া।"

"পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?"

"ফাদার তো তখনই চার্চ থেকে ফোন করলেন থানায়। আর আমি ছুটে এলাম এ-বাড়ির স্যারকে খবর দিতে। উনি তখন ঘুমোচ্ছেন। খবরটা শুনে উনি প্রথমটা তো একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আমিই স্যারকে প্রায় ধরেধরে গাঙপারে নিয়ে গেলাম। বড্ড ভেঙে পড়েছেন স্যার। কান্নাকাটি করছেন।"

কথার মাঝেই নীলাম্বরের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছে মিতিন।

পরখ করছে পায়ের ক্ষতটাকে। দেখতে দেখতেই জিজ্ঞেস করল, "এখানে বডি আনল কে? পুলিশ?"

"সঙ্গে পুলিশের লোক ছিল। তবে আমরাই ধরাধরি করে..."

"ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে?"

"চেম্বার খুললে ডাক্তারবাবু গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছেন।"

"কোন ডাক্তার? কোথায় চেম্বার?"

"সামন্ত ডাক্তার। ফেরিঘাটের কাছেই বসেন। বাজারটায়।"

"নীলাম্বরের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?"

"পুলিশ মেসেজ পাঠিয়েছে। স্যারও বোধহয় ফোন করেছেন ন্যাজাটে। নীলাম্বরদার বাপ-দাদা এসে দেহ দাহ করবে। নীলাম্বরদার এক মেসো আছে সুধন্যখালিতে, তার কাছেও লোক চলে গিয়েছে।" রতন নাক টানল, "কী একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গেল বলুন তো দিদি! নীলাম্বরদার রোজগারপাতির উপরে বাড়ির লোকরা অনেকটা ভরসা করে থাকত, ওরাও কী বিপদে পড়ে গেল ভাবুন।"

মিতিন উঠে পড়ল। শুকনো গলায় বলল, "সে আর কী করা যাবে! দুর্ঘটনার ওপর তো কারও হাত নেই।"

রতন নিচু স্বরে বলল, "একটা কথা বলব দিদি?"

"কী?"

"স্যারের সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই খুব চেনাজানা। স্যারকে একটু বলবেন, নীলাম্বরদার ফ্যামিলির কথাটাও তিনি যদি একটু ভাবেন..."

"বলব।"

আর কথা না বাড়িয়ে টুপুরকে নিয়ে মোরাম বিছানো পথ পার হল মিতিন। বারান্দায় উঠে খানিক ইতস্তত করে ঢুকে পড়েছে অন্দরে।

সুমন্ত্র সান্যাল বাইরের ঘরেই ছিলেন। সোফায়। পায়ের আওয়াজ

পেয়ে চোখ থেকে হাত সরিয়েছেন। ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, "একী? আপনারা? কী করে খবর পেলেন?"

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "হঠাৎই কিছু কৌতূহল নিরসনের জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি এইসব কাণ্ড ঘটে বসে আছে।"

বিস্ময়টাকে যেন খানিকটা সামলে নিলেন সুমন্ত্র। কষ্টের গলায় বললেন, "তাই বলুন। আমি তো ভাবছিলাম এ দেশের পুলিশ ডিটেকটিভ এত প্রম্প্ট হল কবে থেকে, যে মানুষ মরতে না-মরতে কলকাতা থেকে বাসন্তী পৌঁছে গেল! ...বসুন।"

সোফায় বসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মিতিন। তারপর মৃদু গলায় বলল, "শুনলাম আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন..."

"হুঁ।" সুমন্ত্র একটা শ্বাস ফেললেন, "ছেলেটা আমার বড় আপন হয়ে গিয়েছিল। ওকে আমি নিজের ভাইয়ের মতো দেখতাম।"

"বুঝতে পারছি।" মিতিন সামান্য ঝুঁকল, "আমি কি আপনাকে একটা-দুটো প্রশ্ন করতে পারি? অ্যাবাউট দিস মিসহ্যাপ?"

"করুন।"

"নীলাম্বর ভোরবেলা হঠাৎ পুরন্দরের ধারে গেল কেন?"

"কী জানি, আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না। আমি বরাবরই লেট রাইজার। অনেক রাত অবধি জাগি তো, সাড়ে সাতটা-আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না," সুমন্ত্র গলা ঝাড়লেন, "তবে নীলাম্বর খুব সকাল সকালই উঠত। ঘরের টুকটাক কাজকর্ম সারত, বাগানের দেখভাল করত... কে জানে, হয়তো রাস্তাঘাটে একটু হেঁটেও আসত। কিংবা হয়তো আজই বেরিয়েছিল নিয়তির টানে।"

"হুঁ, বড় প্যাথেটিক ডেথ।"

"আমার মনটাও রিয়্যালি ডিস্টার্বড হয়ে গিয়েছে ম্যাডাম। ভাবছি এখানে আর কাজকর্ম করব না। ওই যে অ্যাস্ট্রোলজির ভাষায় কী

যেন বলে... এখানে শনির দশা লেগেছে। একের পর এক মিসহ্যাপ। প্রথমে আমার কুকুরটা গেল, তারপর কোথা থেকে কিছু নেই হঠাৎ চোরের উৎপাত, আর লাস্টলি এই নীলাম্বর। দিস ইজ় টু মাচ। বেটার আই শুড গো ব্যাক টু মিশিগান এগেন। দেশের মাটিতে বসে দেশের জন্য কাজ করা আমার কপালে নেই। মিশিগানেই আমি প্রোজেক্ট কমপ্লিট করব। বউ-মেয়েও খুশি হবে, আমারও শান্তি।"

"একটু অনধিকারচর্চা করব স্যার?"

"বলুন?"

"আপনার কাজটা এখন ঠিক কোন পর্যায়ে আছে?"

সুমন্ত্র সোজা হয়ে বসলেন। সামান্য বিরক্ত স্বরেই বললেন, "কেন বলুন তো?"

"না মানে... আপনি যদি প্রোজেক্টের প্রায় লাস্ট স্টেজে চলে গিয়ে থাকেন, তা হলে আপনাকে হারানো কি আমাদের একটা জাতীয় ক্ষতি নয়? আজ থেকেই তো আই জি সাহেব সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট জোগাড় করে আপনি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করুন না।"

"না ম্যাডাম, এখানে আর নয়। অ্যাট লিস্ট এইরকম রিমোট জায়গাতে তো নয়ই। কাজ এখনও প্রচুর বাকি। দেশেই যদি রয়ে যাই, তবে বাঙ্গালোর টাঙ্গালোর কোথাও চলে যাব।"

"স্টিল... একটু ভাবুন।"

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন না। বসে আছেন গুম হয়ে। হঠাৎই বলে উঠলেন, "আপনি যেন কী সব কৌতূহল নিরসনের কথা বলছিলেন?"

"হ্যাঁ...। পরশু রাতে চোর আসা সম্পর্কে একটু বিশদ জানার ইচ্ছে ছিল।"

"কেন?" এতক্ষণে সুমন্ত্রর ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি, "আপনি চোর ধরবেন?"

"উঁহু। আমি চোরের মোটিভটা বুঝতে চাই।"

"মানে?"

"আপনার বাড়িতে তো স্যার সোনাদানা, মণিমুক্তো তেমন নেই, তবু চোর এল কেন?"

"শুধু মণিমুক্তোর আশাতেই কি চোর আসে? এখানকার গরিব লোকরা বাসনকোসন-কাপড়চোপড় পেলে বর্তে যায়। কুকুরের ভয়ে এতদিন সাহস পায়নি, এবার তাদের বুকের পাটা বেড়েছে।"

"তাই হবে হয়তো। তবু আপনার মতো এক নামী মানুষের বাড়িতে ছিঁচকেবৃত্তি...! চোরটা স্যার কত রাতে এসেছিল?"

"চোর ভেগে যাওয়ার পর ফের শোওয়ার সময় ঘড়ি দেখেছিলাম। দুটো কুড়ি।"

"আপনি তো আগে টের পাননি?"

"না। আমি সবে আধঘণ্টাটাক আগে কম্পিউটার অফ করে এসে শুয়েছিলাম। ভালই ঘুম এসে গিয়েছিল। নীলাম্বরের হাউমাউ শুনে চমকে জেগে উঠি। ব্যাটা আমার দরজার সামনে দিয়েই গেল বটে, তবে ধরতে পারলাম না।"

"মানে, আপনি তাকে দেখেছিলেন?"

"একঝলক। বেঁটেখাটো চেহারা। গাট্টাগোট্টা। তাড়াও করেছিলাম ব্যাটাকে। নীলাম্বরের সঙ্গে। কিন্তু সে ওস্তাদ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ফাস্ট। উঠোনের দরজাটা তো খোলাই থাকে, ওই পথেই বেরিয়ে খরগোশ-পায়ে পাঁচিল টপকে পগারপার," গুছিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎই থমকেছেন সুমন্ত্র, "এবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি ম্যাডাম?"

"অবশ্যই।"

"সামান্য একটা লোকাল চোর নিয়ে আপনি এত ভাবিত হয়ে পড়েছেন কেন? আই জি সাহেব কি ব্যাপারটা আলাদা করে ইনভেস্টিগেট করতে পাঠিয়েছেন?"

"না, না, আমি অন মাই ওন এসেছি। নীলাম্বরের মুখে শুনেছিলাম আপনার কাছে মাসদুয়েক আগে নাকি তিনটে লোক এসেছিল। তাদের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য মতোও হয়। তারপরই আপনার রজার হারাল, বাড়িতে চুরির অ্যাটেম্প্ট... এগুলোকে একটু লিংক করার চেষ্টা করছিলাম আর কী। কেন যেন মনে হচ্ছিল, এর থেকে আপনার কোনও বিপদ ঘটতে পারে।"

সুমন্ত্রর শুকনো মুখে এতক্ষণে একটা স্পষ্ট হাসি ফুটেছে। মিলিয়েও গেল হাসিটা। ভুরুতে আলগা ভাঁজ ফেলে বললেন, "আপনারা গোয়েন্দারা পারেন বটে! তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেছেন। নীলাম্বর যাদের কথা বলেছিল, যত দূর মনে পড়ছে, তারা ছিল গভর্নমেন্টের লোক। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি মন্ত্রকের তিনটে বোকা আমলা। আমার রিসার্চ নিয়ে কিছু সিলি কমেন্ট করেছিল। আমিও ওদের একটু বকাঝকা করেছিলাম। ওই তুচ্ছ ঘটনাকে জটিল করার মনে হয় কোনও প্রয়োজন নেই।"

"হুম।" মিতিন মাথা দোলাল, "আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। এই অসময়ে অহেতুক আপনাকে খানিক জ্বালাতন করলাম।"

"না না, ঠিক আছে।" সুমন্ত্র নড়েচড়ে বসলেন, "সরি, আপনারা এত দূর থেকে এলেন, আজ কিন্তু কোনও খাতিরযত্ন করতে পারলাম না। জলটল খাবেন?"

"নো থ্যাঙ্কস। ব্যস্ত হবেন না," মিতিন ঘড়ি দেখল, "নীলাম্বরের বাড়ির লোকজন কখন আসছে?"

"কী করে বলি। খবর তো গিয়েছে অনেকক্ষণ। তবে মনে হয় না দুপুরের আগে তারা পৌঁছোতে পারবে," বলতে বলতে আচমকাই

ঘাড় নুইয়েছেন সুমন্ত্র। চশমা খুলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "কী যে হয়ে গেল! আমার আর ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না।"

টুপুরও ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, "সত্যি, কী বিশ্রী ব্যাপার! শেষে কিনা চন্দ্রবোড়ার কামড়ে মরতে হল নীলাম্বরদাদাকে!"

সুমন্ত্রর ঘাড় আরও ঝুঁকে গেল।

মিতিন গলা নামিয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা স্যার, সাপটা যে চন্দ্রবোড়াই ছিল, এটা বোঝা গেল কী করে?"

"প্লেন অ্যান্ড সিম্পল।" সুমন্ত্র চোখ তুললেন, "যতটা জায়গা জুড়ে সোয়েলিং হয়েছে, তাতে ধরাই যায় সাপ অনেকটাই বিষ ঢেলেছে। কেউটে বা কালাচ একবারে যে পরিমাণ বিষ ঢালতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশি। প্লাস, নাক-চোখ-মুখ দিয়ে রক্তও বেরিয়েছে। যা একমাত্র চন্দ্রবোড়ার বিষ শরীরে গেলেই হয়।"

"চন্দ্রবোড়ার বিষে মানুষ কতক্ষণ পরে মারা যায়?"

"এক-দেড় ঘণ্টা সময় তো লাগেই।"

"তার মানে ছোবল খাওয়ার পর নীলাম্বরও ঘণ্টাদেড়েক বেঁচে ছিল?"

"থাকার তো কথা। আমার তো সেটাই অবাক লাগছে। নীলাম্বর ছোবল খেয়েই বাড়িতে দৌড়ে এল না কেন! আমার ল্যাবরেটরিতে তো অ্যান্টি-ভেনম মজুতই থাকে। ইঞ্জেকশনটা পড়লে বেঁচে যেত," সুমন্ত্র একটুক্ষণ থেমে থেকে ফের বললেন, "আসলে কী হয় জানেন? বিষধর সাপে কাটলে বহু মানুষই নার্ভাস হয়ে সেন্স হারিয়ে ফেলে। নীলাম্বরও বোধহয়... যদিও আমি ওকে সাহসী বলেই ভাবতাম।"

বাইরে হঠাৎ একটা ডুকরে ওঠা কান্নার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি বাইরে এল টুপুর আর মিতিন। পিছন পিছন সুমন্ত্রও। বারান্দা থেকেই দেখতে পেল বছরপঞ্চাশের ধুতিশার্ট পরা এক গ্রাম্য মানুষ নীলাম্বরের বুকে হাত রেখে গলা ছেড়ে কাঁদছে।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "উনি কে? নীলাম্বরের বাবা?"

সুমন্ত্র কোনও জবাব না দিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে নেমে গেলেন লোকটার কাছে। তাঁকে দেখেই লোকটার কান্না আরও বেড়ে গেল, "এ কী সব্বোনাশ হল বাবু! আমি এখন নীলুর বাবাকে মুখ দেখাব কী করে! কী কুক্ষণে ওকে আমি কাজে দিয়েছিলাম!"

সুমন্ত্র হাত রাখলেন লোকটার কাঁধে। শান্ত হতে বলছেন।

টুপুর ফিসফিস করে বলল, "ওই লোকটাই বোধহয় মঙ্গল।"

মিতিন বলল, "হুঁ।"

"ডেকে কথা বলবে?"

"না থাক। চল, আমরা এগোই।"

ধীর পায়ে গেট অবধি গিয়েও মিতিন দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ কুঁচকে কী যেন ভাবছে। হাতের ইশারায় ডাকল রতনকে।

দৌড়ে এসেছে রতন, "কিছু বলছেন দিদি?"

"নীলাম্বরের বডিটা কোথায় পড়ে ছিল আমায় একবার দেখাবেন?"

"যাবেন? চলুন।"

গেট পেরিয়ে বিশ-পঁচিশ পা গেলে ডাইনে এক সরু মেঠো পথ। দু'ধারে ইতস্তত খেজুর, বাবলা আর কাঁটাগাছের ঝোপ। মাঝেমাঝে ছোট-বড় বাঁশঝাড়। শুরুতেই দু'-চারটে মাটির বাড়ি পড়ল। তারপর আর বিশেষ বসতি নেই। কাল রাতের বৃষ্টিতে রাস্তার দশাও ভারী বেহাল। এঁটেল মাটি গলে কাদাকাদা হয়ে আছে। কাদায় অজস্র পায়ের ছাপ। সকালে নির্ঘাত এই পথে অনেক মানুষ নীলাম্বরকে দেখতে আসা-যাওয়া করেছে।"

সাবধানে পা টিপে-টিপে হাঁটছিল টুপুর। মিতিনও। একখানা গর্ত লাফ দিয়ে টপকে মিতিন বলল, "এ রাস্তা দিয়ে পুরন্দর পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগে?"

"মিনিটপাঁচেক। রাস্তাটা গাঙের ধারে গিয়ে বাঁ দিক পানে ঘুরে গিয়েছে। শেষ হয়েছে আমাদের গির্জার পিছনটায়।"

"জায়গাটা এত ফাঁকা কেন?"

"সবই গির্জার জমি দিদি। এমনিই পড়ে আছে।"

পাঁচ নয়, ধীরেসুস্থে চলতে গিয়ে প্রায় দশ মিনিট লেগে গেল। রতন যেখানে এসে থামল, তারপর আর এগোনোর জো নেই। সামনে থকথকে কাদা। হাতপনেরো দূরে পাড় ঢাল হয়ে নেমে গিয়েছে পুরন্দরে।

রতন বলল, "ওই কাদার মুখটাতেই পড়ে ছিল নীলাম্বরদা।"

উবু হয়ে বসে জায়গাটা দেখছিল মিতিন। ঘুরে ঘুরে সন্ধানী চোখে তাকাচ্ছিল চারদিকে। রতনকে জিজ্ঞেস করল, "নীলাম্বর শুধু হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরেই বেরিয়ে পড়েছিল?"

"তাই তো দেখলাম দিদি।"

"ঘড়ি ছিল হাতে?"

"নাহ।"

"পকেটে টাকাপয়সা?"

"উঁহু।"

"কোনও কাগজপত্র? বা দেশলাই ফেসলাই? বা আর কিছু?"

"না দিদি, কিছুই ছিল না পকেটে। পুলিশ এসে আমাদের সামনেই তো হাতড়ে হাতড়ে দেখল। দুটো পকেটই বিলকুল ফরসা।"

"আপনি শিয়োর?"

"একশো ভাগ। স্বচক্ষে দেখেছি।"

মিতিন আর কিছু বলল না। বেজায় গম্ভীর সহসা। পুরন্দরের পারে আর দাঁড়ালও না। মুখে কুলুপ এঁটে ফিরল মেটে পথটুকু। সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ির সামনে এসে ছেড়ে দিল রতনকে। ছেলেটা ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর টুপুরকে বলল, "চল, একবার থানায় যাই।"

"থানা? কেন?"

"ও সি-কে বলতে হবে নীলাম্বরকে এখন দাহ করা যাবে না। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠানো দরকার।"

"সে কী? সাপে কাটলে পোস্টমর্টেম হয়?"

"সত্যি-সত্যি সাপের কামড়ে মরলে প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নীলাম্বরকে সাপে কাটেনি। কেউ তাকে খুন করেছে!"

শনিবার সারাদিনটা মিতিনমাসির টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। সকাল ন'টার মধ্যে নাকেমুখে গুঁজে সেই যে বেরিয়ে গেল মিতিনমাসি, ফিরল সেই সন্ধের মুখেমুখে। কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, কিছুই বলল না টুপুরকে। প্রশ্ন করলে একটাই জবাব — কাজ ছিল। এমনই দু'-চারটে কথা বলে ঢুকে গেল স্নানে, বেরিয়ে সোজা স্টাডিরুম। সাপের উপর বই কিনে এনেছে খানদুয়েক, দরজা ভেজিয়ে ডুবে গেল বইয়ের পাতায়।

রাতে খেতেও বসল একটা বই নিয়ে। পড়তে পড়তেই খাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে পার্থমেসোকে বলল, "কাল একটু ভাল করে বাজার কোরো তো। দিদি আর অবনীদাকে দুপুরে খেতে বলেছি।"

পার্থ অবাক, "হঠাৎ?"

"আমার ইচ্ছে। দিদি-জামাইবাবুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব, তাতে আবার হঠাতের কী আছে?"

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "কী আনব? চিকেন? না মটন?"

"উঁহু। ইলিশমাছ। দিদি ইলিশমাছটা বড্ড ভালবাসে। মনে করে পুঁইশাকটাকও এনো। কাঁটাচচ্চড়ি হবে। আর ভাল হিমসাগর আম। সঙ্গে মিষ্টি দই।"

"ও কে।"

টুপুর চুপচাপ শুনছিল। বেজার মুখে বলল, "কালই মা-বাবাকে না ডাকলে চলছিল না?"

মিতিন চোখের কোণ দিয়ে দেখল টুপুরকে, "কেন, তোর কী অসুবিধে হল?"

"মা তো এসেই হোমওয়ার্ক নিয়ে পড়বে। এখনও বইখাতা খুলিনি শুনলে রক্ষে রাখবে?"

"তা হোমওয়ার্কগুলো করছিস না কেন? আজ সারাদিন বসে কী ভ্যারেন্ডা ভাজছিলি?"

টুপুর একটু আহত হল, তবে মুখ ফুটে বলল না কিছু। সারাদিন আজ গড়াগড়ি খাওয়া ছাড়া কিছুই করেনি বটে, কিন্তু কেন যে কিছু করেনি, কিংবা করতে মন লাগেনি, তা তো মিতিনমাসি একবার জিজ্ঞেস করল না!

কালকের দিনটাই বারবার ঘুরে এসেছে টুপুরের চোখে। নীলাম্বরের নিষ্প্রাণ দেহ, পুরন্দরের নির্জন পাড়, রতন হেনরি মণ্ডল, সুমন্ত্র সান্যালের নিঝুম বসে থাকা...। আচ্ছা, মিতিনমাসি কী করে নিশ্চিত হল, নীলাম্বর খুন হয়েছে? এটা অবশ্য ঠিক, সাপের ছোবল খেয়ে তার বাড়িতে ছুটে আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে যখন সে জানে তার স্যারের কাছে সাপের বিষের ওষুধ থাকে। ভয় পেয়ে গিয়েছিল? উঁহুঁ, নীলাম্বরের তো সাপদের সঙ্গেই নিত্য ওঠাবসা। অবশ্য ডক্টর সান্যালের যুক্তিটাও ফ্যালনা নয়। বিপদের সময় আচ্ছা আচ্ছা সাহসী লোকেরও বুদ্ধিভ্রম ঘটতে পারে। আর কী পয়েন্ট খুঁজে পেল মিতিনমাসি? কাকভোরে পুরন্দরের পারে হাঁটতে

যাওয়াটা কি মিতিনমাসির অস্বাভাবিক ঠেকেছে? উঁহুঁ, ফাদার ম্যাথুও তো ওই পথে হাঁটতে যান! নীলাম্বরের পকেট থেকে কিছু পাওয়া গেছে কিনা বারবার জিজ্ঞেস করছিল মিতিনমাসি। কেন?

ভেবেভেবে তল পায়নি টুপুর। তবে দিনটা তো চলেই গিয়েছে। এবং মা-ও এসে কাল চেঁচাবেনই।

পরদিন সকালে অবশ্য টুপুরকে ঝাড় খেতে হল না। সহেলি আর অবনী যখন মিতিনদের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন, ঠিক তখনই ইলিশমাছ ছাড়া হয়েছে কড়ায়। মনোলোভা আঁশটে গন্ধে ম-ম করছে চারদিক। ব্যস, সঙ্গেসঙ্গে সহেলি দুনিয়া ভুলেছেন।

জোরে জোরে শ্বাস টেনে সহেলি বললেন, "মাছটার কোয়ালিটি খুব ভাল মনে হচ্ছে!"

পার্থর মুখ হাসিতে ভরে গেল, "কে এনেছে দেখতে হবে তো। খোদ পদ্মার মাছ। দু'কিলো একশো ওজন। পেটে হাল্‌কা ডিমের ছাঁচ আছে।"

অবনী মৃদু স্বরে বললেন, "ইলিশমাছ কিন্তু হজম করা কঠিন। বেশি খেলে পেটের গন্ডগোল হয়।"

"তোমায় একটাও খেতে হবে না।" সহেলি ঝামরে উঠলেন, "তুমি পেঁপের ডালনা খেয়ো।"

"উত্তম প্রস্তাব। পেঁপের মতো উপকারী সবজি আর ক'টা আছে! জানো, পেঁপের আঠা থেকে পেপ্‌টিক আলসারের ওষুধ তৈরি হয়?"

"আর ইলিশ খেলে হার্ট ভাল থাকে। কোলেস্টেরল কমে যায়।"

পার্থ ফুট কাটল, "এবং চিত্ত প্রফুল্ল হয়।"

"বলো, বলো। বেরসিক লোকটাকে বোঝাও। কী যে একটা পেটরোগা লোকের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন!

নানাবিধ চাপানউতোর আর হাসি-মশকরার মাঝে চাপা পড়ে

গেল টুপুরের হোমটাস্ক। শুরু হয়েছে মাথামুন্ডুহীন গুলতানি। অবনী ইদানীং সামাজিক হয়েছেন কিছুটা। মোটামোটা বই ছেড়ে আড্ডাটাড্ডাও মারছেন মাঝেমধ্যে।

শ্যালিকার পিঠে একটা চাপড় মেরে অবনী জিজ্ঞেস করলেন, "তা মিতিনবাবু, তোমার 'থার্ড আই' চলছে কেমন? নতুন কেসটেস কিছু জুটল?"

পার্থ জবাব দিল, "মিতিনের এখন ডাল সিজন। লড়ে লড়ে একটা কেস জোগাড় করেছে বটে, তবে তাতে আদৌ রহস্য আছে কিনা বলা কঠিন।"

"বাজে বোকো না তো। যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং কেস," মিতিন চোখ পাকাল, "এবং ওই কেসের সঙ্গে আমাদের দেশের স্বার্থও জড়িত।"

"বলো কী! ব্যাপারটা তো তা হলে শুনতে হয়!"

সংক্ষেপে সুমন্ত্র সান্যালের গল্পটা বলল মিতিন। রজার হারিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নীলাম্বরের মৃত্যু পর্যন্ত।

মন দিয়ে শুনে অবনী বললেন, "হুম, মিস্ট্রি একটা থাকলেও থাকতে পারে।"

সহেলি ফ্রিজ থেকে একখানা বোতল বার করে ঠান্ডা জল খাচ্ছিলেন। কিছুই শোনেননি তিনি, তবু ফস করে আলটপকা মন্তব্য ছুড়লেন, "মিস্ট্রি মাথায় থাকুক। সাপটাপের ব্যাপারে মিতিনের যাওয়ার কোনও দরকার নেই।"

"দিদি, থাম তো। তুই বরং গিয়ে ভারতীকে একটু গাইড কর রান্নায়।" মিতিন ফের ফিরল প্রসঙ্গে, "বুঝলেন অবনীদা, ওই নীলাম্বরের মৃত্যুটাই আমায় টেনশনে ফেলে দিয়েছে।"

টুপুরেরও তো একই টেনশন। সুযোগ পেয়েই টুপুর প্রশ্নটা উগরে দিল, "একটা কথা বলব মিতিনমাসি? তুমি কেন মানতে চাইছ না, নীলাম্বরকে সাপে কেটেছে?"

"একটা মেজর কারণ তো চোখকান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। নীলাম্বরের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে কখন? ভোর সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছ'টায়। রতন হেনরি মণ্ডলের বক্তব্য অনুযায়ী, তখন নীলাম্বরের বডি স্টিফ। তার মানে রিগর মর্টিস তখন স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু হয়েছে কম করে আরও ঘণ্টাচারেক আগে। দ্যাট মিন্‌স, রাত একটা-দেড়টার পরে নয়। তা অত রাতে নীলাম্বর বেরিয়ে পুরন্দরের ধারে গেল কেন? কেউ তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কি? নাকি নীলাম্বরই কারও সঙ্গে ওখানে রাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল? আর এখানেই খুনের একটা আশঙ্কা এসে যায় না কি? তবে নীলাম্বরের মৃত্যুটা যে খুন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ...," মিতিন আচমকা থেমে গেল।

পার্থ উত্তেজিতভাবে বলল, "কী? বড় প্রমাণটা কী?"

"ওটা এখন সাসপেন্স থাক। পরে বলব।" মিতিন গাল ছড়িয়ে হাসল। অবনীর দিকে ফিরে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা ছিল।"

"বলে ফ্যালো।"

"আপনার বয়স তো এখন চুয়াল্লিশ চলছে। তাই না? যদি না আপনি বিয়ের সময় বয়স ভাঁড়িয়ে থাকেন..."

"ফাজলামি মেরো না। ওসব দু'নম্বরি অভ্যেস আমার নেই।"

"ভেরি গুড। তা আপনি এম এ পাশ করেছেন কদ্দিন আগে?"

"বছরকুড়ি।"

"বায়োকেমিস্ট্রিতে এম এসসি, আপনার সমসাময়িক, এমন কারও সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

অবনী ভুরু কুঁচকোলেন, "আমাদের সময় কি ইউনিভার্সিটিতে আদৌ বায়োকেমিস্ট্রি ছিল? উঁহুঁ। ওটা বোধহয় পরে এসেছে।"

"তবে কী ছিল তখন?"

"পিয়োর কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি। ওখান থেকেই অনেকে পরে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করত।"

"ও।" মিতিন যেন সামান্য দমে গেল, "কেমিস্ট্রির কেউ চেনা আছেন?"

"অনেকেই আছে। আমাদের কলেজের দেবেশই তো আমার ইয়ারে এম এসসি করেছে।"

দু'-এক পল কী ভাবল মিতিন। বলল, "দেবেশবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলা যায়?"

"স্বচ্ছন্দে। যদি চাও তো তাকে এখানেই হাজির করতে পারি।"

"আহা, উনি কষ্ট করে আসবেন কেন? আমিই যাব।"

"আরে না না, তোমার আমন্ত্রণে সে খুশিই হবে। আমার মুখে তোমার কীর্তিকাহিনী শুনে শুনে সে তো রীতিমতো তোমার ফ্যান। কাছেই থাকে। সেলিমপুর। দাঁড়াও, এখনই দেবেশকে একটা ফোন লাগাই।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়লেন দেবেশ। ফরসা দোহারা চেহারা, মাথাজোড়া টাক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, পরনে ছুটির দিনের ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি। মিতিনকে দেখামাত্র এমন গদগদ সুরে কথা বলতে লাগলেন যে, রীতিমতো কুঁকড়ে গেল মিতিন। স্তুতিবাক্যের কী ঘটা! মিতিন যেন শার্লক হোম্‌সের মহিলা এডিশন!

চটপট দেবেশকে চা-ফ্রেঞ্চটোস্ট ধরিয়ে দিয়ে মিতিন সরাসরি কাজের কথায় এল, "বাই এনি চান্স, এম এসসি পড়ার সময় সুমন্ত্র সান্যাল বলে কাউকে আপনি চিনতেন?"

"সুমন্ত্র... সুমন্ত্র...?"

"হ্যাঁ। লম্বা মতো... রোগা মতো... বিশাল খাড়া নাক...?"

"ওহো, আপনি লম্বুর কথা বলছেন? আমেরিকায় ছিল? এখন দেশে ফিরে রিসার্চ করছে?"

"চেনেন?"

"আরে, ও তো কলেজেও আমার ব্যাচমেট ছিল। এম এসসি-তে সুমন্ত্র স্পেশ্যাল পেপার নিল অরগ্যানিক, আমি ফিজ়িক্যাল কেমিস্ট্রি। এককালে ওর সঙ্গে ভালই দোস্তি ছিল।"

"সুমন্ত্রবাবুকে নিয়ে রিসেন্টলি একটা খবর বেরিয়েছিল পড়েছেন?"

"কবে বলুন তো?"

"এই তো, মঙ্গলবার।"

"উঁহুঁ। মিস করে গিয়েছি। পার্ট-ওয়ানের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা চলছে তো, সকালে খবরের কাগজ দেখার সময়ই পাই না। কী করেছে সুমন্ত্র? কোনও প্রাইজটাইজ পেয়েছে বুঝি?"

"না। উনি নিখোঁজ হয়েছিলেন।"

"অ্যাঁ?" দেবেশের মুখ হাঁ, "সুমন্ত্র... নিখোঁজ...?"

"এখন ফিরে এসেছেন। ইনসিডেন্টালি, ওঁকে খোঁজার কাজে আমি সামান্য জড়িয়ে পড়েছিলাম।"

"তাই বলুন।"

"সুমন্ত্রবাবু সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। ...সুমন্ত্রবাবু মানুষটা কেমন?"

"এখনকার সুমন্ত্রর কথা বলতে পারব না। আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল কোনও যোগাযোগ নেই। দেশে ফেরার পর সুমন্ত্রও আর সম্পর্কটা রিভাইভ করেনি, আমিও কনট্যাক্ট করিনি।"

"বেশ তো, আগের সুমন্ত্রবাবুর কথাই বলুন।"

"সুমন্ত্র ছিল একটু আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে নিয়ে, নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই বেশি ভালবাসত। তবে খারাপ ছেলেও নয়। কথাবার্তায় খুবই ভদ্র, সভ্য। প্লিজিং পার্সোনালিটি। মেধার দিক দিয়ে মাঝামাঝি, তবে অসম্ভব স্টুডিয়াস আর সিস্টেমেটিক।

ব্রিলিয়ান্ট ছিল ওর ভাইটা। জয়েন্টে হাই র‍্যাঙ্ক করে মেডিক্যালে অ্যাডমিশন পেয়েছিল। কিন্তু কী বলব, পরে অসৎ সঙ্গে পড়ে একেবারে বখে গিয়েছিল ছেলেটা। কলেজে পড়ার সময় এক-দু'বার গিয়েছি সুমন্ত্রদের মল্লিকপুরের বাড়িতে। তখনও ছেলেটা মেডিক্যাল কন্টিনিউ করছে। কিন্তু তখনই দিনরাত ড্রাগে চুর হয়ে থাকত। সুমন্ত্র ছিল তুলনায় অনেক ব্যালান্সড। ফ্যামিলির অবস্থা ভাল নয় বলে প্রাণ দিয়ে খাটত। বি এসসি'-তে হাই ফার্স্ট ক্লাস পেল সুমন্ত্র, আর ভাইটি থার্ড ইয়ারেই লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে কী এক ইংরিজি গানের ট্রুপ খুলে বসল। কী যেন নাম ছিল ভাইটার? ...হ্যাঁ হ্যাঁ, সুধন্য। এমন নেশার কবলে পড়েছিল যে, নিজের বাড়ির ঘটিবাটি বেচে দিত। চুরির কেসে বোধহয় ধরাও পড়েছে বারকয়েক। এম এসসি পড়ার সময় দেখেছি, ভাইকে নিয়ে সুমন্ত্র ভারী ওয়ারিড থাকত।"

"কিন্তু তিনি তো শুনলাম এখন বাঙ্গালোরে চাকরি করছেন!"

"তাই নাকি? আমি যেন অন্যরকম শুনেছিলাম। কী এক মেডিক্যাল ফার্মে কাজ পেয়েছে, ওষুধটষুধ বেচছে। ...তা বাইরে গিয়ে সেটেল্‌ড হয়ে থাকলে তো আরও ভাল। সুধন্য বিয়ে-থা করেছে?"

"তা তো বলতে পারব না।"

অবনী পাশ থেকে হেঁকে উঠলেন, "দেবেশ, প্রশ্ন কার করার কথা, অ্যাঁ?"

দেবেশ লজ্জিত মুখে বললেন, "না না, সুধন্যর কথা উঠল, তাই...। বলুন ম্যাডাম, আর কী জিজ্ঞাস্য আছে?"

"আপনার কথা শুনে তো বুঝতেই পারছি সুমন্ত্রবাবু দেশে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি!"

"একটি বারের জন্যও না। ইনফ্যাক্ট, ও যে আবার দেশে

ফিরেছে, সুন্দরবনের দিকে কোথায় গিয়ে যেন কাজকর্ম করছে... এও তো জানলাম মাত্র বছরখানেক আগে। আমাদের আর-এক ব্যাচমেট পরিমল, সে এখন দিল্লির সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিনিস্ট্রির হোমরাচোমরা। তার কাছেই ইনফর্মেশন পেলাম। ...পরিমলের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও একটা নাটকের মতো। লাস্ট সামারে বউ-ছেলে নিয়ে গোয়া বেড়াতে গিয়েছি, হঠাৎ কালাংগুটে বিচে সুইমিং কস্টিউম পরা এক লোমশ জলহস্তী ইয়া ভুঁড়ি নিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল, 'আরে দেবু, তুই এখানে!' পাক্কা পাঁচ মিনিট টাইম লেগেছিল আমার পরিমলকে চিনতে। ইউনিভার্সিটির শুঁটকো পরিমল যে কোন ম্যাজিকে...!"

অবনী গলাখাঁকারি দিলেন, "তুমি ভুল ট্র্যাকে ঢুকে পড়েছ, দেবেশ।"

"সরি। সরি।" দেবেশ জিভ কাটলেন, "এই আমার এক বদভ্যাস। ক্লাসেও এরকম হয় জানেন। শুরু করলাম হয়তো গ্যাসের গতিতত্ত্ব, পড়াতে পড়াতে তাপগতিবিদ্যায় চলে গেলাম। হয়তো চাপের সমীকরণটা বার করছি... মানে প্রেশার আর গ্যাস মলিকিউলের ভেলোসিটির রিলেশন..."

"ফের বেলাইন? কপাল ভাল, আমার শ্যালিকার হাতে পড়েছ, পুলিশের খপ্পরে নয়। স্টেটমেন্ট দেওয়ার সময় এমন ফালতু বকবক করলে তারা তোমার ঠোঁট সেলাই করে দিত।"

"আহা, উনি ওঁর মতো করেই বলুন না।" মিতিন হাসছে, "গল্প শুনতে শুনতে কত কিছু তো জানাও হয়ে যাচ্ছে। ...দেবেশবাবু, ডক্টর সান্যালের বাবা-মা বেঁচে আছেন কিনা জানেন?"

"নেই। পরিমলের মুখেই শুনলাম, সুমন্ত্র আমেরিকায় থাকাকালীনই ওর মা গত হন। দেশে ফেরার পর ওর বাবা।"

"তা হলে মল্লিকপুরের বাড়িতে নিশ্চয়ই এখন আর কেউ নেই?"

"ভাই যদি বাঙ্গালোরে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে আর কে থাকবে! হয়তো তালাবন্ধ। অনেক কালের পুরনো বাড়ি তো, হয়তো বেচেও দিয়ে থাকতে পারে। বাড়ির লাগোয়া বেশ খানিকটা জমিও ছিল। প্রোমোটাররা লুফে নেবে। অবশ্য বাড়িটা স্টেশন থেকে অনেকটাই ভিতরে। রিকশায় তেঁতুলতলা না, তেঁতুলগাছি কোন একটা মোড়ে গিয়ে যেন নামতে হয়। সেই কবেকার কথা, অত কী আর মনে থাকে!" বলতে বলতে দেবেশ হঠাৎই থমকেছেন। চোখ পিটপিট করে বললেন, "আচ্ছা, এসব ইনফর্মেশন তো সুমন্ত্রই আপনাকে দিতে পারে। আপনি তো বললেন, নিখোঁজ হওয়ার পর ও আবার ফিরে এসেছে!"

আলতো হেসে মিতিন এড়িয়ে গেল কথাটাকে।

দেবেশের ভুরুতে ভাঁজ, "সুমন্ত্র কি কোনও গন্ডগোল পাকিয়েছে?"

এবারও মিতিন এড়িয়ে গেল কায়দা করে। বলল, "গন্ডগোল একটা পেকেছে বটে। সেটা উনিই পাকিয়েছেন কিনা জানি না। তবে গন্ডগোলটা ওঁকে ঘিরেই। ...বাই দ্য বাই, সুমন্ত্রবাবুর টাকাপয়সার ব্যাপারে বেশি আসক্তি ছিল কি?"

"না না না। চিপ্পুস টাইপ ছিল। মেপেজুপে খরচ করত। তা বলে টাকার জন্য মোটেই হ্যাঙ্কারিং ছিল না। তা ছাড়া ম্যাডাম, সুমন্ত্র যদি লোভীই হবে, তা হলে কি আমেরিকার ঐশ্বর্য ছেড়ে এখানে কাজ করতে চলে আসে? বউ-মেয়ে সব ফেলে?"

"তা ঠিক। আমারও ধারণা উনি সন্ন্যাসী ধরনের মানুষ।"

সুমন্ত্রকে নিয়ে আর কথা হল না বিশেষ। আধঘণ্টাটাক আরও গল্পগুজব করে উঠলেন দেবেশ। দুপুরে ভোজনপর্বটি বেশ ভালই হল। সহেলির পীড়াপীড়িতে দই-ইলিশ খেয়ে সারাটা দুপুর চোঁয়া ঢেকুর তুললেন অবনী। সহেলি চুটিয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করলেন মিতিন আর পার্থর সঙ্গে।

বিকেলে যাওয়ার সময় সহেলি ধরেছেন টুপুরকে, "কী, এখনও তো বইখাতা ছোঁওয়া হয়নি মনে হচ্ছে?"

টুপুর বলল, "এই... কাল থেকে বসব।"

"গৃহে পদার্পণ করছ কবে?"

"এখনও তো অনেক দিন ছুটি বাকি আছে মা।"

"তা হোক। চোখের আড়ালে থাকলে তুমি ডানা মেলে উড়বে। একটা কথা মাথায় রেখো, মাসির সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করলেই শুধু চলবে না। ভুলে যেয়ো না, তোমার মাসিও স্কুল-কলেজ পাশ করে তবে এ লাইনে এসেছে। ছেলেবেলা থেকেই কারও ল্যাংবোট হয়ে নেচে বেড়ায়নি।"

বাড়ি ফাঁকা হল। সন্ধে নেমেছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে অল্প অল্প। হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক হানছে বিদ্যুৎ। আজ আবার কালবৈশাখী আসবে কি? টুপুরের মনে হল, এখন একটা ঝড়বৃষ্টি হলে মজাই হয়। দিনভর যা চিটপিটে গরম গেল!

পার্থমেসো বুমবুমকে নিয়ে সামনের দোকান থেকে ভিসিডি আনতে গেল। হ্যারি পটার দেখবে বলে বায়না ধরেছে বুমবুম। কী যে সব আজগুবি দেখে বসে বসে! এই ছিল মানুষ, এই হয়ে গেল পাখি! শূন্যে ছেলেমেয়েরা উড়তে উড়তে খেলে বেড়াচ্ছে! ইন্দ্রজালের স্কুলে মেয়েরা তালিম নিচ্ছে ডাইনি হওয়ার! টুপুরের তো দেখলেই হাসি পায়। মিতিনমাসির সঙ্গে থেকে থেকে সে এখন অযৌক্তিক কিছু ভাবতেই পারে না।

ব্যালকনি ছেড়ে টুপুর ঘরে এল। মিতিনমাসি শুয়ে পড়েছে বিছানায়। চোখ বন্ধ, কী যেন চিন্তা করছে।

টুপুর মাথার পাশে এসে বসল, "কী গো, দেবেশকাকুর সঙ্গে কথা বলে কিছু লাভ হল?"

"তা একটু হয়েছে বই কী।"

"কীরকম?"

মিতিন সরাসরি জবাব দিল না। চোখ থেকে হাত সরিয়ে সুর করে বলল, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন!"

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে পাউরুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে মিতিন বলল, "টুপুর, আজ দুপুরে তোকে আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।"

টুপুরের হৃৎপিণ্ড ছলাত করে উঠল, "কোথায় যাব গো?"

"উত্তেজিত হোস না। গেলেই দেখতে পাবি।"

"আবার কি বাসন্তী যাব আমরা?"

"না।"

ব্যস, মিতিনের মুখে আর বাক্যিটি নেই। কচরকচর বাটার টোস্ট চিবিয়ে চায়ের কাপ হাতে সোজা বসার জায়গায়। অনিশ্চয় মজুমদারকে ধরেছে ফোনে। বারবার অনুরোধ করল, অনিশ্চয় যেন স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে অতি সত্বর ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা সংগ্রহ করেন। সম্ভব হলে আজই। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে আঙুল বাজাচ্ছে টেবিলে। এই মুদ্রাটা টুপুরের চেনা। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে দোলাচল থাকলে মিতিনমাসি এভাবেই টেবিলে আঙুল ঠুকে তবলা বাজায়।

আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে মিতিন বলল, "না, থাক।"

পার্থ বড় সোফায় বসে শব্দজব্দ করছিল। খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই প্রশ্ন করল, "কী থাকবে?"

"বাসন্তী থানায় একটা ফোন করব কিনা ভাবছিলাম।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "তাদের সঙ্গে আবার কী দরকার?"

"ওসিকে বললে হত রতন হেনরি মণ্ডলকে একটা মেসেজ দিতে।"

"কী জানাবে?"

"যেন সে অতি অবশ্যই আমাকে আজ একবার ফোন করে। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন নেই।"

রতনকে মিতিনমাসির কী কাজে লাগতে পারে, ভেবে পেল না টুপুর। সত্যি, মাসির চিন্তার গতিপ্রকৃতি খুঁজে পাওয়া ভার। কাল রাতে হ্যারি পটার দেখতে দেখতে হঠাৎ ফোন লাগাল বাবাকে। তখনই দেবেশকাকুর টেলিফোন নম্বর চাই!

কথাও বলল দেবেশকাকুর সঙ্গে। ওই রাত পৌনে বারোটায়। দু'জনে কী যে বাক্যালাপ হল কে জানে, ফোন রেখে দিয়ে মিতিনমাসির মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল। যাক গে, অত সাতপাঁচ ভেবে লাভ কী, মিতিনমাসি আজ অভিযানে টুপুরকে সঙ্গে নিচ্ছে এই না ঢের!

স্নান-খাওয়া সেরে কাঠফাটা দুপুরে বেরিয়ে পড়ল টুপুর আর মিতিন। সূর্য খাড়া মাথার উপর, চাঁদি ফেটে যাচ্ছে তাপে, মিতিনের এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। আশমানি রং সালোয়ার কামিজ পরেছে, কাঁধে পেটমোটা ভ্যানিটি ব্যাগ, চোখে সানগ্লাস, মাথায় ছাতা। হাঁটছে গটগট।

ঢাকুরিয়া স্টেশনে এসে টুপুরকে দাঁড় করিয়ে রেখে দু'খানা ট্রেনের টিকিট কেটে আনল মিতিন। ক্যানিং লোকাল ছেড়ে দিয়ে চড়ল ডায়মন্ডহারবারগামী গাড়িতে। হালকা হালকা ভিড়ের কামরায়।

ট্রেনে উঠে টুপুর ফের জিজ্ঞেস করল, "এবার কি জানতে পারি আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

“মল্লিকপুর।”

“নিশ্চয়ই ডক্টর সান্যালদের বাড়িতে?”

“হ্যাঁ।”

“ওখানে কাকে পাবে?”

“দেখা যাক।”

“বিকেল বিকেল বেরোলে ভাল হত না? রোদ পড়ার পর?”

“না। একদমই দেরি করা চলবে না। পাখি উড়ে যেতে পারে।”

“কে পাখি? কী পাখি?”

“ধীরে, বৎস, ধীরে, সময়কালে সব জানতে পারবে।”

মিতিনের ঠোঁটে ফের তালাচাবি। ঢাকুরিয়া থেকে মল্লিকপুর মিনিটপঁচিশেকের পথ। সারাক্ষণ ট্রেনের বাইরে মেলে আছে চোখ। মল্লিকপুরে নেমে স্টেশন চত্বরের বাইরে এল। রিকশাস্ট্যান্ডে।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে স্ট্যান্ড প্রায় ফাঁকা। একটা মাত্র রিকশায় হুড তুলে সিটে বসে ঢুলছে এক বৃদ্ধ।

মিতিন সামনে এসে গলাখাঁকারি দিল, “ও দাদা? যাবেন তো?”

লোকটা ধড়মড় করে জেগেছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, “কোথায় যাবেন?”

“তেঁতুলতলা।”

“তেঁতুলতলা? ও নামে তো কোনও জায়গা নেই!”

“তেঁতুলগাছি?”

“নাঃ, তেঁতুলিয়ার মোড় একটা আছে। অনেক দূর। আট টাকা ভাড়া।”

“চলুন। মনে হচ্ছে তেঁতুলিয়াই হবে।”

স্টেশনবাজার ছেড়ে এগোল রিকশা। বড় রাস্তা ছেড়ে ঘুরল ডান দিকে। এঁকেবেঁকে এপাড়া ওপাড়া পেরিয়ে পাক্কা বারো মিনিট পর এক তেমাথার মোড়ে এসে থেমেছে।

ভাড়া মিটিয়ে এপাশ ওপাশ দেখল মিতিন। দোকানপাট আছে বটে, তবে গ্রীষ্মের দুপুরে সবই বন্ধ। একটা মাত্র চায়ের দোকানই যা খোলা। আধখানা ঝাঁপ ফেলে, উনুন নিভিয়ে, ভিতরের বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছে এক মাঝবয়সি মানুষ।

মিতিন একটু ভাবল। তারপর নিচু হয়ে ঢুকল দোকানটায়। ডাকল, "ও মশাই? শুনছেন?"

"উঁ?" বেজার মুখে চোখ খুলল লোকটা।

"এখানে সান্যালদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?"

"কোন সান্যাল?"

"ওই যে লম্বামতো... দু'ভাই... একজন বিজ্ঞানী, বিদেশে থাকতেন..."

"বুঝেছি। সোনাদা-রুপোদাদের বাড়ি।" লোকটা গামছায় ঘাড় গলা মুছতে মুছতে উঠে বসেছে, "আপনারা বুঝি সোনাদার কাছে এসেছেন?"

"হ্যাঁ মানে ...," মিতিন চোখ থেকে সানগ্লাস খুলল, "মানে একটা দরকার ছিল।"

"দেখা হবে কি? সোনাদা তো এখন শয্যাশায়ী।"

"কী হয়েছে?"

"বেশি নেশাটেসা করলে যা হয়। ...শুনলাম তো, দিনকয়েক হল আর উঠতে নড়তেও পারছে না। কলকাতার এক বন্ধু এসে দেখাশোনা করছে। প্রায় রোজই তো ডাক্তার আসতে দেখি," আড়মোড়া ভেঙে কথাগুলো বলতে বলতে লোকটা হঠাৎ সচকিত। চোখ সরু করে একবার মিতিনকে দেখল, একবার

টুপুরকে। সতর্ক গলায় বলল, "কিন্তু আপনারা কে? সোনাদার আত্মীয়?"

মিতিন ঝটিতি বলে উঠল, "আমি ... ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল, মানে আপনাদের রুপোদার আন্ডারে কাজ করি। গবেষণা। উনি আমার হাত দিয়ে ভাইকে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন।"

"ও, বুঝেছি। চিকিৎসার জন্য। তা রুপোদা এবার নিজে এল না কেন? ভাইয়ের অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখে যেত।"

"কাজেকর্মে খুব ব্যস্ত। আমি কাছেই থাকি। সোনারপুরে। তাই...।"

"কাগজে তো রুপোদাকে নিয়ে খুব শোরগোল পড়েছিল দেখলাম। তিন-চার দিনের জন্য কোথায় যেন চলে গিয়েছিল রুপোদা..."

"উনি একটু কাজে গিয়েছিলেন। কাগজওয়ালারা বাড়িয়ে লিখেছিল।"

"আমরাও তো এখানে সেই আলোচনাই করছিলাম। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, রুপোদার মতো ঠান্ডা মাথার মানুষ হঠাৎ কাজ ফেলে নিরুদ্দেশে যাবে!"

"তা আপনাদের সোনাদার বাড়িটা...?"

"সামনের গলি ধরে সোজা ঢুকে যান। ডাইনে প্রথম যে পুকুর পড়বে, তার পিছনে উঁচু পাঁচিলওয়ালা দোতলা বাড়ি।"

ভাঙাভাঙা ইট ফেলা এবড়োখেবড়ো রাস্তা। টুপুর হাঁটতে হাঁটতে বলল, "এটা কী রকম হল মিতিনমাসি? ডক্টর সান্যাল আমাদের মিথ্যে বললেন? ওঁর ভাই বাঙ্গালোরে যায়নি?"

"তাই তো দেখা যাচ্ছে।"

"আমার মনে হয়, পুলিশ বা মিডিয়ার কাছে নেশাখোর ভাইয়ের কথা বলতে চাননি। চাপা দেওয়ার জন্য বাঙ্গালোর টাঙ্গালোর বলে..."

"চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে আসিস না। এখন তাড়াতাড়ি চল।"

গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে মিনিটতিনেক লাগল। চায়ের দোকানের

লোকটা যাকে পুকুর বলেছিল, আদতে সেটা পানা বোঝাই এক এঁদো ডোবা। সান্যালবাড়িটিও অতি প্রাচীন। দশা অকহতব্য। প্লাস্টারটাস্টার তো কবেই খসে গিয়েছে, দেওয়ালে শ্যাওলার কালচে ছোপ, ছাদের আলসেতে শিকড় ছড়িয়েছে বট-অশ্বত্থের চারা। বাড়িটা কি ক্লাইভের আমলে তৈরি?

ভারী গেট ঠেলে মিতিন আর টুপুর ভিতরে এল। চারপাশের ফাঁকা জমিতে ঘাস-আগাছার জঙ্গল। নির্ঘাত কস্মিনকালে পরিষ্কার করা হয় না। বাড়ি ঘিরে গোটাচারেক বড় গাছ এলোমেলো দাঁড়িয়ে। আম, কাঁঠাল, নিম। ঝাঁকড়া গাছগুলোর দৌলতে জায়গাটা বেশ ঠান্ডাঠান্ডা। ছায়া মাখা।

তিন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে লাল মেঝের টানা বারান্দা। আট ফাটা। ধুলোয় ভরা। দু'ধারে দু'খানা রোয়াকও আছে। লাল রঙেরই। ভাঙা-ভাঙা। বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ির সদর দরজা। বন্ধ। খড়খড়িওয়ালা লম্বা লম্বা জানলাগুলোও খোলা নেই একটাও। না একতলায়, না দোতলায়।

মোটা কাঠের ধূসর দরজাখানার পাশে ডোরবেল খুঁজছিল মিতিন। আচমকাই খুলে গিয়েছে পাল্লা। দরজা জুড়ে দশাসই চেহারার এক লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা, একমাথা কোঁকড়া চুল, ধ্যাবড়া নাক, গায়ের রং আলকাতরাকেও লজ্জা দেয়। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ।

ভারিক্কি স্বরে লোকটা বলল, "কী চাই?"

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "আমরা সুধন্য সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"সুধন্য ঘুমোচ্ছে। ওর শরীর ভাল নেই।"

"কী হয়েছে সুধন্যবাবুর?"

"বললাম তো, অসুস্থ।"

"কী অসুখ?"

লোকটার দৃষ্টি রুক্ষ হল। নিরীক্ষণ করছে মিতিন-টুপুরকে। গলা আরও ভারী করে বলল, "কোত্থেকে আসছেন বলুন তো?"

"বাসন্তী। ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল পাঠিয়েছেন।"

মুহূর্তের জন্য যেন চমকাল লোকটা। কোনও একটা ধন্দেও পড়েছে মনে হল। পরক্ষণেই অবশ্য সামলে নিয়েছে নিজেকে। গলা ঝেড়ে বলল, "দেখা করার অনুমতি নেই। ডাক্তারবাবুর বারণ।"

"আমরা ওঁকে ডিস্টার্ব করব না। জাস্ট দেখা করেই চলে যাব।"

"আঃ, কেন ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন? বলছি তো হবে না। আপনারা আসুন।"

বলেই লোকটা মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

টুপুর রাগরাগ মুখে বলল, "আচ্ছা বেয়াদব লোক তো!"

মিতিনের ঠোঁটে চোরা হাসি, "চল, ফিরি। আমার যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। এবার আসল কাজে নামব।"

দ্রুত পায়ে মোড়ে এসে টুপুররা দেখল, সবেধন নীলমণি সেই রিকশা এখনও দাঁড়িয়ে। উঠে সিটে বসতেই চা-দোকানের লোকটা বেরিয়ে এসেছে, "কেমন দেখলেন সোনাদাকে?"

মিতিন মুখটাকে করুণ করে বলল, "ভাল নয়।"

"রুপোদাকে বলুন না, ভাইকে বাড়িতে ফেলে না রেখে ভাল হাসপাতালে দিয়ে দিক। অপোগণ্ড ভাইটার জন্য এত কিছু করেন, নয় এই দায়টুকুও নিলেন।"

"বলব।"

মিতিনমাসির ব্যাপারস্যাপার আচার-আচরণ সব কেমন হেঁয়ালির মতো লাগছিল টুপুরের। তবে একটা জটিল কোনও

ধাঁধা যে চলছে, তাতে কোনও দ্বিমত নেই। এবং তার সমাধানটাও মিতিনমাসি পেয়ে গিয়েছে।

স্টেশনে পৌঁছেও টুপুর এতাল-বেতাল ভাবছিল। ট্রেন আসতে দেরি হচ্ছে, প্ল্যাটফর্মের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে আছে মিতিনমাসির সঙ্গে। এই তাতেপোড়া দুপুরেও ট্রেনযাত্রীর কমতি নেই, অনেকেই অপেক্ষা করছে ট্রেনের।

টুপুরের একটু তেষ্টা তেষ্টা পাচ্ছিল। এদিক-ওদিক কোনও ডাবওয়ালা আছে কিনা দেখতে গিয়ে হঠাৎই দৃষ্টি স্থির। প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে কে ও? ইতিউতি তাকায়? সান্যালবাড়ির সেই অভদ্র লোকটা না? পলকের জন্য দর্শন দিয়েই সাঁত করে সরে গেল কোথায়! কোনও দোকানের আড়ালে ঘাপটি মারল কি?

মিতিনমাসির হাত চেপে ধরেছে টুপুর। অস্ফুটে বলল, "ওদিকে দ্যাখো!"

চোখে সানগ্লাস চড়ানো মিতিনের স্বর নির্বিকার, "দেখেছি। আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাস না।"

"লোকটা কি আমাদের ফলো করে এল?"

"রোদ্দুরে নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরোয়নি!"

টুপুরের মুখে আর কথা ফুটছে না। ভিতরটা উত্তেজনায় টগবগ করছে। ষণ্ডামার্কা লোকটার কী মতলব আছে রে বাবা? নীলাম্বর যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকে, আর মল্লিকপুরের সান্যালবাড়ির সঙ্গে তার কোনও যোগসূত্র থাকে, তা হলে তো আরও সাবধান হওয়া উচিত মিতিনমাসির।

ট্রেন ঢুকছে। কামরায় ওঠার আগে তাকাব না তাকাব না করেও টুপুরের চোখ ঘুরে গেল। সর্বনাশ, যা ভেবেছে তাই! লোকটা বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে! ট্রেনে চড়তে গিয়েও কী ভেবে

যেন উঠল না। দাঁড়িয়ে গিয়েছে দরজার সামনে। যাক নিশ্চিন্ত, এখনই এখনই তা হলে বিপদের আশঙ্কা নেই।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই মিতিনমাসি হাত ধরে টানল, "নেমে পড়।"

"কেন?"

"আবার মল্লিকপুরে ফিরব।"

আবার সেই এঁদো ডোবা। আবার সেই ভারী গেট। আবার সেই জরাজীর্ণ সান্যালবাড়ি। সময়টাই শুধু দুপুর থেকে বিকেলের দিকে গড়িয়েছে, এই যা। উঁহুঁ, আরও একটা তফাত হয়েছে। একখানা মোটরবাইক দাঁড়িয়ে বাড়িটার ভিতরে। আমগাছতলায়।

এবার আর বারান্দায় উঠে ডোরবেল খুঁজল না মিতিন। গুমগুম ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়।

একতলার একটা জানলার খড়খড়ি ফাঁক হল। চেনা রুক্ষ গলা, "কে?"

"আমরা। তখন এসেছিলাম।"

"আবার কী হল?"

"সুধন্যবাবুকে একটা জিনিস দেওয়ার ছিল।"

"দাঁড়ান। আসছি।"

মিনিটদুয়েক পর দরজা খুলল। এখন আর লুঙ্গি-পাঞ্জাবি নয়, লোকটার পরনে ট্রাউজ়ার আর টি-শার্ট। স্টেশন থেকে ফিরে এখনও পোশাক বদলায়নি। দু'হাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

কর্কশ গলায় বলল, "কী, দেবেনটা কী? বারবার এসে বিরক্ত করছেন কেন?"

"দাঁড়ান না একটু, দিচ্ছি।" মিতিন ধীরেসুস্থে ভ্যানিটি ব্যাগের চেন খুলল। এবং তারপরই যে বস্তুটি বের করল, তার জন্য লোকটা কণামাত্র প্রস্তুত ছিল না। টুপুরও নয়।

আস্ত একখানা রিভলভার!

সেকেন্ডের মধ্যে সেফটি ক্যাচ খুলে মিতিন রিভলভারের নল ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকটার নাকের ফুটোয়। তীক্ষ্ণ স্বরে হিসহিসিয়ে উঠল, "এক চুল নড়লে গুলি চালিয়ে দেব।"

আতঙ্কে চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এল লোকটার। ঘড়ঘড় করছে গলা। ঘামছে দরদর।

রিভলভার দিয়েই লোকটাকে ঠেলল মিতিন, "চলুন, ভিতরে চলুন। উঁহু, ঘোরার চেষ্টা নয়। পিছন দিকেই হাঁটুন।"

অগোছালো বসার ঘরের মাঝখানে এসে মিতিন পলকে চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। জিজ্ঞেস করল, "টেলিফোন কোথায়?"

কাঁপতে-কাঁপতে লোকটা বলল, "দো-দো-দো-দোতলায়।"

"টুপুর, আমার ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের কর তো।"

মিতিনমাসির দাপট দেখে টুপুরের বুকেও বল এসে গিয়েছে সহসা। দ্রুত খুদে যন্ত্রখানা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিয়েছে।

ওই এগিয়ে দেওয়া আর মিতিনের ঝলক ঘুরে তাকানো — দুইয়ের মধ্যে যেটুকু সময়, তার ফাঁকেই লোকটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মিতিনকে। হিংস্র বুনো ভল্লুকের মতো হাঁ হাঁ করে ধেয়ে এল সঙ্গেসঙ্গে।

পর মুহূর্তেই যা ঘটল, টুপুর জীবনেও ভুলবে না। কাঁধের ওড়না ফেলে দিয়ে ভল্ট খেয়ে উঠে দাঁড়াল মিতিনমাসি। বিদ্যুৎবেগে সরে গেল খানিকটা। তারপর বিকট চিৎকার হেনে জোর এক লাফ। এবং

লোকটার বুকে সপাটে জোড়া পায়ের লাথি। কী সাংঘাতিক জোর ওই পদাঘাতের, বাপ্‌স! কাটা কলাগাছের মতো লোকটা ধরাশায়ী!

ত্বরিত গতিতে লোকটার বুকে হাঁটু চেপে মিতিনের রিভলভার এবার লোকটার রগে, "কী, ট্রিগার টিপব?"

লোকটা অসহায়ভাবে মাথা ঝাঁকাল, "আমি কিছু জানি না। আমায় ছেড়ে দিন।"

"কোনও চালাকি নয়। উঠে বসুন। ফোনে বাসন্তীতে কথা বলুন এখনই। আপনার বসের সঙ্গে।"

"কে কে কে..কে বস?"

"ন্যাকা সাজা হচ্ছে? যা যা বলছি, অবিকল সেই কথাগুলো বলবেন। একটা শব্দ এদিক-ওদিক হলে কিন্তু নীলাম্বরের চেয়েও বিচ্ছিরিভাবে মরতে হবে। আমি কিন্তু ঘিলু ছেতরে দেব।"

"কী কী কী কী বলব?" লোকটা কাঁপছে।

"বলছি। মন দিয়ে শুনুন। ... বলবেন, হাওয়া খুব গরম। মেয়ে টিকটিকিটা সব আঁচ করে ফেলেছে। মাল আর এখানে রাখা সম্ভব নয়, আজই পাচার করা দরকার। আপনি যে করে হোক এখনই চলে আসুন। আমি আর-একবার বাইকে চেপে বাইরের হাওয়া দেখে আসছি। তেমন বুঝলে আপনাকে আবার ফোন করব।"

"অ্যা অ্যা অ্যা অ্যাত কথা ...?"

"হ্যাঁ। গলা যেন একটুও না কাঁপে। বলতে পারলে নীলাম্বর হত্যায় রাজসাক্ষী হওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। না পারলে আজই জীবনের ইতি।" বলেই মিতিন ঘুরেছে টুপুরের দিকে, "মোবাইলে সুমন্ত্র সান্যালের নম্বরটা ধর তো। প্রথমে বাসন্তীর এস টি ডি কোড। জিরো থ্রি টু ওয়ান এইট থ্রি টু ..."

রিং বাজতেই টুপুর মোবাইল চেপেছে লোকটার কানে। বীরদর্পে বলল, "নিন, কথা বলুন।"

লোকটা কোনওক্রমে আওড়াচ্ছে শেখানো বাক্যগুলো। ওপারের মানুষটার স্বর চড়ছে ক্রমশ। প্রায় নিঃশব্দ ঘরে তার সংলাপও স্পষ্ট শোনা যায়। ডক্টর সান্যালের মতো সৌম্য শান্ত ভদ্রলোকের মুখে এ কী ভাষা? '... শয়তান মেয়ে টিকটিকিটাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের তলায় ফেলে দিসনি কেন! দাঁড়া, আজকের ঝামেলা মিটুক, ডিটেকটিভকেও আমি নীলাম্বর আর ডোবারম্যানটার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি! আসছি আমি। যত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছোচ্ছি!'

মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল টুপুর।

মিতিন কড়া গলায় বলল, "এবার উঠে দাঁড়ান। কোনও বেগড়বাঁই না করে দোতলায় চলুন। যেখানে টেলিফোন আছে, সেখানে বসে থাকবেন চুপটি করে। আর আপনার বসের ফোন এলে ধরবেন।"

লোকটা বুঝে গিয়েছে আর তার রক্ষা নেই। অগত্যা বেজার মুখে যন্ত্রচালিত রোবটের মতো উঠল সিঁড়ি বেয়ে। মিতিন অবশ্য রিভলভার ঠেকিয়ে রেখেছে তার শিরদাঁড়ায়। দোতলার বড় প্যাসেজে খানতিনেক ছেঁড়াখোঁড়া সোফা, মাঝে কাচের টেবিল। টেলিফোন টেবিলেই শোভা পাচ্ছিল। ধপ করে সোফায় শরীর ছেড়ে দিল লোকটা। হাঁপাচ্ছে।

রিভলভার উঁচিয়ে রেখে মিতিন বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল, "এবার বলুন, আপনাদের মালটা কোথায় রাখা আছে?"

লোকটার গলায় আর স্বর নেই। চোখের ইশারায় বাঁ দিকের বন্ধ ঘরটা দেখাল।

মিতিন টুপুরকে বলল, "যা, ও ঘরে উঁকি দিয়ে আয়। নয়ন সার্থক হবে।"

টুপুর উৎসুক পায়ে গিয়েছে ঘরের সামনে। ঠেলে দরজা খুলতেই দু'চোখ বিস্ফারিত। এ কী দৃশ্য? এও কি সম্ভব?

ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল স্বয়ং ঘুমোচ্ছেন বিছানায়!

মল্লিকপুরে ফের এসে প্রথমে অনিশ্চয় মজুমদারকে ফোন করেছিল মিতিন। খোদ আই জি সাহেবের নির্দেশ পেয়ে স্থানীয় থানার ও সি দেরি করেননি, পৌনে পাঁচটার মধ্যে সদলবলে হাজির। একটা মুশকো শয়তানকে মিতিন একাই কবজা করেছে দেখে তাঁর তো চোখ কপালে। পরক্ষণেই অবশ্য অনুযোগ জানালেন, এত বড় ঝুঁকি নেওয়া নাকি ঠিক হয়নি। পুলিশবাহিনীর জন্য মিতিনের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। বাড়িতে বজ্জাতটার আরও সঙ্গীসাথীও তো থাকতে পারত।

মিতিন আশঙ্কাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিল। সান্যালবাড়িতে প্রথমবার এসেই সে বুঝে ফেলেছে, এখানে পাজি লোকটার কোনও দোসর নেই। বাসন্তী থেকে কর্তার হুকুম পেয়ে সে মোটরবাইক নিয়ে স্টেশন অবধি ছুটেছিল বটে, কিন্তু বাড়ি ফাঁকা বলেই বেচারা ট্রেনে উঠে মিতিনদের অনুসরণ করতে পারেনি। তাকে ফিরতে হয়েছে সান্যালবাড়ির গুহায়। তা ছাড়া চেহারা যতই জবরদস্ত হোক, মিতিনের ধারণা লোকটা আদতে রামভিতু।

টুপুর মনেমনে হাসছিল। মিতিনমাসির স্বভাবটাই এরকম। কখনওই নিজেকে জাহির করতে চায় না। সে তো দেখেছে, কীভাবে মিতিনমাসি কুংফুর দক্ষতায় অবলীলায় পটকে দিল লোকটাকে। থাক সে কাহিনী, শুনে ও সি সাহেব হয়তো ভিরমি খাবেন!

লোকটাকে পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে মিতিন এখন অনেকটা ঝাড়া হাত-পা। মোবাইলে বাড়িতে ফোন করল একবার। জেনে নিল বুমবুম কী করছে। পেট ভরে বুমবুমকে পাস্তা খাইয়ে দিতে বলল ভারতীকে। রাতের রান্না নিয়েও নির্দেশ দিল টুকিটাকি। তারপর উর্দিধারীদের খানিকটা আড়ালে আবডালে থাকতে বলে টুপুরকে নিয়ে সোজা মোড়ের চায়ের দোকানে।

সান্যালবাড়িতে পুলিশ দেখে দোকানে জল্পনাকল্পনা চলছিল

জোর। দুপুরের লোকটা হাত-মুখ নেড়ে খদ্দেরদের বলছিল কী সব, মিতিনদের দেখে থমকে গেল। অবাক হয়ে বলল, "একী, আপনারা তখন যাননি?"

টুপুর বুঝল, দ্বিতীয়বার রিকশায় সোজা সান্যালবাড়ি চলে গিয়েছিল বলে দোকানদারটি তাদের খেয়াল করেনি। মিতিনের পাশে বেঞ্চিতে বসে বলল, "না। দরকারে পড়ে ফিরতে হল।"

টুপুরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মিতিন বলল, "স্টেশনে গিয়ে বাসন্তীতে ফোন করেছিলাম। স্যার জানালেন, উনি আজই আপনাদের সোনাদাকে রিমুভ করতে আসবেন। তাই আমরাও রয়ে গেলাম। যদি স্যারের কাজে লাগি।"

এক কৌতূহলী ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু সান্যালবাড়িতে পুলিশ এসেছে কেন?"

"সোনাবাবুর বন্ধুটি নাকি সুবিধের নয়।" মিতিন চোখ ঘোরাল, "একটা কুকুর আর একটা মানুষকে মার্ডার করে এখানে ঘাপটি মেরে ছিল।"

"ছি ছি, কী সব বন্ধুর সঙ্গে মেশে সোনা! একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে।"

"আর এই জন্যই তো সোনাদার এই হাল।" অন্য এক খদ্দের বলল, "সাধে কি বলে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ!"

মিতিন প্রসঙ্গটায় আর ঢুকলই না। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "কিছু খাবার হবে ভাই?"

দোকানি শশব্যস্ত, "ঘুগনি বানিয়েছি। টোস্ট-অমলেটও হতে পারে। কিংবা টিফিনকেক।"

"ঘুগনিই দিন দু'প্লেট। সঙ্গে দুটো লিকার চা। ... কী রে টুপুর, আজ তোর একটু চা চলবে তো?"

টুপুর লাজুক মুখে বলল, "খাই একদিন।"

"অমলেটও নিতে পারিস সঙ্গে। পেটটা ভরা থাক। আরও ঘণ্টা তিন-চার হয়তো এখানে কাটাতে হবে।"

অতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না অবশ্য। সান্যালবাড়িতে ফিরে একতলার ঘরে বসে ও সি'-কে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শোনাচ্ছিল মিতিন, পৌনে আটটা নাগাদ বাইরে গাড়ির শব্দ। অ্যাম্বাসাডর।

টুপুরের স্নায়ু টানটান। না জানি কী হয় এবার!

বাসন্তীর দীর্ঘদেহী মানুষটি দরজা ঠেলে ঢুকলেন ঘরে। সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে মিতিন। দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "ওয়েলকাম হোম

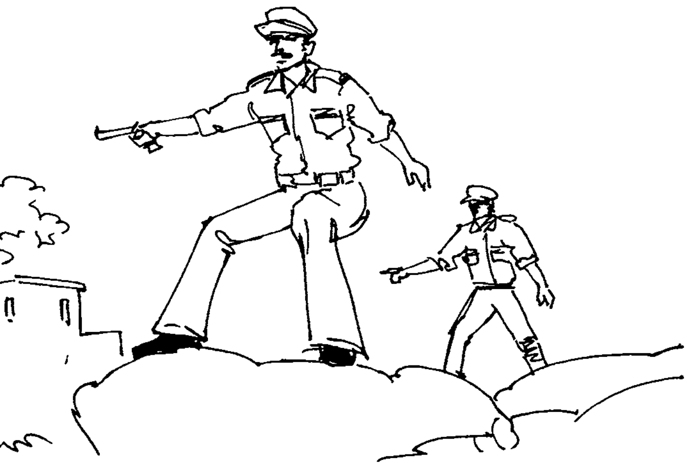

সুধন্যবাবু। আপনার বাকি দুই চ্যালা কি গাড়িতে? তাদের বলে দিন, ভাড়া করা গাড়িটি আর লাগবে না। মহামান্য সরকারবাহাদুরের ব্লু মারিয়া আপনাদের পথ চেয়ে আছে।"

২

বাসন্তীতে ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ি আজ জমজমাট। মিতিন, পার্থ, টুপুরের সঙ্গে বুমবুমও এসেছে। অনিশ্চয় মজুমদারও। রতন হেনরি মণ্ডল এখন দেখাশোনা করছে সুমন্ত্র সান্যালের। বুমবুম তার লেজ ধরে সর্পগৃহ দেখতে গিয়েছিল। দর্শন সেরে সে ছুটে বেড়াচ্ছে গোটা কম্পাউন্ডে। আই জি সাহেবের আগমনবার্তা পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাসন্তী থানার ও সি'ও হাজির। মঙ্গলও আজ রয়েছে বাড়িতে।

ডক্টর সান্যাল এখন অনেকটাই সুস্থ। মল্লিকপুর থেকে উদ্ধার করে তাঁকে দিনকয়েকের জন্য রাখা হয়েছিল কলকাতার এক নার্সিং হোমে, বাসন্তী ফিরেছেন সবে পরশু। টানা আট-ন'দিন কোকেন ইঞ্জেকশন পড়ার প্রতিক্রিয়া তাঁর স্নায়ু থেকে কেটেছে বটে, আচ্ছন্ন ভাবটাও আর নেই। তবে এখনও তিনি বেশ দুর্বল। হাঁটাচলা যতটুকু করছেন, রতনের কাঁধে ভর রেখে। তাঁরই আন্তরিক আমন্ত্রণে আজ এই সমাগম।

বাইরের ঘরে বসে কথাবার্তা চলছিল। চা, মিষ্টি হয়ে গিয়েছে এক প্রস্থ, রতন দ্বিতীয় রাউন্ডে কফি দিয়ে গেল। কাপ হাতে নিয়ে অনিশ্চয় জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ম্যাডাম, শুধু রিগর মর্টিস সেট ইন করার টাইমের সূত্র ধরেই আপনি বুঝে ফেলেছিলেন নীলাম্বর খুন হয়েছে?"

পার্থ বলে উঠল, "সঙ্গে সাপের কামড়ের দাগগুলোও আছে। ইঞ্জেকশনের চিহ্ন আর সাপের দাঁতের দাগ নিশ্চয়ই এক রকম হবে না?"

মিতিন বলল, "হ্যাঁ, ওটাও একটা যুক্তি বটে। ক্ষতস্থানটাও আমার কেমন কেমন যেন লেগেছিল! পরে বই দেখে জানলাম, রাসেল ভাইপার, মানে চন্দ্রবোড়া, পুরো বিষ ঢাললে চামড়া সামান্য হলেও ছিঁড়ে যায়। নীলাম্বরের গোড়ালিতে দুটো বড় বড় ফুটো ছিল বটে, জায়গাটা ফুলেও গিয়েছিল, কিন্তু চামড়া ছিল ইনট্যাক্ট। এ ছাড়া কিন্তু ছোট দাগ, মানে বিষদাঁত ছাড়া বাকি দাঁতের কোনও চিহ্নই ছিল না। অবশ্য বাকি দাঁতের দাগ সবসময় যে পড়বেই তার কোনো মানে নেই।"

মঙ্গল মন দিয়ে শুনছিল। ধরাধরা গলায় বলল, "আমারও কিন্তু একটু একটু সংশয় জেগেছিল। মনে হচ্ছিল, সাপ পুরো ছোবল মারতে পারেনি। গরমকালে সাপের বিষ পাতলা থাকে। পুরো বিষ না ঢেলে থাকলে নীলু অত তাড়াতাড়ি মরে কী করে?"

"হুঁ। তবে এত সূক্ষ্ম জ্ঞান তখনও আমার ছিল না। আমি খুনের ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত হয়েছিলাম অন্য একটা ব্যাপার থেকে। ডেডবডির পকেটে কোনও চাবি ছিল না।"

অনিশ্চয় বিস্মিত স্বরে বললেন, "মানে?"

"ডক্টর সান্যালের বাড়ির গেট সবসময় তালাবন্ধ থাকে। নীলাম্বর রাতেই বেরোক, কি ভোরে, সে নিশ্চয়ই তালা খুলে বেরিয়েছে। অতএব চাবিটি তার পকেটেই থাকার কথা। ছিল কি?"

ও সি বললেন, "না। আমরা ডেডবডির পকেট ভালভাবে সার্চ করেছি। কিচ্ছু ছিল না। ডেডবডির আশেপাশেও কিছু পাওয়া যায়নি।"

"তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? নীলাম্বর তালা খুলে বেরোয়নি, অথচ বডি বাইরে পড়ে ছিল! খুন ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং সেটা হয়েছে বাড়ির ভিতরেই। তারপর খুনি তালা খুলে বডি সরিয়েছে। তবে সত্যি বলতে কী, খুনের চেষ্টা আগের রাত্তিরেই হয়েছিল। একা সুধন্যই সাপের বিষ ইনজেক্ট করতে ঢুকেছিলেন নীলাম্বরের ঘরে। কিন্তু নীলাম্বর জেগে গিয়ে চোর এসেছে ভেবে হল্লাগুল্লা শুরু করায় সুধন্যর মতলবটি কেঁচে যায়। এদিকে নীলাম্বরকে বাঁচিয়ে রাখাও সুধন্যর পক্ষে বিপজ্জনক। যদি নীলাম্বর তাকে চিনে ফেলে? যে-উদ্দেশ্যে তাঁর সুমন্ত্রর বেশ ধারণ, নীলাম্বর উপস্থিত থাকলে তাতেও তো পদেপদে বিঘ্ন!"

পার্থ বলল, "আমার মনে হয় সুধন্য যে সুমন্ত্র নন, এ ধারণা নীলাম্বরের মাথায় এসেওছিল। আঁচ পেয়ে তাই তাকে তড়িঘড়ি ..."

"হতেই পারে।" মিতিন মাথা নাড়ল, "হতে পারে সুধন্যর কোনও ফোনাফুনি শুনে ফেলেছিল নীলাম্বর। ওদিকে তখন অন্য একটা বখেড়াও এসে পড়েছে। পরদিন থেকে বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসার কথা। চোরের উপদ্রবের জন্য। তাই খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই চ্যালাচামুণ্ডাদের ডেকে নীলাম্বরকে নিকেশ করা হল। চ্যালাদের সাহায্যে ক্লোরোফর্মটোরোফর্ম দিয়ে আগেই অজ্ঞান করে মেপেজুপে ভেনাম পুশ। তারপর চ্যালাদের মাধ্যমেই বডি পাচার।"

পার্থ বলল, "কিন্তু শাগরেদরা এল কখন?"

"বিকেল বা সন্ধেতে এলে নীলাম্বর নিশ্চয়ই তাদের দেখেছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা তো এখন আর সম্ভব নয়।" মিতিন কফি শেষ করে কাপ নামাল, "আমার ধারণা, নীলাম্বর তাদের বিকেল-সন্ধেতে দ্যাখেনি। কারণ তারা এসেছিল রাতে।"

"কী করে হয়? রাতে তো ফেরিঘাট বন্ধ থাকে?"

"রাস্তা হাজার একটা আছে মশাই। গোসাবা দিয়েও বাসন্তীতে আসা যায়। সেখানকার ফেরিঘাট এই বাড়ি থেকে অনেকটাই দূরে। ওই ঘাটে সন্ধেয় এসে, জিরিয়েটিরিয়ে রাত বাড়লে হয়তো রওনা হয়েছে। সোনাখালি থেকে প্রাইভেট নৌকো ভাড়া নিয়ে, যেখানটা নীলাম্বর পড়ে ছিল, সেখানে এসে নামলেও জানছেই বা কে, দেখছেই বা কে! তারপর রজারকে মারার জন্য যেভাবে কম্পাউন্ডে ঢুকেছিল, সেভাবেই পাঁচিল টপকে গৃহে প্রবেশ।"

"হ্যাঁ। আমার রজারকে ওরাই মেরেছিল।" ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত সুমন্ত্রর ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, "মল্লিকপুরে আমাকে ওরা ভয় দেখিয়ে বলত, রিভলভারে সাইলেন্সার লাগিয়ে মেরে রজারকে যেমন জলে ভাসিয়ে দিয়েছি, আপনাকেও সেভাবে..."

"পাষণ্ডের দল।" পার্থ গজগজ করে উঠল, "অনিশ্চয়বাবু, ওরা তো এখন পুলিশ হাজতে। রোজ ওদের একশো ঘা করে বেত মারা যায় না?"

মিতিন বলল, "আহা, বেচারাদের আর উপায়ই বা কী ছিল! রজারকে না সরালে সুমন্ত্রবাবুর জায়গায় সুধন্যবাবু ঢুকবেন কী করে! দু'জনে যমজ ভাই ঠিকই, দেখতেও হুবহু এক। তবে মানুষ ধোঁকা খেতে পারে, কুকুর তো আসল লোক চিনতে এক সেকেন্ডও সময় নেবে না।"

টুপুর বলল, "সত্যি, যমজ ভাইদের চেহারায় এত মিল আমি জন্মে দেখিনি।"

"হয় রে, হয়। অনেক হয়। হয়তো একটু ডিফারেন্স থাকে। হয়তো হাইটে হাফ ইঞ্চি কম-বেশি, কিংবা ভুরু অন্যরকম। অথবা নাকে স্লাইট তফাত। পাশাপাশি দু'জনকে একসঙ্গে না দেখলে ওটুকু ধরাই যাবে না।"

"আমাদের মধ্যেও আছে।" সুমন্ত্র বললেন, "চোখের মণিতে।"

"জানি। আপনার মণি কালো। আর আপনার ভাইয়ের চোখ কটা। সুধন্যবাবু কনট্যাক্ট লেন্স পরে সেটা সহজেই ম্যানেজ করেছিলেন।"

পার্থ ভুরু কুঁচকোল, "তুমি আই-বলের ব্যাপারটা জানলে কী করে?"

"দেবেশ সেনের কল্যাণে। দেবেশবাবুর মুখে গল্প শুনে হঠাৎই রাতে মাথায় স্ট্রাইক করল, দু'ভাই বোধহয় যমজ। নইলে একজন যখন বি এসসি ফাইনাল ইয়ারে, অন্যজনের তখন মেডিক্যাল থার্ড ইয়ার? রাতে ফোন লাগাতেই রহস্য জলবৎ তরলং। চোখের কালারের ডিফারেন্সটাও জেনে গেলাম।"

"আর-একটা চিহ্নও ছিল আমাদের চেনার।" সুমন্ত্র চোখ বুজলেন, "আমার কাঁধে জড়ুল আছে, সোনার নেই।"

অনিশ্চয় বললেন, "আপনাদের মধ্যে আরও অনেক তফাত আছে ডক্টর সান্যাল। আপনাদের দু'জনের ক্যারেক্টারটাই একদম আলাদা। আপনি সৎ, বিদ্বান, দেশপ্রেমিক। আর আপনার ভাই লোভী, শঠ, নেশাখোর। আপনার উপর তার টানও নেই। নইলে লোভে পড়ে আপনার সঙ্গে এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর আচরণ করে!"

"সোনা কিন্তু চিরকাল এমনটা ছিল না, জানেন আই জি সাহেব।" সুমন্ত্র পূর্ণ চোখে তাকালেন। ভেজাভেজা স্বরে বললেন, "ডাক্তারি পড়তে যাওয়াটাই ওর কাল হল। বিশ্বাস করুন, ওকে সুপথে আনার কম চেষ্টা করিনি। ওর জন্য আমার বাবা-মাও জ্বলেপুড়ে মরেছেন! বিদেশে থাকতেই এখানকার এক বন্ধুকে ধরেকরে বাঙ্গালোরে সোনার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কোম্পানির টাকাপয়সা হাতিয়ে চম্পট দিল। এই বাসন্তীতে এসে আমি যখন কাজ শুরু করলাম, ওকে আবার সুযোগ দিলাম একটা। আমার সঙ্গেই থাকুক। পেটে মেডিক্যাল লাইনের বিদ্যে আছে তো, সাহায্য করুক আমার কাজে। কীসের কী! সে আমার সাপের বিষ

কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বেচা শুরু করে দিল। কী দাম ওই সব বিষের! পাঁচ হাজার টাকা, ছ'হাজার টাকা ভরি। শুধু তাই নয়, বিষ চুরি হলে আমার গবেষণাও তো চৌপাট। বাধ্য হয়ে বললাম, 'তুই মল্লিকপুরেই ফিরে যা। মাস-মাস গিয়ে টাকা দিয়ে আসব, কিন্তু তুই আর বাসন্তীর ছায়া মাড়াস না।' বুঝতে পারতাম, ভাইটার আরও ক্ষতি করলাম। কোনও কাজকর্ম না করেই হাতে টাকা পেয়ে প্রাণের সুখে নেশা করছে, আর চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে ফূর্তি করছে। মল্লিকপুরের বাড়িটা সারাতে টাকা দিলাম, সেই পয়সাও উবে গেল। আমার স্ত্রী তো ঘৃণাক্ষরেও এত সব কথা জানে না। ভাইকে আমিই প্রশ্রয় দিয়েছি জানলে সে যে কী অনর্থ করবে!"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু স্যার, আপনি যে ক্যান্সারের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছেন, এই খবরটি সুধন্যবাবু পেলেন কোত্থেকে?"

"আমি। আমি। আমিই দায়ী।" সুমন্ত্র বড়বড় শ্বাস ফেলছেন, "এত বড় একটা সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি, আপনজনের কাছে সেই আনন্দটুকু জানাব না? সোনা যে শুনে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, আমি বুঝব কী করে? কী স্পর্ধা ভাবুন, সে আমাকে বলে কিনা, 'ফর্মুলাটা দিয়ে দে! বড় কোনও ওষুধ কোম্পানিতে মোটা টাকায় বেচে তুই আমি দু'জনেই কোটিপতি বনে যাই!' আমি রাজি হইনি বলেই ওর এই চণ্ডমূর্তি।"

"তা স্যার, আপনার কাছে মাসদু'য়েক আগে যে তিনটে লোক এসেছিল, তারা কারা?"

"তারাই তো ওরা। সোনার তিন শাগরেদ। তখন এসে পরিচয় দিয়েছিল ওষুধ কোম্পানির অফিসার বলে। প্রথমে মিষ্টি কথায় লোভ দেখাল, তারপর সরাসরি শাসানি।" সুমন্ত্র যেন সামান্য উত্তেজিত,

"পরে বুঝলাম, সোনাই ওদের সাজিয়েগুজিয়ে পাঠিয়েছিল।"

টুপুর বলল, "তারপরই তো রজারকে সরিয়ে দিল। তাই না স্যার?"

"রজারকে হারিয়ে আমি প্রথমটা বড় বিহ্বল হয়ে পড়ি। সে আমায় বড্ড ভালবাসত।" সুমন্ত্রর গলা প্রায় বুজে এল, "তারপর হঠাৎই কেমন একটা ভয় এসে আমায় আঁকড়ে ধরল। রজারকে কে ইলোপ করল? কেন করল? ঘাবড়ে গিয়ে আই জি সাহেবকে তাই ফোন করেছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, যে-কোনও সময় সোনা আমায় আরও কোনও মারাত্মক ফাঁদে ফেলতে পারে।"

মিতিন বলল, "এরপর কী হল আমি বলছি। আপনি যাদবপুরে সেমিনারে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ফোন এল আপনার ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ঠিক সেখানে সংবাদ আসেনি, সেমিনার থেকে গেস্টহাউজে গিয়ে আপনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখনই পেয়েছিলেন ফোনটা। আপনি ভালমানুষের মতো ছুটলেন মল্লিকপুর। এবং সেখানে গিয়ে বন্দি হয়ে গেলেন।"

অনিশ্চয় জিজ্ঞেস করলেন, "এ তথ্য আপনি পেলেন কোত্থেকে?"

মিতিন বলল, "সুধন্যবাবুই আমায় তথ্যটি জানতে সাহায্য করেছিলেন। প্রথমদিন তিনি বলে ফেলেন, কলকাতায় গেলে সাধারণত সি এস আই আর গেস্টহাউজে থাকেন। ঢাকুরিয়া লেকের ধারে। নিজেকে সুমন্ত্র সান্যাল প্রতিপন্ন করার জন্যই হয়তো ওই বেফাঁস কথাটি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরও একটা ব্যাপারে তিনি সেদিন বেশ অসতর্ক ছিলেন। রজারকে বারবার 'কুকুর', 'কুকুর' করছিলেন। এতে যে রজারের প্রতি যথেষ্ট অবহেলাই প্রকাশ পায়, সেটা তাঁর খেয়াল ছিল না। সে যাই হোক, সুধন্যবাবুর কাছ থেকে ছোট একটা হিন্ট পেয়েই আমি

লেকের ধারের গেস্টহাউজটিতে যাই। এবং রিসেপশনে ফোনের খবরটি জানতে পারি। আরও খবর পাই, পরদিন গেস্টহাউজে গিয়ে সুমন্ত্রবাবু নাকি নিজের ব্রিফকেসটি নিয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ সুমন্ত্রবাবুর ভাইয়ের বানানো ঘাটশিলার গল্পটিও মিথ্যে।

পার্থ বলল, "তার মানে তখনই তুমি বুঝে গিয়েছিলে, সুধন্যবাবু সুমন্ত্র সান্যাল সেজে বাসন্তীতে বসে আছেন?"

"না। গেস্টহাউজে তো গিয়েছিলাম আমি শনিবার। তখনও ভাবছি, ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল বুঝি দু'মুখো মানুষ। তলেতলে কোনও অপকর্ম করে সাক্ষ্য লোপের জন্য নীলাম্বরকে খুন করিয়েছেন। কিন্তু কার্যকারণ সূত্র মিলছিল না। রজারের মৃত্যুটাই গোল পাকিয়ে দিচ্ছিল। ডক্টর সান্যাল রজারকে সরাবেন কেন? তা হলে কি মেঘের আড়ালে কোনও মেঘনাদ আছে? রবিবার দেবেশবাবুর মুখে ডক্টর সান্যালের ভাইয়ের গল্প শুনে ছবিটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর রাত্তিরবেলা ছবিটা তো একদম স্পষ্ট।"

অনিশ্চয় বললেন, "একটাই বাঁচোয়া, আপনি খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন। ডক্টর সান্যালকে আরও ক'টা দিন কবজায় রাখতে পারলে সুধন্য তাঁকে পুরোপুরি কোকেনে আসক্ত করে ফেলত। তারপর তিনি যখন নেশার জন্য ছটফট করতেন, কোকেনের সিরিঞ্জ মুখের সামনে নেড়ে পেট থেকে বার করে ফেলত ফর্মুলাটা।"

"না আই জি সাহেব, সেটি বোধহয় পারত না।" সুমন্ত্র মাথা দোলাচ্ছেন, "প্রথমত, কাজটা আমার পুরোপুরি শেষ হয়নি। এখনও একটা-দুটো সিঁড়ি পেরোতে হবে। পরীক্ষা হবে মানুষের শরীরের উপরে। এবং তারপরই এটিকে আমি প্রতিষেধক বলে দাবি করতে পারব। তবে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় যতটা এগিয়েছি তা আমি সিডি করে লুকিয়ে রেখেছি। মরে গেলেও ওই

সিডি আমি সোনার হাতে তুলে দিতাম না। আর সোনাও সারাজীবন এ বাড়িতে মাথা খুঁড়ে সেটি খুঁজে পেত না।"

মিতিন হেসে বলল, "আমি কিন্তু স্যার অনুমান করতে পারছি ওটা কোথায় আছে।"

সুমন্ত্র কষ্ট করেও সোজা হয়ে বসলেন। দম নিয়ে বললেন, "কোথায় বলুন তো?"

"ল্যাবরেটরিতে। আপনি যে নতুন এগজ়স্ট ফ্যান বসিয়েছেন, সেখানেই বোধহয় গোপন গর্ত করে রাখা আছে।"

সুমন্ত্র ফ্যালফ্যাল তাকালেন, "কী করে বুঝলেন?"

"রজারকে হারানোর পরেই আপনার ঘরবাড়ি সারানো, নতুন এগজ়স্ট ফ্যানের ব্যবস্থা, এবং মই কেনা— আইডিয়াটা পেয়েছেন 'মুঘল এ আজ়ম'-এর ক্যাসেট দেখে, তাই না স্যার? আকবর যেভাবে নর্তকী আনারকলিকে দেওয়ালে গেঁথে ফেলেছিলেন, সেভাবেই আপনিও আপনার আবিষ্কারকে ..."

"না না, পুরো বন্ধ করিনি।" এতক্ষণে সুমন্ত্রর ঠোঁটে অনাবিল হাসি, "বক্স বানিয়েছি। উপরে সিমেন্টের ঢাকনাও আছে। দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা যাবে না।"

"আবার তা হলে সিডিখানা বের করে নিন স্যার। কাজটা শেষ করে ফেলুন। গোটা পৃথিবীর মানুষ কিন্তু ক্যান্সারের প্রতিষেধকের আশায় দিন গুনছে।"

"দেখি, পারি কিনা।" সুমন্ত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "আমার ভাইটার যে কী হবে!"

ঘরের বাতাস আরও যেন ভারী হয়ে গেল। বাইরেও আজ বড় গুমোট, মেঘ জমছে আকাশে। ডক্টর সান্যালের উদ্বেগটা যেন একটুক্ষণ পাক খেল ঘরে। তারপর বাইরের গুমোটে গিয়ে মিশে গেল।

সুমন্ত্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবার ফেরার পালা। বুমবুমকে ডেকে নিয়ে এগোতে শুরু করল সকলে। আগেআগে হাঁটছেন অনিশ্চয়, পাশে বাসন্তী থানার ও সি। পার্থ আর মিতিন তাঁদের পিছনে। সঙ্গে টুপুর, বুমবুম।

রাস্তায় এসে পার্থ তারিফের সুরে বলল, "নাঃ, কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিংই ছিল।"

অনিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন কথাটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটা ব্যাপার আমায় খুব হন্ট করছে, জানেন। প্রায় একই সময়ে একই মায়ের পেটে জন্মে, দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত নেচারের হয় কী করে? এ যে দেখি হিন্দি ফিল্মের গল্প! এক ভাই ভিলেন হল, এক ভাই হিরো!"

পার্থ বলল, "পরিবেশ একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করে, আই জি সাহেব। কুসঙ্গে পড়ে ক্রমশ অবনতি ঘটেছে সুধন্য সান্যালের। শেষ পর্যন্ত সে একটি বিষধর সাপে পরিণত হয়েছে।"

"সাপ কী বলছেন? এ তো সাপের চেয়েও মারাত্মক।"

"হুম। একমাত্র মানুষই বুঝি এত নিষ্ঠুর হতে পারে।"

টুপুর ম্লান গলায় বলল, "ডক্টর সান্যালের কথা ভাবলে আমার খুব খারাপ লাগছে।"

অনিশ্চয় বললেন, "অন্য অ্যাঙ্গল থেকেও ভাবুন। ডক্টর সান্যাল কীভাবে বেঁচে গেলেন! কাজ হাসিল হয়ে গেলে ভাইকে মেরে ফেলতে সুধন্যর মোটেই হাত কাঁপত না।"

"অথচ সব বুঝেও ডক্টর সান্যাল এখনও ওই ভাইয়ের জন্য মন খারাপ করছিলেন।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। কাজকর্মে আবার ডুবে গেলে সামলে যাবেন।"

"এসব ক্ষত কি আর সারে মজুমদারসাহেব?" মিতিন এতক্ষণে

মুখ খুলেছে, "ভাইটিকে ডক্টর সান্যাল সত্যিই বড় ভালবাসেন। সেই ভাই তাঁর সঙ্গে এরকম ...!"

"এর পরও টান থাকলে সেটা কিন্তু অন্ধ ভালবাসা ম্যাডাম। ডক্টর সান্যালের মতো বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।" অনিশ্চয় মৃদু হাসলেন, "যাক গে যাক, আপনি এবার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো ম্যাডাম। সুমন্ত্ররূপী সুধন্য সেদিন রজারের বদলে 'কুকুর' বলেছিল বলেই আপনি আন্দাজ করে ফেললেন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়?"

"বললাম তো, ওটা কানে লেগেছিল।" মিতিনের ঠোঁটে রহস্যের হাসি, "সেদিন এ-বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছিলাম মনে আছে?"

"কী বলুন তো?"

"একটা লোকাল ট্রেনের টিকিট। ওই দিনেরই। মল্লিকপুর টু ক্যানিং। ডক্টর সান্যাল তো ফিরেছেন ঘাটশিলা থেকে, ওই টিকিটে তা হলে কে এল? অবশ্য পথচলতি কেউও ফেলে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা তা হলে গেটের ভিতর পড়ে কী করে? এবং সেখান থেকেই আমার সন্দেহের শুরু। কেন যেন মনে হয়েছিল, মল্লিকপুরের টিকিট পড়ে থাকাটা কাকতালীয় নয়। বাড়িতেই কেউ এসেছিল। আসলে সুধন্যবাবুই বেখেয়ালে টিকিটটা ..."

টুপুর মুগ্ধ চোখে মিতিনমাসিকে দেখছিল। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'সত্যি মিতিনমাসি, ইউ আর জিনিয়াস!'

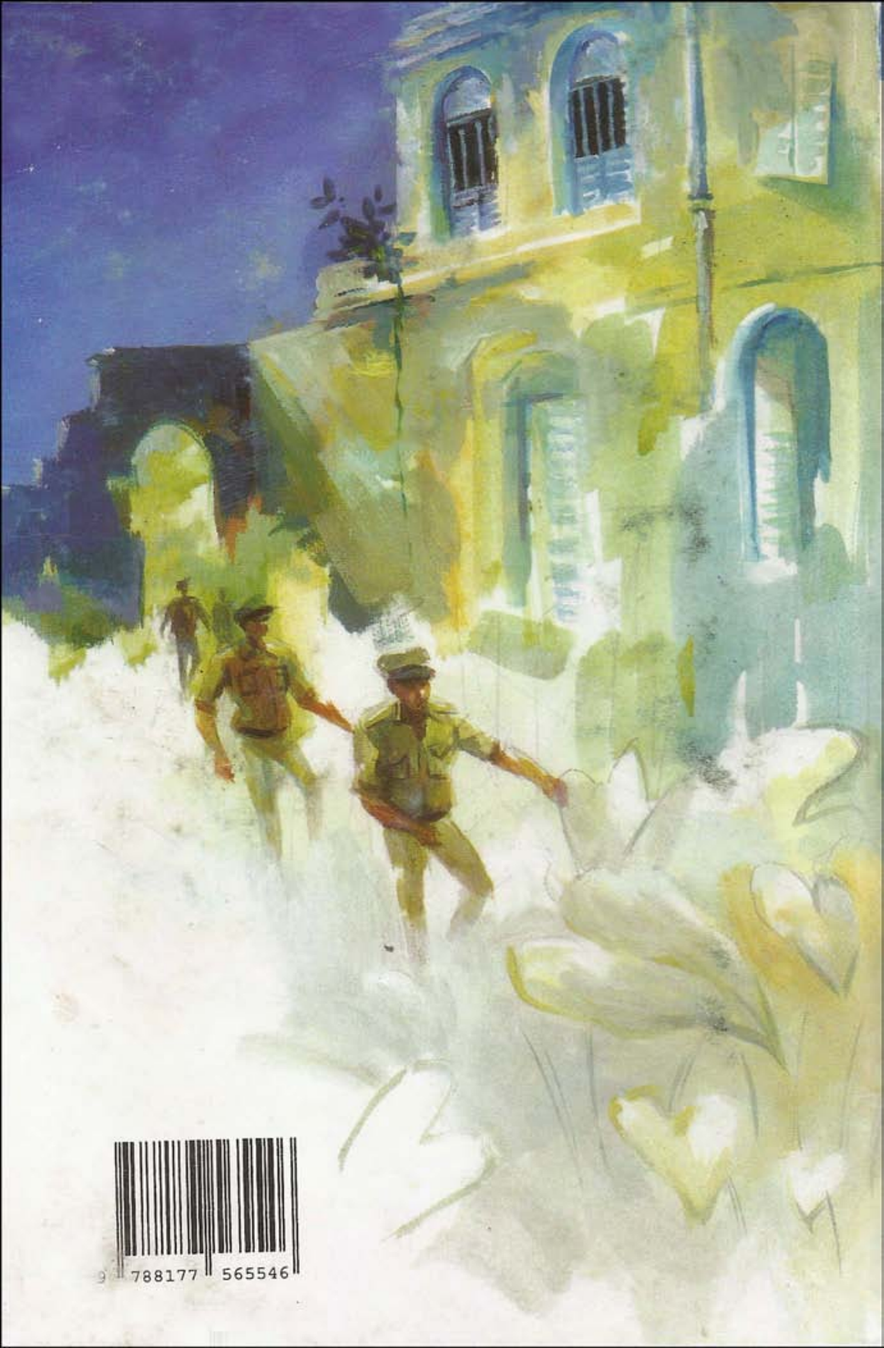

9 788177 565546

কিশোর কাহিনি সিরিজ

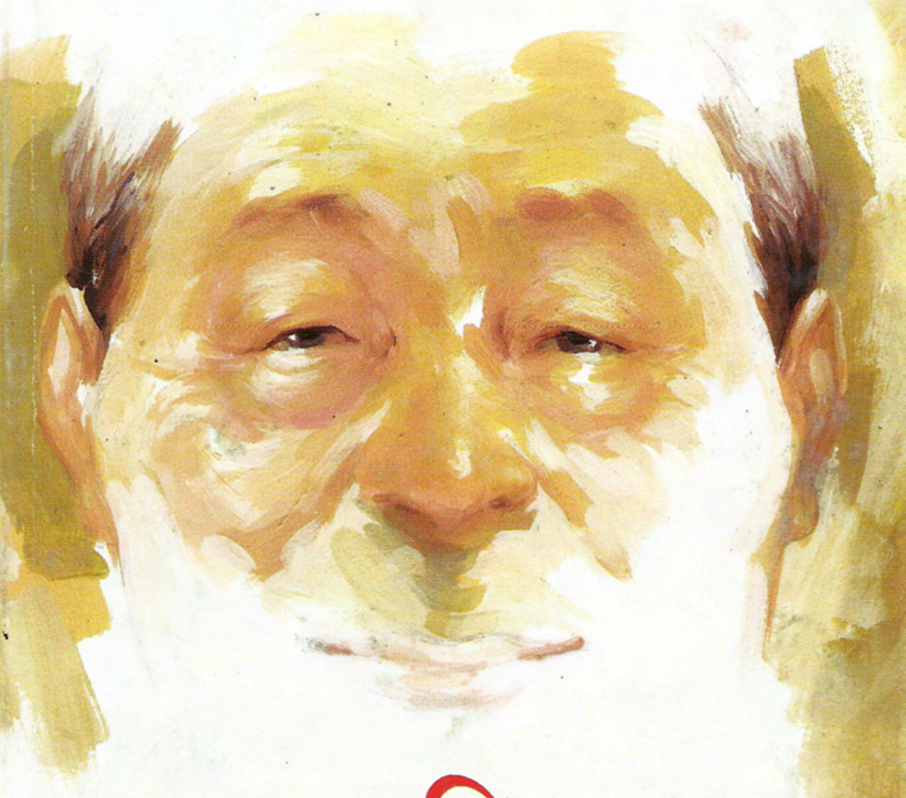

ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য

ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

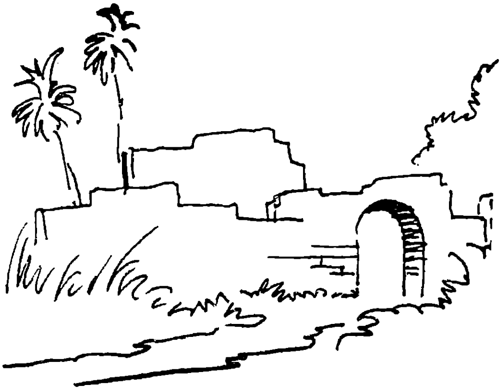

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

স্নেহের তিতানকে—

টেলিফোনটা রেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল টুপুর। রোববার সকালে এমন একটা সুসংবাদ! এইমাত্র পার্থমেসো জানাল, এবার মুম্বই যাওয়া হচ্ছে সদলবলে। শুধু তাই নয়, অজন্তা ইলোরা ঘুরে আসারও প্ল্যান আছে। বেরোনো হবে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন, ফেরা দেওয়ালির পরে। সব মিলিয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ। টানা চোদ্দো দিন মিতিনমাসির লেজ হয়ে থাকতে পারবে টুপুর, তার মধ্যে একটাও কি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটবে না?

অবনী ডাইনিং টেবিলে বসে পাকা পেঁপে খাচ্ছেন। সহেলি আর টুপুরের মতো ছুটির সকালে লুচি-পরোটা, ভাজাভুজি খাওয়া তাঁর একদমই পছন্দ নয়। ইদানীং তিনি বেশি করে ফলাহারে মন দিয়েছেন। শশা, আপেল, আনারস, কলা, কমলালেবু, যখন যা পাওয়া যায়।

বেড়ানোর খবরটায় অবনীর তেমন হেলদোল দেখা গেল না। ছোট্ট কাঁটায় এক টুকরো পেঁপে গেঁথে বললেন, "অজন্তা ইলোরা আমার দু'বার ঘোরা। মুম্বইও গিয়েছি বারচারেক। এবারে মহারাষ্ট্রের দুর্গগুলো দেখে আসতে পারলে কাজের কাজ হয়।"

সঙ্গে সঙ্গে সহেলি হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "কখনও না। আমি মরে গেলেও কোনও দুর্গে যাব না।"

টুপুর অবাক মুখে বলল, "কেন মা? দুর্গ তো খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা। এক-একটা দুর্গ মানে, এক-একটা ইতিহাস। আর মহারাষ্ট্রের অনেক ফোর্টই তো ছত্রপতি শিবাজির তৈরি। ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি জানতে গেলে ওই ফোর্টগুলো তো দেখা দরকার।"

"নিকুচি করেছে তোর ইতিহাসের।" সহেলি ঝেঁঝে উঠলেন, "যা উঁচু উঁচু সিঁড়ি হয় কেল্লাগুলোর, বাপ্‌স। মনে আছে, রাজস্থানের যোধপুর ফোর্টে গিয়ে আমার কী হাল হয়েছিল? হাঁটু নাড়তে পারছি না, কোমর ঝনঝন, দরদরিয়ে ঘামছি..."

"অজন্তা ইলোরা গেলেও কিন্তু হাঁটতে হবে, মা। পাহাড়ে চড়তে হবে।"

"সে আমি রাজি আছি। সুন্দর জিনিস দেখার জন্য কষ্ট করতে আমার আপত্তি নেই।"

"বা রে, দুর্গে বুঝি সুন্দর সুন্দর জিনিস নেই?"

অবনী পেঁপে শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছলেন। বললেন, "প্রায় প্রতিটি দুর্গেই একটা করে মিউজিয়াম থাকে। সেখানে রাজা-রাজড়াদের পোশাকআশাক, সেই সময়কার অস্ত্র, বাহন, পালকি, হাতির পিঠের হাওদা..."

"খ্যামা দাও। খ্যামা দাও। ওই সব ভারী ভারী ঢাল তলোয়ার দেখে দেখে আমার চোখ পচে গিয়েছে। এবার আর ওসবের ছায়া মাড়াচ্ছি না।"

অবনী গোমড়া মুখে বললেন, "তোমরা যা খুশি করো। তবে টুরে কেল্লা না থাকলে আমাকে তোমরা বাদ দাও। পুজোর ছুটিটা আমি বাড়িতেই থাকব।"

সহেলি বললেন, "তা হলে এও শুনে রাখো, তোমাদের কেল্লা ঘোরার মতলব থাকলে আমি নেই। ...টুপুর, এখনই তোর পার্থমেসোকে জানিয়ে দে আমাকে ছাড়াই যেন প্রোগ্রাম করা হয়।"

এ তো মহা ফ্যাচাং। কোথায় কোথায় যাওয়া হবে তার এখনও ঠিক নেই, তার আগেই বাবা-মা ফাইট শুরু করে দিলেন? মাঝখান থেকে বেড়ানোটাই না কেঁচে যায়!

দু'হাত তুলে টুপুর বলল, "ঠান্ডা হও। আগেই মাথা খারাপ

কোরো না। একটা-দুটো ফোর্ট তো টুর প্রোগ্রামে থাকতেই পারে। ইচ্ছে যদি না হয়, মা ফোর্টে ঢুকবে না। ওই সময়টায় নিশ্চিন্ত মনে শপিং সারবে।”

এই প্রস্তাবটা দু'জনেরই মনোমতো হয়েছে। অবনী খানিকটা সন্তুষ্ট হয়ে অজন্তা আবিষ্কারের কাহিনি শোনাতে শুরু করলেন টুপুরকে। কিছু কিছু টুপুরের জানা, অনেকটাই অজানা। সেই ১৮১৯ সালে কীভাবে একদল ব্রিটিশ শিকারির চোখে পড়ে গিয়েছিল গুহাগুলো, তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাঠানো শিল্পীরা কত কষ্ট করে কুড়ি বছর ধরে অজন্তা গুহার ছবিগুলোকে নকল করল, আবার সামান্য অসাবধানতার জন্য ইংল্যান্ডের কেনসিংটন প্রাসাদে রাখা সেই ছবিগুলোর বেশিরভাগই কেমন করে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল...। ভারী গুছিয়ে বলছেন অবনী, সহেলিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন।

আপন মনেই সহেলি বিড়বিড় করে উঠলেন, “কী কাণ্ড বলো তো! ভাগ্যিস ইংরেজ শিকারিদের ঘোড়াগুলো জল খাওয়ার জন্য ছটফট করেছিল! নইলে হয়তো অজন্তা গুহার খবরই পাওয়া যেত না!”

অবনী বললেন, “অনেক বড় বড় আবিষ্কারই ওরকম হঠাৎ হয়ে যায়। ভীমবেট্‌কা গুহার ছবিগুলোও তো হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।”

টুপুর বলল, “তারপর ধরো, কাশ্মীরের অমরনাথ। এক রাখালের ভেড়া হারাল, আর সেই ভেড়া খুঁজতে গিয়ে...।”

সহেলি বললেন, “সে তো শুনেছি ক্রিস্টোফার কলম্বাসও ভারতে আসার জন্য বেরিয়ে, দিক ভুল করে পৌঁছে গিয়েছিলেন আমেরিকায়।”

জমে-ওঠা আড্ডায় ছেদ পড়ল আচমকা। ডোরবেল বেজে উঠেছে।

দরজা খুলে একটু অবাকই হল টুপুর। কুশল! সঙ্গে আবার একটা চাইনিজ় ছেলে!

কুশল টুপুরের পাড়ার বন্ধু। মোড়ের হলুদ বাড়িটায় থাকে কুশল, বড়-একটা আসে না এ-বাড়িতে, রাস্তাঘাটে দেখা হলে গল্প-আড্ডা হয় টুপুরের সঙ্গে।

তা সেই কুশল এক চীনা ছেলেকে নিয়ে...?

টুপুর কোনও প্রশ্ন করার আগে কুশল বলে উঠল, "একটা জরুরি দরকার ছিল রে। আমার এই বন্ধুকে একটু হেল্প করতে হবে।"

"কী ব্যাপারে?"

"তোর এক মাসি খুব নামী ডিটেকটিভ না?"

"হ্যাঁ! মিতিনমাসি। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। ভেরি ভেরি ফেমাস। পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত আমার মাসিকে সমঝে চলে।"

"সেই মাসির সঙ্গে আমার এই বন্ধুর একটু যোগাযোগ করিয়ে দিবি?" বলেই জিভ কাটল কুশল, "দেখেছিস কাণ্ড! তোর সঙ্গে লিয়াংয়ের আলাপ করিয়ে দিতেই তো ভুলে গিয়েছি।"

দু'মিনিটেই আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ। লিয়াং নিজেই জানাল, তার পুরো নাম ঝাও লিয়াং, সে কুশলের ক্লাসমেট, থাকে মধ্যকলকাতার ছাতাওয়ালা গলিতে। টুপুরের ভাল নাম ঐন্দ্রিলা শুনে বার কয়েক বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণের চেষ্টা করল লিয়াং, তারপর লজ্জা লজ্জা মুখে বলল সে তাকে 'তুপুর' নামেই ডাকবে।

কুশল আর লিয়াংকে নিজের ঘরে এনে বসাল টুপুর। সহেলি একবার উঁকি দিয়ে গেলেন দরজায়, তাঁর চোখে একরাশ কৌতূহল। ভ্রুকুটি করে মাকে এখন ঘরে আসতে বারণ করল টুপুর।

ফ্যান চালিয়ে দিয়ে টুপুর বলল, "হ্যাঁ, এবার ব্যাপারটা আমায় খুলে বল।"

"তুই?" কুশল নাক কুঁচকোল, "তোকে বলে কী হবে?"

"আহা, শুনিই না। আমাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিস কেন? অনেক কেসেই আমি মাসির অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকি, আমিই হয়তো লিয়াং-এর প্রবলেমটা সল্‌ভ করে দিতে পারব।"

কুশল হেসে ফেলল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "অলরাইট। ...লিয়াং, বল তা হলে।"

ছোটখাটো চেহারায় লিয়াংয়ের চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সিনেমার হ্যারি পটারের স্টাইলে কাটা চুল। কব্‌জিতে শোভা পাচ্ছে একটা কালো ব্যান্ড। চশমার কাচের আড়াল থেকে ছেলেটার সরু সরু চোখ দুটো পিটপিট করে উঠল। তার পরেই লিয়াং বলতে শুরু করেছে, "লাস্ট উইকে আমাদের ফ্যামিলিতে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এ ব্যাড ইন্সিডেন্ট। আমার বো...আই মিন আমার কাকা... একটা কার-অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে, কাকাকে কেউ ইচ্ছে করে মেরে দিয়েছে।"

টুপুর নড়েচড়ে বসল, "কেন? এরকম মনে হচ্ছে কেন?"

"কারণ, আমার কাকা অত্যন্ত সাবধানি মানুষ ছিলেন। খুব দেখেশুনে রোড ক্রস করতেন। দু'দিক ভালভাবে না দেখে তিনি ফুটপাত থেকে নামতেনই না। আমরা তাই নিয়ে কত ঠাট্টা-রসিকতাও করেছি। এমন একজন লোককে একটা গাড়ি কী করে ধাক্কা দিল, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

"কোথায় হয়েছিল অ্যাকসিডেন্টটা?"

"জায়গাটাও খুব অড। সেই প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে। কাকা যে ওখানে সন্ধেবেলা কেন গিয়েছিলেন, সেটাও আমাদের মাথায় ঢুকছে না। কাকার বডিটাও পড়ে ছিল একেবারে ফুটপাতের গা ঘেঁষে। কোনও গাড়ি রাস্তার অতটা ধারে এসে কী করে যে তাঁকে চাপা দিল...!"

লিয়াংয়ের কথায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ আছে বটে, তবে তার

বাংলাটাও মন্দ নয়। উচ্চারণে একটা বিচিত্র টান থাকলেও বুঝতে তেমন অসুবিধে হয় না।

একটু থেমে থেকে লিয়াং ফের বলল, "আরও একটা ব্যাপার। কাকার কাছে একটা জিনিস থাকার কথা ছিল। জিনিসটা কিন্তু ডেডবডির কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যায়নি। কাকার মোবাইল ফোনটাও মিসিং। অথচ কাকার ঘড়ি, পার্স, টাকাকড়ি কিচ্ছু খোওয়া যায়নি। পার্সে আড়াই হাজার টাকা ছিল। টাকাটা নিল না, অথচ একটা পুরনো মোবাইল ফোন আর সেই জিনিসটা ভ্যানিশ হয়ে গেল... এটা কি খুব স্ট্রেঞ্জ নয়? সেই জন্যই আমাদের সন্দেহ, সামওয়ান অথবা কোনও গ্যাং আমার কাকাকে মার্ডার করেছে।"

মার্ডার শব্দটা শুনে একটু কেঁপে উঠল টুপুর। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, "জিনিসটা কী জানতে পারি?"

"সেটা তো আমরাও সঠিক জানি না। তবে কোনও শোপিস-টোপিস ধরনের কিছু হবে। মানে, কাকা আমাদের সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।"

টুপুরের কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ঘটেছে কার-অ্যাকসিডেন্ট, অথচ লিয়াংয়ের মনে হচ্ছে খুন! একটা জিনিস লিয়াংয়ের কাকার কাছে থাকার কথা ছিল, কিন্তু জিনিসটা কী তা-ও লিয়াংরা জানে না! অর্থাৎ আসল ক্লুটাই নেই। কেসটা কি টুপুরের পক্ষে একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে না?

মুখে অবশ্য ঘাবড়ানো ভাবটা ফুটতে দিল না টুপুর। মাথা নেড়ে বলল, "খুবই ইন্টারেস্টিং। ... দাঁড়াও, মাসির সঙ্গে একবার কথা বলে আসি।"

ফোন করতেই ওপারে পার্থমেসো, "কী রে, বেড়ানোর নাম শুনেই লাফ-ঝাঁপ শুরু হয়ে গিয়েছে বুঝি? একটু ধৈর্য ধর, আগে টিকিট-ফিকিট কাটি।"

টুপুর বলল, "না গো, বেড়ানো নয়, অন্য ব্যাপার। একটু মিতিনমাসিকে ডেকে দেবে?"

"সে কি এখন তোর সঙ্গে কথা বলবে? সকাল থেকেই যা ব্যস্ত!"

"কেন?"

"একটা জাল উইলের কেস সল্‌ভ করছে। এখন ফাইনাল স্টেজ। দরজা বন্ধ করে নিজের অফিসরুমে বসে মাথার চুল ছিঁড়ছে।"

"ও।" টুপুর সামান্য মিইয়ে গেল, "তা-ও যদি একটু কথা বলা যেত...! এখানেও একটা বেশ মিস্টিরিয়াস কেস..."

"তুইও আজকাল কেস ধরছিস নাকি?"

"না গো। আমার এক বন্ধু এসেছে। মিতিনমাসির খোঁজেই। একজন চিনা ভদ্রলোক..."

"ওরে বাবা, চিনেম্যানদের কেস! তা হলে তো রহস্য ঘনীভূত। ধর, ডেকে দিচ্ছি।"

মিতিনমাসি ফোনে এল বটে, কিন্তু যেন মন দিয়ে শুনছে না। তবু যেটুকু জেনেছে, তার সবটুকুই উগরে দিল টুপুর। বেশ উত্তেজিতভাবে।

টুপুর থামার পর মিতিন বলল, "হুম। কিন্তু আমি তো এখনই ওদের মিট করতে পারব না রে টুপুর। এখনও অন্তত দু'-তিনটে দিন আমাকে ছোটাছুটি করতে হবে।"

"তা হলে ওদের কী বলব? তিন দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা করতে?"

"তা কেন। সময় গড়িয়ে যেতে দেওয়াটা ঠিক নয়। তুইই বরং ডিটেলে শুনে নে। যদি কারও সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়, ঘুরেও আয়। গিয়ে কথাবার্তা বল, তারপর দেখা যাক, কী করা যায়।"

"আমি ...? একা-একা ...?"

"সাহস আন। আত্মবিশ্বাস জোরদার কর। ইনভেস্টিগেশনে গিয়ে চোখকান খোলা রাখবি, ফিরে এসে সব স্টেটমেন্ট নোট করবি।"

"পারব আমি?"

"কিছুই যদি না পারিস, তোর উপর আমি ভরসা করব কী করে? তোর যে বন্ধুটা লিয়াংকে নিয়ে এসেছে, তাকেই আপাতত অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নে। আজ বিকেলেই ছাতাওয়ালা গলিতে চলে যা।"

ফোন রেখে টুপুর চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে দেখল, সহেলি প্লেট-ভরতি সন্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, লিয়াং খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, কুশল টপাটপ সাঁটাচ্ছে।

মুখ-ভরতি সন্দেশ নিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন মাসি?"

"মাসি এখন অন্য একটা কেস নিয়ে ব্যস্ত রে। আমাকেই তদন্ত শুরু করতে বলল," টুপুর গলায় একটা ভারিক্কি ভাব আনল, লিয়াংয়ের দিকে ফিরে বলল, "হ্যাঁ, তোমার কেসটা এবার একটু ডিটেলে শোনা যাক। আমি যা-যা প্রশ্ন করব, ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে। কিচ্ছু লুকোবে না, কেমন?"

লিয়াংয়ের চোখের পাতা আবার পিটপিট কেঁপে উঠল। ঢক করে ঘাড় নাড়ল শ্রীমান ঝাও লিয়াং।

"তোমার কাকার নাম কী, লিয়াং?"

"ঝিয়েন। আই মিন, ঝাও ঝিয়েন। ঝাও আমাদের ফ্যামিলি নেম।"

"মানে, আমরা যাকে বলি পদবি?"

"হ্যাঁ। অনেকটা তাই। আমাদের ফ্যামিলি নেমটা আসল নামের আগে থাকে।"

"ও। ... তোমার কাকার বয়স কত হয়েছিল?"

"ফরটিসেভেন।"

"তোমার কাকিমা আছেন তো?"

"কাকা বিয়ে করেননি। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, কাকা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। টেরিটি বাজারে একটা চাইনিজ় স্কুল আছে, অনেক বছরের পুরনো, কাকা ওখানেই পড়াতেন। হিস্ট্রি। পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন সারাদিন। আমরা কাকাকে বলতাম 'বুকওয়ার্ম'। উনি আমাদের ... মানে বাড়ির ছোটদের কী ভাল যে বাসতেন! কত কিছু কিনে আনতেন আমাদের জন্য। এই তো ক'দিন আগেই আমার আর মেইলির জন্য হ্যারি পটারের সিডি নিয়ে এলেন ..."

"মেইলি কে?"

"আমার বোন। ছোট বোন। শি ইজ় ইন ক্লাস সিক্স।"

"ও।"

"মেইলি কাকার খুব পেট ছিল। ও এখনও খুব কান্নাকাটি করছে।

ইনফ্যাক্ট, কাকার ওভাবে মৃত্যুটা আমরা কেউই মেনে নিতে পারছি না। আমি, বাবা, মা ...”

বলতে-বলতে লিয়াংয়ের গলা ধরে এল। নাক টানছে। টুপুর ডায়েরিতে নোট নিতে নিতে থমকাল। দেখছে লিয়াংকে। রাস্তায় চিনা ছেলেমেয়েদের দেখলে কেমন ভাবলেশহীন মনে হয়, কিন্তু মোটেই এ তো তা নয়! লিয়াং একেবারে টুপুরদের মতোই আবেগপ্রবণ।

একটু সময় নিয়ে টুপুর আবার কলম ধরল, “এবার তা হলে আমরা মেন টপিকে আসি।”

কুশলও আর চুপ থাকতে পারল না। বলল, “হ্যাঁ, হেঁয়ালিটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। লিয়াং বলছে, ওর কাকার কাছে একটা জিনিস থাকার কথা ছিল। অথচ লিয়াংরা জানে না জিনিসটা কী। এটা কীরকম একটু শোনাচ্ছে না?”

লিয়াং বলল, “সত্যি জানি না রে। তবে কাকা বাড়িতে যা বলে বেরিয়েছিলেন, সেইমতো কাকার কাছে জিনিসটা থাকার কথা।”

“কিন্তু কী জিনিস?”

“তা হলে আর-একটু আগে থেকে বলি। দিন পনেরো আগে কাকা একদিন রাতে বাড়ি ফিরে বললেন, বেকবাগানের এক কিউরিও শপে তিনি অদ্ভুত একটা জিনিস দেখতে পেয়েছেন। জিনিসটা সম্ভবত খুব মূল্যবান। কাকা ঠিক করেছিলেন ওটা তিনি কিনে আনবেন। আর ওই জিনিসটাই নাকি হবে এবারের মুন ফেস্টিভ্যালে আমাদের বাড়ির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।”

টুপুর ডায়েরি থেকে চোখ তুলল, “মুন ফেস্টিভ্যালটা কী?”

কুশল আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, “মুন ফেস্টিভ্যাল জানিস না? ... লিয়াংদের চাইনিজ় ক্যালেন্ডার তো আমাদের মতো নয়। ওদের বছর ঘোরে চাঁদের হিসেবে। অমাবস্যা টু অমাবস্যা এক মাস।

ফেব্রুয়ারি মাসের অমাবস্যার দিন ওদের নববর্ষ। আর সেই হিসেবে অষ্টম চান্দ্রমাসের ফিফটিনথ্ ডে'তে হয় ওদের মুন ফেস্টিভ্যাল। পূর্ণিমার দিন। ঠিক বলছি তো রে লিয়াং?"

"হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট।"

"সেদিন তো তোদের বাড়িতে বাড়িতে কেক বানানো হয়, তাই না? গত বছর তুই স্কুলে এনে খাইয়েছিলি, আমার মনে আছে। দেদার ড্রাই ফ্রুট্স ছিল কেকে। দারুণ টেস্ট।"

"আমরা ওই কেকটাকে বলি 'মুনকেক'। মুন ফেস্টিভ্যালের দিন রাত্তিরবেলা আমরা ওই কেক খাই। ... যাই হোক, কাকার কথায় আসি। আমরা তো খুব আশায় আশায় ছিলাম, কাকা একটা দারুণ কিছু আনবেন। কিন্তু পরদিন কাকা ফিরলেন বেশ গোমড়া মুখে। কেন? না কিউরিও শপের মালিক নাকি জিনিসটা বেচবেন না। আবার তার দু'-তিন দিন পরেই দেখি, কাকার মুখে হাসি। দোকানের মালিক নাকি শেষ পর্যন্ত দশ হাজার টাকায় জিনিসটা দিতে রাজি হয়েছেন।"

"তখনও তোমরা জানতে চাওনি জিনিসটা কী?"

"জিজ্ঞেস করেছিলাম। মেইলি তো কাকার কানের পোকা বের করে দিয়েছিল প্রায়। কিন্তু কাকা কিছুতেই বলেননি। খালি বলতেন, সারপ্রাইজ়, সারপ্রাইজ়, ধৈর্য ধরো। ... তারপর লাস্ট স্যাটারডে কাকা স্কুল থেকে বাবাকে মোবাইলে জানালেন, ছুটির পর জিনিসটা কিনে তবে উনি বাড়ি ফিরবেন। কাকার কলিগরা তো বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁরাও বলেছেন কাকা ওই দিন দুটোতেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। আর অ্যাকসিডেন্টটা ঘটেছে সন্ধেবেলায়। এই চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কাকা কি আর জিনিসটা কিনে ফেলেননি?"

"এটা কিন্তু ঠিকঠাক বলা কঠিন।" টুপুর ভুরু কুঁচকোল,

“কিনতেও পারেন, না-ও কিনতে পারেন। ... সেই দোকান কী বলছে? কিউরিও শপ?”

লিয়াং যেন থমকাল একটু। ঢোক গিলে বলল, “দোকানে তো খবর নেওয়া হয়নি।”

“সে কী?”

“হ্যাঁ মানে ... আমি তো বেকবাগানের দিকটা ভাল চিনি না ... একা-একা যেতে সাহসও পাইনি। তা ছাড়া পোস্টমর্টেম, কাকাকে সমাধি দেওয়া, এসব করতেও তো চলে গেল দিন চারেক। বাড়িতেও সকলের মনের যা অবস্থা ...”

“স্ট্রেঞ্জ! জিনিসটা আদৌ কেনা হয়েছিল কিনা সেটা তো আগে জানবে,” টুপুর গলা ভারী করল, “যাক গে, পুলিশকে বলেছ কাকার মৃত্যুটাকে তোমরা অ্যাকসিডেন্ট বলে মানতে পারছ না?”

“বাবা বলেছেন।”

“কেন মানতে পারছেন না, তা-ও বলেছেন নিশ্চয়ই?”

“হ্যাঁ।”

“পুলিশ কী বলছে?”

“খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, কাকার কোনও এনিমি ছিল কিনা। এমন শত্রু, যে কিনা কাকাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে পারে।”

“আছে কি তেমন কেউ?”

“প্রশ্নই আসে না। আমার কাকা নিপাট ভালমানুষ। বললাম তো তোমাকে, কাকা বই আর পড়াশোনাতেই ডুবে থাকতেন। আমরা কখনও তাঁকে কারও সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করতে দেখিনি।”

“আর জিনিসটা হারানোর ব্যাপারে পুলিশের কী রিঅ্যাকশন?”

“দোকানের লোকেশানটা নিয়েছে। বলেছে, খোঁজ করে দেখবে।” লিয়াং চশমা ঠিক করল, “তবে বাবা বলছিলেন, পুলিশ

নিজে থেকে কিছুই করবে না। সারাক্ষণ ওদের পিছনে লেগে থাকতে পারলে, নিয়মিত তাড়া লাগালে, হয়তো একটু নড়াচড়া করবে, নইলে তা-ও করবে না। আর আমার বাবার পক্ষে ওদের পিছনে সব সময়ে ছোটাছুটি করা সম্ভবই নয়।"

"কেন?"

"দোকান সামলাতে হয় যে! তা ছাড়া বাবার মনটাও খুব ভেঙে গিয়েছে। বলছেন, আর কাটাছেঁড়া করে কী লাভ, আমার ভাই তো আর ফিরবে না।"

"তা হলে আমার মাসির খোঁজে এসেছ যে বড়?"

"সে তো আমি এসেছি। বাবা জানেনও না। ... আমি ব্যাপারটার শেষ দেখতে চাই। কাকাকে যদি সত্যিই কেউ মেরে থাকে, তাকে শাস্তি না দিয়ে আমি ছাড়ব না।"

লিয়াং আবার নাক টানছে। টুপুর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি শান্ত হও লিয়াং। আমি দেখছি কী করা যায়। তবে আমাদের একদম সিস্টেমেটিক্যালি এগোতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হল ..."

"আগে দোকানটায় যাওয়া।" টুপুরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল কুশল, "জানতে হবে জিনিসটা সত্যিই লিয়াংয়ের কাকা কিনেছিলেন কিনা।"

"এবং জিনিসটা কী ছিল।" টুপুর ফের কথা ধরে নিল, "যদি সত্যিই জিনিসটা মূল্যবান হয়, তখন তো খুনের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তখন কিন্তু আমাদের লিয়াংয়ের বাড়িও যেতে হবে, সবাইকে কিছু প্রশ্নও করতে হবে। ... তোমার বাবা তখন কিছু মনে করবেন না তো, লিয়াং?"

নাক কুঁচকে দু'-এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল লিয়াং। তারপর বলল, "নো প্রবলেম। আমি বাবাকে সব বুঝিয়ে বলব।"

"গুড।" টুপুর কুশলের দিকে ফিরল, "কাজে তা হলে নেমে পড়া যায়, কী বল?"

"অবশ্যই। আমিও তোর সঙ্গে আছি," কুশল একগাল হাসল, "আমার প্রচুর ডিটেকটিভ বই পড়া আছে। আমার অ্যাডভাইস নিলে তিন দিনে কেস সল্‌ভ হয়ে যাবে।"

মনে মনে হাসল টুপুর। রহস্যগল্প পড়েই যদি ডিটেকটিভ হওয়া যেত, তা হলে তো মিতিনমাসি নয়, পার্থমেসোই কবে গোয়েন্দা বনে যেত। ডিটেকটিভ হতে গেলে একটা তিন নম্বর চোখ থাকা দরকার। সেই চোখ বই পড়ে গজায় না। যাক গে, তবু কুশল থাকলে ক্ষতি নেই। লোকবলেরও তো মূল্য আছে।

মুখে একটা প্রাজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে টুপুর বলল, "তা হলে দোকানে আমরা কবে যাচ্ছি?"

কুশল বলল, "শুভস্য শীঘ্রম। আজই চল।"

"দুর, আজ তো রবিবার। দোকান বন্ধ থাকবে। আমরা যাব কাল। বিকেলে। ... লিয়াং, তুমি বরং কাল স্কুল থেকে কুশলদের বাড়ি চলে এসো। আমি তোমাদের ডেকে নেব।"

লিয়াং বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছে। জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "তাই হবে।"

লিয়াং আর কুশল চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এলেন সহেলি। ঘটনাটা অর্ধেক শুনেই হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "না না, তোর ওসবের মধ্যে থাকার দরকার নেই। একে খুনখারাপির ব্যাপার, তায় আবার এক চিনাম্যান জড়িত, কোত্থেকে কী হয়ে যায়!"

অবনী বললেন, "চিনেম্যান তো কী আছে? ওরা কি খুনে-বদমাইশ নাকি? তোমার বোধহয় জানা নেই, চিনারাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতি। কত কী যে ওরা আবিষ্কার করেছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। এই যে তুমি চা খাচ্ছ, এটাও ওদের অবদান।

কাগজ পড়ছ ... এটাও ওদের আবিষ্কার। কাগজ কী করে ছাপতে হয়, সেটাও ওরাই শিখিয়েছে। আর চিনে খাবার দেখলে তোমার তো জিভে জল গড়ায়।"

"থাক, আর চিনাদের গুণ ব্যাখ্যান করতে হবে না। মেয়ের একটা কিছু বিপদ হোক, তখন দেখব তোমার লেকচার কোথায় থাকে!"

"আহা, আগেই ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? টুপুর তো আর কেসটা করছে না, মাসির হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে শুধু। যদি কেসটার মেরিট থাকে, মিতিনই তো মাঠে নেমে পড়বে।"

বাবার সমর্থন পেয়ে টুপুরেরও গলার জোর বেড়েছে। সহেলিকে বলল, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, মা। তুমি কি চাও আমি ঘরকুনো হয়ে বসে থাকি?"

অবনী বললেন, "মাকে ওভাবে বলতে নেই টুপুর। তোর মা'র ভয় পাওয়ার একটু-একটু কারণও তো আছে। এই যে চিনারা, এরা আমাদের শহরে কতকাল ধরে আছে জানিস? দুশো বছরেরও বেশি। সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে। ভারতের কোনও শহরে এত চাইনিজ নেই। কলকাতায় এখন এদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। অথচ কী আশ্চর্য, ভাব তুই, এত বছর ধরে এত লোক আমাদের প্রতিবেশী হয়ে থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু সেভাবে তাদের চিনিই না। তাদের রীতিনীতি আদবকায়দা, উৎসব-পার্বণ, কোনও কিছুরই খবর রাখি না। আর এই না-চেনা থেকেই তো তৈরি হয় আশঙ্কা, রহস্য, ভয়।"

"তা অবশ্য ঠিক। এই তো, ওদের মুন ফেস্টিভ্যালের নামই আমি জন্মে কখনও শুনিনি।"

"আমি অবশ্য খানিকটা জানি। ওদের মুন ফেস্টিভ্যাল অনেকটা আমাদের নবান্নের মতো। ফসল কাটার পরে চিনদেশে এই উৎসবটা হত। এখনও হয়। কলকাতার চিনারাও ট্র্যাডিশনটা বজায় রেখেছে।

ওই দিন চিনারা যে মুনকেক খায়, তাই নিয়েও একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ রে। চেঙ্গিস খাঁর নাতি কুবলাই খাঁ থারটিনথ্ সেঞ্চুরিতে চিন দখল করে নিয়েছিল। তখন ওখানকার সাধারণ লোকদের মনে একটা বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে। এই মুন ফেস্টিভ্যালের দিনই প্রথম মুনকেক বানিয়ে তার মধ্যে কাগজ পুরে পুরে বিপ্লবীরা দেশময় খবর চালাচালি করেছিল। এখনও তাই চিনারা মুনকেককে বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে মনে করে।”

বাঃ, এটা তো একটা ভাল তথ্য যোগ হল টুপুরের মগজের ভাঁড়ারে। লিয়াংয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা বাড়লে চিনাদের সম্পর্কে আরও কিছু জানা যাবে নির্ঘাত।

কিন্তু লিয়াংদের কেসটা কী? ঝোঁকের মাথায় দায়িত্ব তো নিয়ে ফেলল টুপুর, শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারবে তো? ইস, কুশল আর লিয়াংয়ের চোখে সে হাসির খোরাক না হয়ে যায়।

দোকানটা বেকবাগানের মোড়েই। নাম ‘গ্র্যান্ড কিউরিও শপ’। খুব-একটা বড় নয়, তবে নানারকম বাহারি জিনিসপত্রে ঠাসা। রয়েছে অজস্র ধরনের রঙিন চিনেমাটির পুতুল, পাথরের ছোটখাটো মূর্তি, সাবেকি ফুলদানি, খুদে ঝাড়লণ্ঠন। সঙ্গে ফেং-শুই আইটেমও রয়েছে বেশ কিছু। উইন্ডচাইম, লাফিং বুদ্ধা, লাভবার্ডস্। কাচের শোকেসের ওপারে, দোকানে ঝোলানো স্ফটিকগুলো ঝকঝক করছে।

বাইরে থেকে দোকানের ভিতরটা দেখছিল টুপুররা। ঢুকবে কি ঢুকবে না ইতস্তত করছিল তিন মূর্তি। দোকানে কোনও ক্রেতা নেই এখন, কাউন্টারে বসে আছেন এক মধ্যবয়সি মানুষ। মাথা নিচু করে লিখছেন কী যেন। সম্ভবত হিসেবটিসেব।

টুপুর একটা বড়সড় শ্বাস ভরে নিল বুকে। কুশলকে বলল, "আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, আয়, কপাল ঠুকে ঢুকে পড়ি।"

তিন মূর্তি কাচের দরজা ঠেলতেই চোখ তুলেছেন ভদ্রলোক। হাসিহাসি মুখে বললেন, "কী নেবে ভাই তোমরা?"

কুশল গলা ঝেড়ে বলল, "আমরা একটু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"কী কথা?"

লিয়াংকে দেখিয়ে টুপুর বলল, "আমাদের এই বন্ধুর কাকা আপনাদের দোকান থেকে একটা জিনিস কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরশু শনিবারের আগের শনিবার।"

"কী জিনিস?"

"সেটা তো আমরা ঠিক জানি না ... মানে সেটা জানতেই আসা ..."

দু'-চার সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। তার পরেই মুখভাব হঠাৎ বদলে গিয়েছে। লিয়াংকে আপাদমস্তক জরিপ করে নিয়ে বললেন, "তোমারই কাকা মারা গিয়েছেন বুঝি?"

লিয়াং মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"পুলিশ তোমাদের কিছু জানায়নি? পুলিশ তো আমার দোকানে এসেছিল, তাদের তো আমি বলে দিয়েছি উনি কী কিনেছিলেন।"

"এখনও থানা থেকে আমাদের কিছু বলেনি।"

"ও," ভদ্রলোক একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "তোমার কাকাকে আমি একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিং বিক্রি করেছিলাম।"

টুপুর বলল, "ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কীরকম ছিল যদি একটু বলেন ..."

"বড়সড় একটা ক্যালেন্ডারের মতো দেখতে। কাপড়ের। খুবই পুরনো। হলদেটে কাপড়ের উপর কী সব আঁকাজোকা ছিল। আর চিনে ভাষায় লেখাও ছিল কিছু।"

"কী লেখা ছিল?"

"সে আমি কী করে বলব? আমি কি চিনে ভাষা পড়তে পারি? সত্যি বলতে কী, ওটা যে চাইনিজ় লেখা তা-ও আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, ওগুলো ছোট ছোট ছবি। ওই চিনা ভদ্রলোকই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলেন, তাই দেখে আমি বুঝতে পারলাম।"

"উনি কি আপনাকে বলেছিলেন কী লেখা আছে?"

"নাঃ। শুধু বলেছিলেন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং পিস, মনে হচ্ছে আমার রিসার্চের কাজে লাগবে। ... ও হ্যাঁ, আর-একটা কথাও বলেছিলেন। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কার যেন আঁকা ... কী যেন নাম ... মো ... মো ... দুর ছাই, নামটা মনে আসছে না।"

"পুলিশকে বলতে পেরেছিলেন নামটা?"

"উঁহু। শুধু ওই মো-টুকুই মনে আছে।"

"ও। যদি আপত্তি না থাকে, আর-একটা প্রশ্ন করব? আমরা শুনেছি, আপনি নাকি গোড়ায় ওটা বিক্রি করতে চাননি। কারণটা জানতে পারি?"

ভদ্রলোককে এবার বেশ গম্ভীর দেখাল, "এ-কথা কে বলল তোমাদের?"

লিয়াং বলল, "আমার কাকাই বাড়িতে গল্প করেছিলেন।"

"উম্," আবার কথা বলতে সামান্য সময় নিলেন ভদ্রলোক, "সত্যিই ওটা বেচার আমার ইচ্ছে ছিল না। অবশ্য কোনও স্পেসিফিক কারণ নেই। জাস্ট একটা প্রাচীন-প্রাচীন লুক আছে বলে দোকানেই সাজিয়ে রেখেছিলাম।"

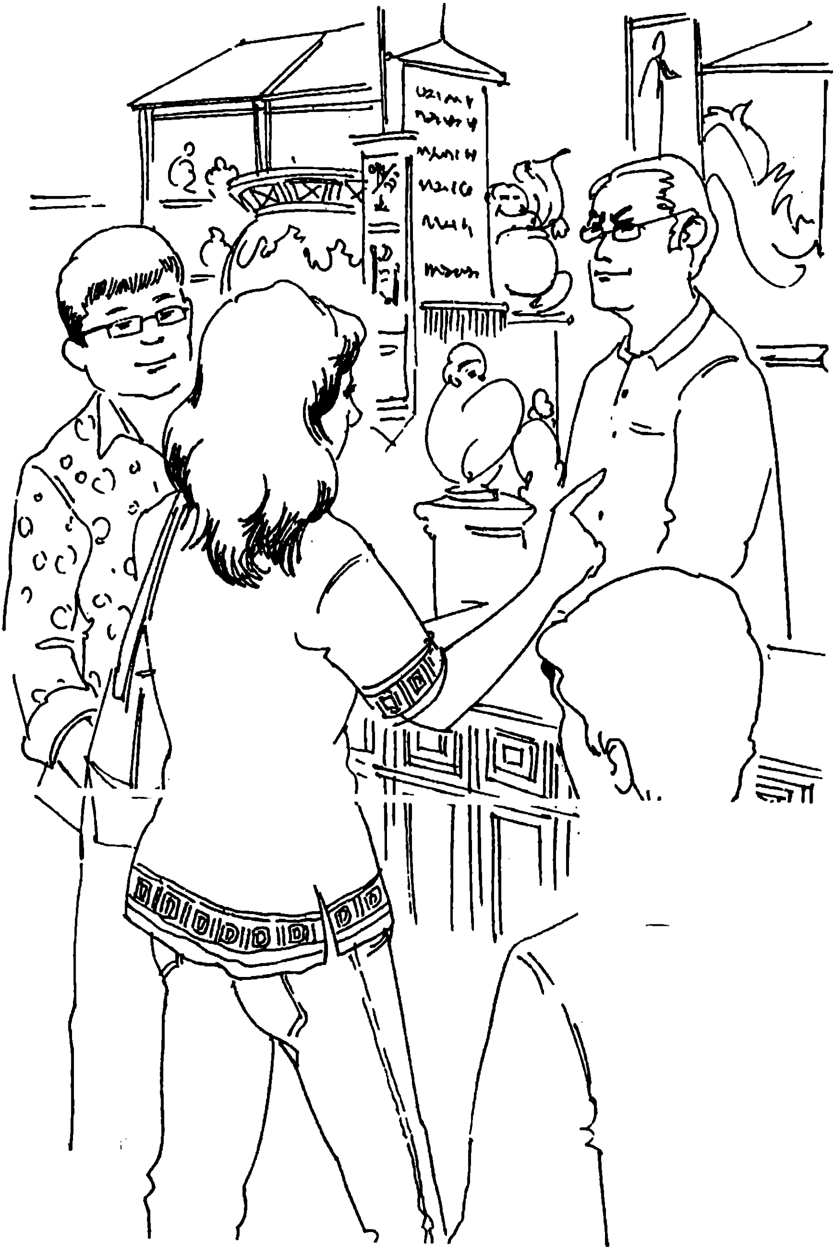

"পরে তা হলে ডিসিশন বদল করলেন যে?"

"ভদ্রলোক বারবার এসে চাইছিলেন...আমিও ভাবলাম, যদি কাজে লাগে তো দিয়েই দিই..."

কুশল ফস করে বলে উঠল, "তার জন্য আপনি দশ হাজার টাকা দরও হেঁকে বসলেন..."

"তাতে তোমার কী হে?" ভদ্রলোক এবার চটে গেলেন দুম করে, "ডেঁপোমি কোরো না। বাচ্চা ছেলে, বাচ্চা ছেলের মতো থাকো। জিনিসটা আমি দশ হাজারে বেচেছি, না দশ লাখে, তার হিসেব আমি তোমায় দেব কেন? যদি বলি জিনিসটা বিনা পয়সায় দিয়ে দিয়েছি, তা হলেও কি তোমার কিছু বলার আছে?"

"আহা, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন আঙ্কল?" টুপুর তাড়াতাড়ি হাল ধরল, "আমার বন্ধু খারাপ সেন্সে কিছু বলেনি। ও শুধু জানতে চাইছিল, দশ হাজার টাকা দাম পেয়েই কি আপনি জিনিসটা বেচতে রাজি হলেন?"

"আমি এই প্রশ্নের জবাব দেবই না।" ভদ্রলোকের গোলগাল মুখখানা থমথম করছে, "জিনিসটা বেচে আমি অপরাধী হয়ে গিয়েছি নাকি? একবার পুলিশ এসে জেরা করবে, একবার তোমরা এসে সাড়ে-সতেরোখানা প্রশ্ন হানবে..."

"প্লিজ আঙ্কল, আপনি অন্যভাবে নেবেন না। আসলে, জিনিসটা কেনার পরেই লিয়াংয়ের কাকা মারা গেলেন তো..."

"এবং ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাও ভ্যানিশ হয়ে গেল..."

"অ্যাই, অ্যাই, তোমরা কী বলতে চাও, অ্যাঁ?" ভদ্রলোকের নাকের পাটা ফুলে উঠল, "আমার দোকান থেকে কিছু কেনার পর কোনও কাস্টমারের যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়, তার জন্য আমি দায়ী? তার কাছ থেকে যদি কিছু খোওয়া যায়, তাতেই বা আমার করার কী আছে? আর তোমাদের আমি এত কৈফিয়তই বা কেন দেব, অ্যাঁ?"

কুশল পালটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, টুপুর চোখের ইশারায় তাকে থামাল। নিজেও চুপ করে গিয়েছে। নিরীক্ষণ করছে দোকানের মালিককে। ভদ্রলোকের মুখচোখে কেমন যেন অস্থির-অস্থির ভাব। টুপুররা তো এমন কিছু আজেবাজে প্রশ্ন করেনি, অথচ ভদ্রলোক খেপে গেলেন। কেন? পুলিশ কি এসে খুব চোটপাট করে গিয়েছে?

দু'জন খদ্দের ঢুকেছে দোকানে। স্বামী-স্ত্রী। ভদ্রলোক পলকে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। টুপুরদের ছেড়ে তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পটাপট আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আরও ঝলমল করে উঠল দোকান। ঘুরে ঘুরে হরেক রকমের উইন্ডচাইম দেখাচ্ছেন। টুংটুং, টিংটাং বাজনায় দোকান মুখর। শুধু বাতাসি ঘণ্টাই নয়, একটা হাস্যমুখ বুদ্ধমূর্তিও পছন্দ করল স্বামী-স্ত্রী। দরাদরির কোনও বালাই নেই, করকরে সাতশো টাকা দিয়ে, প্যাকেট বগলদাবা করে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

ক্যাশবাক্সে টাকা রাখলেন দোকানের মালিক। মেজাজ ঈষৎ প্রসন্ন যেন। তেরচা চোখে বললেন, "কী হল, তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে?"

টুপুর মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল, "এমনিই। ...আপনার মনে কষ্ট দিয়ে ফেললাম, তাই 'সরি' বলার জন্য ওয়েট করছি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" ভদ্রলোকের কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁকে একফালি হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। নরম স্বরে লিয়াংকে বললেন, "শোনো ভাই, তোমার কাকার মৃত্যুসংবাদে আমি সত্যি খুব দুঃখিত হয়েছি। ওঁর সঙ্গে আমার কতটুকুই বা পরিচয়! দু'-চার দিন দোকানে এসেছেন, দুটো-চারটে কথা বলেছেন, ব্যস। তাতেই ভদ্রলোককে আমার বেশ লেগেছিল। শান্ত ধরনের মানুষ... ভেরি লাইকেব্‌ল ফেলো।"

লিয়াং মৃদু গলায় বলল, "আমার কাকাকে সবাই লাইক করত।

সেই জন্যই তো ভেবে পাচ্ছি না কে তাঁকে ওভাবে মারল!"

"আহা, ইচ্ছে করে কেউ মেরে দিয়েছে, এমনটাই বা ভাবছ কেন? ভাল মানুষরা গাড়িচাপা পড়েন না? আর ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা হয়তো এদিক ওদিক পড়ে ছিল, রাস্তার কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা নিয়ে কাকার তো বাড়ি ফেরার কথা। তিনি প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে যাবেনই বা কেন?"

"সেটা তো আমি বলতে পারব না। দ্যাখো, পুলিশের তদন্তে কী বেরোয়।"

টুপুর বলল, "আঙ্কল, আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"আবার কী প্রশ্ন?"

"আপনি কি জানতেন ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা খুব মূল্যবান? দশ হাজার টাকা দামও হতে পারে?"

"বারবার দশ হাজার, দশ হাজার করছ কেন? দাম নিয়ে আমি কোনও কথাই বলব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। ...আর একটা কোয়েশ্চেন, আঙ্কল। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কদ্দিন ধরে আপনার দোকানে ঝুলছিল?"

"রিসেন্টলিই এনে রেখেছিলাম। দেড়-দু'মাস হল।"

"পেয়েছিলেন কোত্থেকে? ...মানে কারও কাছ থেকে কিনে সাজিয়েছিলেন, নাকি...?"

"ওটা আমার বাড়িতেই ছিল। বহুকাল ধরে।"

কুশল বলে উঠল, "আশ্চর্য! বহুকাল ধরে বাড়িতে ছিল... অথচ দেড়-দু'মাস আগে দোকানে টাঙিয়েছিলেন... কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?"

"অ্যাই, কী মিন করতে চাইছ তুমি, অ্যাঁ? আমার জিনিস আমি ঘরে রাখি, দোকানে টাঙাই, তাতে তোমাদের কী?"

"কিছুই না। তবে শেষ পর্যন্ত মোটা টাকায় বেচে দিলেন তো?"

"চোপ। বেশ করেছি বেচেছি।" ভদ্রলোক ঝপ করে ফের তেতে গিয়েছেন, "যাও তো, ভাগো তো এবার। একে খদ্দেরটদ্দের নেই, তার উপর কোত্থেকে যত উটকো আপদ এসে...! আউট। আউট।"

ভদ্রলোকের হম্বিতম্বির ধাক্কাতেই টুপুররা প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। ফুটপাত থেকেই দেখল ভদ্রলোক এখনও কটমট চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎই পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন কথা বলা শুরু করেছেন। বাতচিত চালাতে চালাতেও দৃষ্টি টুপুরদের দিকে।

টুপুর চাপা গলায় বলল, "চল, সরে যাই।"

দু'-চার পা গিয়েও কুশল দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তেজিত গলায় বলল, "ভদ্রলোককে ছেড়ে দেওয়া বোধহয় উচিত হল না। আর-একটু বাজানোর দরকার ছিল।"

লিয়াং মাথা দুলিয়ে বলল, "ইয়েস। লোকটাকে আমার যথেষ্ট সাসপিশাস মনে হচ্ছে। কাকার অ্যাকসিডেন্টের পিছনে ওর একটা হাত থাকলেও থাকতে পারে।"

কুশল মুঠো ঝাঁকিয়ে বলল, "অবশ্যই। জিনিসটা বিক্রি করার পরই হয়তো মনে হয়েছে কাজটা ভুল হয়ে গেল। আরও বেশি দামে জিনিসটা বেচা যেত। তাই হয়তো ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা ফের হাতানোর জন্য অ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়েছে।"

টুপুর হেসে ফেলল, "তার মানে দাঁড়াচ্ছে, জিনিসটা বেচার পরেই ভদ্রলোক লিয়াংয়ের কাকাকে মারতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন?"

"নিজে যাবেন কেন? লোকও তো লাগাতে পারেন।"

"বেশ। তাই না হয় হল। কিন্তু লিয়াংয়ের কাকা বাড়ি না-ফিরে প্রিন্সেপ ঘাটেই বা গেলেন কেন? যাতে কেউ তাঁকে ফাঁকা জায়গায় নিশ্চিন্তে গাড়িচাপা দিতে পারে?"

কুশল একটু দমে গেল এবার। বেলা পড়ে এসেছে, সন্ধে নামছে শহরে। আনমনে একবার আকাশের দিকে তাকাল কুশল। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই আমার আইডিয়াটাকে পাত্তা দিচ্ছিস না, টুপুর? আমি কিন্তু এরকম একটা কেস পড়েছি। জুয়েলারির মালিক একটা হিরের নেকলেস বিক্রি করার পর নিজের কাস্টমারকে খুন করিয়ে গয়নাটা আবার নিয়ে নিচ্ছে। কেউ তাকে সন্দেহ করেনি, কিন্তু ডিটেকটিভ ঠিক ধরে ফেলেছিল। মনে রাখবি টুপুর, যাকেই তুই সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখবি, সে-ই কিন্তু সম্ভাব্য অপরাধী।"

"বুঝলাম। কিন্তু প্রিন্সেপ ঘাটে যাওয়াটা....?"

"কারণটা খুঁজতে হবে। সেটাই তো ডিটেকটিভের কাজ।"

টুপুর আর তর্কে গেল না। তবে কিউরিও শপের মালিককেও একেবারে ঝেড়ে ফেলল না চিন্তা থেকে। আরও অনুসন্ধান দরকার। লিয়াং বলছে, তার কাকা অজাতশত্রু। তা হলে তাঁকে কেউ মারবে কেন? ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাই কি একমাত্র কারণ? ভাল করে খতিয়ে না-দেখে নিশ্চিত হওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? লিয়াংদের পরিবারের মধ্যেই কোনও গন্ডগোল নেই তো? কোনও জ্ঞাতিশত্রুতা? সম্পত্তি-টম্পত্তির জন্য? কিংবা অন্য কিছু, যা টুপুর এখনও জানে না?

চিন্তিত স্বরে টুপুর বলল, "মনে হচ্ছে একবার লিয়াংদের বাড়িতে যেতেই হবে।"

লিয়াং বলল, "কবে যাবে বলো?"

"দেখি। রাত্তিরে ফোন করে তোমায় জানিয়ে দেব।"

কুশল বলল, "আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে ওই দোকানদার ভদ্রলোকই কোনও ফাউল প্লে করেছে। ভদ্রলোককে ভাল করে চেপে ধরতে পারলেই সত্যিটা বেরিয়ে আসবে।"

টুপুর অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, "দরকার হলে তা-ও করা যাবে।"

লালবাজার পার হয়ে, বাঁ ফুটপাত ধরে, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে একটুখানি হাঁটলেই ছাতাওয়ালা গলি। লিয়াং রাস্তাটার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল, টুপুরদের দেখে হাত তুলল, "হাই! তোমরা এত লেট করলে কেন?"

কুশল বলল, "আর বলিস না, বাড়ি ফিরে স্কুল-ইউনিফর্ম চেঞ্জ করে টুপুরকে ডাকতে গেলাম... টুপুরও রেডি হল... তারপর বাস... ট্রাফিক জ্যাম..."

"ও কে। ও কে। তাড়াতাড়ি চলো। বাবা কিন্তু আর বেশিক্ষণ বাড়ি থাকবেন না।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "দোকানে যাবেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। বাবা দুপুরে খেতে আসেন তো, তারপর একটু রেস্টফেস্ট নিয়ে বেরোন। মা ততক্ষণ দোকান সামলান।"

"তোমাদের দোকানটা কীসের, সেটা কিন্তু জানা হয়নি, লিয়াং।"

"সরি। আমারই বলা উচিত ছিল।" লিয়াং হাঁটা শুরু করেছে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আমাদের লন্ড্রির বিজনেস। মিশন রো-তে। বহু দিনের পুরনো ব্যবসা। আমার ঠাকুরদার বাবা স্টার্ট করেছিলেন।"

"ওরেব্বাস্! তার মানে সত্তর-আশি বছর আগেকার?"

"হিসেব করলে দেখা যাবে, তারও অনেক অনেক বছর আগের। আমাদের ফ্যামিলি বংশানুক্রমে এই বিজনেস করছে। কবে যে শুরু

হয়েছিল, বলা কঠিন। বাবার মুখে শুনেছি, সাংহাইতেও নাকি আমাদের লন্ড্রি ছিল।"

কুশল অবাক মুখে বলল, "তোরা সাংহাইয়ের লোক? আমার ধারণা ছিল কলকাতার চাইনিজ়রা সবাই বুঝি ক্যান্টন থেকে এসেছেন।"

"না রে। আমাদের কমিউনিটিতে নানান জায়গার লোক আছে। কেউ এসেছিল হাক্কা থেকে, কেউ বা হুপে। অবশ্য সংখ্যায় ক্যান্টনের লোকই বেশি।"

টুপুর বলল, "আমি বোধহয় এই বিষয়ে একটু একটু জানি।"

"কী রকম?"

"এই যেমন ধরো, তোমরা চিনারা অনেকেই এ-দেশে এসেও নিজের নিজের বিজ়নেসই বজায় রেখেছ। তোমাদের এক-এক জায়গার লোকরা এক-একটা ব্যবসায় ওস্তাদ। যেমন ক্যান্টনিরা কাঠের কাজ করেন, কিংবা হোটেল-রেস্টুরেন্ট চালান। আর যত চিনা ডেন্টিস্ট আছেন, তাঁরা সবাই এসেছিলেন হুপে থেকে। আর হাক্কারা, মানে চিনে যাঁদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, তাঁরা করেন চামড়ার ব্যবসা।"

"বাঃ, তোমার জি কে তো দারুণ!" লিয়াং মুগ্ধ হয়েছে, "আমার অবশ্য লন্ড্রিতে বসার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি টিচিং লাইনে যাব। আমার কাকার মতো।"

কথায় কথায় অনেকটা পথ চলে এসেছে টুপুররা। ছাতাওয়ালা গলি এঁকেবেঁকে চলেছে তো চলেছেই। রাস্তায় এখন বেশ চিনা মুখ দেখা যায়। মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে ছুটে গেল দুই চিনা যুবক। হাতে-টানা রিকশায় চড়ে চিনা গৃহিণী কেনাকাটা সেরে ফিরছেন। স্কুল-ইউনিফর্ম পরা একদল চিনা মেয়ে কলকল করতে করতে চলে গেল পাশ দিয়ে। একটা-দুটো স্টেশনারি দোকানও আলো করে বসে

আছেন চিনা দোকানদার। অন্যান্য মানুষ দেখা গেলেও পাড়াটা যে চিনাদের, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

মূল রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকল লিয়াং, সেখান থেকে আর একটা সরু গলি। অবশেষে একখানা পুরনো-পুরনো বাড়ির সামনে এসে থেমেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ওয়েলকাম টু আওয়ার প্লেস। একটু দেখে দেখে এসো। আমাদের এন্ট্রান্সটা কিন্তু অন্ধকার-অন্ধকার।"

টুপুরের অবশ্য অত অন্ধকার লাগল না। সে থাকে হাতিবাগানে, প্রচুর পুরনো পুরনো বাড়ি তার দেখা। তুলনায় এ-বাড়ির ভিতরটায় যথেষ্ট আলো। তবে মাথায় রং-বেরঙের কাচ বসানো দরজা, নকশাদার সবুজ সানশেড লাগানো জানলা, আর বারান্দার স্যান্ডকাস্টিং করা রেলিং ঘোষণা করছে বাড়ির বয়স একশো পেরিয়েছে বহুকাল।

সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে, লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে লিয়াংদের ফ্ল্যাট। বড়সড় ড্রয়িংরুমের সোফায় টুপুরদের বসিয়ে অন্দরে গেল লিয়াং। দিব্যি সাজানো-গোছানো ঘর। টিভি, টেলিফোন, শোকেস, ক্যাবিনেট, কী নেই ড্রয়িংরুমে। পেল্লাই উঁচু সিলিং থেকে লম্বা লম্বা ডাঁটি বেয়ে ঝুলছে ফ্যান, রংদার বাহারি ল্যাম্পশেড। দরজা-জানলায় সিল্কের পরদা। দেওয়ালে দু'খানা বড়-বড় বাঁধানো ছবি দৃশ্যমান। একটা ল্যান্ডস্কেপ। সম্ভবত কোনও বিখ্যাত চিনা শিল্পীর মূল ছবির নকল। অন্য ছবিটি সান-ইয়েৎ-সেনের। শোকেসে বার্বিডলের পাশে চিনামাটির পুতুল, ফুলদানি। টিভির মাথায় ছোট্ট ছোট্ট সফ্ট টয়। একখানা পিতলের উইন্ডচাইমও ঝুলছে ঘরে। ফ্যানের হাওয়া পেয়ে শব্দ বাজিয়ে দুলছে।

টুপুর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল ঘরখানা। গৃহসজ্জা সাবেকি

ধাঁচের হলেও মোটের উপর রুচিশীল। চৈনিক সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশে আছে কি? নাকি ব্রিটিশ?

কুশল কেমন বেজার মুখে বসে। হঠাৎই চাপা স্বরে বলল, "ইস, খ্যাটনটা আজ মিস হয়ে গেল রে। আগেরবার যখন এসেছিলাম, আন্টি কত কিছু খাইয়েছিলেন। একদম অরিজিনাল চাইনিজ রান্না।"

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "সাংহাই তো চিনের নর্দার্ন সাইডে। উত্তর চিনের লোকেরা তো সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার খায়।"

"হ্যাঁ, আন্টির রান্নাতেও তেল বেশ কম ছিল। কিন্তু হেভি টেস্টি। রাইস নুড্‌লসের একটা প্রিপারেশান খাইয়েছিলেন,.এখনও জিভে লেগে আছে। আর-একটা সুপ ... লেটুসটেটুস দিয়ে ..."

টুপুর হেসে ফেলল, "কী আর করা, আন্টি আজ যখন নেই ..."

কথার মাঝেই বাবাকে নিয়ে লিয়াংয়ের প্রবেশ। সঙ্গে লিয়াংয়ের বোনও রয়েছে। মেইলি। ভারী মিষ্টি দেখতে মেয়েটা। পুতুল-পুতুল। চেরা চেরা নীলচে চোখ, ফোলা ফোলা ফরসা গাল, চুল টেনে ঝুঁটি করে বাঁধা। ঝুঁটিতে নীল রঙের এক টুকরো উল লাগানো আছে। লিয়াংয়ের বাবার রং অবশ্য অতটা উজ্জ্বল নয়, হলদেতে তামাটে ছোঁওয়া। টুপুরের ধারণা ছিল, চিনারা ছোটখাটো হয়, লিয়াংয়ের বাবা কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া। পরনে নেভি-ব্লু ট্রাউজার আর ঘিয়ে রং বুশশার্ট। লিয়াংয়ের মতো লিয়াংয়ের বাবার হাতেও একটা কালো ব্যান্ড।

টুপুর আর কুশল উঠে বাও করেছিল, লিয়াংয়ের বাবাও মাথা ঝোঁকালেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, "আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর-একটু বড় মেয়ে। এখন দেখছি, একেবারেই ছোট। আমাদের লিয়াংয়ের মতো।"

টুপুর হাসল, "আমাদের তো সেম ক্লাস আঙ্কল। স্কুলটাই যা আলাদা।"

"লিয়াং বলছিল, তুমি নাকি খুব সাহসী মেয়ে! তোমার ডিটেকটিভ আন্টির অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করো!"

"ওই আর কী। করি মাঝে মাঝে।"

"তোমার কি মনে হয় ঝিয়েনের কেসটা ... মানে আমার ভাইয়ের কেসটা তোমরা সল্‌ভ করতে পারবে?"

"চেষ্টা তো করব। কিন্তু তার আগে তো আঙ্কল আমাদের জানতে হবে, ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সত্যি মূল্যবান ছিল কিনা।"

"নিশ্চয়ই ছিল। নইলে কি ঝিয়েন ওটা কেনার জন্য অত ছটফট করে?" লিয়াংয়ের বাবা সোফায় বসলেন, "আমার ভাই মোটেই অকারণে দশ হাজার টাকা নষ্ট করার বান্দা ছিল না।"

টুপুর বলল, "লিয়াং তো কিছুই বলতে পারল না। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সম্পর্কে আপনার ভাই আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?"

"আকাশের পাখি মাটির প্রাণীর সঙ্গে কী কথা বলবে? একে অপরের ভাষা বোঝে কি?"

টুপুরের ঠিক বোধগম্য হল না কথাটা। অবাক মুখে লিয়াংয়ের দিকে তাকাচ্ছে।

লিয়াং তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "পাপা বলতে চাইছেন, তাঁরা দুই ভাই দুটো আলাদা জগতের মানুষ। একজন অনেক উঁচুতে বিচরণ করতেন, আর-একজন আর পাঁচটা মানুষের মতো সাধারণ। কাকার সঙ্গে পাপার তাই কোনও বিষয় নিয়েই বড় একটা আলোচনা হত না।"

কথায় কী হেঁয়ালি, বাপ্‌স। এই ভাষায় ভদ্রলোক যদি উত্তর দিতে থাকেন, টুপুরকে তো তা হলে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফিরতে হবে।

টুপুর নার্ভাস গলায় বলল, "অর্থাৎ ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কেমন ছিল, তা আপনার অজানা। তাই তো?"

"সেরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।" লিয়াংয়ের বাবা সোজা হয়ে বসলেন, "তবে এই বিষয়টা নিয়ে কেন যেন ঝিয়েন আমার সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করেছিল। বলেছিল, ওই এক টুকরো কাপড় নাকি আমাদের জানা ইতিহাসের অনেকটাই বদলে দেবে।"

"তাই বুঝি? কীভাবে?"

"তা তো বলতে পারব না। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, ঝিয়েনের মতো পণ্ডিত তো নই।" হঠাৎই লিয়াংয়ের বাবার স্বর বুজে এল। ধরা ধরা গলায় বললেন, "এত পড়াশোনা ... এত জ্ঞান ... কী হল শেষ পর্যন্ত? মাটির নীচে যাওয়ার আগে পৃথিবীতে পঞ্চাশটা বসন্তও তো দেখতে পেল না বেচারা।"

"উনি তো শুনলাম প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণাও করছিলেন?"

"হ্যাঁ। ইতিহাসই ছিল ওর নেশা। কত লাইব্রেরিতে যে ছুটে ছুটে বেড়াত। সপ্তাহে তিনদিন আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি তো বাঁধা। স্কুল ছুটির পর সটান চলে যেত, লাইব্রেরি বন্ধ না-হওয়া অবধি বসে থাকত বই মুখে করে। কত বিদ্বান মানুষদের সঙ্গে যে আলাপ ছিল ওর।"

"তাঁরাও কি চাইনিজ়?"

"না। বেশির ভাগই বাঙালি। ঝিয়েনের সাবজেক্টেরই লোক। তাঁদের দু'-তিন জনের সঙ্গে তো প্রায় রাতেই কথা বলত টেলিফোনে।"

কুশল গলা ভারী করে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আঙ্কল ঝিয়েন কি তাঁদের কাছে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার গল্প করেছিলেন?"

"কী জানি, বলতে পারব না।"

"তাঁদের নাম-ধাম কিছু আপনার কাছে আছে?"

"বোধহয় আছে। ঝিয়েনের ডায়েরিতে। দাঁড়াও দেখছি।"

লিয়াংয়ের বাবা উঠে পড়লেন। ভিতরে যেতে গিয়েও ঘুরে তাকিয়ে মেইলিকে কী যেন নির্দেশ দিলেন চিনা ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে মেইলিও দৌড়ে অন্দরে চলে গেল। ফিরেছে ট্রে সাজিয়ে। ট্রে-তে পেস্ট্রি, কাজু আর দু'গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক।

টুপুর বলল, "কী কাণ্ড! এসবের আবার কী দরকার ছিল?"

ছোট্ট করে হাসল মেইলি। উত্তর দিল না।

কুশল তড়িঘড়ি গ্লাস তুলে নিয়েছে। চুমুক দিয়ে লিয়াংকে বলল, "আয়, তোরাও একটু শেয়ার কর।"

"আমরা নেব না রে। স্কুল থেকে এসে থুপ্‌কা খেয়েছি।"

টুপুর একটা কাজুবাদাম তুলে দাঁতে কাটল। মেইলিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি চুলে নীল উল লাগিয়েছ কেন? ফ্যাশন?"

পলকে মেইলির মিষ্টি মুখে বিষাদের ছায়া। ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

লিয়াং বোনকে একবার দেখে নিয়ে বলল, "ওটা আমাদের কাস্টম, তুপুর। ঘনিষ্ঠ কোনও রিলেটিভ মারা গেলে মেয়েরা মাথায় নীল উল বাঁধে। আর ছেলেরা হাতে কালো টেপ। মৃত্যুর ঊনপঞ্চাশ দিন পরে আমরা এই উল আর টেপ খুলে পুড়িয়ে ফেলি।"

"ও।" একটু সময় নিয়ে টুপুর ফের বলল, "মেইলিকে কি আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

মেইলি অল্প ঘাড় নাড়ল।

"আঙ্কল ঝিয়েন তো তোমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি কি তোমাকে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?"

মেইলি ভার মুখে বলল, "না। শুধু একবার বলেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় আবার ফু শাংয়ের নাম ফিরে আসবে।"

"তিনি কে?"

"একজন অভিযাত্রী। তিনি নাকি প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ...

নাকি তারও অনেক আগে, জাহাজে চড়ে সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতেন।"

লিয়াং চোখ বড় বড় করে বলল, "কই, বো আমাকে তো বলেনি! ... ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিং কি তবে ফু শাংয়েরই ছিল?"

মেইলি বলল, "তা তো আমি জানি না।"

লিয়াংয়ের বাবা ফিরেছেন ঘরে। এক হাতে বাঁধানো ডায়েরি, অন্য হাতে একটা খবরের কাগজ। প্রথমে খবরের কাগজখানাই টুপুরকে বাড়িয়ে দিলেন, "লুক, আমাদের এখানকার লোকাল নিউজ়পেপারে ঝিয়েনের মৃত্যুর খবরটা ডিটেলে বেরিয়েছিল। সঙ্গে ঝিয়েনের ছবিও।"

খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে টুপুর হতবাক। অস্ফুটে বলল, "চাইনিজ নিউজ়পেপার? লোকাল?"

"হ্যাঁ। কলকাতা থেকেই বেরোয়। একটা নয়, দুটো পেপার পাবলিশ হয় চাইনিজ় ল্যাঙ্গোয়েজে। অন্যটাতেও ঝিয়েনের অবিচুয়ারি ছিল, কিন্তু ছবি নেই বলে আনলাম না।"

টুপুর আর কুশল একসঙ্গে ঝুঁকে দেখল ঝাও ঝিয়েনের ছবিটা। দেখে লিয়াংয়ের বাবা বলেও ভুল হতে পারে। একই রকম গোলগাল মুখ, চওড়া কপাল, ফোলা ফোলা চোখের পাতা। শুধু ভাইয়ের চোখে চশমা আছে, দাদার নেই।

কাগজটাকে একটু উলটেপালটে দেখে রেখে দিল টুপুর। লিয়াংয়ের বাবা ফের বসেছেন সোফায়। গর্বিত গলায় বললেন, "আমাদের কমিউনিটিতে ঝিয়েনের খুব কদর ছিল। ওর এই সাডেন চলে যাওয়ায় কলকাতার গোটা চাইনিজ় সমাজ বড় দুঃখ পেয়েছে। ওকে সমাধি দেওয়ার দিন... আই মিন লাস্ট থার্সডে... কত মানুষ যে এসেছিল! ঝিয়েনের স্কুলও ছুটি ডিক্লেয়ার করেছিল সেদিন।"

লিয়াং বলল, "বো-এর ন্যাশনাল লাইব্রেরির বন্ধুরাও এসেছিলেন।"

"দু'জন।" লিয়াংয়ের বাবা ডায়েরি খুললেন, "এই যে, তাঁদের নাম-ঠিকানা চাইছিলে... লেখা আছে এখানে। চাইনিজে লেখা, তোমরা পড়তে পারবে না, নোট করে নাও। নাম্বার ওয়ান, ডক্টর বাসব সমাদ্দার। ফাইভ বাই টু, আর এন দাস রোড, কলকাতা একত্রিশ। নাম্বার টু, ডক্টর শিবতোষ রায়। টোয়েন্টি ওয়ান বাই থ্রি, সিমলাই পাড়া লেন, কলকাতা টু। ...আর-একজনের নামও দেখতে পাচ্ছি। তিনি অবশ্য আসেননি। ডক্টর তরুণ বাসু। এঁর ঠিকানা নেই, ফোন নম্বর আছে..."

তিনটে নাম-ঠিকানাই পরিষ্কার করে টুকে নিল টুপুর। ঝাও ঝিয়েনের স্কুল, আর স্কুলের সহকর্মীদের সম্পর্কেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল। পাড়া-প্রতিবেশীদের সম্পর্কেও। লিখে নিল লিয়াংয়ের বাবা-মা'র নামও।

আরও কিছুক্ষণ কথা হল টুকটাক। তথ্যভাণ্ডার মোটামুটি সমৃদ্ধ করে উঠে পড়ল টুপুর। লিয়াংয়ের বাবাও বেরোনোর জন্য তৈরি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লিয়াংয়ের বাবা বললেন, "কী মনে হল? এইসব ইনফরমেশন থেকে কিছু বেরোবে?"

"দেখি। মাসির সঙ্গে আলোচনা করি। প্রয়োজন হলে মাসিকে নিয়ে আবার আসব।"

"ইউ আর অলওয়েজ় ওয়েলকাম। ঝিয়েনের মৃত্যুরহস্য জানার জন্য আমিও বড় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"

বাড়ির সদরে এসে টুপুর দাঁড়াল ক্ষণেক। মেইলিও এসেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। মুখ থমথম, দু'চোখ ভরে গিয়েছে জলে।

মেয়েটার কাঁধে আলগা চাপ দিল টুপুর, "মন খারাপ কোরো না

মেইলি। তোমার বো'কে যদি সত্যিই কেউ মেরে থাকে, তাকে আমরা ধরবই। কথা দিলাম।"

মেইলির চোখের জল এবার টুপটুপ নেমে এসেছে গালে। ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা।

বাড়ি ফিরেই পড়ার বই নিয়ে বসে গিয়েছিল টুপুর। বসাই সার, মন দিতে পারছে না। ঘুরেফিরে ঝাও ঝিয়েনই চলে আসছেন চিন্তায়। লিয়াংয়ের বাবা, লিয়াং, মেইলি, এমনকী কিউরিও শপের বদমেজাজি মালিকটার কথা শুনে ধরে নেওয়াই যায়, ঝিয়েন মানুষটি ছিলেন নিতান্তই নিরীহ। একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিং কেনার দরুন তাঁকে কিনা দুনিয়া থেকেই সরে যেতে হল? কী এমন বিশেষত্ব থাকতে পারে একফালি কাপড়ের টুকরোয়, যাতে কিনা ইতিহাস বদলে যাবে? মেইলি আবার কোত্থেকে যেন ফু শাং নামের এক আধাপৌরাণিক ক্যারেক্টারকেও এনে ফেলল!

না, গুলিয়ে যাচ্ছে। এমন নয় তো, স্রেফ এক মোটর দুর্ঘটনাকে অকারণে রহস্যময় করে তোলা হচ্ছে? হয়তো সেদিন এমনিই প্রিন্সেপ ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলেন মিস্টার ঝিয়েন! পছন্দের জিনিসখানা হাতে পেয়ে হয়তো বেজায় আনন্দ হয়েছিল, হঠাৎই সাধ জেগেছিল গঙ্গার হাওয়া খাওয়ার। মানুষের মনে কখন কী ইচ্ছের উদয় হয়, কেউ কি তা নিখুঁতভাবে বলতে পারে? ...কিন্তু ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা যে মিসিং হয়েছে, এতে তো কোনও সন্দেহ নেই। কে নিল? কেন নিল? অবশ্য এ-ও হতে পারে, যে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা

নিয়েছে, সে হাতের সামনে পেয়েছে বলেই নিয়েছে। মোবাইলটাও হয়তো সেভাবেই গিয়েছে। ডেডবডির কব্জি থেকে ঘড়ি খোলা, কিংবা পকেট থেকে পার্স সরানোর মতো ঝুঁকিতে সে যায়নি। পুরনো হিজিবিজি ন্যাকড়া ভেবে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সে হয়তো এতদিনে ফেলেও দিয়েছে। হতে পারে। হতেও তো পারে।

ভাবনার মাঝেই ডোরবেলের ঝংকার। এবং মেঘ না-চাইতেই জল, মিতিনমাসি স্বয়ং হাজির। হাতে ইয়া এক বাক্স। চিকেন মোমোয় ঠাসা।

সহেলি মহা আহ্লাদিত। দু'গাল ছড়িয়ে বললেন, "হঠাৎ এত খাবার কেন রে?"

"পেমেন্ট পেয়েছি," মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "জাল উইলের রহস্যজাল ফর্দাফাঁই। বাড়ির ছোট ছেলের শ্রীঘর বাসের বন্দোবস্ত করে এলাম।"

অবনী দোকানের খাবার দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, তবে মোমোর প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। সহেলিকে বললেন, "চটপট দুটো বের করো তো। গরম গরম টেস্ট করে দেখি।"

বড় প্লেটে মোমোর পাহাড় সাজিয়ে দিলেন সহেলি। টপাটপ উড়ে যাচ্ছে। মিতিন একটা মোমোতে লঙ্কা-রসুনের চাটনি মাখাতে মাখাতে টুপুরকে প্রশ্ন করল, "তারপর মিস ওয়াটসন, তোমার তদন্তের কী হাল?"

টুপুর বিরস মুখে বলল, "ধুৎ, খুন করার কোনও জোরদার কারণই খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তার মানে তোর মনে হচ্ছে খুন নয়?"

"বলতে পারো। তবে লিয়াংরা মানতে চাইছে না।"

"পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কী বলছে? হোমিসাইড?"

"ওরা বোধহয় পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখনও পায়নি। নইলে তো

লিয়াং আমায় বলত।" টুপুর চোখ কুঁচকোল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, মিস্টার ঝিয়েন যদি গাড়িচাপা পড়েই মারা গিয়ে থাকেন, পোস্টমর্টেম কী করে ধরবে এটা খুন?"

"যদি সত্যিই ভদ্রলোক রানওভার হয়ে থাকেন, তা হলে খুন কিনা বোঝা কঠিন। কিন্তু ভদ্রলোক যে গাড়িচাপাই পড়েছেন, এটা কি এখনও প্রমাণ হয়েছে? কোনও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গিয়েছে কি?"

"না। তখন তো ওদিকে নির্জন রাস্তা..."

"নির্জন রাস্তায় তো ডেডবডিও ফেলে দেওয়া যায়। তারপর তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে প্রাথমিকভাবে রানওভারের কেসই মনে হবে।"

"তা বটে। কিন্তু কেন..."

"কেনটেন তো পরে ভাবা যাবে। আগে বল, এটা সম্ভব, কি সম্ভব না?"

"সম্ভব।"

"অতএব পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আগে দরকার। যদি দেখা যায়, গাড়িচাপা পড়াটাই মৃত্যুর কারণ, তখন সেটা কেউ ইচ্ছে করে করেছে, নাকি অনিচ্ছাকৃত, সেটা ভাবা যেতে পারে। তার আগে পর্যন্ত গোটা দৌড়টাই বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা।"

অবনী মন দিয়ে মাসি-বোনঝির কথোপকথন শুনছিলেন। হালকা ভাবে মন্তব্য ছুড়লেন, "তার মানে টুপুরের অভিযান বৃথা গেল?"

মিতিন হেসে বলল, "তা কেন অবনীদা? জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। দু'দিনের ঘোরাঘুরিতে কিছু অভিজ্ঞতা তো হল টুপুরের।"

"বটেই তো," টুপুর ঘাড় নাড়ল, "একটা চিনা পরিবারকে তো কাছ থেকে দেখা গেল।"

"কী কী কথা হল সেখানে? যা বলেছিলাম সেভাবে নোটফোট করেছিস?"

"হুঁ।"

আস্তে আস্তে টুপুরের পেট থেকে আজকের অভিযানের যাবতীয় বৃত্তান্ত নিপুণভাবে বের করে নিল মিতিন। খানিকক্ষণ চোখ বুজে ভাবল কী যেন। চোখ পিটপিট করে বলল, "প্রিন্সেপ ঘাটে মৃত্যু... মানে হেস্টিংস থানার কেস?"

"হ্যাঁ। লিয়াংয়ের বাবা তো হেস্টিংস থানাতেই গিয়েছিলেন।"

"ঠিক আছে, আমি তো ফ্রি হয়েছি, এবার আমি দেখছি। পরশু তোর স্কুল ছুটি আছে না?"

" হুঁ। জন্মাষ্টমী।"

"ওদিন তৈরি থাকিস, তোকে নিয়ে বেরোতে পারি। যে নাম-ঠিকানাগুলো টুকে এনেছিস, আমায় একটা কাগজে লিখে দে। তোর লিয়াংয়ের কাকার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজখবর করি।"

টুপুর ঘর থেকে কাগজ-কলম নিয়ে এল। দেখে দেখে নামধাম লিখছে, তখনই আবার মিতিনের প্রশ্ন, "আচ্ছা টুপুর, তুই বললি মিস্টার ঝিয়েনকে সমাধি দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার। অর্থাৎ মৃত্যুর পাঁচ দিন পর। এত দিন দেরি হল কেন? মর্গ থেকে বডি পেতে কি লেট হয়েছিল?"

অবনী বললেন, "চিনারা একটু দেরি করেই সমাধি দেয়, মিতিন।"

"কেন?"

"কারণ, এ-ব্যাপারে ওদের একটা সংস্কার আছে। চিনাদের ধারণা, মানুষের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত হোয়াংহো নদীর জলে নিজের ছায়া দেখে বুঝতে পারছে সে আর বেঁচে নেই, ততক্ষণ তার দেহ সমাধিতে শোওয়ানো উচিত নয়।

মারা যাওয়ার পর ডেডবডি তাই দু'-চার দিন বরফে রেখে দেয় ওরা।"

"তাই নাকি? এটা তো আমার জানা ছিল না!"

"স্বীকার করছ তা হলে, তোমারও অনেক কিছুই অজানা রয়ে গিয়েছে?". অবনী হো-হো হেসে উঠলেন, "আমাদের এই কলকাতায় এখনও কত চিনা বাস করে, সে-খবরটা রাখো তো?"

মিতিন বলল, "হবে হাজার দশেক।"

"উঁহুঁ। প্রায় কুড়ি হাজার।" অবনী হাসিটা ধরে রেখেই বললেন, "আমারও এখানকার চিনাদের সম্পর্কে এত নলেজ ছিল না। টুপুর কেসটায় নাক গলিয়েছে দেখে আমার জ্ঞানপিপাসা বেড়ে গেল। ইন্টারনেট ঘেঁটে ঘেঁটে ইনফরমেশনগুলো জোগাড় করে ফেললাম। কিছু নলেজ টুপুরকেও পাস করে দিয়েছি।"

"গুড।" মিতিনও হেসে ফেলল, "সব তথ্য মগজে ধরে রাখুন। পরে আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

সহেলি চা করতে গিয়েছিলেন। কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে ফিরলেন আসরে। ডিশগুলো টেবিল থেকে নামাতে নামাতে বললেন, "আর কী, মাসি-বোনঝি আবার ধ্যাতাং-ধ্যাতাং শুরু করে দাও। ...টুপুর, তুমি কিন্তু ভুলে যেও না, পুজোর আগে তোমার পরীক্ষা আছে।"

"জানি তো।" টুপুর মাকে আর এগোতে দিল না। মিতিনকে বলল, "কুশলকেও কিন্তু আমরা সঙ্গে রাখব। ও এই কেসটায় খুব ইন্টারেস্ট পেয়েছে।"

"ছেলেটা কেমন? বুদ্ধিসুদ্ধি আছে?"

"একটু হামবাগ। পেটুক। তবে বোকা নয়।"

"থাকুক তা হলে। এবার তো আর তোর পার্থমেসো জয়েন করতে পারছে না। প্রেসে ডিটিপি বসিয়েছে, নিজে নিজেই কম্পোজ

করছে। পুজো পর্যন্ত তার নড়াচড়ার উপায় নেই। কুশল নয় তোর পার্থমেসোর প্রক্সি দিক।"

অবনী বললেন, "তা হ্যাঁ হে, পুজোয় বেরোনোটা হচ্ছে তো? পার্থ তো একবার আওয়াজ তুলেই চেপে গেল, আর কোনও সাড়াশব্দ নেই!"

সহেলি ঝামরে উঠলেন, "শুনছ না, বেচারা এখন ব্যস্ত?"

"আহা, ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে না? অগাস্ট তো প্রায় শেষ হয়ে এল!"

মিতিন ফিক করে হাসল। টুপুরকে বলল, "অ্যাই, তোর বাবাকে বলে দে গোয়েন্দাগিরির প্রথম শিক্ষাটা কী?"

টুপুর মাথা চুলকোল, "কী গো?"

কোনও কিছু আগে থেকে ধরে নিতে নেই।... অবনীদা, আপনি কেন ভাবছেন আমরা ট্রেনেই মুম্বই যাব? প্লেনেও তো যেতে পারি।"

সহেলির মুখ হাঁ হয়ে গেল, "এরোপ্লেন? আকাশপথে মুম্বই?... কিন্তু যদি অ্যাকসিডেন্ট-ফ্যাকসিডেন্ট হয়?"

"দুর্ঘটনা কীসে হয় না, দিদি? ওভাবে ভাবলে ট্রেন-বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি, কোনও কিছুতেই তো চড়া যায় না। এমনকী, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো গাড়ি এসে ধাক্কা মারতে পারে। তার জন্য কি পথে বেরোনো বন্ধ করে দেবে?"

"ঠিকই তো। বটেই তো।" প্লেনে চড়ার প্রস্তাবে টুপুর টগবগ ফুটছে। উত্তেজিতভাবে বলল, "মিস্টার ঝিয়েনের কী হল, অ্যাঁ? তিনি তো বেজায় সাবধানি ছিলেন। তাঁকেও তো গাড়িচাপা পড়েই..."

"নো টুপুর। নো।" মিতিন আঙুল দোলাচ্ছে, "ওই ব্যাপারটায় তুমি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারো না। মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুর কারণ এখনও তদন্তের পর্যায়ে।"

টুপুর অপ্রস্তুত মুখে হাসল, "তা ঠিক।"

রাতে একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখল টুপুর। শাঁ-শাঁ করে একটা গাড়ি ছুটছে। লিয়াংয়ের বাবা দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, গাড়িটা তাঁকে পিষে দিয়ে শূন্যে উড়ে গেল। পলকে এরোপ্লেন হয়ে গিয়েছে গাড়িটা, পাইলটের সিটে বসে আছে কিউরিও শপের মালিক। এরোপ্লেনের লেজের দিকটায় ঝুলছে একটা হলুদ রঙের ময়লা কাপড়। কুশল, টুপুর আর লিয়াং তাড়া করছে প্লেনটাকে। বাতাসে ভেসে ভেসে। অনেকটা কুইডিচ খেলার মতো। হঠাৎই বুদুম আওয়াজ, প্লেনটা দাউদাউ জ্বলে উঠল। সহেলি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন...।

ঘুম ভাঙার পরও ধন্দ-মাখা মুখে বিছানায় বসে রইল টুপুর। বিটকেল স্বপ্নটার কোনও অর্থ আছে কি? কী হতে পারে? ভবিষ্যতের কোনও আভাস?

কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল জোর। প্রায় ঘণ্টাখানেক। বর্ষা যেন এ-বছর গিয়েও যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই জানান দিচ্ছে নিজেকে। সকালবেলা অবশ্য মেঘ কেটে গিয়ে ঝিকমিক করছে রোদ্দুর। বেলা বাড়তে না-বাড়তে সূর্যের তাপ রীতিমতো চড়া। একটা বিচ্ছিরি চিটচিটে গরমে প্রাণ আইঢাই।

পৌনে এগারোটা নাগাদ বেকবাগানের মোড়ে এসে থামল মিতিনের গাড়ি। নিজের নয়, ভাড়ার। সারাদিনের জন্য আজ গাড়িটা নিয়েছে মিতিন, এতে নাকি ঘোরাঘুরির সুবিধে হয়।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে টুপুর বলল, "ইস, প্রথমেই আজ ওই লোকটার মুখ দেখতে হবে।"

কুশল বলল, "আমাকে দেখলে আবার চটে যাবে নির্ঘাত। সেদিন এমন ক্রস করা শুরু করেছিলাম..."

মিতিন বলল, "আজ কিন্তু তোমরা চুপ থাকবে। যা প্রশ্ন করার আমিই করব। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, আমার কোনও প্রশ্নেই অবাক হবে না।"

কিউরিও শপ খুলেছে সবেমাত্র। দোকান-মালিক আজ একা নন, একজন কর্মচারীও রয়েছে। ডাস্টার বুলিয়ে ঝাড়পোঁছ করছে কাচের শো-কেস। আর মালিক ছোট্ট একটা গণেশের মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

ঢুকেই মিতিন গলাখাঁকারি দিল, "এই যে মিস্টার...এই যে মিস্টার? শুনছেন?"

ঘুরে মিতিনকে দেখে ঠোঁটে একটা হাসি ফুটব-ফুটব করছিল, কিন্তু পাশে দুই ল্যাংবোটকে দেখে ভদ্রলোকের মুখটা কেমন ভেটকে গেল। কপালে একরাশ ভাঁজ ফুটিয়ে বললেন, "ইয়েস?"

"আমি থার্ড আই থেকে আসছি।" ভ্যানিটিব্যাগ খুলে ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল মিতিন, "আমি একজন লাইসেন্সড প্রাইভেট ডিকেটকটিভ।"

কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে কাউন্টারের কাচের তলায় রেখে দিলেন ভদ্রলোক। কপালের ভাঁজ সামান্য হাল্কা করে বললেন, "আমার কিন্তু নতুন করে কিছু বলার নেই।"

"কিন্তু আমাদের কৌতূহল যে মেটেনি মিস্টার..."

"আমি স্বপন দত্ত। আপনি মিস্টার দত্ত বলতে পারেন। অথবা স্বপনবাবু।"

"স্বপনবাবুই ভাল।" মিতিন আলগা হাসল, "আমি আপনার বেশি সময় নেব না। জাস্ট দু'-চারটে প্রশ্ন..."

"বলুন? চটপট।"

"মিস্টার ঝিয়েন... মানে যে চিনা ভদ্রলোকটির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে..."

"অস্বাভাবিক বলছেন কেন?" স্বপনবাবুর গলায় ঠাট্টার সুর, "কলকাতার রাস্তায় গাড়িচাপা পড়া তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।"

"মিস্টার ঝিয়েন গাড়িচাপা পড়ে মারা যাননি, স্বপনবাবু।"

"যাঃ। কী বলছেন?... তা হলে কী করে মারা গিয়েছেন?"

"সেটা আপাতত না-জানলেও চলবে। তা ছাড়া বলার হয়তো প্রয়োজনও নেই। মৃত্যুর কারণটা হয়তো আপনার জানাই আছে।"

"আমি... কী করে জানব?"

"সে তো সময়ই বলে দেবে।"

স্বপনবাবু বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছেন। কুশল আর টুপুরও মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা বিস্ময় ঠেলে উঠতে চাইছিল টুপুরের গলায়, কোনওক্রমে সেটাকে গিলে নিল টুপুর।

মিতিন টুল টেনে বসেছে। দোকানটায় চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, "হ্যাঁ, যে-কথা হচ্ছিল...। মিস্টার ঝিয়েন আপনার এখান থেকে যে-বস্তুটি কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কেউ কি সেটা কখনও কিনতে এসেছিল? অন্য কোনও কাস্টমার?"

"আমি তো দোকানে ওটা আগে টাঙাইনি। সুতরাং আর কারও..."

"ভাল করে ভেবে বলুন। উত্তরটা কিন্তু খুব ভাইটাল।"

একটু ভাবার চেষ্টা করে স্বপনবাবু বললেন, "মনে পড়ছে না।... মন্টু, ওই ঝঞ্ঝাটে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কিনতে আর কেউ এসেছিল নাকি রে?"

কর্মচারীটি গোল গোল চোখে তাকিয়ে ছিল। আমতা আমতা করে বলল, "একজন বোধহয় এসেছিল। আপনি বেচবেন না বলেছিলেন বলে তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম।"

"কবে এসেছিল? কখন?" এবার স্বপনবাবুর গলায় বিস্ময়, "আমাকে বলিসনি তো?"

"আপনি সেদিন সন্ধেবেলায় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন... পরদিন আমার আর মনে ছিল না।"

"দেখেছেন তো কাণ্ড! আমাকে কেমন অড পজ়িশানে ফ্যালে!" স্বপনবাবু গজগজ করছেন। বিরক্ত গলায় মন্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কবে এসেছিল বল তো? ওই ঝিয়েনবাবু দোকানে ঘুরে যাওয়ার আগে, না পরে?"

"পরে।" মন্টু ঘাড় চুলকোল, "হ্যাঁ, পরেই হবে।"

এবার মিতিনের প্রশ্ন করার পালা, "তিনিও কি চাইনিজ়?"

"না না, বাঙালি।"

"চেহারা মনে আছে?"

"খেয়াল নেই। রোজ এত কাস্টমার আসে...। তবে প্যান্টশার্ট পরা ছিল।"

"ফরসা? কালো? চোখে চশমা? টাক মাথা?"

"একদমই মনে নেই ম্যাডাম।"

"দেখলেও মনে পড়বে না?"

"হয়তো...। কী যে বলি...!"

"অলরাইট। আপনি কাজ করুন।" মিতিন আবার স্বাপনবাবুতে ফিরল। হেসে বলল, "প্রথম প্রশ্নটা তো গুবলেট হয়ে গেল। যাক গে, এবার নেক্সট। ...মিস্টার ঝিয়েন যেদিন আপনার দোকান থেকে জিনিসটা কিনলেন, সেদিনটার কথা আপনার স্মরণে আছে তো?"

"মোটামুটি। উনি অ্যারাউন্ড পৌনে তিনটেয় এসেছিলেন।

ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা প্যাক করে দিলাম, দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই উনি দোকান থেকে বেরিয়েও গেলেন।"

"বাঃ, আপনার মেমারি তো বেশ শার্প।... এবার বলুন তো, মিস্টার ঝিয়েন বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে শুরু করে সন্ধে সাতটা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন?"

"দোকানেই ছিলাম। আর কোথায় যাব!"

"ভাল করে ভেবে বলুন। আমি কিন্তু আপনার স্টেটমেন্ট ভেরিফাই করব।"

এতক্ষণে স্বপনবাবুকে একটু থতমত দেখাল। একটুক্ষণ নাক কুঁচকে থেকে বললেন, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিন মন্টু আসেনি তো... আমার একটা জরুরি কাজ ছিল, তাই দোকান বন্ধ করে বেরোতে হয়েছিল।"

"কী কাজ জানতে পারি?"

"আপনাকে বলব কেন? আমার পারসোনাল কাজ থাকতে পারে না?"

"অবশ্যই পারে। তবে মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুটা তো আপনার দোকান থেকে বেরোনোর পর হয়েছে...। আমাকে না-বলতে চাইলে ক্ষতি নেই, তবে পুলিশ কিন্তু বের করে নেবে।"

স্বপনবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "আবার পুলিশ আসবে নাকি? কেন?"

"বা রে, ডেথটা যদি সিম্পল রানওভার না হয়, পুলিশ সব্বাইকে একটু বাজিয়ে বাজিয়ে দেখবে না?"

"সক্কাল সক্কাল এ কী শুরু করলেন বলুন তো?" স্বপনবাবুকে এবার রীতিমতো বিপর্যস্ত দেখাল। একটুক্ষণ থম মেরে থেকে গোমড়া মুখে বললেন, "ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম।"

"কোন ব্যাঙ্ক?"

"সেটাও জানাতে হবে? স্টেট ব্যাঙ্ক। থিয়েটার রোড ব্রাঞ্চ।"

লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলছে। টুপুরের জিভ নিশপিশ করছিল। ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কিন্তু সেদিনটা তো ছিল শনিবার। স্যাটারডেতে তিনটের পরে ব্যাঙ্কে তো কাজ হয় না!"

মিতিন বলল, "দেখেছেন তো, স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে। এত সিলি মিথ্যে বলার কোনও মানে হয়?"

স্বপনবাবু এবার পুরোপুরি কাহিল। মিনমিন করছেন, "বিশ্বাস করুন, মিস্টার ঝিয়েনবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।"

"আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, সম্ভবত সেটা আমি জানি। এবং সে জায়গাটা বোধহয় প্রিন্সেপ ঘাট থেকে খুব দূরেও নয়। কী বলেন?"

ভীষণ চমকেছেন স্বপনবাবু। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "আ-আ আপনি আ-আমাকেই খুনি ঠাওরালেন নাকি?"

"বললাম তো, টাইম উইল টেল।" মিতিনের মুখ ভাবলেশহীন। নীরসভাবে বলল, "আশা করি, এর পরের প্রশ্নের উত্তরটা আমাকে ঠিকঠাক দেবেন।"

"আপনি ভুল করছেন ম্যাডাম, আমি কিন্তু খারাপ লোক নই।"

মিতিন কথাটাকে আমল দিল না। বলল, "আমি ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার হিস্ট্রি ডিটেলে জানতে চাই। আপনার কাছে কোত্থেকে এল... কীভাবে এল..."

"আমি তো আগের দিনই ওদের বলেছি।" কুশল আর টুপুরকে দেখালেন স্বপনবাবু, "ওটা আমার বাড়িতেই ছিল।"

"হঠাৎ তা হলে দোকানে নিয়ে এলেন কেন? তা-ও মাত্র এক-দু' মাস আগে?"

"সত্যি বলব? বিশ্বাস করবেন তো?"

"শুনি।"

"ওই জিনিসটা আগে আমি দেখিইনি। কিছুদিন আগে পুরনো বাক্সপ্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই চোখে পড়েছিল।"

"পরিষ্কার হল না। আপনার বাড়িতে ছিল, অথচ আগে দেখেননি...!"

"তা হলে আর-একটু খুলে বলি। আমরা এখন থাকি ভবানীপুরে। যদুবাবুর বাজারের কাছে। তবে আমাদের আদি বাড়ি বজবজে। ওখানে আমাদের পৈতৃক বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তাই বছর দশেক আগে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমার এই দোকানের মূলধনের মেজর পোরশন এসেছিল ওই টাকার ভাগ থেকে। ও-বাড়ির বড় বড় ফার্নিচারগুলো নিলামঘরে দিয়ে দেওয়া হয়, আর কিছু দরকারি-অদরকারি মাল আমরা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনরা ভাগাভাগি করে নিই। তখনই বোধহয় ওটা কোনও ট্রাঙ্কে করে এসে গিয়েছিল আমাদের কাছেতে। যে-পুরনো ট্রাঙ্কে ওটা পাওয়া যায়, সেই ট্রাঙ্কটা রাখা ছিল আমাদের ভবানীপুরের বাড়ির চিলেকোঠায়। সম্প্রতি ঘরটা সাফ করাচ্ছিলাম, তখনই...। জিনিসটা দেখে ভারী চোখে লেগে গেল, দোকান ডেকরেট করার জন্য এনে টাঙিয়ে দিলাম।"

"কিন্তু বিক্রি করতে চাইছিলেন না কেন?"

"তার অবশ্য একটা কারণ আছে। আমার বাবা... একাশি বছর বয়স... আমার সঙ্গেই থাকেন... ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা সেল করতে আমাকে নিষেধ করেছিলেন। ফর সেন্টিমেন্টাল রিজ়নস।"

"কীরকম?"

"আমাদের এক পূর্বপুরুষ... কত পুরুষ আগে বাবাও জানেন না, তবে অনেক... আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদা গোছের কেউ একজন নাকি বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তিনি এক চাইনিজ়কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। সেই চিনাটিই নাকি আমাদের ওই

ডাক্তার পূর্বপুরুষকে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা প্রেজেন্ট করেছিল। আমি অবশ্য এত গল্প জানতাম না, বাবাই বললেন। উনি জিনিসটা দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলেন। ইনফ্যাক্ট, ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা কার আঁকা বাবা সেই নামটাও বলেছিলেন আমাকে। অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জলি, ঝিয়েনবাবুও ওটা দেখে ওই রকমই একটা নাম বলেছিলেন।"

"কী নাম?"

"দাঁড়ান। আমি মনে রাখতে পারি না। সোমবার এই ছেলেমেয়েগুলো ঘুরে যাওয়ার পর আবার কোনও বখেড়া হতে পারে ভেবে বাবার কাছ থেকে ফের জেনে নিয়েছি।" স্বপনবাবু পকেট থেকে পার্স বের করলেন। হাতড়ে হাতড়ে একখানা চিরকুট। চোখে চশমা লাগিয়ে পড়লেন, "মো-ই-টং।"

মিতিন লিখে নিল নামটা। হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

স্বপনবাবুর চোখমুখ সামান্য উজ্জ্বল হয়েছে। বললেন, "দেখছেন তো ম্যাডাম, কোনও কিছুই গোপন করা আমার উদ্দেশ্য নয়!"

"এখনও পর্যন্ত যা বললেন, তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না আপনি নির্দোষ। ...যাক গে, একটা ইনফরমেশন কিন্তু এখনও পাইনি। বাবা বারণ করা সত্ত্বেও আপনি জিনিসটা বেচলেন যে বড়?"

"উনি বারবার এসে চাইছিলেন..."

"শুধু সেই কারণেই?"

এবার আর জবাব নেই। মিতিনকে একবার আড়চোখে দেখে মাথা নামিয়ে নিয়েছেন স্বপন দত্ত। অস্ফুটে বললেন, "ভাবলাম ফালতু ফালতু টাকাটা এসে যাচ্ছে... শনিবার টাকাটার খুব দরকারও ছিল..."

মিতিন বাঁকা হেসে বলল, "লাভ হয়েছিল টাকাটা পেয়ে?"

এবারও উত্তর নেই। স্বপনবাবুর মাথা আর উঠছেই না।

মিতিন মৃদু গলায় বলল, "ও-কে। আজ তা হলে চলি। প্রয়োজন হলে আবার আসব কিন্তু!"

রাস্তায় এসে কুশল বলল, "দেখেছিস তো টুপুর, আমি সেদিনই বলেছিলাম, লোকটা সুবিধের নয়!"

টুপুর বলল, "হুম্। তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে মিতিনমাসি এতক্ষণ ধরে জেরা করে!"

ভাড়াগাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা আছে। সেদিকে এগোতে এগোতে মিতিন বলল, "আমি তো ক্রস করলাম খুনের মোটিভ জানতে। সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না বলে একটু ভয় দেখাতে হল।"

টুপুর বলল, "কিন্তু আঙ্কল ঝিয়েন খুনই হয়েছেন তুমি বুঝলে কী করে?"

"ওরে গাধা, আদৌ কোনও খবর না-নিয়ে আমি এগোই নাকি? হেস্টিংস থানা, লালবাজার, দু'জায়গাতেই আমার যোগাযোগ করা হয়ে গিয়েছে। আর আমার সংশয়টাই সত্যি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর কারণ কার অ্যাক্সিডেন্ট নয়, হেড ইনজুরি। অর্থাৎ মাথায় আঘাত করে মিস্টার ঝিয়েনকে আগে মারা হয়েছিল, তারপর বডিটা ওখানে ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়।"

"কী সর্বনাশ! লিয়াংরা খবরটা পেয়েছে?"

"পেয়ে যাবে। কিংবা হয়তো পেয়ে গিয়েছেও।"

কুশল উত্তেজিতভাবে বলল, "কে করল খুন? ওই স্বপন দত্ত নিশ্চয়ই?"

"আশঙ্কা কম। লোকটার খুন করার মতো সাহস আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া মোটিভটাও তেমন জোরালো নয়। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটার মূল্য সম্পর্কে ধারণা থাকলে স্বপন দত্ত থোড়াই ওটাকে বেচত।... লোকটা লোভী... নেশাড়ু... তবে খুন..."

কুশল বলল, "কিন্তু মাসি, তুমিই তো বললে ও সেদিন প্রিন্সেপ ঘাটের কাছাকাছি ছিল।"

মিতিনের ঠোঁটে রহস্যের ঝিলিক, "তা ছিল। তবে গঙ্গার ধারে নয়। রেসের মাঠে। দশ হাজার টাকা পেয়ে, দোকান বন্ধ করে, রেস খেলতে চলে গিয়েছিল।"

টুপুর বিস্মিত গলায় বলল, "এত খবর তুমি জানলে কী করে?"

"ওহে মিস ওয়াটসন, কত বার বলেছি না, গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে চোখকান খোলা রাখতে হয়! স্বপন দত্তর কাউন্টারের কাচের নীচে রেসের বই পড়ে ছিল দেখেছিস? শৌখিন রেসুড়েরা বই কেনে না। যারা নিয়মিত যায়, তাদের কাছেই ওই বই থাকে। রেসুড়ে লোক শনিবার করকরে দশ হাজার টাকা পেলে দোকানটোকান শিকেয় তুলে আর কোথায়ই বা যেতে পারে! একে-একে দুই করে ওটা মিলিয়ে দিয়েছি। আর তাতে কেমন কাজও হল বল? হুড়মুড় করে পেটের কথা সব বেরিয়ে এল। আমি তো তা-ও অল্পেই ছাড়ান দিলাম, এর পর পুলিশ ওকে যা ভোগাবে! তুলে নিয়ে গারদে না পুরে দেয়।"

মিতিনের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসেছে টুপুর আর কুশল।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "এবার কোথায়? বাড়ি?"

সামনের সিটে বসে মুচকি হাসল মিতিন, "ধুৎ, সবে তো কলির সন্ধে। এখন আমরা যাব ঢাকুরিয়ায়।"

"তোমার বাড়ি?"

"না। বাসব সমাদ্দারের বাড়ি। আমাদের দাসপাড়ায়।"

"কাকে চাই?"

"মিস্টার বাসব সমাদ্দার... আই মিন, ডক্টর সমাদ্দার..."

"এখন দেখা হবে না। উনি কাজে বসেছেন।"

"একটা জরুরি দরকার ছিল যে।"

"কাল আসবেন। সকাল ন'টায়। পড়াশোনায় বসে গেলে উনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।"

কাজের মেয়েটি মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল, তার আগেই মিতিন চৌকাঠে পা গলিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটি রুক্ষ স্বরে বলল, "আপনারা জোর করে ঢুকবেন নাকি?"

"ধরো তাই," মিতিনের স্বরও কড়া, "গিয়ে বলো, আমরা থানা থেকে আসছি।"

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না মেয়েটির। তিন আগন্তুককে আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, "ভেতরে ঢুকবেন না। এখানেই দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস করে আসি।"

উঁকি দিয়ে বাইরের ঘরখানা দেখে নিল টুপুর। ভারী অগোছালো। কালচিটে হয়ে যাওয়া বেতের সোফা যেমন-তেমন ছড়িয়ে আছে, মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে বই, তক্তপোশের উপরও বইয়ের স্তূপ, জানলায় পাতলা পাতলা মলিন পরদা, দেওয়ালের কোনায় কোনায় ঝুল। কোনও অধ্যাপকের ঘর এমন ছ্যাতাপ্যাতা হয়?

কাজের মেয়েটি ফিরেছে। পিছনে কুচকুচে কালো গাঁট্টাগোট্টা

এক মানুষ। মাথার চুল ধবধবে সাদা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

দূর থেকেই হাঁক ছাড়লেন, "তোমরা পুলিশের লোক? ভাঁওতা দেওয়ার জায়গা পাওনি?"

মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "আমরা হাফ পুলিশ স্যার। আমি একজন ডিটেকটিভ।"

"অ। তা আমার কাছে কী মনে করে?"

"মিস্টার ঝাও ঝিয়েনের ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসেছিলাম।"

"তার ব্যাপারে আবার কী কথা? সে তো মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।"

কী কর্কশ লোক রে বাবা! এরকমভাবে কেউ মৃত মানুষ সম্পর্কে বলে?

মিতিনের অবশ্য হেলদোল নেই। নরম করেই বলল, "মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুটা তো আনন্যাচারাল, তাই..."

"জানি। গাড়িচাপা পড়েছে। সবসময় যে লোক ভাবের ঘোরে থাকে, তার এই পরিণতিই হয়।"

"ভাবের ঘোরে মানে? উনি তো যথেষ্ট সাবধানি লোক ছিলেন!"

"তা হবে। আমি তো দেখতাম, সর্বদা আজব আজব থিয়োরিতে বুঁদ হয়ে আছে। অ্যাদ্দিন ধরে হিস্টোরিয়ানরা, অ্যানথ্রোপলজিস্টরা, যা বলেছে সবই নাকি ভুল। দুনিয়ায় সব কিছু নাকি চিনেরাই আগে করেছে। হ্যাঃ, যত্ত সব।"

"আমি মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্কেই আর-একটু ডিটেলে জানতে এসেছিলাম।"

"যা বলার তা তো বলেই দিলাম। আর কিছু জানি না।"

"তবু স্যার... আপনারা তো একসঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসতেন..."

"একসঙ্গে নয়। আমি গেলে ও ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে থাকত।"

"আপনার সঙ্গে মিস্টার ঝিয়েনের কদ্দিনের পরিচয়?"

"বছর দু'য়েক। আমেরিকার কোথায় কারা প্রথম কলোনি বানিয়েছিল, তাই নিয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা লেকচার ছিল, সেখানেই ও যেচে এসে আলাপ করে।" বাসব সমাদ্দারের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, "প্রথমে ভেবেছিলাম জ্ঞানপিপাসু। পরে দেখলাম, ট্যাড়া বাঁশ। নিজের মত থেকে এক চুল নড়বে না, এবং অন্যকেও সেটা মানাতে চাইবে।"

"শুনছিলাম উনি নাকি প্রায়ই রাতে আপনাকে ফোন করতেন?"

"বাজে কথা। মাঝে মাঝে করত। আমি ওকে সাফ বলে দিয়েছিলাম, তোমার চিনে অহমিকা তুমি ছাড়ো, নচেৎ আমার কাছে আর ভেড়ার চেষ্টা কোরো না।"

"উনি কি আপনাকে একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিংয়ের ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?"

"যত্ত সব গুলগাপ্পি। আমি ওর কথা বিশ্বাসই করিনি।" শুভ্র চুলে আঙুল চালাচ্ছেন বাসব সমাদ্দার। হঠাৎই কটকট করে তাকালেন, "অ্যাই, এবার তোমরা যাও তো। ফালতু বকবক করার সময় আমার নেই।"

"বি পেশেন্ট ডক্টর সমাদ্দার।" মিতিনও ফের গলা রুক্ষ করেছে, "আপনাকে একটা কথা বলে রাখা দরকার। মিস্টার ঝিয়েন কিন্তু অ্যাকসিডেন্টে মারা যাননি, ওঁকে মার্ডার করা হয়েছে। ওঁর চেনাপরিচিত সকলকেই আমরা সন্দেহের তালিকায় রেখেছি। আপনিও কিন্তু তার বাইরে নন।"

কীমাশ্চর্যম্, বাসব সমাদ্দার হঠাৎই শান্ত হয়ে গেলেন। তাঁর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। ঠান্ডা গলায় বললেন,

"তা হলে তো আমি আর একটি কথাও বলব না। তোমরা এসো।"

মিতিনও ছাড়ার পাত্রী নয়। ততোধিক শীতল গলায় বলল, "তার মানে আপনি আরও কিছু বলতে পারতেন?"

বাসব সমাদ্দার পিছন ঘুরে ভারী পায়ে ভিতরে চলে গেলেন। যেতে যেতেই বললেন, "রত্না, দরজায় ছিটকিনি তোল। আর কোনও টিকটিকি-গিরগিটি যেন আমায় বিরক্ত করতে না পারে।"

একতলা বাড়িটার বাইরে এসে টুপুর ঝেঁঝে উঠল, "কী অভদ্র লোক রে বাবা! একটু বসতে পর্যন্ত বলল না!"

কুশল আহত গলায় বলল, "লোকের বাড়ি গেলে অন্তত এক গ্লাস জল তো খাওয়ায়!"

মিতিন বলল, "সহবতজ্ঞান নেই। তবে লোকটা ইন্টারেস্টিং। টুকুস টুকুস করে কিছু খবর তো বের করা গেল।"

"সেটাও বললেন কী রেগে রেগে!"

"রাগের অনেকটাই লোক দেখানো। ইচ্ছেমতো স্নায়ু কন্ট্রোল করার ক্ষমতা আছে প্রোফেসর সাহেবের। এই ধরনের মানুষরা সাংঘাতিক ক্লেভার হয়। ইনি মিস্টার ঝিয়েনকে সমাধি দেওয়ার দিন গিয়েছিলেন না?"

কুশল গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, "হ্যাঁ। লিয়াংরা তো তাই বলল।"

"বোঝ তা হলে। একদিকে কথা শুনে মনে হচ্ছে, মিস্টার ঝিয়েনের নাম শুনতে পারেন না, ওদিকে তাঁর ফিউনারালে প্রেজেন্ট!"

টুপুর ফুট কাটল, "ওঁকে কিন্তু আর-একটু টোকা দিয়ে দেখলে পারতে, মিতিনমাসি।"

"হুম্। কিন্তু এখন যে পেটে ইঁদুররা টোকা দিচ্ছে রে। চল, আমার বাড়িতে গিয়ে আগে খাওয়াদাওয়াটা সারি।"

"কী মেনু গো?"

"দিশি মোরগের ঝোল, আর ভাত।"

কুশল সিটে বসেই লাফিয়ে উঠল, "ওয়াও!"

একটু তাড়াতাড়িই সন্ধে নেমেছে আজ। দুপুর পর্যন্ত দিব্যি রোদ ছিল, তারপর আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। তড়িঘড়ি গা ঢাকা দিয়েছেন সূর্যদেব। তাপ এখন অনেক কম। বাতাসে যেন কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব।

সারাদিন চটচটে গরমের পর বাতাসটা ভালই লাগছিল টুপুরের। সিটে হেলান দিয়ে বলল, "মিতিনমাসি, এবার কি সিমলাইপাড়া?"

মিতিনের চোখ জানলার বাইরে, গভীর মনোযোগে ভাবছিল কী যেন। হাল্‌কাভাবে বলল, "হুঁ।"

কুশল সামনের সিটে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, "তরুণ বসুকে তোমার কেমন লাগল, মিতিনমাসি? ডক্টর সমাদ্দারের একেবারে উলটো টাইপ না?"

মিতিন নিচু স্বরে বলল, "হুঁ, খুবই ঠান্ডা মানুষ।"

টুপুর বলল, "একটু বেশিই ঠান্ডা। তবে আঙ্কল ঝিয়েনের মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত।"

কুশল বলল, "ওঁর কাছে যাওয়াটা কিন্তু বেকার হল। আঙ্কল ঝিয়েনের ব্যাপারে নতুন কিছুই জানা গেল না। ... আপ্যায়নটা অবশ্য মন্দ হয়নি।"

"ওয়ালহ্যাঙ্গিংয়ের ব্যাপারে একটা পয়েন্ট কিন্তু পাওয়া গিয়েছে।"

"কী বলো তো?"

"যা বাবা, এর মধ্যে ভুলে গেলি? মিষ্টি সাঁটানোর সময় তোর কি কোনও দিকে মন থাকে না?"

"অ্যাই, আওয়াজ দিস না। তুইও দুটো সন্দেশ, একটা রসগোল্লা খেয়েছিস। সেটাও নেহাত কম নয়।"

"তুইও খা না যত খুশি, আনমাইন্ডফুল হোস কেন?" টুপুর গলা নামাল, "তরুণবাবু বলছিলেন, স্বপন দত্তর কাছ থেকে কালেক্ট করা নামটা নাকি রিয়েল হতেও পারে। ওই নামে একজন শিল্পী নাকি সত্যিই ছিলেন। ফিফটিন্থ সেঞ্চুরিতে। চিনে তখন মিং বংশের রাজত্ব চলছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উনি আর-একটা কথাও বললেন। গবেষকরা নাকি অনেক সময় ফেক জিনিসকে মূল্যবান বলে ভুল করেন। ইতিহাসে তো নাকি আকছার এরকম ঘটনা ঘটছে।"

কুশল সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "তার মানে ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাও জালি নাকি?"

"কী জানি, উনি তো ওয়ালহ্যাঙ্গিংটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলেন বটে, আঙ্কল ঝিয়েনের খুন হওয়ার সূত্র নির্ঘাত চিনে পাড়াতেই লুকিয়ে আছে।"

"তা হলে তো মহা মুশকিল। লিয়াংয়ের রিলেটিভদেরও ধরে ধরে জেরা করতে হয়। কেসটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেশ জটিল হয়ে যাচ্ছে!"

ভাড়াগাড়ি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ধরে উত্তরমুখো ছুটছে। এবার ভি-আই-পি রোডে পড়ে, লেকটাউন ভেদ করে, ঢুকবে পাইকপাড়ায়। সিমলাইপাড়া লেন নাকি পাইকপাড়ায়, মিতিনমাসি চেনে।

কুশল বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারে না। আপন মনেই বলে উঠল, "তরুণবাবু কিন্তু বেশ মালদার। কী ঘ্যামা ফ্ল্যাট, দারুণ সাজানো ড্রয়িংরুম, ওয়ালে প্লাজ়মা টিভি... বাসব সমাদ্দারের বাড়ির সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাত।"

টুপুর সায় দিল, "তরুণবাবুর গাড়িটাও বিদেশি। রংটা কী সুন্দর! হাঁসের ডানার মতো ধবধবে সাদা!"

"গাড়ি তুই কখন দেখলি?"

"আশ্চর্য, তুই কি অন্ধ নাকি? আমরা রওনা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তো উনিও বেরোলেন। আমাদের গাড়ির পাশ দিয়েই গেলেন। নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। পাশে মিসেস।"

"মনে হয় খানদানি বড়লোক। এখনও ওল্ড বালিগঞ্জে এরকম বনেদি পরিবার অনেক আছে। তাই না মিতিনমাসি?"

অনেকক্ষণ পর মিতিনের গলা পাওয়া গেল, "তোদের দেখছি তরুণবাবুকে খুব পছন্দ হয়েছে!"

"স্বাভাবিক। কী ভদ্র ব্যবহার... এতটুকু অহংকার নেই," টুপুরের স্বরে মুগ্ধতা, "তুমিই বলো, তরুণবাবু তো বাসববাবুর চেয়ে কম পণ্ডিত নন... কিন্তু কোনও খিটকেলপনা করলেন কি?"

"হুম্।"

"তারপর ধরো, সামনের মাসেই উনি বিদেশে সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন। অথচ সে খবরটাও কত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন।"

"ঠিক।"

"একটা কথা বলি, মিতিনমাসি?" কুশল গলা ঝাড়ল, "আমার মনে হয়, তরুণবাবুর অ্যাডভাইসই আমাদের শোনা উচিত। লিয়াংদের পরিবারের মধ্যেই বোধহয় কোনও গন্ডগোল আছে। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাসে পড়েছিলাম, এক চিনা পরিবারেরই কোনও জ্ঞাতিভাই তিন পুরুষ আগের ঝগড়ার ঝাল মেটাতে..."

"আমি কোনও আশঙ্কাই উড়িয়ে দিচ্ছি না, কুশল। মিস্টার ঝিয়েনের স্কুলেও একবার আমাদের যেতে হবে। যত বেশি ডেটা হাতে আসবে, সত্যের কাছে পৌঁছোতে তত সুবিধে। তবে আপাতত এখন শিবতোষ রায়কে তো মিট করে আসি।"

সিমলাইপাড়ায় এসে শিবতোষ রায়ের বাড়ি খুঁজতে কোনও সমস্যাই হল না। পাড়ার সবাই তাঁকে চেনে। একজনকে জিজ্ঞেস করেই পৌঁছোনো গিয়েছে গন্তব্যস্থানে।

শিবতোষ রায় বাড়িতেই ছিলেন। মিতিনদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বাসববাবুর বাড়িতে অভ্যর্থনার বহর দেখে মিতিন আর ঝুঁকিতে যায়নি, আগেই ফোনে সময় চেয়ে নিয়েছিল শিবতোষবাবুর কাছ থেকে। বেল বাজাতে তিনি নিজেই দোতলা থেকে নেমে দরজা খুলেছেন।

মিতিন হাত জোড় করে নমস্কার করল ভদ্রলোককে। স্মিত হেসে শিবতোষবাবু বললেন, "আমি কিন্তু আপনাকে একটু একটু চিনি।"

"কীভাবে?"

"আপনার একটা কেস ডিটেকশন কাগজে খুব মন দিয়ে পড়েছি। সেই যে... শ্বশুর পুত্রবধূকে টাকার জন্য ব্ল্যাকমেল করত..."

"সে তো প্রায় চার বছর আগের ঘটনা। আপনার মনে আছে?"

"সাল, তারিখ, নাম, ঘটনা... এসব মনে রাখাই তো আমাদের পেশা। ...আসুন ...ভেতরে আসুন।"

একতলাতেই ড্রয়িংরুম। বাসববাবুর মতো অগোছালোও নয়, আবার তরুণবাবুর মতো ঘ্যামচ্যাকও নয়, ছিমছাম। ঘরের আসবাব পুরনো ধাঁচের হলেও পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে গাঁথা কাচের আলমারিতে শুধু ইতিহাসের বই নয়, রবীন্দ্র-বঙ্কিম-শরৎ রচনাবলিও দৃশ্যমান।

টুপুররা সোফায় বসতে না-বসতেই শরবত এসে গেল।

শিবতোষবাবু বসেছেন টুপুরদের উলটো দিকে। বয়স বড়জোর বছর পঞ্চাশ। রোগা, লম্বা চেহারা, গায়ের রং তামাটে। সরু একখানা গোঁফও আছে, শুঁয়োপোকার মতো। মিতিনদের শরবত শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভদ্রলোক, গ্লাস খালি হতেই বললেন, "বলুন ম্যাডাম, কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?"

মিতিন ঝুঁকে বসল, "ফোনেই তো বললাম... মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।"

শিবতোষবাবু দু'-এক সেকেন্ড চোখ বুজে থেকে বললেন, "আমার সঙ্গে ঝিয়েনের আলাপ বছর পাঁচেক আগে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আমি কুবলাই খাঁ'র উপর একটা বই খুঁজছিলাম। পাচ্ছিলাম না। রোজই শুনতাম কে একজন যেন ইসু করে নিয়ে রিডিংরুমে চলে গিয়েছে। খুঁজে খুঁজে দেখি, ঝিয়েন। বইটাকে ও

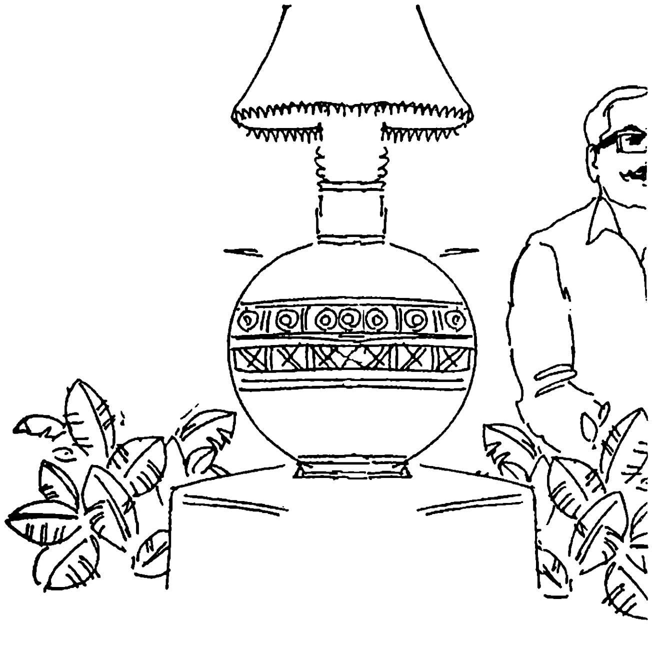

নিজের কাজের রেফারেন্স হিসেবে ইউজ় করছিল। সেদিন থেকেই পরিচয়। আমাদের দু'জনেরই গবেষণার বিষয়ে বেশ লিঙ্ক ছিল, তাই মোটামুটি জমেও গেল।"

"আপনি কী নিয়ে কাজ করছেন?"

"বর্তমানে আমার বিষয়, চিনের উপর বিদেশি আক্রমণের প্রভাব। টাইম টু-টাইম, বহু বহিরাগতই তো চিন আক্রমণ করেছে... তাতে চৈনিক সংস্কৃতির উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে..."

"আর মিস্টার ঝিয়েন?"

"চিনারা কীভাবে বহির্বিশ্বে ছড়িয়েছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ঝিয়েন অনেক ভাল ভাল তথ্য জোগাড় করেছিল। যত্ন করে সিস্টেমেটিক্যালি কম্পাইল করত। অত্যন্ত সিনসিয়ার। ভারী বিদ্যানুরাগী। অ্যাকাডেমিক্যালিও খুব সাউন্ড ছিল তো।"

"মিস্টার ঝিয়েন তো পিএইচডি, টিএইচডি করেননি?"

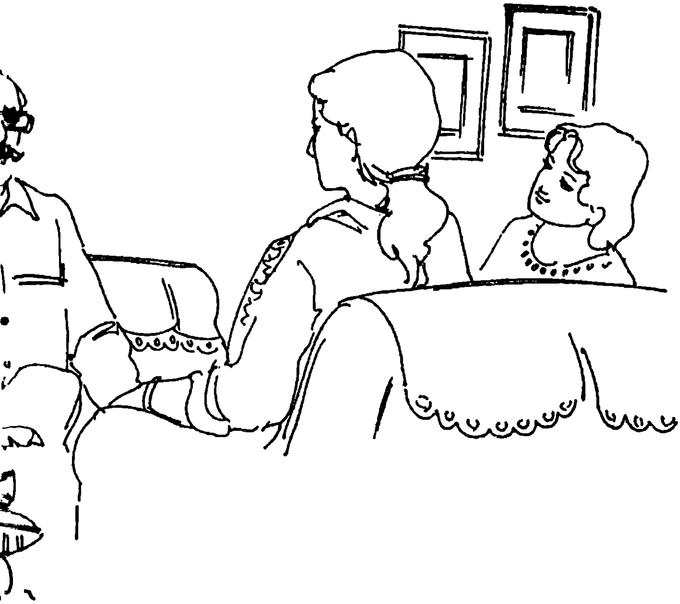

"ডিগ্রিফিগ্রির ওপর ওর আগ্রহই ছিল না। থাকলে তো কবেই ডক্টরেট হয়ে যেত। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে অত ভাল মার্ক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন, এম-এ'তে হিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস... এরকম ছাত্র পেলে তো যে-কোনও গাইড লুফে নিত। প্রথাগত গবেষণায় না-গিয়েও ঝিয়েন অবশ্য কাজ করে যাচ্ছিল। একটা ব্যাপার তো ঝিয়েন প্রমাণই করে দিয়েছে। ইউরোপিয়ানরা চিনাদের যে ইতিহাস তৈরি করেছে, তা একেবারেই অসম্পূর্ণ এবং অনেকটাই ভুল।"

"যেমন?"

"যেমন, নেভিগেশন বা জলপথে চলাচলের ব্যাপারটায় চিনারা ইউরোপিয়ানদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। তার নিখাদ প্রমাণ হল, নৌকোর সাইজ়। ইউরোপের বিখ্যাত নৌ অভিযাত্রীদের নৌকো যেখানে তিরিশ ফিট থেকে মেরেকেটে চল্লিশ, সেখানে চিনারা একশো ফিটের চেয়ে বড় নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ঘুরত। অবশ্য পাল বাঁধার ব্যাপারটা চিনারা খুব ভাল জানত না। তবে দিকনির্ণয়ে ওদের ভুলচুক হত না কোনও। ইউরোপিয়ানরা তো প্রমাণ করতে চান, পৃথিবীটাকে ওঁরাই সভ্য করেছেন। কথাটা যে কত ভুল..."

শিবতোষবাবু কথা শুরু করলে আর থামতেই চান না। মিতিন তাঁকে কোনওক্রমে রুখল। বলল, "আচ্ছা, সম্প্রতি মিস্টার ঝিয়েন একটা ওয়ালহ্যাঙ্গিং কিনেছিলেন। আপনি কি সে ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"ওই বস্তুটি কেনার পরেই তো মিসহ্যাপটা ঘটল, এবং দুর্ভাগ্যবশত জিনিসটাও লোপাট। খুব ক্ষতি হয়ে গেল... খুব ক্ষতি হয়ে গেল..."

"কেন?"

"ওটা আসলে কী জানেন? মো-ই-টং-এর আঁকা ম্যাপ। মিং ডাইনেস্টির সেই ফেমাস আর্টিস্ট..."

"তরুণবাবুও বলছিলেন উনি খুব বিখ্যাত শিল্পী..."

"তরুণ তো জানবেই। তরুণ তো ঝিয়েনের লাইনেই কাজ করছে। ইস, ওই ম্যাপটা হাতে থাকলে কত দিনের একটা মিথ্যে প্রচার যে নস্যাৎ করা যেত!"

টুপুর হতভম্ব মুখে বলে উঠল, "ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা শুধুই একটা ম্যাপ?"

"মোস্ট প্রবাবলি। ঝিয়েন ভুল করার লোক নয়। ইস, ম্যাপটা আমার আর দেখা হল না।"

"ওটা কীসের ম্যাপ ছিল স্যার?"

"পৃথিবীর।"

এবার মিতিনও স্তম্ভিত। অস্ফুটে বলল, "মানে?"

"এককথায় বলা কঠিন। বলা যেতে পারে, ওটাই গোটা পৃথিবীর প্রথম অথেন্টিক মানচিত্র।"

"ঠিক বুঝলাম না, স্যার।"

"তা হলে একটু ইতিহাসে ঢুকতে হয়।... থারটিন্থ সেঞ্চুরিতে চেঙ্গিস খাঁর নাতি কুবলাই খাঁ চিন দখল করেছিল। তাদের হটিয়ে প্রায় একশো বছর পর মিংদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিংদের আমলকে বলা হয় চিনের স্বর্ণযুগ।"

কুশল বলল, "জানি। ওই সময় চাইনিজ় ওয়াল তৈরি হয়েছিল।"

"আরও অনেক কিছুই হয়েছিল। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সবেতেই তখন চিনের রমরমা। মিং রাজত্ব প্রতিষ্ঠার একশো বছর পরে এক বিখ্যাত চিনা অভিযাত্রীর জন্ম হয়। সালটা তেরোশো একাত্তর। তাঁর নাম মা-সান-পাও। ইতিহাস তাঁকে জানে অ্যাডমিরাল জেং নামে। শৈশব থেকেই বেচারা অনাথ। বড় হয়ে তিনি হলেন রাজা ইয়ং-লোর এক সৈনিক। রাজা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। নৌযোদ্ধা হিসেবে তাঁর খুব নাম হয়েছিল বলে রাজা

তাঁকে নৌবাহিনীর বড় পদে বসান। তারপর হঠাৎই একদিন হুকুম দেন, তোমাকে আর যুদ্ধটুদ্ধ করতে হবে না, তুমি চিনের প্রতিনিধি হয়ে দেশে দেশে ঘোরো, আর পারলে নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বের করো। ...তারপর থেকে শুরু হল জেংয়ের নৌঅভিযান। একবার নয়, সাত-সাত বার বেরিয়েছিলেন তিনি। প্রথম বার গিয়েছিলেন মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে। সঙ্গে ছিল বাষট্টিটা জাহাজ আর সাতাশ হাজার আটশো মতো অনুচর।"

"আরিব্বাস!" কুশলের চোখ কপালে, "এটাই তো একটা নৌবহর।"

"বলতে পারো। প্রথমবার জেং গিয়েছিলেন ভিয়েতনাম, মালাক্কা, জাভা, শ্রীলঙ্কা। ...আমাদের কোচিন-কালিকটেও এসেছিলেন। ভাস্কো-দা-গামার তিরানব্বই বছর আগে। সেই জেং-ই তাঁর ষষ্ঠ অভিযানের সময় আফ্রিকাটাফ্রিকা পেরিয়ে, অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে, পৌঁছেছিলেন আমেরিকায়। চোদ্দোশো একুশ সালে। আমরা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের গল্প শুনি। কলম্বাস কিন্তু তখনও জন্মাননি।"

টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বলছেন কী স্যার? কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেননি?"

"আমেরিকা আবার আবিষ্কার করার কী আছে? আমেরিকা বলে দেশটা তো ছিলই। সেখানে অন্তত তিরিশ হাজার মানুষ থাকত। ইনকা, আজটেকের মতো উন্নত সভ্যতা ছিল সেখানে। শুধু তাই নয়, ভাইকিংরা... মানে যারা ইউরোপের উত্তর দিকে থাকত... প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা... জলদস্যু হিসেবে যাদের খুব বদনাম ছিল... তারাও কলম্বাসের আগে আমেরিকা গিয়েছিল। কলম্বাসকে অকারণে হিরো করা হয়েছে। যাই হোক, ওই মো-ই-টং ছিলেন জেং-এর সঙ্গী। ম্যাপ আঁকার কাজে দারুণ তুখোড় ছিলেন মো। তিনি দেশে দেশে ঘুরতে

ঘুরতে আস্ত একখানা ম্যাপ বানিয়ে ফেলেছিলেন পৃথিবীর। অবশ্য ফু শাংয়ের বানানো মানচিত্র তাঁকে হেল্প করেছিল।”

“ফু শাং নামটা শুনেছি না?” টুপুর কুশলের দিকে তাকাল, “মেইলি বলছিল না?”

“হ্যাঁ তো।” কুশল ঢকঢক ঘাড় নাড়ল। শিবতোষবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “ফু শাং কে স্যার?”

“তিনিও এক জলের পোকা। তিনি সমুদ্রে চক্কর খেয়েছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। চিনে ফু শাংকে একজন প্রাবদপুরুষ বলে মানা হয়।”

টুপুর বলল, “বেশ তো, এসব নয় বুঝলাম। কিন্তু ম্যাপটা আমাদের দেশে এল কীভাবে?”

“বলা খুব কঠিন। ইন ফ্যাক্ট, ম্যাপটা তো থাকারই কথা নয়।”

“কেন?”

“সে আর-এক ইতিহাস। ষষ্ঠ বার সমুদ্র অভিযান শেষ করে জেং যখন দেশে ফিরলেন, তখন রাজা ইয়ং লো মারা গিয়েছেন। নতুন রাজা হয়েছেন হুং শি। তিনি সিংহাসনে বসার পর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। হঠাৎ একদিন বাজ পড়ে রাজপ্রাসাদ চৌচির। রাজার মন্ত্রণাতাদারা তখন রাজামশাইকে বোঝাল, ওই সমুদ্র অভিযানই নাকি যত নষ্টের গোড়া। ওই জন্যই নাকি বজ্রের দেবতা কুপিত হয়েছেন। ব্যস, যায় কোথায়, অমনই রাজা জেংয়ের উপর চটে লাল। ফের সমুদ্রে যাওয়া তো বন্ধ হলই, জেংয়ের কাছ থেকে সব কাগজপত্র, নথিটথি, কেড়ে নিয়ে রাজামশাই জ্বালিয়ে দিলেন। ওই ম্যাপটাও তখনই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা। তবে মো ছিলেন ধুরন্ধর, বিপদের গন্ধ পেয়ে আগে ভাগে সরিয়ে ফেলেছিলেন ম্যাপটা। তারপর থেকে ওটা লুকোনোই ছিল। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পর ওই মো-র বংশধররাই ম্যাপটার গোটা চার-পাঁচ কপি

করান। যাতে ভবিষ্যতে মানচিত্রটা নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়। সম্ভবত ঝিয়েনের কেনা মানচিত্রখানা ওই কপিগুলোরই একটা।"

শিবতোষবাবু থামলেন। মিতিন নিশ্চুপ হয়ে শুনছিল, হঠাৎই তার স্বর ফুটেছে, "হুম্, এটা খুবই সম্ভব। মোটামুটি ওই সময় থেকেই তো বেঙ্গলে চিনারা আসতে আরম্ভ করে। তাদের কেউই হয়তো নিয়ে এসেছিল ম্যাপখানা।"

"হয়তো নয়, তাই হয়েছে।" শিবতোষবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, "ঝিয়েন আমাকে জিনিসটার যা বর্ণনা দিয়েছিল..."

কথায় ব্যাঘাত ঘটল। শিবতোষবাবুর স্ত্রী এসেছেন দরজায়। বললেন, "গ্যারাজের লোক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। গাড়ি রঙের কাজ শেষ। পেমেন্ট দিতে হবে।"

শিবতোষ সামান্য অসন্তুষ্ট মুখে বললেন, "তুমিই চেক কেটে দাও না।"

"রং-টা একবার দেখে নেবে না?"

"দরকার নেই। তুমি তো দেখেছ।"

স্ত্রী দরজা থেকে সরে যেতেই আবার সৌম্য ভাব ফুটেছে শিবতোষবাবুর মুখে। হাসিহাসি মুখে টুপুরদের বললেন, "তোমাদের একটা ভাল হিস্ট্রির ক্লাস হয়ে গেল, কী বলো?"

কুশলের ঘাড় পেন্ডুলামের মতো দুলছে, "সে তো বটেই।"

মিতিন বলল, "তা হলে স্যার, বোঝা যাচ্ছে, ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা ছিল খুবই মূল্যবান। যার জন্য একটা মানুষ খুনও হয়ে যেতে পারেন?"

"অবশ্যই। জিনিসটার দাম টাকায় মাপা যাবে না।" বলেই শিবতোষবাবুর চোখ পিটপিট, "হঠাৎ খুনের কথা বললেন কেন? তবে কি ঝিয়েনের মৃত্যুটা...?"

"হ্যাঁ স্যার। মিস্টার ঝিয়েনকে মেরে ফেলা হয়েছে।"

"ও নো।" শিবতোষবাবু দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। মিনিটখানেক পর

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়েছেন। বিড়বিড় করে বললেন, "আমার বোঝা উচিত ছিল... আমার বোঝা উচিত ছিল। জিনিসটা যখন উধাও হয়েছে, তখনই তো..."

শিবতোষের স্বর আটকে গেল। গোটা ঘর নিঝুম, মাথার উপর ফ্যান ঘোরার আওয়াজটাই যা শোনা যাচ্ছে শুধু।

মিতিন নীরবতা ভাঙল, "ভেঙে পড়বেন না স্যার। যা ঘটার তা তো ঘটেই গিয়েছে। এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। নিশ্চয়ই আপনি চান কালপ্রিট ধরা পড়ুক।"

শিবতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "বেচারা ঝিয়েন। পুয়োর সোল।"

"আরও একটা-দুটো প্রশ্ন করি স্যার? আপনার সঙ্গে মিস্টার ঝিয়েনের লাস্ট কবে দেখা হয়েছিল?"

"অ্যাকসিডেন্টের আগের দিনই।"

"কোথায়?"

"ইউনিভার্সিটিতে। আমার রুমে। ও তো ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসতই, তখন উলটো দিকে আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টেও একবার ঢুঁ মেরে যেত। ...সেদিন ঝিয়েন অসম্ভব এক্সাইটেড ছিল। বলছিল, সোমবার দিনই আমাকে জিনিসটা দেখিয়ে যাবে।

"কত টাকায় জিনিসটা উনি কিনেছিলেন, আপনি জানেন?"

"এগজ়াক্ট অ্যামাউন্ট বলতে পারব না। তবে ও বলেছিল, জলের দরে।"

"আর-একটা প্রশ্ন। ডক্টর বাসব সমাদ্দার... ডক্টর তরুণ বসু... এঁদের তো আপনি চেনেনই। এঁরা মানুষ হিসেবে কেমন?"

শিবতোষবাবুর চোখ সরু হল, "ঠিক কী জানতে চাইছেন বলুন তো?"

"তা হলে স্পষ্ট করেই বলি। আপনার কি মনে হয়, ওই

মহামূল্যবান জিনিসটার জন্য এঁরা কেউ... কোনও ভাবে... মিস্টার ঝিয়েনকে... ?”

“কী যে বলেন আপনি! তা হলে তো আমাকেও সন্দেহ করতে হয়।”

“ধরুন করছি,” মিতিন হাসল, “এবার বলুন।”

“দেখুন, এঁরা দু’জনেই বিদ্বান মানুষ। ইতিহাসবিদ হিসেবে এঁদের নামও আছে। এঁদের মধ্যে তরুণ খুব মেথডিক্যাল, অ্যাম্বিশাস...”

“আর বাসববাবু?”

“আই ওন্ট কমেন্ট।”

“কেন?”

“উনি একটু পিকিউলিয়ার। মাঝে মাঝেই উলটোপালটা কাণ্ডকারখানা করে বসেন। এই কেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, তবু বলি... উনি একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বইয়ের পাতা কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, ব্যাপারটা থানা-পুলিশ অবধি গড়িয়েছিল।”

“লাস্ট কোয়েশ্চেন ...মিস্টার ঝিয়েন হঠাৎ প্রিন্সেপ ঘাটে কেন গিয়েছিলেন, সে-ব্যাপারে কোনও আইডিয়া করতে পারেন?”

শিবতোষ রায় স্থির চোখে তাকালেন, “না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।”

পরদিন বিকেলে টুপুর সবে স্কুল থেকে ফিরেছে, কুশল লাফাতে লাফাতে উপস্থিত। চকচকে চোখে বলল, "এই জানিস, মিতিনমাসির আন্দাজই ঠিক।"

টুপুর ভারিক্কি মুখে বলল, "মিতিনমাসি কখনওই ভুলভাল গেস করে না।"

"তাই তো দেখছি। লিয়াংরা সত্যিই কাল খবর পেয়ে গিয়েছে। পুলিশ কাল বিকেলেই লিয়াংয়ের বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে আঙ্কল ঝিয়েনের মৃত্যুটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, হোমিসাইড।"

"লিয়াংরা তো আগেই সন্দেহ করেছিল। পুলিশ তো জাস্ট কনফার্ম করল।"

"তা ঠিক। তবে ওর বাবা নাকি একদম গুম হয়ে গিয়েছেন। কারও সঙ্গে কথাই বলছেন না।"

"ওরকম হয়। সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণ হলে একটা বড় ধাক্কা তো লাগেই ...লিয়াংকে আমাদের কালকের কথাগুলো বললি?"

"হুঁ।"

"শুনে কী রিঅ্যাকশান?"

"বোঝা গেল না। ওর মুখে তো সহজে এক্সপ্রেশন ফোটে না। তবে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। তোর কী মনে হয় রে? কাল অত ঘোরাঘুরি করে কোনও লাভ হল?"

"জ্ঞান বাড়ল। ডেটা জমল।"

"কাজের কাজ কিছু হল কী?"

"নিশ্চয়ই হয়েছে। মিতিনমাসি মিছিমিছি ছোটাছুটি করে না।"

"তার মানে কাল যাদের মিট করলাম, তারা যে-কেউ কালপ্রিট হতে পারে?" কুশল নাক কুঁচকোল, "অবশ্য একটা ডিটেকটিভ বইয়ে পড়েছিলাম, একজন প্রোফেসর রাত্তিরবেলা একদম বদলে যেত। তখন সে ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, সব কিছু করতে পারত। হয়তো ওই তিনজনের মধ্যে একজন ওরকম দু'মুখো মানুষ!"

"হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। তবে ওঁদের সঙ্গে বাতচিত করে একটা তো লাভ হয়েছে। ওয়ালহ্যাঙ্গিংটা যে একটি মহামূল্যবান বস্তু সেটা তো জানা গেল। আর ওটা কেনার পরে মৃত্যু, মানে ওটা কেনার জন্যেই মৃত্যু। এবং ওটা খোওয়া যাওয়াও কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। মোটিভ ইজ় ক্লিয়ার। এবার শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে তোলার অপেক্ষা।"

"অত সোজা নয় রে টুপুর। এখনও মিতিনমাসিকে প্রচুর দৌড়োতে হবে। আঙ্কল ঝিয়েনের স্কুল আছে। তাঁর সহকর্মীদের কে কেমন আমরা জানি না..."

"কিন্তু তারা কি কেউ জিনিসটার দাম জানে? গুরুত্ব বোঝে?"

অবনী উঁকি দিয়েছেন টুপুরের ঘরে। সদ্য কলেজ থেকে ফিরেছেন, এখনও পোশাক বদলাননি। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "কী-ই, তোমাদের চাইনিজ়-পাজল কদ্দুর? একটাও গিঁট খুলল?"

কুশল বলল, "না মেসোমশাই। সুতো টানাটানি চলছে।"

"এবং গিঁট আরও শক্ত হচ্ছে। তাই তো?" অবনী ঢুকে পড়লেন ঘরে, "আমি কিন্তু তোমাদের কেসে খানিকটা হেল্প করতে পারি।"

"কীভাবে?"

"তোমরা তো কাল জেনে এলে কিউরিও শপের মালিকের কোনও পূর্বপুরুষ নাকি এক চিনেম্যানের কাছ থেকে ওয়ালহ্যাঙ্গিং...

থুড়ি, ম্যাপটা পেয়েছিল। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, লোকটা এই কথাটা অন্তত মিথ্যে বলেনি।"

টুপুর বলল, "কোন যুক্তিতে বলছ?"

"কারণ, বজবজের দিকটায় সত্যিই একসময় চাইনিজ় কলোনি ছিল। প্রপার বজবজ নয়, তার কাছাকাছি। জায়গাটার নাম এখন অছিপুর। এই অছিপুর নামটা কীভাবে হয়েছিল জানিস? আজ থেকে প্রায় সওয়া দুশো বছর আগে আৎসু নামে এক ক্যান্টনি চিনা জাহাজভরতি চা নিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিল। পথে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ সরতে-সরতে এসে পড়ল বজবজের গঙ্গায়। জাহাজ গিয়েছে ভেঙে, তাই আৎসুকে বজবজেই নামতে হল। একেবারে অচেনা জায়গা, অজানা ভাষা... আৎসুর তো মাথা খারাপ হওয়ার দশা। তবে জায়গাটা ওর খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তা তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির গভর্নর জেনারেল। আৎসু তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চা-টা খাওয়াল, নিজের অবস্থাটা বোঝাল। হেস্টিংস তো চা খেয়ে বেজায় খুশি। আৎসুকে একটা ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'এক ঘণ্টায় যতটা জায়গা বেড় দিয়ে আসতে পারবে, সবটাই তোমার।' ব্যস, জমিজমা পেয়ে আৎসু থেকেই গেল। বজবজের কাছে একটা চিনির কারখানা খুলেছিল আৎসু। চিনে তখন ঘোর দুঃসময়, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, দাঙ্গা লেগেই আছে। আৎসু সুযোগ বুঝে চিন থেকে সস্তায় লেবার আনতে শুরু করল চিনির কলে। ওই চিনিকল ঘিরেই তৈরি হল আৎসুপুর। চিনা মহল্লা। সেই আৎসুপুরই মুখে মুখে অছিপুর।"

কুশল বলল, "কিন্তু ওদিকে কি এখন আর চিনা আছে? শুনি না তো?"

"যারা ছিল, তাদের বংশধররা সবাই এখন কলকাতায়। আৎসুর চিনিকলটা তো চলেনি। পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যে আৎসুও মারা গেল,

চিনিকলও ডকে উঠল। আর ওখানকার চিনারাও ধীর ধীরে সরে এসে ডেরা বাঁধল কলকাতায়। ...মনে হয় ওই আৎসুর সময়েই, কিংবা তার দশ-বিশ বছর পরে, কিউরিও শপের মালিকের পূর্বপুরুষের কপালে জুটেছিল ওই ম্যাপখানা। কিউরিও শপের মালিক এত ইতিহাস জেনে, সেইমতো সাজিয়েগুছিয়ে মিথ্যে বলবে — অসম্ভব।"

টুপুর বলল, "আমারও ওর কথার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই বলছে।"

অবনী হেসে বললেন, "আমার এই ইনফরমেশনটা তা হলে তোমার ডিটেকটিভ মাসিকে পাস করে দিও।"

চিনাদের নিয়ে আরও খানিকক্ষণ আড্ডা চলল তিনজনের। লিয়াংয়ের আবির্ভাবের পর থেকে চিনাদের সম্পর্কে অসম্ভব আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে অবনীর। এখন তিনি অবিরাম জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়ে চলেছেন। বছরে চিনাদের ক'টা বড় উৎসব হয়, কোন উৎসবের পিছনে কী গল্প আছে, কোনটাকে চিনারা শুভ বলে মানে, কোনটা অশুভ — সব তিনি সংগ্রহ করে ফেলেছেন ইন্টারনেট থেকে। অবনীর দৌলতেই টুপুররা জানতে পারল, চিনারা বেগুনকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করে।

কুশল বাড়ি গেল সাড়ে ছ'টা নাগাদ। টুপুর বসল অ্যালজেব্রা নিয়ে। সন্ধের দিকেই অঙ্কটা তার আসে ভাল, রাত বাড়লে উত্তর আর কিছুতেই মিলতে চায় না। পুরো একটা প্রশ্নমালা শেষ করে, খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে, সবে একটু টিভির সামনে বসেছে, হঠাৎই ফোনের ঝনাৎকার। সহেলি রিসিভার তুলেছিলেন, কানে চেপেই আঙুল নেড়ে ডাকলেন টুপুরকে, "ধরো। তোমার চিনে বন্ধু।"

টুপুর একটু অবাকই হল। তবে স্বরে ফুটতে দিল না বিস্ময়। স্বাভাবিকভাবেই বলল, "হাই!"

"হাই! গুড ইভনিং। আমি কি তোমাকে ডিসটার্ব করলাম?"

"নট অ্যাট অল। কী বলছ বলো?"

"আমার পাপা তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।"

টুপুর চমকাল। কী বলবেন লিয়াংয়ের বাবা?

ওপারে লিয়াংয়ের বাবার গলা শোনা গেল। কেমন যেন মিয়োনো-মিয়োনো, "হ্যালো, মাই চাইল্ড!"

"ইয়েস আঙ্কল।"

"লিয়াংয়ের মুখে শুনলাম তোমরা কাল সারাদিন অনেক দৌড়োদৌড়ি করেছ। তোমার মাসি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর তদন্ত করছেন। তাঁকে বোলো, এই হতভাগ্য মানুষটা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

"কৃতজ্ঞতার কিছু নেই আঙ্কল। লিয়াং আমার বন্ধু। তার বাড়ির একটা বিপদে আমরা সবাই তার পাশে থাকব, এটাই তো স্বাভাবিক।"

"নো মাই চাইল্ড। এটা তোমার মাসির মহানুভবতা। তিনি এক পেশাদার গোয়েন্দা। তাঁর মূল্যবান সময় আমার ভাইয়ের জন্য তিনি খরচ করছেন। তাঁকে বোলো, তাঁর যথাযোগ্য পারিশ্রমিক আমি হয়তো দিতে পারব না, তবু কথা দিচ্ছি, আমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে ধরে দিলে তিনি যে-অঙ্কই চাইবেন, আমি দেব।"

"ছি ছি, পারিশ্রমিকের কথা উঠছে কেন আঙ্কল? মাসি তো আমাদের ভালবেসে... লিয়াংয়ের কথা ভেবে..."

"ঠিক কথা। গাছ কখনও প্রতিদানের আশায় ফল দেয় না। কিন্তু মানুষের তো গাছের প্রতি কর্তব্য আছে। তুমি মাসিকে আমার মিনতিটা জানিও। তাঁকে আরও বোলো, ঝিয়েনের মৃত্যুতে আমার পাঁজরের একটা হাড় খসে গিয়েছে। অপরাধী ধরা না-পড়লে আমার যন্ত্রণা কমবে না।"

অত্যন্ত শান্ত স্বরে কথাগুলো বলছেন লিয়াংয়ের বাবা। কিন্তু

শুনতে শুনতে টুপুরের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। ঢোক গিলে বলল, "নিশ্চয়ই বলব, আঙ্কল।"

"আর একটা অনুরোধ। যে ম্যাপটার কথা তোমরা শুনেছ, সেটা কিন্তু চিনাদেরই সম্পত্তি। কোনও একজন বাঙালিকে আমাদেরই কেউ একসময় উপহার দিয়েছিলেন। ওটা আবার আমরা ফেরত পেলে বিশেষ খুশি হব। আমার ভাইয়ের আত্মাও শান্তি পাবে।"

"আমি বলব মাসিকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"শুভরাত্রি। প্রার্থনা করি, শয়তান যেন তোমার ঘুমে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না-পারে।"

টুপুরও গুডনাইট বলতে যাচ্ছিল, দুম করে কাজের কথাটা মনে পড়ে গেল। কাজটা কুশলেরই করার কথা, তবে সে নির্ঘাত ভুলে মেরে দিয়েছে।

ব্যস্তভাবে টুপুর বলে উঠল, "এক সেকেন্ড, আঙ্কল, এক সেকেন্ড।"

"বলো, মাই চাইল্ড?"

"আমার মাসি একটা কথা জানতে চেয়েছিল।"

"কী?"

"আঙ্কল ঝিয়েনের মোবাইল নাম্বারটা কী ছিল?"

"নোট করে নাও। নাইন এইট থ্রি..."

ফোন রেখে একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল টুপুর। মিতিনমাসিকে কি এখনই জানাবে লিয়াংয়ের বাবার কথাগুলো? ইচ্ছে করছে না। হঠাৎই মনটা কেমন ভারী হয়ে গিয়েছে।

রাতে অবশ্য বেশ গাঢ় ঘুম হল টুপুরের। লিয়াংয়ের বাবার শুভকামনায় কী? অন্য দিন বেশ স্বপ্নটপ্ন দ্যাখে, আজ সেসবের বালাই নেই।

সকালে নিদ্রা ভঙ্গ হতে না হতেই নতুন চমক। খবরের কাগজের

প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ। অবনীই ডেকে তুলে দেখালেন টুপুরকে। চিনা ইতিহাসবিদ ঝাও ঝিয়েনের হত্যাকারী সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নামটা পড়ে টুপুর প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মন্টু! কিউরিও শপের মালিক স্বপন দত্তর সেই ছোকরা কর্মচারী!

টুপুর ভাবছিল মিতিনমাসিকে একটা ফোন করবে, তার আগেই দূরভাষে মিতিনমাসি স্বয়ং।

টেলিফোন কানে চেপে টুপুর হাউমাউ করে উঠল, "আজকের কাগজটা দেখেছ?"

"মন্টুকে গ্রেপ্তার? হুঁ, চোখে পড়ল।" মিতিনের কোনও ভাবান্তর নেই, "আজ তোর ক'টা অবধি স্কুল রে?"

"আজ তো শনিবার। একটায় ছুটি।" টুপুর ফের প্রসঙ্গে ফিরল, "এটা কেমন হল, মিতিনমাসি? একটা নিরীহ ছেলেকে পুলিশ অকারণে হ্যারাস করবে? মালিকটাকে পাকড়াও করলেও না হয় কথা ছিল।"

"কিছুই অকারণে ঘটে না টুপুর। বাতাস ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না।"

"কিন্তু তোমার যুক্তি কী বলে? আঙ্কল ঝিয়েন যেদিন জিনিসটা কেনেন, মন্টু তো সেদিন কাজেই আসেনি!"

"তাতে কিস্সু প্রমাণ হয় না। নিশ্চয়ই পুলিশ কিছু একটা ভেবে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ...যাক গে, পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দে, আমরা আমাদের মতো এগোই।" মিতিন আবার একটু থেমে

থেকে বলল, "কাজের কথা শোন। দিদিকে বলে দে, তুই আজ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিস না। আজ আর কাল আমার এখানে থাকবি, পরশু মেসো তোকে স্কুলে পৌঁছে দেবে। ছুটির পর স্কুলগেটে দাঁড়াস, আমি তোকে তুলে নেব।"

"কোথায় যাব গো আমরা?"

"মিস্টার ঝিয়েনের কর্মক্ষেত্রে। কুশল যদি আগ্রহী থাকে, তাকেও সঙ্গে নিতে পারিস।"

"ওদের সেন্ট পিটার্সে তো শনিবার হলিডে। কুশল মনে হয় বাড়িতেই থাকবে।"

"ওকেও তা হলে তোর স্কুলের সামনে চলে আসতে বল। কাঁটায় কাঁটায় একটায়।"

"ঠিক আছে। ...ইস, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। লিয়াংয়ের বাবা কাল রাতে ফোন করেছিলেন। উনি বলছিলেন..."

"পরে শুনব। তাড়া আছে। ছাড়ছি।"

ফোন রেখে বোঁ করে একখানা পাক খেয়ে নিল টুপুর। কী মজা! আজ আর কাল, দুটো দিন, উত্তেজনার আগুনে বেশ সেঁকে নেওয়া যাবে নিজেকে! মিতিনমাসি নিশ্চয়ই কোনও পরিকল্পনা করছে... টুপুরকে কি আর একটুও বলবে না?

সহেলি অবশ্য প্রস্তাবটা শুনে খুব প্রীত হলেন না। গজগজ করতে করতে গুছিয়ে দিলেন টুপুরের জামাকাপড়। কড়া গলায় বললেন, "যাচ্ছ যাও। কিন্তু কোনও অজুহাতেই সোমবার স্কুল ডুব দেওয়া চলবে না।"

স্কুলে গিয়েও টুপুরের মন উচাটন। কখন একটা বাজে!

মিতিন আজ এল ট্যাক্সিতে। কুশলও সময়মতো পৌঁছেছিল, টুপুর আর কুশলকে তুলে নিয়ে স্টার্ট দিল ট্যাক্সি। টেরিটিবাজারের দিকে চলেছে।

স্কুলের নাম নানকিং হাই স্কুল। দোতলা বাড়ি, খুব একটা প্রকাণ্ড নয়। চেহারাও বেশ মলিন। ভিতরে ঢুকে টুপুর তো রীতিমতো হতাশ। ছাত্রছাত্রী কোথায়? স্কুল প্রায় শুনশান, দুটো-চারটে চিনা কুচোকাঁচা দেখা যাচ্ছে শুধু। সবে তো দেড়টা, আজ আগে-আগে ছুটি হয়ে গিয়েছে নাকি?

প্রিন্সিপালের নেমপ্লেট লাগানো ঘরে এক চিনা বৃদ্ধা। পরনে গাউন। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

দরজায় দাঁড়িয়ে মিতিন বলল, "মে আই কাম ইন?"

মহিলা চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন একবার। নরম গলায় বললেন, "ইয়েস?"

"আমরা মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে এসেছি," মিতিন টেবিলের সামনে গিয়ে নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিল, "বসতে পারি?"

"ও শিয়োর।" টুপুরদেরও হাত তুলে ইশারা করলেন মহিলা, "তোমরাও বোসো।"

ইংরেজিতেই কথাবার্তা চলছে। মহিলা বিনীত ভঙ্গিতে নিজের নাম-পরিচয় জানালেন। তিনিই অধ্যক্ষা কিউ ইউয়ান। থাকেন স্কুলেরই দোতলায়। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর ধরে এই স্কুলে রয়েছেন। অবসর নেওয়ার বয়স হওয়া সত্ত্বেও স্কুল কমিটি তাঁকে নাকি দায়িত্ব থেকে রেহাই দিচ্ছে না।

মূল প্রসঙ্গে যেতে মিতিন সময় নিল না বিশেষ। জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুটা যে অস্বাভাবিক, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন? আপনার কি কখনও মনে হয়েছিল, মিস্টার ঝিয়েনের এরকম একটা বিপদ ঘটতে পারে?"

মিসেস ইউয়ান জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "কখনও না। একদমই না। ঝিয়েনের কোনও শত্রু থাকতে পারে, আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

"সহকর্মীদের সঙ্গে মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"সহকর্মী?" মিসেস ইউয়ান ম্লান হাসলেন, "তা হলে তো আমাদের স্কুলের অবস্থাটা আগে বলতে হয়। আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে এখন ছেচল্লিশে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা সাকুল্যে ছয়। আমাকে নিয়ে। মিসেস মিং, মিসেস ওয়া আর মিস লি। ঝিয়েন ছাড়া আর-একজনই শিক্ষক আছেন। মিস্টার ওয়াং। তা মিস্টার ওয়াংয়েরও অবসর গ্রহণের সময় হয়ে গিয়েছে। এঁদের কারও সঙ্গে ঝিয়েনের অসদ্ভাব ছিল বলে আমি শুনিনি।"

"মিস্টার ঝিয়েন কি সহকর্মীদের সঙ্গে খুব গল্পগুজব করতেন? মানে উনি তো গবেষণা করছিলেন... সেসব বিষয় নিয়ে...?"

"কথা সে সকলের সঙ্গেই বলত। তবে আমরা একটু দূরত্ব বজায় রাখতাম।"

"কেন?"

"তার কি এই স্কুলে পড়ানোর কথা? সে তো ছিল অনেক উঁচু স্তরের। এই বিদ্যালয় এখন নামেই হাই স্কুল, কিন্তু এখানে তো ক্লাস ফোরের বেশি পড়ানোই হয় না। একটু আধটু চিনা ভাষা শেখাই বাচ্চাদের, চিনের ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কে খানিকটা অবগত করি, আর অঙ্কের প্রাথমিক পাঠটাঠ দিই। এর জন্য কতটুকু বিদ্যে লাগে, বলো? তাই আমাদের কারওই তেমন প্রথাগত ডিগ্রি নেই। একমাত্র ঝিয়েনেরই ছিল সেটা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে একজন উজ্জ্বল ছাত্র। এম.এ পাশ। তবু সে এখানে পড়াত। এই স্কুলকে ভালবেসে। ইচ্ছে করলে সে যে-কোনও ভাল জায়গায় যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। আমরা সবাই ঝিয়েনকে খুব সমীহ করতাম। আমাদের মতো স্বল্পশিক্ষিতদের সঙ্গে সে গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেই বা কেন, আর আমরা তা বুঝবই বা কী! তবে জানতাম, সে চিনাদের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য পড়াশোনা করছে।"

"তার মানে কোনও ওয়ালহ্যাঙ্গিং বা কোনও ম্যাপ কেনার ব্যাপারে তিনি আপনাদের কাউকে কিছু বলেননি?"

"মারা যাওয়ার দিন সকালে আমাকে একবার বলেছিল কী একটা যেন কিনতে যাবে। ভীষণ খোশমেজাজে ছিল সেদিন। বেরনোর মুখে মুখে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন মোবাইলে কার যেন একটা ফোন এল। তাঁর সঙ্গেও খুব হেসে হেসে কথা হল খানিক।"

"চিনা ভাষায়?"

"না। ইংরেজিতে। ...তারপর তো হুড়মুড় করে বেরিয়েই গেল।" মিসেস ইউয়ান চশমা খুলে চোখ মুছলেন, "কে জানত ওটাই তার শেষ যাওয়া! ছেলেটা আমাকে জিয়ের মতো, মানে বড় দিদির মতো দেখত। আমার ছোট ভাই আর রইল না।"

"আর-একটা কথা। আপনি কি স্মরণ করতে পারেন, মোবাইলে উনি কী বলছিলেন?"

মিসেস ইউয়ানের বলিরেখা এসে যাওয়া কপালে ভাঁজ বাড়ল। দু'-চার সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন, "শুধু তো 'ঠিক আছে' 'ঠিক আছে' করছিল। একবার বোধহয় সাড়ে চারটে শব্দটা উচ্চারণ করল..."

"কোথাও যাওয়ার কথা, বা কারও সঙ্গে দেখা করার কথা বলছিলেন কী?"

"সেটা তো বলতে পারব না।" মিসেস ইউয়ান বড়সড় একটা শ্বাস ফেললেন, "এবার বোধহয় আমাদের স্কুলটা উঠেই যাবে। ঝিয়েনের নাম দেখে দু'-চারজন অভিভাবক তা-ও ছেলেমেয়ে পাঠাত, আর তো সেই আকর্ষণটুকুও রইল না। ...এমনিই তো কেউ আর চিনে ভাষায় পড়াশোনা করতে চায় না, সবাই ছুটছে ইংরেজি মাধ্যমের দিকে...। কেনই বা ছুটবে না? ইংরেজি না জানলে কি আর

চাকরি পাবে? ...আমার নাতিকেই তো এই স্কুলে ভর্তি করতে পারলাম না। ছেলে, ছেলের বউ, দু'জনেই এমন আপত্তি জুড়ল! ...অথচ আমাদের ভাষার কত ঐশ্বর্য ছিল...”

দুঃখী-দুঃখী মুখে একটানা বলে চলেছেন মিসেস ইউয়ান। তাঁর মন খারাপটা টুপুরকেও ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সত্যি, ইংরেজি ছাড়া বাকি সব মাতৃভাষারই বুঝি একই হাল।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়ল। বাচ্চারা বেরোচ্ছে ক্লাসরুম থেকে। টুপুরদের নিয়ে স্কুলের স্টাফরুমে এলেন মিসেস ইউয়ান। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন, মিস্টার ঝিয়েনের সম্পর্কে মিতিন জানতে এসেছে শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। প্রত্যেকেই হায়-হায় করছেন। এক মধ্যবয়সি শিক্ষিকা তো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। আলাপচারিতা কাম জিজ্ঞাসাবাদ সেরে টুপুররা যখন বেরোল, সূর্য অনেকটাই পশ্চিমে হেলে গিয়েছে।

বাইরে এসে মিতিন বলল, “চল, এবার একটু লিয়াংয়ের বাড়ি যাই। লিয়াংয়ের বাবা দুপুরে বাড়ি থাকেন বলছিলি না?”

শুধু লিয়াংয়ের বাবা নন, লিয়াংয়ের মা'ও আজ আছেন বাড়িতে। শনিবার লিয়াংদের লন্ড্রি দু'টোয় বন্ধ হয়, দুপুরবেলা লিয়াংয়ের মাকেও তাই বেরোতে হয়নি। মিতিনদের আগমনে ববকাট চুল, শক্ত-সমর্থ চেহারার চৈনিক মহিলাটি বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কীভাবে অভ্যর্থনা করবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। ঝটিতি বরফশীতল লেমন স্কোয়াশ এসে গেল, সঙ্গে স্যান্ডউইচ, পেস্ট্রি, কাস্টার্ড। মেইলি হাতে হাতে সাহায্য করছে মাকে। তার কাঁধ ছোঁয়া চুলে আজও সেই নীল উল। তার মায়ের চুলেও। ছোট-ছোট চুলে উলের টুকরোটা বারবার ক্লিপ করতে-করতে লিয়াংয়ের মা কতবার যে জিজ্ঞেস করলেন টুপুরদের দুপুরের খাওয়া হয়েছে কিনা। খেলে এখনই তিনি বানিয়ে দিতে পারেন, সংকোচ করার কোনও প্রয়োজন নেই, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

লিয়াংয়ের বাবা অবশ্য আজ খুবই ম্রিয়মাণ। কথাই বলছেন না বিশেষ। ভাইয়ের মৃত্যুতেই তিনি যথেষ্ট শোকাহত ছিলেন, খুন হওয়ার সংবাদে যেন একেবারেই বিপর্যস্ত। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বিমর্ষ গলায় মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঝিয়েনের স্কুলে গিয়ে কেনও লাভ হল ম্যাডাম?"

মিতিন বলল, "একটা দরকারি তথ্য পাওয়া গেল। সেদিন স্কুল থেকে বেরনোর মুখে-মুখে মিস্টার ঝিয়েনের মোবাইলে একটা কল এসেছিল। সম্ভবত কেউ একজন আপনার ভাইয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। বিকেল সাড়ে চারটেয়।"

লিয়াংয়ের মা বিস্মিত স্বরে বললেন, "কই, এ খবরটা তো আমাদের কেউ জানায়নি!"

"ফোনটা এসেছিল মিসেস ইউয়ানের সামনে। উনিও খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন তো, তাই হয়তো কথাটা ঠিক মাথায় ছিল না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎই মনে পড়ে গেল।"

"উনি কি বলতে পারলেন কার ফোন ছিল?"

"না।"

"তা হলে তো আর জানাও যাবে না।" লিয়াংয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "মোবাইলটাই তো মিসিং।"

"তাতে কিছু যায় আসে না মিস্টার ঝাও। সেদিন আপনার ভাইয়ের মোবাইলে কোন-কোন নাম্বার থেকে কল এসেছিল আমি জেনে নেব। যে কোম্পানির কানেকশন, তাদের কাছে সবই রেকর্ডেড আছে।"

"ইজ় ইট? তা হলে তো কালপ্রিট ধরাই পড়ে গেল।"

"অত সহজ নয় বোধ হয়। ফোন করে কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেই কি প্রমাণ হয় দু'জনের দেখা হয়েছিল? আর হলেও সেই যে খুনি, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?"

লিয়াংয়ের মা অস্ফুটে বললেন, "ও। তা হলে এখন কী করবেন?"

"দেখি। ইনফরমেশনগুলো ভালভাবে যাচাই করি। আর-একবার স্বপন দত্তর কাছেও যেতে হবে।" মিতিন একটা স্যান্ডউইচ তুলল। ছোট্ট কামড় দিয়ে বলল, "এবার আপনাদের কি দু'-চারটে প্রশ্ন করতে পারি? পার্সোনাল?"

"বলুন কী জানতে চান?"

"ওই ওয়ালহ্যাঙ্গিং... মানে ওই ম্যাপের কথাটা আপনারা ছাড়া আর কে কে জানতেন?"

লিয়াংয়ের বাবা বললেন, "ওটা যে অত মূল্যবান ম্যাপ, সেটা তো আমরাই জানতাম না। সুতরাং আমাদের মাধ্যমে কারও জানার প্রশ্নও আসে না।"

"তা ঠিক।" মিতিন মাথা দোলাল, "তবে মিস্টার ঝাও ঝিয়েন যদি আপনাদের কমিউনিটির কারও কাছে গল্পটল্প করে থাকেন..."

"অসম্ভব। সে আমাদেরই বলেনি, অন্য লোকদের বলতে যাবে কেন?"

লিয়াংয়ের মা বললেন, "তা ছাড়া আমাদের ঝিয়েন তো কারও সঙ্গে সেভাবে মিশতই না। আর এই ছাতাওয়ালা গলি থেকে বেশিরভাগ চিনাই তো চলে গেছে সেই ট্যাংরায়। এখন আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই প্রায় ওখানে। সামাজিক অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান ছাড়া ঝিয়েনের সঙ্গে তাদের দেখাসাক্ষাৎই হত না।"

"অর্থাৎ আপনারা নিশ্চিত, ওই ম্যাপের লোভে আপনাদের সম্প্রদায়ের কারও পক্ষে ওই কাজ করা সম্ভব নয়?"

"দু'শো ভাগ নিশ্চিত। ওই সব ম্যাপট্যাপ, ইতিহাস-টিতিহাস নিয়ে আমরা তো কেউ ভাবিই না। ঝিয়েন ছিল নেহাতই ব্যতিক্রম। এখানকার চিনারা, মানে আমরা তো ব্যস্ত থাকি কীভাবে দু'বেলা

রুটির জোগাড় করব, কী করে একটা চাকরি জোটাব, কিংবা ব্যবসা চালাব, এসব নিয়ে। ঝিয়েনকে তো তাই প্রায় আমাদের সমাজের বাইরের লোক বলে ধরে নেওয়া যায়।”

মিতিন শরবত শেষ করে মুখ মুছল। হেসে বলল, “ধন্যবাদ। আপনারা আমার কাজটাকে অনেক সহজ করে দিলেন। আশা করছি, শিগগিরই মিস্টার ঝাও ঝিয়েনের হত্যাকারীকে ধরে ফেলতে পারব।”

রবিবার দুপুরে ছোটখাটো একটা সভা বসেছে মিতিনের ড্রয়িংরুমে। মিতিন, টুপুর, পার্থ ছাড়াও সেখানে কুশল হাজির আজ। কুশলকে কাল বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসার সময়েই আজ মধ্যাহ্নভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মিতিন। আর খ্যাঁটনের গন্ধ পেলে কুশল কি না এসে পারে! বার্ডফ্লু'র অজুহাতে সম্প্রতি বাড়িতে মুরগি আনছে না পার্থ, তবে চিংড়ির মালাইকারি আর মাটনকোর্মা মিলিয়ে মেনু মন্দ হয়নি আজ। এখন ভরাপেটে শুরু হয়েছে ঝিয়েন হত্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর সম্ভাব্য আততায়ীর অনুসন্ধান।

পার্থ মন্তব্য করল, “যাক, একটা ব্যাপারে অন্তত তো তোমরা নিশ্চিন্ত হয়েছ। খুনি কোনও চিনেম্যান নয়।”

মিতিন বলল, “এখনও পর্যন্ত তো তাই মনে হচ্ছে।”

কুশল বলল, “তা হলে রইল পড়ে চার। স্বপন দত্ত আর ওই তিন প্রোফেসর। থুড়ি, পাঁচ। স্বপন দত্তর দোকানের মন্টুকেও তো ধরতে

হবে। যদিও আমার মনে হয় না, খুনটা সে করেছে। ভুল করে তাকে ধরেছে পুলিশ।"

"বটেই তো।" টুপুর মুখে ভাজা মৌরি পুরল। চিবোতে চিবোতে বলল, " আমার মনে হয়, মন্টু বেচারাকে অযথা হ্যারাস করার কোনও মানেই হয় না। আঙ্কল ঝিয়েন জিনিসটা কেনার দিন সে তো কাজেই যায়নি!"

পার্থ বলল, "ওটাই হয়তো মন্টুর চাল। আগের দিন যখন স্বপন দত্ত জিনিসটাকে দশ হাজারে বেচতে রাজি হয়ে গেল, তখনই ও প্ল্যান ছকে নিয়েছে।"

টুপুর বলল, "তার মানে বলতে চাও মন্টু বুঝে গিয়েছিল জিনিসটা দামি?"

"আন্দাজ করেছিল। মিস্টার ঝিয়েন যেভাবে জিনিসটার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। প্লাস, আর-একজন ভদ্রলোকও তো এসেছিলেন জিনিসটার খোঁজে। ...এইসব থেকেই মন্টু হয়তো ভেবেছিল, জিনিসটা হাতিয়ে অন্য কোথাও বেচতে পারলে অনেক অনেক বেশি টাকা পাবে। এখন তো যা শুনছি, জিনিসটার দাম বিশ-পঞ্চাশ লাখ হওয়াও বিচিত্র নয়। এর থেকে কত অল্প টাকার জন্য আজকাল মানুষ মানুষকে খুন করে দেয়।"

"মেসোর কথায় কিন্তু যুক্তি আছে রে টুপুর।" কুশল পার্থর দিকে হেলে গেল, "দ্বিতীয় যে লোকটা জিনিসটার খোঁজে এসেছিল, সেই হয়তো মন্টুকে টোপ দিয়ে... মানে টাকার লোভ দেখিয়ে মন্টুকে দিয়েই করিয়েছে কাজটা।"

"চান্স খুব কম।" টুপুর মাথা ঝাঁকাল, "মন্টুর যদি জিনিসটা হাতানোরই ইচ্ছে থাকত, সহজেই তো দোকান থেকে নিয়ে পগারপার হত। খামোখা খুনের ঝুঁকি সে নেবে কেন?"

"তা হলে পুলিশ তাকে আদৌ ধরলই বা কেন?"

"অনেক সময়ই এরকম এক-আধজনকে ধরে পুলিশ।" অনিশ্চয় আঙ্কল বলেন, কাউকে গ্রেপ্তার না-করতে পারলে খবরের কাগজের লোকরা নাকি খুব বাঁকা বাঁকা কথা শোনায়। দেখে নিস, মন্টুকে দু'-চার দিন পরে ছেড়েও দেবে।"

"তোদের মন্টু-গবেষণা থামাবি?" হঠাৎই সরব হয়েছে মিতিন। সোফায় বাবু হয়ে বসে বলল, "মন্টু ছাড়াও আর যে চারজন সন্দেহভাজন আছে, তাদের কথায় আয়।"

পার্থ বলল, "মন্টুকে যদি বাদ দাও, তা হলে তো নেক্সট সাসপেক্ট তোমার স্বপন দত্ত। সে তো স্বীকারই করেছে, সেদিন সে রেসের মাঠে গিয়েছিল। সেখান থেকে প্রিন্সেপ ঘাট আর কদ্দুর? আর-একটু চাপ দিলেই পেট থেকে বেরিয়ে আসবে, রেসের মাঠ নয়, সে সেদিন গিয়েছিল প্রিন্সেপ ঘাটেই। মিস্টার ঝিয়েনকে ফলো করে।"

মিতিন হেসে ফেলল, "বড্ড গোঁজামিল দিয়ে ফেলছ, পার্থ। মিস্টার ঝিয়েন জিনিসটা কিনে চলে যাওয়ার পর দোকান বন্ধ করতেও তো পাঁচ-দশ মিনিট সময় লাগে। যদি ধরেও নিই, স্বপন দত্ত সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের শাটার নামিয়ে মিস্টার ঝিয়েনের পেছন-পেছন দৌড়েছে, তা হলেও ব্যাপারটা দাঁড়ায় কী? ডোন্ট ফরগেট, মিস্টার ঝিয়েনের জিনিসটা কেনা এবং খুন হওয়া, এর মাঝে প্রায় ঘণ্টা দু'-আড়াইয়ের ব্যবধান।"

"সো?" পার্থ হাত ওলটালো, "দু'-আড়াই ঘণ্টা ধরে একটা লোককে ফলো করা যায় না? আমিই তো তোমার ডিরেকশন মতো একজনকে ছ'ঘণ্টা ফলো করেছিলাম। স্বপন দত্ত হয়তো ধাওয়া করতে করতে, ধাওয়া করতে করতে, জায়গামতো মিস্টার ঝিয়েনকে পেয়ে..."

কুশল বলল, "কিন্তু মেসো... স্বপন দত্ত তা হলে জিনিসটা আদৌ বেচল কেন?"

"ইনস্ট্যান্ট টাকার লোভে। এবং টাকাটা পেয়েই মনে হয়েছে বিক্রি করাটা গোখ্খুরি হয়ে গেল। আবার এও হতে পারে, জিনিসটা কেনার পর মিস্টার ঝিয়েনই হয়তো খুশির আতিশয্যে জিনিসটা যে কত মূল্যবান, সেটা বলে ফেলেছিলেন। তাতেই স্বপনের লোভ চাড়া দিয়ে ওঠে।"

"সব ঠিক আছে।" টুপুর মাথা নাড়ল, "তবে তুমি কিন্তু দুটো পয়েন্ট মিস করে যাচ্ছ পার্থমেসো। এক নম্বর, আঙ্কল ঝিয়েনকে মাথায় আঘাত করার পরে একটা গাড়ি কিন্তু সত্যি-সত্যিই তাঁকে চাপা দিয়েছিল। রাস্তার মধ্যিখানে নয়, একেবারে ফুটপাতের গা ঘেঁষে। তার মানে, গাড়ি চাপা দেওয়াটাও হয়েছিল প্ল্যানড ওয়েতে। যে-লোকটার মাথায় হঠাৎ জিনিসটা হাতানোর মতলব এসেছে, তার পক্ষে কি এত কিছু প্ল্যান করে ঘটানো সম্ভব? প্রথমে মাথায় ডান্ডা মেরে ফুটপাতের ধারে ফেলে রাখল, তারপর একটা গাড়ি জোগাড় করে এনে চাপা দিল... অত সোজা? সেকেন্ডলি, দ্য মিস্টিরিয়াস ফোন কল। আঙ্কল ঝিয়েনের সঙ্গে কারও একটা সাড়ে চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কার সঙ্গে? কোথায়? কেন? নিশ্চয়ই সেই লোকটা স্বপন দত্ত নয়?"

"হয়তো ছিল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মিস্টার ঝিয়েন সেখানে যাননি!"

"অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও সেটি রক্ষা না-করে, নিজের বাড়িতেও না-ফিরে, মিস্টার ঝিয়েন মনের আনন্দে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে চলে গেলেন!" মিতিন মুখ বাঁকাল, "কী অকাট্য যুক্তি!"

"হতে পারে না?"

"হতে পারে কি পারে না, সেই গোলকধাঁধায় না-ঢুকে বরং দেখা যাক, কী কী হয়েছে। খুন। গাড়ি চাপা। ম্যাপ চুরি। মোবাইল মিসিং। যে-লোকটা খুন করেছে, ম্যাপ আর মোবাইল যদি সে-ই নিয়ে

থাকে, তার থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। খুনি অবশ্যই ভেবেছে, মোবাইল ফোন থেকে তার পরিচয়টা জানাজানি হয়ে যেতে পারে, তাই ম্যাপের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও সরাতে হয়েছে তাকে। এবং সেই অ্যাঙ্গল থেকে দেখলে স্কুলে মিস্টার ঝিয়েনের কাছে আসা ফোনটা কিন্তু সত্যিই খুব ভাইটাল। কলটাকে ডিটেক্ট করার জন্য আমি কালই ভবানী ভবনে আই জি সাহেবকে জানিয়েছি। অনিশ্চয়বাবু কাল দুপুরের মধ্যেই আমায় ডিটেলটা দিয়ে দেবেন।"

"তবে যে মাসি তুমি কাল বললে ওই ফোন থেকে কিছু প্রমাণ হয় না?"

"সে তো হয়ই না। কিন্তু আর-পাঁচটা এভিডেন্সের সঙ্গে মিলিয়ে ... ধর, যদি দেখা যায়, যে ফোন করেছিল সে ম্যাপটার মূল্য সম্পর্কে জানে ... ম্যাপটা পেতে সে আগ্রহী ... তা হলে কলটাকে এভিডেন্স হিসেবে তো ব্যবহার করাই যায়। অবশ্য তার চেয়েও আগে যা জরুরি সেটা হল, আমাদের বের করতে হবে কীভাবে হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে। এবং স্বপনবাবু কিংবা বাকি তিনজন সাসপেক্টের পক্ষে ওইভাবে খুন করাটা আদৌ সম্ভব, কি না।"

পার্থ চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ওই তিন অধ্যাপকের একজন মিস্টার ঝিয়েনকে মারতে পারেন?"

"হতেই পারে। বাসববাবু অত্যন্ত রুক্ষ, বদমেজাজি লোক, কিন্তু আবার দরকারমতো মাথা ঠান্ডাও করে ফেলেন। ভান করেন মিস্টার ঝিয়েনের মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, আবার মিস্টার ঝিয়েনকে সমাধি দেওয়ার দিন তিনি সেখানে উপস্থিত হন। অপরাধ প্রবণতাও আছে। বইয়ের পাতা কাটতে গিয়ে ধরাও পড়েছিলেন। অর্থাৎ বেশ জটিল চরিত্র। তরুণবাবু খুবই ভদ্র সভ্য মানুষ। কিন্তু মিস্টার ঝিয়েনের ব্যাপারে তাঁকে কি একটু বেশি শীতল মনে হল

না? ওই আপাত উদাসীনতাটা এক ধরনের অভিনয় নয় তো? শিবতোষবাবু আবার অতি অমায়িক। মিস্টার ঝিয়েনকে যথেষ্ট ভালবাসতেন বলেও মনে হল। কিন্তু দু'জনের গবেষণার বিষয় প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ চোরা রেষারেষি থাকলেও থাকতে পারে। অবশ্য তরুণবাবুও প্রায় একই সাবজেক্টের উপর কাজ করছেন ...।"

টুপুর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "বুঝেছি। তুমি সবাইকে সমান সন্দেহের চোখে দেখছ।"

"তাই তো নিয়ম রে। প্রমাণ ছাড়া সন্দেহের বাড়া-কমা হবে কী করে?"

পার্থ গোমড়া মুখে বলল, "তা অধ্যাপক মশাইদের কেউ একজন খুনটা করলেন কীভাবে?"

"আমি বলব?" কুশল হাত তুলল, "তিনজন প্রোফেসরই ম্যাপটার কথা জানতেন। আমাদের সে কথা বলেওছেন। এঁদের মধ্যেই একজন ম্যাপটা বাগানোর জন্য প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে আঙ্কল ঝিয়েনকে আসতে বলেন ... তারপর গাড়ি নিয়ে গিয়ে ..."

"এক সেকেন্ড।" টুপুর কুশলকে থামাল, "গাড়ি চাপা দেওয়ার আগেই কিন্তু আঙ্কল ঝিয়েনের মাথায় আঘাত করা হয়েছে রে।"

"সে আর কী এমন কঠিন কাজ! আঙ্কল ঝিয়েন যখন আহ্লাদে আটখানা হয়ে ম্যাপটা দেখাচ্ছেন, তখনই হয়তো ..."

"তবু একটা 'কিন্তু' থেকেই যাচ্ছে রে কুশল। আঙ্কল ঝিয়েনের তো ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেই অধ্যাপক বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত। হঠাৎ একটা শুনশান জায়গায় ... অড রুটে দেখা করতে বললে আঙ্কলের তো খটকা লাগা উচিত।"

"গুড পয়েন্ট। ভেরি গুড পয়েন্ট," মিতিন তারিফ করল, "একটা অদ্ভুত জায়গায় মিট করতে চাইলে মিস্টার ঝিয়েনের তো অবাক হওয়ারই কথা। অ্যাটলিস্ট টেলিফোনে কেন টেন ধরনের একটা প্রশ্ন

তো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। অথচ মিসেস ইউয়ানের স্টেটমেন্ট বলছে, মিস্টার ঝিয়েন সেদিন খুব স্বাভাবিক স্বরেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছিলেন।"

"তা হলে?"

"ভাবতে হবে। মোডাস অপারেন্ডিটা ভাবতে হবে। নিজেকে খুনির জায়গায় প্লেস করে বুঝতে হবে আমি হলে এ ক্ষেত্রে কীভাবে এগোতাম।"

বলেই তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়েছে মিতিন। পাশের ঘরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে মোবাইলে। স্বর কানে আসে, তবে সংলাপগুলো শোনা যায় না ঠিকমতো। মিনিট দশেক পর ফিরল ড্রয়িংরুমে। নাইটি-হাউসকোট বদলে সালোয়ার-কামিজ পরে নিয়েছে, চুল টানটান করে বাঁধা।

টুপুর অবাক মুখে বলল, "এ কী? তুমি এখন বেরোচ্ছ নাকি?"

ঘড়ির চেন বাঁধতে বাঁধতে মিতিন বলল, "হুঁ, একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবে?"

"স্বপন দত্তর কাছে।"

"হঠাৎ?"

"দরকার আছে।"

"কিন্তু কিউরিও শপ তো আজ বন্ধ!"

"স্বপন দত্তর বাড়িতে যাব। ভবানীপুর। কথা বলে নিয়েছি।"

চটি গলিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল মিতিন। কুশল, টুপুর, পার্থ, তিনজনেই হতভম্ব।

কুশল ভ্যাবলা মুখে বলল, "মাসি তো স্বপন দত্তকে ক্লিন চিট দিয়ে দিয়েছিল! হঠাৎ আবার তাকে ...?"

"কে জানে কী মতলব!" পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "তোমাদের মাসির থই পাওয়া মুশকিল।"

মিতিন সন্ধেবেলা ফেরার পর কুশলের সঙ্গে বাড়ি চলে এল টুপুর। মিতিনই বলল, টুপুরের আর রাতে থাকার দরকার নেই, সে বরং কাল বাড়ি থেকেই স্কুলে যাক। স্বপন দত্তর বাড়ি কেন গিয়েছিল, সেখানে কী হল, তা-ও জানা হল না টুপুরের, এটা-ওটা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল মিতিন।

মাসির উপর খুব অভিমান হচ্ছিল টুপুরের। নয় নয় করে বেশ কয়েকটা কেসে সে মাসির পাশে পাশে থেকেছে, এখনও যেন তার উপর মাসির সেভাবে আস্থা জন্মাল না! অথচ মাসির থট প্রসেসটা জানতে পারলে টুপুর তো নিজের চিন্তাভাবনাকেও সেই খাতে বইয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া ঝিয়েন আঙ্কলের কেস তো টুপুরের দৌলতেই পেয়েছে মিতিনমাসি, সে সুবাদেও তো টুপুরের জানার অধিকার আছে সব কিছু। নয় কি? কুশলের সামনে কি আলোচনা করতে চায় না? উঁহুঁ। তা হলে তো রাতে টুপুরকে থেকে যেতেই বলত।

না, মিতিনমাসি এখনও টুপুরকে এলেবেলেই ভাবে। সে যে একাই তদন্তটা শুরু করেছিল, সেটাকে পর্যন্ত আমল দিল না!

টুপুরের অভিমানটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না। সোমবার স্কুল থেকে ফিরতেই মিতিনের ফোন, "তোকে একটা ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল রে।"

মন খারাপটা লুকোতে পারল না টুপুর। ভার গলায় বলল, "আমি জেনে কী করব?"

"তবু শুনে রাখ।" মিতিন নির্বিকার, "মিস্টার ঝিয়েনের মোবাইলে ওই সময়ে আসা কলটাকে ট্রেস করা গিয়েছে।"

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে টুপুরের উদাসীনতা উধাও। মুখ থেকে উত্তেজনা ছিটকে এল, "কে? কার ফোন?"

"তা জানা যায়নি। তবে নম্বরটা একটা পাবলিক বুথের।"

"অ্যাঁ?"

"অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনের এক বুথ থেকে করা হয়েছিল।"

"ও। ... তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে! আমি তো এরকমটাই গেস করেছিলাম। ঘটে এটুকু বুদ্ধিও না-থাকলে তেমন ক্রিমিনালের সঙ্গে লড়ে মজা কোথায়!"

"এখন কী করবে?"

"মাছের চার বানাব।"

"মানে?"

"দেখতেই পাবি।"

"হেঁয়ালি করছ কেন? আমাকে কি কিছুই বলা যায় না?"

"আহা, চটিস কেন? শার্লক হোম্স কি প্রতিটি খুঁটিনাটি ওয়াটসনকে বলতেন? নাকি তোদের ফেলুদা বলেছেন তোপসেকে? ... শোন, একটু সাসপেন্স থাকা ভাল। লাস্ট রাউন্ডের চমকটা তা হলে পুরোপুরি এনজয় করা যায়।"

এর পর আর টুপুরের কী বলার থাকে! অগত্যা ফোন নামিয়ে রাখতেই হয়। মনের উৎকণ্ঠাটুকু রেখে দিতে হয় মনেই। এবং একা-একা ডুবে থাকতে হয় ভাবনার অকূল পাথারে।

পরদিনটা নিরামিষ কাটল। মিতিনমাসির দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিকেলবেলা কুশল এসে খোঁচাখুঁচি করল

খানিকক্ষণ, কেঠো হাসি ছাড়া তাকে আর কিছুই উপহার দিতে পারল না টুপুর।

বুধবার সকালে সহসা বিস্ফোরণ। মেঘলা মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, দিব্যি আরাম করে ঘুমোচ্ছিল টুপুর। অবনী ঠেলে তুলেছেন তাকে। উত্তেজিত স্বরে বলছেন, "অ্যাই টুপুর, ওঠ। দ্যাখ দ্যাখ, খবরের কাগজে কী বেরিয়েছে!"

টুপুর ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, "কী?"

"তোদের সেই ম্যাপ নিয়ে এক বিশাল সমাচার।"

প্রভাতী আলস্য পলকে খানখান। টুপুর ঝাঁপিয়ে পড়ল খবরটার উপর। প্রথম পাতার নীচের দিকে বড়সড় হেডিং—

অবশেষে চিনাদের ঘরে ফিরছে দুষ্প্রাপ্য চৈনিক ম্যাপ

বেকবাগানের গ্র্যান্ড কিউরিও শপের মালিক স্বপন দত্ত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এক দুষ্প্রাপ্য চিনা ম্যাপ আছে তাঁর সংগ্রহে। প্রায় সাতশো বছর আগে মো-ই-টং নামের এক চিনা শিল্পী নাকি এই মানচিত্রটি বানিয়েছিলেন। মানচিত্রটি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অনেক আগেই চিনারা পা রেখেছিল আমেরিকার মাটিতে। স্বপন দত্তর এক পূর্বপুরুষ, প্রায় দুশো বছর আগে, জনৈক চিনার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ম্যাপখানা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি ওই ম্যাপটির আদলে আঁকা একটি ওয়ালহ্যাঙ্গিং দোকানে টাঙিয়েছিলেন স্বপনবাবু, সেটিকেই আসল মানচিত্র ভেবে নিয়ে দশ হাজার টাকায় কিনে ফেলেন চিনা ইতিহাসবিদ ঝাও ঝিয়েন। কিন্তু ম্যাপখানি নিয়ে বাড়ি অবধি পৌঁছতে পারেননি তিনি, তার আগেই প্রিন্সেপ ঘাটে এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন, এবং নকল মানচিত্রটিও খোওয়া যায়। পুলিশ তড়িঘড়ি গ্র্যান্ড কিউরিও শপের এক কর্মচারীকে

গ্রেফতার করেছে বটে, তবে নকল মানচিত্রটি এখনও উদ্ধার হয়নি। এই ঘটনার পর থেকে স্বপন দত্ত গভীর মর্মপীড়ায় ভুগছিলেন এবং অবশেষে তিনি স্থির করেছেন মানচিত্রখানা তিনি নিহত ঝাও ঝিয়েনের পরিবারকে দিয়ে দেবেন। কোনও মূল্য ছাড়াই। চিনা অষ্টম চান্দ্রমাসের প্রথম দিনে, অর্থাৎ পাঁচ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, বেলা বারোটায় মানচিত্রটির হাত-বদল ঘটবে। বজবজের অদূরে, অছিপুরে চিনা অভিযাত্রী আৎসুর যে সমাধি আছে, সেখানেই ঝাও ঝিয়েনের দাদার হাতে পারিবারিক সম্পদটি তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হতে চান স্বপন দত্ত।

টুপুর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলে কী স্বপন দত্ত? যে ম্যাপের জন্য ঝিয়েন আঙ্কলকে প্রাণ দিতে হল, সেটা আদৌ আসল নয়? মুখ দিয়ে বেরিয়েও গেল, "স্বপন দত্ত তো মহা শয়তান। একটা দু'নম্বরি ম্যাপ টাঙিয়ে রেখেছিল!"

অবনী খবরের কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, "দু'নম্বরি বলছিস কেন? সে একটা ম্যাপের নকল শোয়ের জন্য সাজিয়ে রেখেছিল মাত্র। কেউ যদি সেটাকে মহামূল্যবান ভাবে, তাতে স্বপন দত্তর কী করার আছে?"

"তবু বলে দেওয়া উচিত ছিল। দিব্যি দশ হাজার টাকা গুনে নিল ..."

"ওরে, আর্ট অ্যান্টিক কিউরিও, এসব লাইনে দশ হাজার কিস্‌সু না। আর এই নকল জিনিস বেচা তো হরবখত হচ্ছে। নকল মোনালিসা কতবার বিক্রি হয়েছে, জানিস? ... তাও তো তোদের ঝিয়েন আঙ্কলের মৃত্যুতে তার অনুতাপ-টনুতাপ হয়েছে, বিনা পয়সায় দিয়ে দিতে চায় জিনিসটা।"

টুপুর একটুও সান্ত্বনা পেল না। গুম হয়ে বসে রইল একটুক্ষণ।

তারপর উঠে দাঁত ব্রাশ করে এসেই মিতিনমাসিকে ফোন।

"আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?"

"হুম্।"

"কী সব বেরিয়েছে, অ্যাঁ? ম্যাপটা নাকি আসল নয়?"

"তাই তো দেখছি।"

"একটা কথা সত্যি করে বলো তো মিতিনমাসি? তুমি কি ব্যাপারটা আগেই সন্দেহ করেছিলে? স্বপন দত্তকে তাই ভয় দেখাতে গিয়েছিলে সেদিন?"

"ধরে নে তাই।"

"তা হলে এখন আমাদের মার্ডার কেসটার কী হবে?"

"সেটা যেমন চলছিল চলবে। ... আমরা তো কালপ্রিটের দিকে গুটিগুটি পায়ে এগোচ্ছি। যাক গে, কাজের কথা শোন। শুক্রবার তোকে স্কুলে যেতে হবে না। কুশলকেও ডুব মারতে বল। আমরা সেদিন দল বেঁধে অছিপুর যাচ্ছি।"

"ওখানে তো শুধু ম্যাপ দেওয়া-নেওয়া?"

"সেটাই তো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমরা তার সাক্ষী থাকব।"

"লিয়াংকে সঙ্গে নেব না?"

"লিয়াং তো যাবেই। বাবা-মা-বোনের সঙ্গে। আমরা আমাদের মতো যাব। ওরা ওদের মতো। ঠিক সাড়ে ন'টায় তুই আর কুশল শেয়ালদায় চলে আয়। সাউথ সেকশনে। আমি ইলেকট্রনিক ঘড়ির নীচে ওয়েট করব।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল টুপুর। আশ্চর্য, মিতিনমাসি টের পেল কী করে, স্বপন দত্ত নকল ম্যাপ বেচেছে? মিতিনমাসির দাবড়ানির চোটেই কি লোকটা আসল ম্যাপ হাতছাড়া করতে রাজি হয়ে গেল? স্টেটমেন্ট পর্যন্ত দিয়ে

দিল কাগজে? কী বলে ভয় দেখিয়েছে মিতিনমাসি?

উঁহু, কেমন যেন ধন্দ লাগছে। জ়রুর ডালমে কুছ্ কালা হ্যায়।

শুক্রবার টুপুররা অছিপুর পৌঁছোল বেলা সাড়ে এগারোটায়। বজবজ স্টেশনে নেমে একখানা ভ্যানরিকশা ধরে বাসরাস্তা বরাবর অছিপুরের বড়বটতলা, সেখান থেকে গঙ্গার দিকে খানিকটা গিয়ে চিনেম্যানতলা। অছিপুরের এই তল্লাটে এখন আর একটা চিনা পরিবারও বাস করে না, তবে একসময় তাদের বসতি ছিল বলে নামটা রয়েই গিয়েছে। অবশ্য কালের বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে টিকে আছে এক চিনামন্দির, আর আৎসুর সমাধি।

মন্দিরের প্রকাণ্ড ফটকটার সামনে এসে ভ্যানরিকশা দাঁড় করাল মিতিন। আশপাশের পরিবেশের মাঝে ফটকটা যেন একটু বেমানান, বোঝাই যায় সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। তবে নির্মাণশৈলী চিনা ধাঁচের। গেটের মাথায় থাকথাক কাঠের কারুকাজ। গেটের দু'দিকের পাঁচিলে বড় বড় দু'খানা রঙিন চক্র আঁকা, বোধহয় চিনাদের কোনও বিশেষ প্রতীক।

রিকশাভাড়া মিটিয়ে মিতিন বলল, "আয়, চট করে মন্দিরটা দেখে আসি।"

কুশলের চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছে। কপাল কুঁচকে বলল, "কিন্তু বাকি লোকরা সব কোথায়? চারদিক তো একেবারে শুনশান।"

"যারা আসার তারা ঠিক এসে যাবে। এখনও তো বারোটা বাজেনি। আয় আয়, দাঁড়িয়ে থাকিস না।"

মন্দিরটা দ্রষ্টব্যস্থান হিসেবে এমন কিছু আহামরি নয়। মূল গেট পেরিয়ে ভিতরে গেলে সবুজ গাছপালার মাঝে আর-একখানা পাঁচিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারার। পাঁচিলের গায়ে আবার একখানা ছোট্ট গেট। এতই ছোট যে, কুঁজো হয়ে ঢুকতে হয় মূল প্রাঙ্গণে।

মন্দিরটাও বেশ ছোট। জুতো খুলে টুপুররা দেখে এল এক জোড়া চিনা দেবদেবীর মূর্তি আছে অন্দরে। মিতিন তাঁদের নামও বলে দিল। খুদা আর খুদি।

টুপুর বলল, "চাইনিজ়দেরও এমন ঠাকুর-দেবতা আছে আমার ধারণা ছিল না। আমি ভাবতাম চাইনিজ মাত্রই হয় বৌদ্ধ, নয় খ্রিস্টান।"

মিতিন হেসে বলল, "ভুলে যাস না টুপুর, চিনারা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতি। এদের ইতিহাস প্রায় সাত হাজার বছরের পুরনো। বুদ্ধদেব জন্মেছেন মাত্র আড়াই হাজার বছর আগে। আর যিশুখ্রিস্ট তো সেদিনের লোক, এই তো সবে দু'হাজার পেরোলেন। এদের আগেও তো চিনে দেবদেবী ছিল, পুজোআচ্চার চল ছিল। তাদের সবাই পরে বৌদ্ধ-খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে ধরে নিচ্ছিস কেন?"

কুশল ফুট কাটল, "চিনে তো মুসলমানও আছে।"

"অবশ্যই। ইনফ্যাক্ট, যে-চিনা অভিযাত্রী কলম্বাসের আগে

আমেরিকায় গিয়েছিলেন, অ্যাডমিরাল জেং, তিনিই তো মুসলিম ছিলেন। তাঁর মূল নাম মা-সান-পাও।"

টুপুরের চোখ প্রায় কপালে, "তুমি জানলে কী করে?"

"তোর পার্থমেসোর ইনফরমেশন। সে-ও এখন তোর বাবার মতো ইন্টারনেটে চিনা ইতিহাস ঘাঁটছে।"

কথার মাঝেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ। টুপুর উৎকর্ণ হয়ে বলল, "ওই বোধহয় লিয়াংরা এসে গেল। নাকি স্বপন দত্ত?"

গাড়ির শব্দ মন্দির অতিক্রম করে গঙ্গার দিকে যাচ্ছে। টুপুর আর কুশল দৌড়ে দেখতে যাচ্ছিল, মিতিন বলল, "দাঁড়া, ছটফট করিস না। গেটের সামনে যাই চল।"

বড় ফটকটা থেকে গঙ্গার দিকে তাকালে চোখে পড়ে এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাঠামো। লালচে ইটের। তারই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গাড়িটা। বিদেশি গাড়ি, সাদা রঙের।

কুশল জিজ্ঞেস করল, "গাড়িটা ওখানে গিয়ে দাঁড়াল কেন?"

মিতিন বলল, "ওটাই তো আৎসুর সমাধি।"

টুপুর বলল, "গাড়িটা চেনা চেনা লাগছে না?"

মিতিন গম্ভীর স্বরে বলল, "লোকটাকেও চেনা লাগবে। হুটোপাটি না করে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে আয়।"

দু'পাশে ইটভাঁটি, মধ্যিখান দিয়ে রাস্তা। দু'-চার পা এগোতে না-এগোতে দেখা গেল গাড়ি থেকে নামছে একটা লোক। সোজা ঢুকে গেল সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে। পরক্ষণে হনহনিয়ে বেরিয়ে এসে উঠে পড়ছে গাড়িতে।"

টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, এ তো ... !"

"চুপ। শব্দ করিস না, শুধু দ্যাখ, কী হয়।"

আৎসুর সমাধিকে পাক খেয়ে, গঙ্গার ধারের বিশাল বটগাছটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়িটা। ফিরছে। রীতিমতো স্পিড তুলে।

টুপুর-কুশলকে হতবাক করে দিয়ে মিতিন আচমকা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। রাস্তার একদম মাঝখানে গিয়ে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল গাড়ি। ড্রাইভারের সিটে পরিচিত মুখ। অধ্যাপক তরুণ বসু।

তরুণবাবু জানলা দিয়ে মাথা বাড়ালেন। আমতা আমতা করে বললেন, "কী ব্যাপার? আপনারাও এখানে?"

গাড়ির বনেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল মিতিন। বাঁকা সুরে বলল, "যাক, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে তা হলে! আমার ওপর দিয়ে অন্তত গাড়িটা চালিয়ে দেননি!"

তরুণবাবুর সৌম্য মুখে অমায়িক হাসি, "এ কী কথা! চাপা দেব কেন?"

"কারণ, চাপা দেওয়ার অভ্যেসটা যে আপনার আছে। মিস্টার

ঝিয়েনের ডেডবডির উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে তো আপনার হাত কাঁপেনি।"

"এসব কী বলছেন আপনি?" তরুণবাবু দরজা খুলে নামলেন। হতভম্ব স্বরে বললেন, "আপনার কথার মাথামুন্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন তো প্রোফেসর সাহেব?" মিতিনের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি, "কাগজ পড়ে মিস্টার ঝিয়েনের কাছ থেকে হাতানো ম্যাপটার উপর আস্থা রাখতে পারলেন না তো? যাচাই করতে চলে এলেন?"

"কী যা-তা বলছেন!" তরুণবাবুর মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, "আপনারা এখানে যে-কারণে এসেছেন, আমিও সেই কারণেই এসেছি। একটা হিস্টোরিক্যাল ঘটনার সাক্ষী হতে। নাথিং মোর, নাথিং লেস। ম্যাপ হাতানো-ফাতানো...এসব আবার কী ধরনের অ্যালিগেশন?"

"কিছুই বুঝতে পারছেন না, তাই তো?" তরতর পায়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা আটকে দাঁড়াল মিতিন। হাত উলটে বলল, "বেশ, থানায় চলুন তা হলে। ওখানে অভিযোগটার ফয়সালা হয়ে যাক।"

"ইউ আর গোয়িং টুউ ফার," তরুণবাবু গরগর করে উঠলেন, "জানেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?"

"ভাল মতোই জানি," মিতিনের স্বরও রুক্ষ হল, "একজন জঘন্য খুনির সঙ্গে। নিজেকে আরও বিখ্যাত করার জন্য মিস্টার ঝিয়েনের মতো সরল আলাভোলা বন্ধুকে যিনি অনায়াসে হত্যা করতে পারেন।"

"আআআমি খুন করেছি?"

"রেকর্ড তো তাই বলছে।"

"কীসের রেকর্ড?"

"আপনার কর্মকাণ্ডের। ওই দিন সাড়ে চারটের সময় আপনার গাড়ি এসে দাঁড়াল ন্যাশনাল লাইব্রেরির গেটে। আপনারই অনুরোধে ম্যাপটা আপনাকে দেখানোর জন্য সেখানে তখন অপেক্ষা করছিলেন মিস্টার ঝিয়েন। তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আপনি সোজা চলে এলেন প্রিন্সেপ ঘাটে। গঙ্গার ধারে বসে ভাল করে দেখলেন ম্যাপটা। তারপর কথাবার্তা বলে বুঝে নিতে চাইলেন টাকার বিনিময়ে মিস্টার ঝিয়েন আপনাকে ম্যাপটি দেবেন, কি দেবেন না। যখন দেখলেন, মিস্টার ঝিয়েন কোনও প্রলোভনেই রাজি হবেন না, তখন আপনি চরম পন্থাটি বেছে নিলেন।"

তরুণবাবু বিদ্রুপের স্বরে বললেন, "কী রকম? লোহার রড মেরে ঝিয়েনের মাথা দু'ফাঁক করে দিয়ে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে এনে রাস্তায় ফেলে দিলাম? তারপর গাড়ির চাকায় তাকে পিষে দিলাম? এবং গঙ্গার ধারের কোনও জনপ্রাণীর সেটি চোখে পড়ল না? তাই তো? সরি। গল্পটা কিন্তু আপনার জমছে না।"

"না-জমাটাই তো স্বাভাবিক," মিতিন মৃদু হাসল, "কারণ, ওই পদ্ধতিতে মার্ডার করে তো মোটা বুদ্ধির ক্রিমিনালরা। আপনার মোডাস অপারেন্ডিটা একটু সূক্ষ্ম।"

"কী রকম?"

"আপনি হাসিমুখেই ফিরলেন গাড়িতে। মিস্টার ঝিয়েনকে পাশে বসালেন। কিন্তু গাড়ি কিছুতেই স্টার্ট হল না। নেমে বনেট খুলে গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে লাগলেন। মিস্টার ঝিয়েনকেও ডাকলেন পাশে। অথবা কৌতূহলবশতও মিস্টার ঝিয়েন নিজেও নেমে এসে থাকতে পারেন। আপনি মিস্টার ঝিয়েনকে বললেন, ঝুঁকে ইঞ্জিনের ভেতরের কিছু একটা দেখার জন্যে। মিস্টার ঝিয়েন নিচু হওয়ামাত্র গাড়ির টুলবক্সের স্প্যানার দিয়ে মিস্টার ঝিয়েনের

মাথার পিছনে মোক্ষম আঘাত। চলন্ত গাড়ি বা দূরের কোনও পথচারীর সন্দেহ করার কোনও সুযোগই নেই এখানে। তার উপর তখন সন্ধে নেমেছে। মিস্টার ঝিয়েন মারা গেছেন কিনা নিশ্চিত হতে না পেরে দ্রুত তাঁর উপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্যই ম্যাপ আর মোবাইল তার আগেই আপনার কবজায় এসে গিয়েছে। ... এ গল্পটা জমছে কি?"

"ফালতু স্টোরি শোনার আমার সময় নেই।" তরুণবাবুর স্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল, "যত্ত সব আষাঢ়ে কল্পনা! আমার সঙ্গে ঝিয়েনের সেদিন দেখাই হয়নি। ... সরুন, যেতে দিন।"

"দাঁড়ান।" মিতিনের গলা অস্বাভাবিক রকমের কঠিন, "আপনি যে সেদিন দুপুর দেড়টায় মিস্টার ঝিয়েনকে কল করেছিলেন, সেটা কিন্তু ডিটেক্ট করা গিয়েছে।"

"বাজে কথা। আমি ঝিয়েনকে সেদিন ফোনই করিনি।"

"আপনার মোবাইল থেকে আপনি ফোনটা করেননি। বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকেও না।" মিতিনের ঠোঁটে ফের এক টুকরো হাসি, "ফোনটা আপনি করেছিলেন চিড়িয়াখানার সামনের এক এসটিডি, আইএসডি বুথ থেকে।"

"মিথ্যে। মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কি সত্যি সেটা বুথের ছেলেটাই বলবে। সে কিন্তু আপনার চেহারার বর্ণনা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে।"

"হতেই পারে না। বুথে তখন কোনও ছেলে ছিলই না। শুধু একজন মহিলা ..."

বেফাঁস কথাটা ঠিকরে বেরোতেই তরুণবাবুর বাকরোধ সহসা। মুখ পলকে ফ্যাকাশে। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছেন।

মিতিন দু'পা এগিয়ে গেল। ঠান্ডা গলায় বলল, "সো? ... ফোনটা তা হলে করেছিলেন?"

তরুণবাবুর ঘাড় আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ল। মুখ তুলছেন না আর। বিড়বিড় করে বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমি ঝিয়েনকে অনেক টাকা অফার করেছিলাম। এমন গোঁয়ারতুমি করছিল, ঝপ করে মাথাটা গরম হয়ে গেল।"

"ম্যাপটা পেলে লাভ কী হত আপনার?"

"ওটা যে কত বড় আবিষ্কার! ইতিহাসের পাতায় আমার নাম লেখা থাকত।"

"শুধু নিজের নামের জন্য মিস্টার ঝিয়েনের মতো একজন ভালমানুষকে ...? আপনি তো কিউরিও শপেও গিয়েছিলেন। দোকানের মালিককেই টাকাটা অফার করতে পারতেন।"

তরুণবাবু চমকে চোখ তুলে তাকালেন। পরক্ষণেই নামিয়ে নিয়েছেন মাথা। নিস্তেজ গলায় বললেন, "চিনা ভাষা তো পড়তে পারি না। ওটাই যে মো-ই-টংয়ের ম্যাপ, নিশ্চিত হব কী করে?" বলতে বলতে পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়লেন কান্নায়, "অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ঘোরতর অন্যায় করেছি। আমার পাপের কোনও ক্ষমা নেই।"

দু'-এক সেকেন্ড তাঁকে দেখে নিয়ে পায়ে পায়ে ইটভাঁটার দিকটায় গেল মিতিন। চেঁচিয়ে ডাকল, "ওসি সাহেব, এবারে আসুন।"

জনাপাঁচেক বন্দুকধারী পুলিশ বেরিয়ে এল ইটভাঁটার পিছন থেকে। মিতিনের ইশারায় ঘিরে ফেলেছে তরুণ বসুকে।

কুশলের চোখ ছানাবড়া। টুপুরও তথৈবচ।

"একটা প্রশ্ন করব, মিতিনমাসি?"

"একটা কেন, য'টা খুশি কর।"

"তুমি গেস করলে কী করে তরুণবাবুর সঙ্গে ঝিয়েন আঙ্কলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনেই হয়েছিল?"

"জলের মতো সোজা। ন্যাশনাল লাইব্রেরিই ছিল ওঁদের ইউজুয়াল মিটিং প্লেস। হঠাৎ অন্য কোথাও যেতে বললে মিস্টার ঝিয়েনের মনে সন্দেহ জাগত না?"

"কিন্তু ... শুধু তরুণবাবুর স্বীকারোক্তিই তো সম্বল। পরে তরুণবাবু ডিনাইও তো করতে পারেন। খুনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়?"

"সেটা জোগাড় করা কিছু এমন কঠিন নয়। প্রথমত, পুলিশ ওঁর বাড়ি থেকে ম্যাপটা পেয়ে গিয়েছে। আর জেরার মুখে মার্ডার ওয়েপনের সন্ধানও উনি দিয়ে দেবেন। আরে বাবা, যতই যা হোক, ভদ্রলোক হার্ডকোর ক্রিমিনাল তো নন, বেশি চাপ সহ্য করতে পারবেন না।"

"তা বটে।" টুপুর মাথা দোলাল। মুচকি হেসে বলল, "তবে যা-ই বলো, ফাঁদটা কিন্তু তুমি জব্বর পেতেছিলে!"

অবনী ইজিচেয়ারে। চোখ কুঁচকে শুনছিলেন মাসি-বোনঝির সংলাপ। পুট করে লঘু মন্তব্য ছুঁড়লেন, "জব্বর কী রে! বল, নাটকীয়। যবনিকা পতনের আগে চরম ক্লাইম্যাক্স।"

"এ ছাড়া যে আর উপায় ছিল না, অবনীদা। আমার তিন

সাসপেক্টই অত্যন্ত সম্মাননীয় ব্যক্তি। তাঁদের কারও সঙ্গেই এমন কিছু আচরণ করা সম্ভব ছিল না, যাতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন। অথচ আমাকে বেড়ালটাও ধরতে হবে। ... তবে হ্যাঁ, কেসটা নিয়ে দু'-চার পা এগিয়েই টের পেলাম, সন্দেহটা এক জায়গায় ঘনীভূত হচ্ছে। তিনজনের মধ্যে একমাত্র তরুণবাবুই সেদিন দুপুর থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ছিলেন ... যে-বুথ থেকে ফোন করা হয়েছে, সেটাও ন্যাশনাল লাইব্রেরির খুবই কাছে ... সুতরাং অরুণবাবুরই কল করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ... মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকেও ইনফরমেশন পাচ্ছি, সেদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তরুণবাবু মোবাইল থেকে মিস্টার ঝিয়েনকে অন্তত তিনটে কল করেছিলেন ... মিস্টার ঝিয়েনের শেষ আউটগোয়িং কলও তরুণবাবুর নাম্বারে ... কিন্তু এসবই তো ক্লু, খুনের প্রমাণ নয়। হাজারটা খরগোশ জোড়া লাগিয়ে তো একটা ঘোড়া বানানো যায় না। অতএব ছলচাতুরি ছাড়া আর পন্থা কী?"

পার্থ আর কুশল একমনে শিঙাড়া খাচ্ছিল। সহেলির হাতে বানানো। একটা গরম শিঙাড়ার কোণ ভাঙতে ভাঙতে পার্থ বলল, "আর তাই স্বপন দত্তকে পটিয়েপাটিয়ে একটা আজগুবি গপ্পো বানিয়ে ফেললে এবং অনিশ্চয়বাবুকে জপিয়েজাপিয়ে সেটা খবরের কাগজে ছাপানোর বন্দোবস্তও হয়ে গেল।"

"সত্যি, আই জি সাহেব এই কেসটায় কিন্তু দারুণ সাহায্য করলেন। আমার প্ল্যান মাফিক মন্টুকে অ্যারেস্ট করা থেকে শুরু করে ..."

"ও।" কুশল লাফিয়ে উঠল, "মন্টুকে গ্রেপ্তার করানোটা তবে তোমার চাল?"

"ইয়েস মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান। কারণ তখনও তো আমি বুঝতে পারছি না খুনি কতটা ডেঞ্জারাস। মন্টু যে লোকটাকে দেখেছিল,

সেই লোকটাই যদি আল্টিমেটলি খুনি হয়, তবে সে তো হবে খুব মূল্যবান সাক্ষী। অতএব খুনি তাকে টার্গেট করতেই পারে। তাই মন্টুর সিকিওরিটির কথা ভেবেই ...। ইনফ্যাক্ট, নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমি আগাগোড়াই মাথায় রেখেছি। যার জন্য স্বপন দত্ত বা লিয়াংদের আমি চিনেম্যানতলায় যেতে দিইনি।"

"তবু মন্টু বেচারাকে মিছিমিছি হাজতবাস করতে হল তো।"

"দুর, পরদিনই তো ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মন্টু এখন মেদিনীপুরের গ্রামে, নিজের দেশে। খবর না-পাওয়া পর্যন্ত ওর কলকাতামুখো হওয়া মানা আছে।"

সহেলি আরও এক প্লেট শিঙাড়া নিয়ে ঢুকেছেন ঘরে। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "হ্যাঁরে, লিয়াংয়ের বাবা ম্যাপখানা শেষ পর্যন্ত হাতে পেলেন?"

"পেয়ে যাবেন। পুলিশ আর কোর্টের কিছু ফরম্যালিটি আছে, হয়ে গেলেই ওঁর জিম্মায় দিয়ে দেওয়া হবে।"

"আহা, ওঁদের মুন ফেস্টিভ্যালের আগে পেয়ে গেলে খুব ভাল হয়। লিয়াংয়ের কাকার ইচ্ছেটা পূরণ হয় তা হলে।"

"দেখা যাক।" মিতিন শিঙাড়ায় কামড় দিল, "তবে লিয়াংয়ের বাবা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ম্যাপটা উনি নিজের কাছে রাখবেন না। কেসের ঝামেলা মিটলেই ম্যাপখানা উনি চিনা দূতাবাসে দিয়ে দেবেন।"

"খুব ভাল ডিসিশন।" অবনী সোজা হলেন, "ওই ম্যাপ তো চিনের জাতীয় সম্পত্তি। চিনের কোনও সংগ্রহশালাই ওর উপযুক্ত স্থান।"

পার্থ বলল, "ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগে, তাই না? ওরকম একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস বজবজের কোন এক দত্ত পরিবারে দুশো বছর ধরে অবহেলায় পড়ে ছিল!"

"অবাক কাণ্ড তো বটেই। সেই কবে ফিফটিন্থ সেঞ্চুরির গোড়ায় অ্যাডমিরাল জেং রাজার হুকুমে নৌকোটৌকো সাজিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন ... নৌকোয় বসে শিল্পী মো-ই-টং আঁকলেন পৃথিবীর ম্যাপখানা ... রাজরোষে পড়ে সেই ম্যাপ চলে গেল লোকচক্ষুর আড়ালে ... তারপর ঘুরপাক খেতে খেতে, ঘুরপাক খেতে খেতে, প্রায় চারশো বছর পর ম্যাপ চলে এল আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজে ... সেখান থেকে এক বাঙালিবাবুর হাতে ..."

পার্থ বলল, "ভাগ্যিস বাঙালিবাবুটির বংশধর ওয়ালহ্যাঙ্গিং ভেবে ম্যাপটাকে দোকানে ঝুলিয়েছিল! জঞ্জাল মনে করে ফেলে দেয়নি! এবার ওই ম্যাপের দৌলতে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মিথের যে কী দশা হবে!"

"যাক গে যাক, আমেরিকা আবিষ্কার নিয়ে পণ্ডিতরা যত পারেন চুল ছিঁড়ুন এখন।" মিতিন আর-একখানা শিঙাড়া তুলে নিল, "মিস্টার ঝিয়েনের কেসটা থেকে আমার কিন্তু বেশ লাভ হল।"

"মোটা টাকা পেলি বুঝি?" সহেলির প্রশ্ন ধেয়ে এল, "কত রে?"

"টাকা নয়, দিদি। জ্ঞানভাণ্ডারটা বাড়ল। চিনাদের সম্পর্কে আরও কত কিছু জানলাম।"

"কী জানলে?" পার্থর চোখ সরু, "বলো তো, চিনাদের এখন কোন বছর চলছে?"

"ভেরি এলিমেন্টারি কোয়েশ্চেন। এটা কুকুরের বছর। গত বছরটা ছিল মোরগের। তার আগেরটা বাঁদরের। এ ছাড়াও আছে ইঁদুর, ষাঁড়, সাপ, বাঘ, খরগোশ, ড্রাগন, ভেড়া, শুয়োর, ঘোড়া। মোট বারোটা জন্তুর নামে বারোটা বছর। চাইনিজ় ক্যালেন্ডারে বারো বছর পর পর সেম জন্তুর টার্ন আসে। কী ঠিক বলছি তো?"

মিতিনের তুরন্ত জবাবে পার্থ থতমত। আমতা আমতা করে

বলল, "জানো তা হলে? বলো দেখি, 'ড্রাগন বোট উৎসব' কবে হয়?"

"চিনাদের পঞ্চম চান্দ্রমাসের পঞ্চম দিনে।"

"আর 'লণ্ঠন উৎসব'?"

"প্রথম চান্দ্রমাসের পূর্ণিমার দিন।" মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "ইন্টারনেট ঘেঁটে খুব চিনবিশারদ হয়েছ দেখছি! এবার তুমি বলো তো, চিনারা কেন মৃতদেহ সমাধি দিতে যাওয়ার সময় চটের পোশাক পরে?"

"কেন বলো তো?"

"বিয়ের কনে কেন সাত রঙের সাতটা ফিতে গরম জলে ডুবিয়ে স্নান করে?"

"করে বুঝি?"

"স্নান সেরে বিয়ের কনে কেনই বা পান্তাভাত আর হাফবয়েল ডিম খায়?"

"খায়? সত্যি?"

"কেন ড্রাগন উৎসবের দিন বাঁশপাতার বালিশের মধ্যে চাল-ডাল সেদ্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দেয় চিনারা?"

"জানি না তো!"

"আমিও জানি না। অথচ জানা আমাদের উচিত ছিল। কলকাতায় এত চাইনিজ়দের বাস ... দু'-চার দিনের নয়, সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে ... অথচ তাদের সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের ইন্টারনেট ঘাঁটতে হয়।"

অবনী বললেন, "সত্যি, আমরা বাঙালিরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। আমাদের মনের জানলাটা আরও খোলা দরকার।"

মাসি-মেসো আর বাবা বকবকম করেই চলেছেন। সহেলি ফুট কাটছেন মাঝে মাঝে। কুশলও কথা বলছে টুকটাক। একমাত্র টুপুরই

যা আনমনা। তার মন চলে গিয়েছে এই শহর পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে। গাঢ় নীল মহাসাগরের বুকে। দু'পাশে ঢেউ তুলে সমুদ্র ভেঙে তরতর এগিয়ে চলেছে সারসার নৌকো। প্রকাণ্ড নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছেন এক চৈনিক যোদ্ধা। তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম, কোমরে তলোয়ার। দূরের দিকে স্থির তাকিয়ে আছেন সেই যোদ্ধা। পাশে এক মগ্ন শিল্পী। তুলোট কাগজে ছবি আঁকছেন পৃথিবীর। ওই শিল্পী কি জানতেন, প্রায় ছ'শো বছর পর ওই ম্যাপখানার জন্য প্রাণ দিতে হবে এক গবেষককে?

আঙ্কল ঝিয়েনকে দেখেনি টুপুর। তবু তাঁর জন্য হঠাৎই খুব কষ্ট হচ্ছিল টুপুরের। কান্না পাচ্ছিল। কেন যে বেচারা ম্যাপটার কথা বন্ধুদের বলতে গেলেন! কোনও মানে হয়? কোনও মানে হয়?

সবার অলক্ষে চোখের কোলটা মুছে নিল টুপুর।

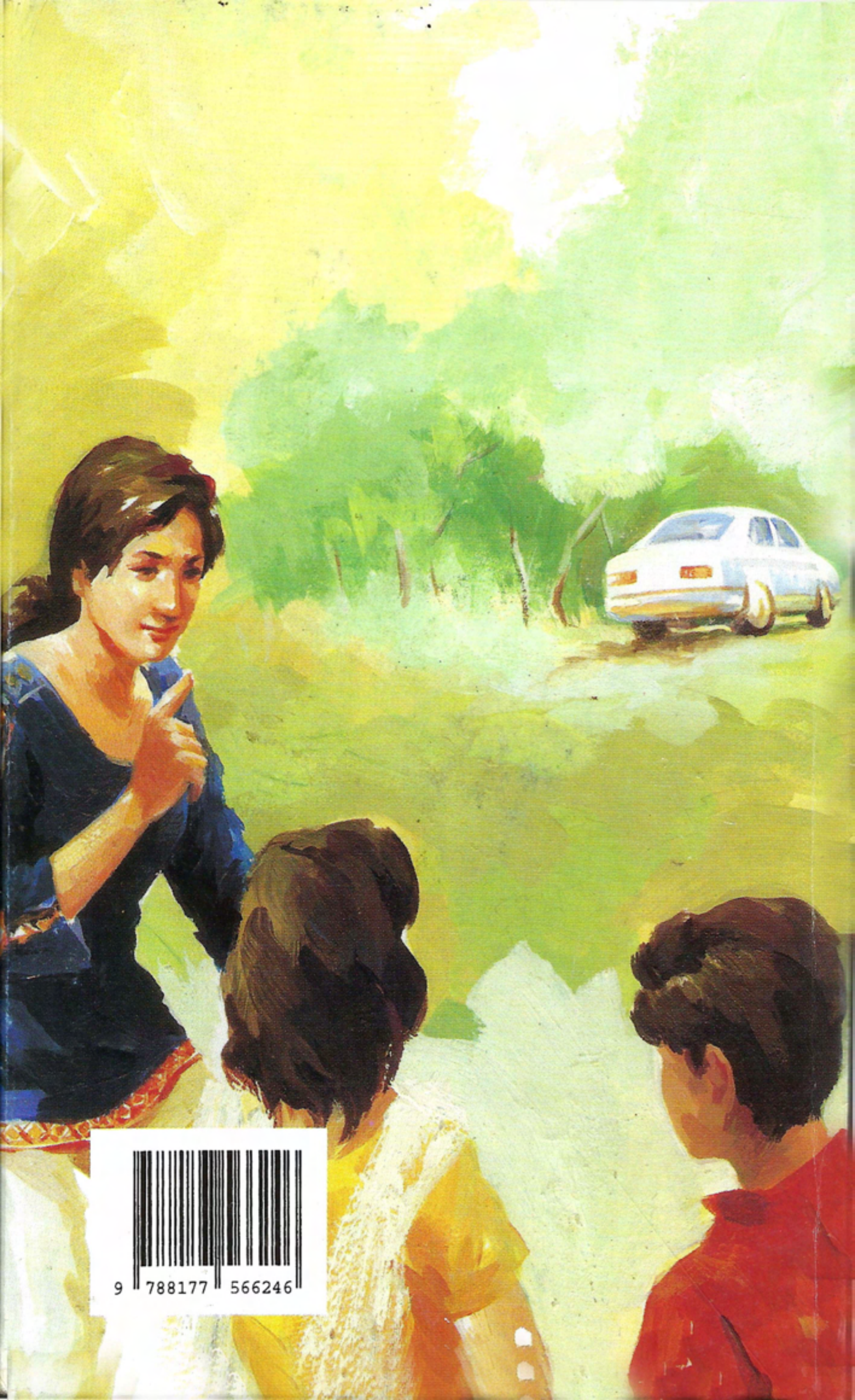

9 788177 566246

কিশোর কাহিনি সিরিজ

ছকটা সুডোকুর

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

ছকটা সুডোকুর

ছকটা সুডোকুর

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

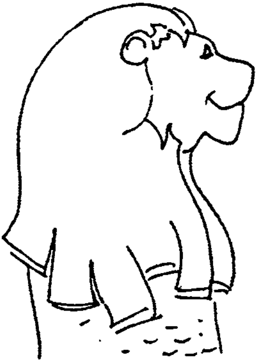

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

সিঙ্গাপুরের ছোট্ট সঙ্গী
অর্পণ বসুকে

অনেক দিন পর আজ একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল টুপুর। মিতিনমাসি আর বুমবুমের সঙ্গে। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের জলদস্যুদের নিয়ে গল্প। ছবির শুরু থেকে শেষ অবিরাম ঢিসুম ঢাসুম, তলোয়ারের ঝনঝনানি, আর মাস্তুলতোলা জাহাজে বিকট চেহারার দাড়িওয়ালা মানুষজনের বিস্তর লাফঝাঁপ। উপরি পাওনা, সুন্দর-সুন্দর সিনারি। সমুদ্রে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নীল সাগরের বুকে সবুজ-সবুজ পাহাড়ি দ্বীপ...আহা, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। টানা আড়াই ঘণ্টা জমজমাট সব দৃশ্য দেখে টুপুর যখন সিট ছেড়ে উঠল, গত এক মাসে পরীক্ষার চাপে জেরবার হয়ে যাওয়া মাথা দিব্যি ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে।

হল থেকে বেরোতে না-বেরোতেই মিতিনমাসির মোবাইল ফোনে সুরেলা ঝংকার। নম্বরটা দেখে নিয়ে, দু'-চারটে 'হুঁ-হ্যাঁ আচ্ছা' বলে ফের ভ্যানিটিব্যাগে চালান করে দিল ফোন।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কে গো? তোমার কোনও ক্লায়েন্ট?"

"উঁহু, তোর মেসো। আজ শনিবার তো, তাড়াতাড়ি ফিরেছে প্রেস থেকে। আর ফিরেই হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে।"

"কেন?"

"কী যেন এক জব্বর খবর আছে।"

"কী খবর?"

"ভাঙল না তো। বলল, সাসপেন্স। বাড়ি গেলে তবে জানাবে।"

"তা হলে ফোনটা করল কেন?"

"ওটাই তো তোর মেসোর ট্যাকটিক্স। ভেবেছে কৌতূহলে পেট ফুলবে, দৌড়তে-দৌড়তে আমরা বাড়ি চলে যাব।... যাক গে যাক, খাবি কিছু?"

বুমবুম বেশ একটা বড়-বড় হাবভাব নিয়ে পাশে-পাশে হাঁটছিল। খাওয়ার কথা কানে যেতেই লাফিয়ে উঠেছে, "চিপ্‌স খাব, চিপ্‌স।"

মিতিন মাথা নেড়ে বলল, "এখন নো চিপ্‌স।"

"তা হলে আইসক্রিম?"

"চলতে পারে। তবে পেটে সলিড কিছু পড়ার পর... গরম গরম মোমো খেলে কেমন হয়?"

আহারের ব্যাপারে বুমবুমের অজস্র ফ্যাঁকড়া। তবে মোমোর প্রস্তাবটা তার মনে ধরেছে। টুপুরেরও। এলগিন রোডের ফুটপাত ধরে এগোচ্ছিল তিনজনে, পথ বদলে চলে এসেছে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালের সামনে। ছোট্ট তিব্বতি রেস্তরাঁয় ঢুকে অর্ডার দেওয়া হল স্টিম্‌ড মোমোর। সঙ্গে টুপুরের জন্য তার প্রিয় থুপকাও।

খেতে-খেতে সিনেমাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বুমবুম বলল, "মা, জলদস্যুরা বড় বেশি নিষ্ঠুর হয়, তাই না?"

"হুম। খুব মারপিট করে। লুটপাটের সময় ওরা কোনও বাধা মানে না, ঘ্যাচাং-ঘ্যাচাং মাথা কাটে।"

"আমাদের দেশে জলদস্যু নেই?"

"আগে অনেক ছিল। এখনও আছে কিছু। তারা মাঝে-মাঝে সুন্দরবনের নদীগুলোতে লঞ্চ বা নৌকোর যাত্রীদের উপর হামলা চালায়।"

"অবশ্য আমরা ওদের জলদস্যু বলি না," টুপুর এবার নিজের জ্ঞান জাহির করল, "আমরা ওদের নাম দিয়েছি হার্মাদ।"

"দুর বোকা, এখনকার ওই ডাকাত-লুঠেরাগুলো হার্মাদ হতে যাবে কেন? হার্মাদ তো পর্তুগিজ জলদস্যু। স্পেন-পর্তুগালের

নৌবহরের নাম একসময় ছিল 'আর্মাডা'। পর্তুগিজ জলদস্যুরা বিরাট-বিরাট জাহাজ নিয়ে আসত বলে কীভাবে যেন ওই আর্মাডা শব্দটা লোকের মুখে-মুখে হার্মাদ হয়ে গিয়েছিল।"

"বুঝেছি, যেমন মরাঠা দস্যুদের বলা হত বর্গি।"

"রাইট। বর্গ মানে শ্রেণি বা দল। মরাঠিরা দল বেঁধে আক্রমণ করত তো, তাই বর্গ থেকে বর্গি। কিংবা ধর, মগ। ব্রহ্মদেশ, অর্থাৎ বর্মা... এখন কিনা যার নাম মায়ানমার... সেখানকার লোকরা নামের আগে লিখত মং, আমাদের যেমন শ্রী বা শ্রীমান। ওই মং থেকেই বর্মার লোকের নাম হয়েছিল মগ।"

"তাই নাকি?" টুপুরের চোখ বড়-বড়, "আমরা যে তা হলে কথায়-কথায় 'মগের মুলুক' বলি, সেটা আসলে বর্মাদেশ?"

"ইয়েস ম্যাডাম। এককালে ওখানে ভীষণ অরাজক অবস্থা ছিল। কেউ আইন-কানুনের তোয়াক্কা করত না। খুন-জখম, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই লেগেই থাকত। তাই যে দেশে কেউ কোনও নিয়মকানুন মানে না, সেটাকে আমরা বলি মগের মুলুক।"

এত সব জ্ঞানগর্ভ বিষয় বুমবুমের বুঝি একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। মাত্র দু'খানা চিকেন মোমোতে তার পেট ভরে গিয়েছে, এখন সে আইসক্রিম চায়। অগত্যা চটপট প্লেট শেষ করে টুপুরদের উঠতেই হল। বাইরে এসে ছেলেকে একটা স্ট্রবেরি কাপ কিনে দিয়ে মিতিন ট্যাক্সি ধরেছে। জানলার ধারে বসে আইসক্রিম চাটতে-চাটতে চলেছে বুমবুম, মাসি আর বোনঝি কথা বলছে টুকটাক। ট্যাক্সি যখন বাড়ির সামনে পৌঁছল, তখনও বুমবুমের কাপ চাটা শেষ হয়নি।

তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজাতে হল না, তার আগেই পার্থ দরজা খুলেছে। সম্ভবত ব্যালকনিতে ছিল, দেখতে পেয়েছে ট্যাক্সি। উত্তেজিত মুখে বলল, "তোমরা এত দেরি করলে?"

মিতিন সেভাবে আমল দিল না। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল,

“তো? হয়েছেটা কী?”

“খবরটা দেব বলে কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি... এমন একটা গ্র্যান্ড নিউজ়...”

“হুঁ। বুঝলাম। তা প্রাইজ়টা কী?”

পার্থ থতমত খেল একটু। ঢোক গিলে বলল, “কী করে বুঝলে প্রাইজ় পেয়েছি?”

“সিম্পল। তোমার উচ্ছ্বাস দেখে,” মিতিন চটি ছেড়ে সোফায় গিয়ে বসল। ভুরু বাঁকিয়ে বলল, “এটুকু আন্দাজ করতে পারি বলেই তো আমি ডিটেকটিভ হয়েছি, নয় কি?”

“তা বটে!” পার্থ হেসে ফেলল, “এবার তা হলে প্রাইজ়টাও গেস করে ফ্যালো।”

“হবে হাঁড়ি-কড়া গোছের কিছু। কিংবা স্যান্ডউইচ-টোস্টার। অথবা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি।”

“ঢিলটা মোটেই লাগল না ম্যাডাম!” পার্থর হাসি চওড়া হল, “সুডোকু মেলানো নিয়ে খুব আওয়াজ দিতে না আমায়? ওই সুডোকুর কল্যাণেই একটা ফ্যান্টাস্টিক অফার পেয়েছি।”

“কীরকম?”

“ফুল ফ্যামিলি বিদেশ ভ্রমণ। প্রায় নিখরচায়।”

এবার মিতিনও চমকেছে। টুপুরের তো চক্ষুস্থির হওয়ার দশা। এমনও হয় নাকি?

আস্তে-আস্তে ব্যাপারটা খোলসা হল। ইদানীং শব্দছকের পাশাপাশি নতুন একটা নেশায় মেতেছে পার্থ। সুডোকু। খবরের কাগজ হোক, ম্যাগাজিনই হোক, যেখানেই ওই ন' ঘরের সংখ্যাছক চোখে পড়ে, অমনই বসে যায় মেলাতে। খুচরো প্রাইজ়ের আশায় পোস্ট করে দেয় নির্দিষ্ট ঠিকানায়। অবশ্য একটা আলপিনও জোটেনি কখনও। কিন্তু এবার সত্যি-সত্যি কপালে শিকে ছিঁড়েছে।

গত তিন মাস ধরে, ফি রোববার, ইংরিজি খবরের কাগজের সঙ্গে একটা হ্যান্ডবিল আসছিল বাড়িতে। সুডোকুর ছকসহ। দিল্লির কোন এক পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনালের পাঠানো। হ্যান্ডবিলে ঘোষণা থাকত, ঠিকঠাক ছক মিলিয়ে অমুক পোস্টবক্সে পাঠিয়ে দিন। প্রথম সঠিক উত্তরদাতার জন্য রয়েছে এক আকর্ষক পুরস্কার। তা পার্থ প্রতিবারই তড়িঘড়ি পাঠিয়ে দেয়, তবে কিছুতেই ফার্স্ট হতে পারে না। অবশেষে নবম চেষ্টায় সফল হয়েছে সে। এবং পুরস্কারটাও সত্যিই লোভনীয়। স্বামী-স্ত্রী আর একটি বাচ্চার সিঙ্গাপুর যাতায়াতের প্লেনভাড়া দিচ্ছে পেঙ্গুইন ইন্টারন্যাশনাল। সঙ্গে সিঙ্গাপুরের কোনও একটি বিশেষ হোটেলে তিন দিন, দু' রাত থাকার খরচাও।

বলতে-বলতে পার্থ উল্লাসে ফুটছিল। প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ব্যাপারটা বুঝলে তো? যাতায়াত ফ্রি, থাকা ফ্রি। শুধু খাওয়াদাওয়ার খরচটা যা লাগবে। আর এদিক-ওদিক বেড়ানো, কি কিছু কেনাকাটার। একটা বিদেশি শহরে টুঁ মেরে আসার কেমন সুন্দর সুযোগ এসে গেল, বলো?"

"কিন্তু..." মিতিনের তবু যেন ধন্দ যায় না। চোখ কুঁচকে বলল, "যত দূর জানি, এই ধরনের প্রাইজে শুধু হোটেলের খরচটাই দেয়। এরা প্লেনফেয়ারও দেবে?"

"দিচ্ছে তো। এটাই হয়তো পেঙ্গুইন রিসর্ট্সের মার্কেটিং স্টাইল। ওখানকার যে হোটেলে রাখবে, তাদের সঙ্গে এদের হয়তো কোলাবরেশন আছে। সিঙ্গাপুরে টুরিজম প্রোমোট করার এটাই হয়তো নতুন কায়দা।"

"হুম, হতে পারে!" মিতিন মাথা নাড়ল, "কই, চিঠিটা দেখি।"

"চিঠি তো কম্পিউটারে। আমার মেল বক্সে।"

"তোমার ই-মেল অ্যাড্রেস ওদের দিয়েছিলে বুঝি?"

"অবশ্যই। জলদি চিঠি চালাচালি করতে এখন ই-মেলই তো ভরসা। সেকেন্ডের মধ্যে দুনিয়ার যে-কোনও প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়," পার্থ সোফায় বাবু হয়ে বসল, "যাক গে, কাজের কথা শোনো। আমাদের যাত্রার সম্ভাব্য তারিখটা ওরা জানতে চেয়েছে। সেই অনুযায়ী প্লেনের টিকিট পাঠাবে। বেশি দেরি করা যাবে না, কারণ অফারটার মেয়াদ মাত্র এক মাস। আজ ২৪ মার্চ, ২৪ এপ্রিলের মধ্যে আমাদের ঘুরে আসতে হবে।"

"অসুবিধের কী আছে? বুমবুমের তো পরীক্ষা হয়েই গিয়েছে, আমারও এই মুহূর্তে হাতে কোনও কাজ নেই, আমরা নেক্সট উইকেই যেতে পারি," মিতিন যেন এতক্ষণে বেশ খুশি-খুশি।

"আমাদের তিনজনেরই তো পাসপোর্ট আছে। সিঙ্গাপুরের ভিসা পাওয়াও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এখন তো শুনি, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে নেমেও ভিসা করিয়ে নেওয়া যায়। দু'-তিন দিন বেড়িয়ে এলেও মাথাটা বেশ ফ্রেশ হয়ে যাবে।"

"বটেই তো। তোমার তো এখন যা ঘোরাঘুরি, সব কাজের জন্য। স্রেফ আরাম করে বেড়ানো তোমার আর হয় কোথায়! কী রে টুপুর, ঠিক বলছি কিনা বল?"

টুপুরের বুকটা কেমন ভার-ভার ঠেকছিল। মাসি, মেসো আর বুমবুম তিন-চার দিনের জন্য বেড়াতে যাবে, এতে তো তার হিংসে জাগা উচিত নয়, তবু মনটা কেমন খচখচ করছে। উদাস গলায় টুপুর বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও। তোমাদের সকলেরই ভাল লাগবে। খুব মজা করতে পারবে।"

পার্থ চোখ পিটপিট করল, "তুই যাবি নাকি সঙ্গে?"

"আমি কী করে যাব? ওরা তো শুধু তোমাদের তিনজনকেই..."

"সো হোয়াট? তুইও যেতে পারিস। তোর খরচ আমি দেব। পাসপোর্টও তো আছে তোর। তাই না?"

টুপুর খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ল। গত বছর টুপুরের বাবা একটা সেমিনারে যোগ দিতে ঢাকা গিয়েছিলেন, তখনই টুপুর আর টুপুরের মা'র পাসপোর্টটাও করিয়ে রেখেছিলেন। অবনীর সঙ্গে যদিও টুপুর আর সহেলির বাংলাদেশ যাওয়া হয়নি, তবে পাসপোর্টটা তো আছে।

ঈষৎ লজ্জা-লজ্জা মুখে টুপুর বলল, "কিন্তু... স্কুল কামাই হবে... আমার সুবিধেমতো ডেটে যদি যাওয়া না হয়..."

"বকিস না তো! তিন দিন স্কুল ডুব মারলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না," পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "জানিস, আমি প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে চার দিন স্কুল বাঙ্ক করতাম।"

"আর রাস্তায়-রাস্তায় ডাংগুলি খেলে বেড়াতে," মিতিন ফোড়ন কাটল।

"নো। আই ওয়াজ় আ ফুটবলার। পাউরুটি, আলুরদমের বিনিময়ে কত দূর-দুরান্তে খেপ খেটে এসেছি। স্ট্রাইকার হিসেবে আমার যা নাম ছিল... সমস্ত ক্লাব আমায় খেলানোর জন্য ঝুলোঝুলি করত। বারাসত থেকে ডাকছে, উলুবেড়িয়া থেকে ডাকছে... নেহাত কলেজে উঠে ফুটবলটা ছেড়ে দিলাম, নইলে ন্যাশনাল টিমে তো আমার জন্য জায়গা বাঁধা ছিল।"

"হয়েছে, এবার গুল মারা থামাও," মিতিন দু' হাত তুলল "চটপট গিয়ে আগে ই-মেলটার জবাব দিয়ে দাও তো। লিখবে, আমাদের সঙ্গে এক্সট্রা একজন যাচ্ছে, তার এয়ারটিকিট আমরা করে নেব। আর পারলে যেন এমনভাবে ব্যবস্থা করে, যাতে মাঝে শনি-রোববারটা থাকে।"

"তুমিও তা হলে ততক্ষণে ভাল করে কফি বানিয়ে ফ্যালো। তোমার আরতিরানি কাজ সেরে যাওয়ার সময় এমন এক কাপ চা খাইয়েছে, মুখ তিতকুটে মেরে আছে।"

পার্থমেসো কম্পিউটারে বসল। মিতিনমাসি রান্নাঘরে। বুমবুম টিভিতে কার্টুন দেখছে। সিন চ্যাং। ভয়ংকর এক দুষ্টু ছেলের কাহিনি, বেশিক্ষণ তার কাণ্ডকারখানা দেখলে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। টুপুর দু'-পাঁচ মিনিটের বেশি বসতে পারল না টিভির সামনে। পায়ে-পায়ে চলে গেল মিতিনমাসির নিজস্ব চেম্বারটায়।

এই ঘরখানায় ঢুকলেই অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগে টুপুরের। কত কিছু যে আছে এখানে! সম্প্রতি একটা ল্যাপটপ কিনেছে মিতিনমাসি, বাহারি ছোট্ট কম্পিউটারখানা শোভা পাচ্ছে টেবিলে। দেওয়ালজোড়া র‍্যাকে থরে-থরে বই আর বই। ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য, সবই অবস্থান করছে পাশাপাশি। এ ছাড়াও আছে অজস্র ফাইল। নানান কেসের। এক-একটা বিষয় ধরে খবরের কাগজের কাটিং জমায় মিতিনমাসি, সেই ফাইলও সংখ্যায় কম নয়। কোনওটায় একের পর-এক খুনের খবর। কোনওটায় শুধু কিডন্যাপিং। কিংবা জালিয়াতি, ডাকাতি। গত তিন-চার বছরের একটা অপরাধও বোধ হয় মিতিনমাসির তথ্যভাণ্ডারের বাইরে নেই। এত গুছিয়ে কাজ করে বলেই না ঝানু গোয়েন্দা হিসেবে মিতিনমাসির এত নামডাক!

বইয়ের তাক ঘেঁটে টুপুর একটা মানচিত্রের বই বের করল। পাতা উলটে-উলটে থামল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ম্যাপে। সিঙ্গাপুর খুঁজছে।

হ্যাঁ, পেয়েছে। ভারতের পরে বাংলাদেশ, তারপর মায়নমার। তারপর মগের মুলুক পেরিয়ে, আন্দামান সমুদ্র ছুঁয়ে, তাইল্যান্ডকে পাশে রেখে, মালয়েশিয়া অতিক্রম করে সিঙ্গাপুর দ্বীপ। ও-ওইখানে যাবে টুপুর?

ইস, টুপুরের বিশ্বাসই হচ্ছে না। এমন আকস্মিকভাবে সিঙ্গাপুর ভ্রমণটা আকাশ থেকে খসে পড়ল! শেষমেশ যাওয়া হবে তো সত্যি-সত্যি? এর মধ্যে দুম করে মিতিনমাসির কোনও কেস না এসে যায়!

॥ ২ ॥

নাঃ, কোনও গড়বড় হল না শেষ পর্যন্ত। পার্থ সম্মতি জানানোর তিন দিনের মধ্যেই উত্তর হাজির। এবার আর ই-মেল নয়, কুরিয়ারের মাধ্যমে। সুদৃশ্য খামে, হালকা নীলরঙা পেঙ্গুইনের একটা বড়সড় লোগো বসানো প্যাডে চিঠি পাঠিয়েছে পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল। পত্রের বয়ানটি সংক্ষিপ্ত, নেহাতই কেজো। 'শ্রীপার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় ও তার পরিবারকে এই ভ্রমণটি উপহার দিতে পেরে পেঙ্গুইন রিসর্ট্স কৃতার্থ বোধ করছে। তারা আশা করে, ভ্রমণটি অবশ্যই উপভোগ্য হবে। সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে তাদের প্রতিনিধি যথাসময়ে উপস্থিত থাকবে এবং হোটেলবাসের যথাযথ বন্দোবস্ত করে দেবে।'

খামে তিন-তিনখানা বিমান-টিকিটও মজুত। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের। পার্থ, মিতিন, আর বুমবুমের নামে। যাওয়া ৩ এপ্রিল, শুক্রবার। ফেরা সোমবার রাতে। অর্থাৎ ঠিক যেমনটি চাওয়া হয়েছিল, তেমনটি।

ব্যস, পার্থকে আর পায় কে! আনন্দে প্রায় লাফাতে-লাফাতে কম্পিউটারে বুক করে ফেলল টুপুরের টিকিট। সিঙ্গাপুরে নেমে ভিসা করাতে গিয়ে কী ঝামেলা হয় কে জানে, এখানকার এক ট্র্যাভেল এজেন্ট বন্ধুকে ধরে একদিনেই বের করে ফেলল সিঙ্গাপুরবাসের অনুমতি। টাকা ভাঙিয়ে সিঙ্গাপুর ডলার কিনল বেশ কিছু। খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি, কেনাকাটার খরচ তো নিজেদেরই করতে হবে। দু'-তিন দিনের জন্য পাহাড়প্রমাণ জামাকাপড়ও

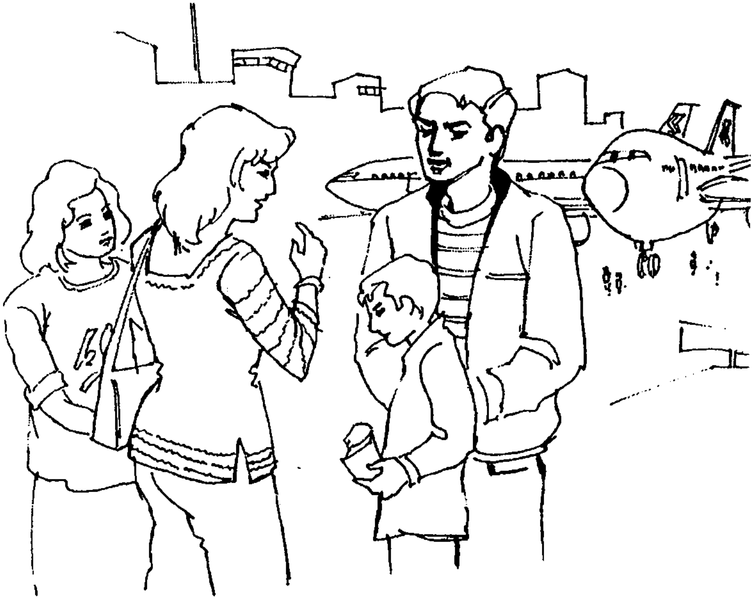

গুছিয়ে নেওয়া হল সুটকেসে। এবার শুধু উড়লেই হয়।

টুপুরও উত্তেজনায় ফুটছিল। জীবনে এই প্রথম বিদেশভ্রমণ বলে কথা! বাবা-মা'র সঙ্গে নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন তো টুপুরের রীতিমতো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ফ্লাইট রাত ১১টা ৫০-এ। টুপুরদের বিদায় জানিয়ে ফিরে গিয়েছেন অবনী আর সহেলি। শুল্কদপ্তর আর নিরাপত্তা বেষ্টনী টপকে দোতলার ঝকঝকে লাউঞ্জে এসে বসল টুপুররা। প্লেন ছাড়তে এখনও খানিক দেরি, একটু-একটু করে যাত্রীতে ভরে যাচ্ছে লাউঞ্জ। সাহেব, মেমসাহেব, চিনা, জাপানি, বাঙালি, অবাঙালি,

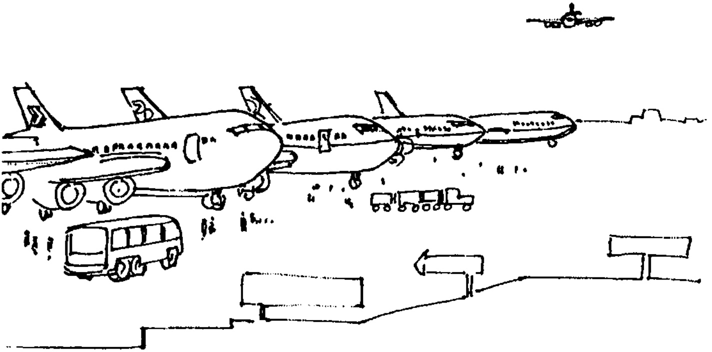

কতরকম যে লোক। কেউ বা একা বসে, কেউ গল্পগুজব করছে, কেউ বা হেঁটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। চা-কফি স্ন্যাক্স কোল্ড ড্রিঙ্কসের ছোট্ট-ছোট্ট দোকানগুলো বন্ধ ছিল এতক্ষণ, ঝাঁপ খুলতেই কিয়স্কগুলোর কাউন্টারে খুচরো জটলা। লাউঞ্জে একটা টিভিও চলছে, সেদিকেও চোখ মেলেছে কেউ-কেউ। অনেকেরই কানে মোবাইল, দরকারি কথা সারছে টুকটাক। কোণের বিনা পয়সার টেলিফোন বুথেও হালকা লাইন।

পার্থ হাঁটতে-হাঁটতে ওই বুথের দিকেই গিয়েছিল। একবার কফিশপেও ঢুঁ মেরে এসে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কিছু খাবি নাকি?"

টুপুরের অল্প-অল্প খিদে পাচ্ছিল। ন'টার মধ্যে এয়ারপোর্টে আসতে হয়েছে, সন্ধেবেলার লুচি-তরকারি হজম হয়ে গিয়েছে মোটামুটি। ঠোঁট কুঁচকে বলল, "কী পাওয়া যাবে?"

"পেস্ট্রি, স্যান্ডউইচ..."

"না না, ওসব এখন খেতে হবে না। প্লেনে উঠলেই তো ডিনার দেবে," মিতিন প্রস্তাবে জল ঢেলে দিল, "বরং দু'-এক প্যাকেট চিপ্‌স নাও, কফির সঙ্গে খাই।"

বুমবুম ঢুলছিল এতক্ষণ। চিপ্‌সের নাম কান যেতে সে আচমকাই চাঙা। উজ্জ্বল মুখে বলল, "আমি কিন্তু একটা গোটা প্যাকেট খাব।"

এসে গেল মুচমুচে চিপ্‌স। পার্থ আর মিতিনের কফিও। কাগজের কাপে চুমুক দিয়ে মিতিন বলল, "কী রে, কেমন দেখছিস লাউঞ্জটা? মনে হচ্ছে না একটা মিনি পৃথিবী?"

টুপুর ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ, সে তো বটেই।"

"ইন্টারেস্টিং কিছু চোখে পড়ছে?"

টুপুর এদিক ওদিক ঘাড় ঘোরাল, "ওই দু'জন বুদ্ধিস্ট মঙ্কের কথা বলছ? ন্যাড়া মাথা? গেরুয়া পরা?"

"নাঃ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এখনও বৌদ্ধদের রমরমা। ওঁরা তো থাকবেনই।... আর কিছু?"

চিপ্‌স চিবোতে-চিবোতে আর-একবার প্রকাণ্ড হলঘরের মতো জায়গাটাকে নিরীক্ষণ করল টুপুর। আমতা-আমতা করে বলল, "কই, সেভাবে তো..."

"আমার অবজ়ারভেশনটা বলব?" পার্থ ফুট কাটল, "ওই যে টেলিফোন বুথের সামনে তিনটে লোক দাঁড়িয়ে... ওরা মনে হচ্ছে একটু সন্দেহজনক। সম্ভবত ওরা ক্যারিয়ারের কাজ করে।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "সেটা কী?"

"সিঙ্গাপুর থেকে নানা ধরনের জিনিসপত্র কিনে এনে এখানকার

বাজারে বেচা হয়। এই ধর, ফ্যান্সি মার্কেটে, বাগরি মার্কেটে... কেনাকাটা আর চোরাপথে মাল আনার বন্দোবস্ত করে এই সব ক্যারিয়াররা। এদের পিছনে থাকে বড় কোনও ব্যবসায়ী বা স্মাগলার। লাভের গুড় সেই লোকটাই খায়, এরা ক্যারি করে আনার জন্য কিছু পয়সা পায় শুধু।"

"কী কাণ্ড, কাস্টমস এদের ধরে না?"

"কখনও ধরা পড়ে, কখনও বেরিয়ে যায়। ওই ঝুঁকিটুকুর জন্যই তো টাকা দেওয়া হয় ওদের।"

লোক তিনটেকে ভাল করে দেখল টুপুর। চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব নেই। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। পোশাক-আশাকও নিতান্ত সাধারণ। নিজেদের মধ্যে হাত নেড়ে-নেড়ে গল্পগুজব করছে লোকগুলো। টুপুরের মনে পড়ল, শুল্ক দপ্তরের অফিসাররা এদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিলেন। জেরা করছিলেন কি? হবেও বা।

ভাবনাটার সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা প্রশ্নও উঁকি দিয়েছে টুপুরের মাথায়। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা পার্থমেসো, এরা কি নিষিদ্ধ ড্রাগটাগও নিয়ে আসে? ওই যে কাগজে মাঝে-মাঝে বেরোয়, দমদম বিমানবন্দরে কোকেন বা হেরোইন ধরা পড়েছে..."

"হ্যাঁ, ওসব দ্রব্যও তো ক্যারিয়াররাই বহন করে আনে," এবার পার্থর বদলে মিতিনের জবাব, "তবে সিঙ্গাপুর থেকে ড্রাগ আনা ভীষণ কঠিন।"

"কেন?"

"ড্রাগের ব্যাপারে সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্ট সাংঘাতিক কড়া। ড্রাগসমেত কেউ সেখানে ধরা পড়লে তার একটাই শাস্তি। ডেথ, প্রাণদণ্ড। অতএব খেয়াল রেখো... এটা শুধু তোমাকে নয়, তোমার মেসোকেও বলছি, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে নিজের হ্যান্ডব্যাগটি

সম্পর্কে সাবধান। আত্মভোলা হয়ে থাকলে চলবে না। ড্যাবড্যাব করে ডিউটি-ফ্রি শপে জিনিস দেখছ... পুট করে কেউ ব্যাগে একটা প্যাকেট গুঁজে দিল... ব্যস, তা হলেই তুমি গেলে।"

"এই শর্মা মোটেই অত ক্যালাস নয়," পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "সুডোকু প্র্যাকটিস করার পর থেকে আমার চোখ-কান আরও অনেক বেশি খুলে গিয়েছে।"

"দ্যাট্স গুড। কফি শেষ করে কাগজের কাপটা পার্থর হাতে ধরিয়ে দিল মিতিন, "এটা বিনে ফেলে এসো তো।"

বুমবুম বলল, "আমায় দাও। আমি ফেলে আসছি।"

ফাঁকা কাপদুটো নিয়ে দৌড় লাগাল বুমবুম। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উলটো দিকের সোফায় বসে থাকা এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। পার্থর চেয়ে খানিক বড়ই হবেন বয়সে। শ্যামলা রং, গাট্টাগোট্টা চেহারা, হাইট মাঝারি, মাথায় অল্প টাক। পরনে কালো ট্রাউজ়ার্স আর আকাশি নীল বুশশার্ট। অনেকক্ষণ থেকেই এদিকে তাকিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক, বারকয়েক চোখাচোখিও হয়েছে টুপুরের সঙ্গে, টুপুর তেমন আমল দেয়নি।

ভদ্রলোক বিনীত স্বরে পার্থকে বললেন, "এক্সকিউজ় মি। আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। আগে কোথাও আমাদের দেখা হয়েছে কি?"

পার্থ থতমত খেল সামান্য। বলল, "না মানে... আমি তো ঠিক... মনে করতে পারছি না।"

"যদি কিছু মনে না করেন... আপনার নামটা জানতে পারি?"

"পার্থপ্রতিম মুখার্জি।"

নামটাকেও বুঝি মনে-মনে হাতড়ালেন ভদ্রলোক। মাথা নেড়ে বললেন, "কিন্তু আমার যে খুব... আচ্ছা, আপনি কি সেন্ট পল্স স্কুলে পড়তেন?"

“না তো। আমি সেন্ট কালী,” বলেই পার্থ একগাল হাসল, “আমি কালীপ্রসাদ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ছিলাম।”

“ও। তা হলে কি কর্মসূত্রে কোথাও...?”

“আপনি কোথায় কাজ করেন?” পার্থ চোখ সরু করল।

“আমার কাপড়ের ব্যাবসা। বড়বাজারের পগেয়াপট্টিতে। আপনি কি যান ওদিকে?”

“না তো। আমি বউবাজারে একটা ছোট প্রেস চালাই। ক্যানিং স্ট্রিটে যাই মাঝে-মাঝে। কাগজ কিনতে।”

“ও। তা হলে হয়তো শিয়ালদা-টিয়ালদা কোথাও... আমি শিয়ালদা হয়েই বাড়ি ফিরি তো!”

“হতে পারে। আবার হয়তো আমি নয়, আমার মতো আর কাউকে দেখেছেন। একই টাইপের ফেসকাটিং তো আরও থাকতে পারে।”

“তাই কি?” ভদ্রলোকের তবু যেন ধন্দ যাচ্ছে না। চোখ পিটপিট করে বললেন, “আচ্ছা... বাই এনি চান্স... আপনি কি আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে থাকতেন কখনও? বা মানিকতলার কাছাকাছি?”

“না না, আমি বরাবর দক্ষিণ কলকাতায়। আগে ভবানীপুরে ছিলাম, এখন ঢাকুরিয়ায়।”

“তা হলে বোধ হয় ঢাকুরিয়াতেই আপনাকে দেখেছি। প্রায়ই তো ঢাকুরিয়া যাই। আমার এক মাসির বাড়ি। ওই পাড়াতেই সম্ভবত...”

“আপনার মাসির বাড়ি কোথায়? স্টেশনের এপার? না ওপার?”

“স্টেশনের পশ্চিম দিকে। বাবুবাগান।”

“আমরা থাকি পুবে। শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডে।” পার্থ একগাল হাসল, “একমাত্র শিয়ালদা টু ঢাকুরিয়া ট্রেন ছাড়া আমাদের দেখা হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা খুব কম।”

“তাই হবে। হয়তো ট্রেনে, কিংবা রাস্তায়...” ভদ্রলাক এবার যেন

একটু লজ্জিত, "সরি, মিছিমিছি আপনাকে বিরক্ত করলাম।"

"আরে না, আমি একদমই মাইন্ড করিনি। বরং ভালই তো, আলাপ পরিচয় হয়ে গেল।"

"তা ঠিক। নতুন-নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে আমারও বেশ লাগে।" ভদ্রলোক হাসলেন, "আপনারা কদ্দুর চললেন? সিঙ্গাপুর? নাকি ভায়া সিঙ্গাপুর অন্য কোথাও?"

"আমাদের দৌড় সিঙ্গাপুর পর্যন্তই।"

"বেড়াতে?"

"ওই আর কী! আলটপকা একটা সুযোগ জুটে গেল, ভাবলাম ঘুরেই আসি।"

"বেশ করেছেন। সিঙ্গাপুর ভারী সুন্দর শহর। ...ক'দিন থাকছেন তো?"

"তিন দিন, দু' রাতের প্যাকেজ টুর।"

"আই সি। তার মানে কোনও ট্র্যাভেল কোম্পানির সঙ্গে যাচ্ছেন? ওরাই ঘোরাবে?"

"ঠিক তা-ও নয়। আমরা নিজেরাই ঘুরব ফিরব। পেঙ্গুইন কোম্পানি শুধু আমাদের হোটেলের ব্যবস্থাটা করে দেবে।"

"পেঙ্গুইন?"

"পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল। নাম শুনেছেন?"

"মনে হচ্ছে, শোনা-শোনা। আপনাকে যেমন দেখা-দেখা মনে হচ্ছিল।" বলেই ভদ্রলোক দরাজ গলায় হেসে উঠলেন, "আমার এই এক বদরোগ, বুঝলেন। হঠাৎ-হঠাৎ কোনও মানুষকে চেনা-চেনা মনে হয়। অথবা কোনও নাম শুনেই মনে হয় শোনা-শোনা। আমার মা বলেন..."

ভদ্রলোকের মা কী বলেন তা আর শোনা হল না। বোর্ডিং গেট খুলে গিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে লাউঞ্জে চকিত ব্যস্ততা। সিট নম্বর

অনুযায়ী ডাক চলছে মাইক্রোফোনে, সুড়ঙ্গপথের মতো লম্বা এয়ারব্রিজে একে-একে ঢুকে পড়ছে যাত্রীরা।

প্লেনের গেটে বিমানসেবিকাদের সুস্বাগতম পেরিয়ে টুপুররা নিজেদের সিটে এসে বসল। প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ। প্রতিটি সারিতে দশজনের বসার জায়গা। দু' দিকে জানলার ধারে তিন তিন ছয়, মধ্যিখানে চার। রাত্রিবেলা বাইরে কিছু দেখার নেই, তার উপর বসাও যাবে একসঙ্গে, তাই ভেবেচিন্তে মাঝের সিটই নিয়েছে পার্থ।

কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটা পঞ্চাশে রানওয়ে ধরে ছুটল প্লেন। টুপুরের বিমানযাত্রা এই প্রথম নয়, গত বছরই মুম্বই যাতায়াত করেছিল আকাশপথে। তবু বিমান আকাশে উড়তেই বুকে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ। শরীর যেন হালকা হয়ে গেল সহসা। এবার কানে তুলো লাগাব-লাগাব করেও লাগায়নি শেষ পর্যন্ত। একটু পরে কানদুটো যেন ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। একে নাকি বলে হাই অল্টিটিউড সিনড্রোম। পার্থমেসোর ভাষায়, 'উঁচুতে ওঠার গেরো।' প্লেন নীচে নামার পরেও নাকি বেশ খানিকক্ষণ থেকে যায় ভোঁ-ভোঁ ভাব। কান কটকটও করে কখনও কখনও।

মিতিনমাসির পরামর্শমতো বেশ খানিকক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে, ছাড়া-নেওয়া করে কান দুটোকে সমে ফেরাল টুপুর। সিটবেল্ট খোলার সংকেত পেয়ে ভাল করে গুছিয়ে বসেছে। প্লেন ছাড়ার আগেই হেডফোন বিলি করা হয়েছিল যাত্রীদের, যন্ত্র কানে লাগিয়ে বুমবুম চোখ রেখেছে সামনের সিটের পিঠে লাগানো খুদে মনিটরে। কার্টুন দেখছে। মিতিনমাসিই চালিয়ে দিয়েছে। টুপুর, মিতিনমাসি, আর পার্থমেসোর সামনে, মনিটরে, ফুটে উঠেছে বিমানের যাত্রাপথ। এখন বিমান ঠিক কোথায়, কতটা উচ্চতায়, সেখানকার তাপমাত্রাই বা কত, সবই দেখা যাচ্ছে পরদায়।

কোল্ড ড্রিঙ্কস আর চানাচুরের প্যাকেট দিয়ে গেল হাস্যমুখ

বিমানসেবিকা। আর-একটু পরে বুঝি নৈশাহার দেবে। বুমবুমের চানাচুর নিমেষে শেষ, হাত বাড়িয়েছে টুপুরের প্যাকেটে। পার্থও চিবোচ্ছে কচরমচর করে। মেনুকার্ডটা উলটেপালটে দেখে নিয়ে বলল, "আমি কিন্তু সেদ্ধ-সেদ্ধ কন্টিনেন্টাল খাব না।"

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "সে তো আমি জানি। সাধে কি তোমায় ভেতো বলি!"

"ভাতকে অত হেলাফেলা কোরো না ম্যাডাম। জাপানিরা ভাত খায় বলেই এত কর্মঠ। এত বুদ্ধিমান। ইন ফ্যাক্ট, ভাতের জন্যই আমার অঙ্কে এত মাথা!"

"শুধু ক'টা সংখ্যা মেলানো অঙ্ক নয়, স্যার। একটা পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে পৌঁছনোটাও অঙ্ক। আর সে ব্যাপারে তোমার মগজ টুঁটু।"

"কী করে বুঝলে?"

"তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে। একটা সম্পূর্ণ অচেনা লোক তোমার পেট থেকে যাবতীয় খবর নিয়ে চলে গেল, অথচ তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জানার চেষ্টা করলে না!"

"কেন, জেনেছি তো। উনি একজন বস্ত্রব্যবসায়ী। বড়বাজারে দোকান।"

"ব্যস, ওইটুকুই। বলো তো, ভদ্রলোকের নাম কী?"

পার্থ একটুক্ষণ মাথা চুলকোল। তারপরই গুম। ঘাড় উঁচিয়ে দেখল এদিক-ওদিক। হঠাৎই সিট ছেড়ে উঠে গেছে। ভদ্রলোককে খুঁজে বের করে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে।

টুপুর সভয়ে বলল, "সর্বনাশ, পার্থমেসোকে তুমি রাগিয়ে দিলে তো! এখন ভদ্রলোককে না উলটোপালটা প্রশ্ন করে বসে।"

"ছাড় তো," মিতিন পাত্তাই দিল না। ছোট্ট মনিটরে আঙুল রেখে বলল, "এদিকে তাকা। দ্যাখ, আমরা বাংলাদেশ পেরিয়ে এখন

বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছি। কাছাকাছি ল্যান্ড এখন মায়ানমার।"

"মানে মগের মুলুক?"

"হুম। বর্মায় আগে কত বাঙালি থাকত, জানিস? একসময় তো ধুয়ো ছিল, এদেশে কিছু হচ্ছে না, বর্মা পাড়ি দাও। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রই তো বাড়ি থেকে পালিয়ে বর্মা চলে গিয়েছিলেন। ওখানকার মান্দালয় জেলে আমাদের এখানকার স্বাধীনতাসংগ্রামীদের রাখা হত।"

টুকটাক ইতিহাস আর ভূগোল নিয়ে কথা চলছিল। আলোচনা পুরোপুরি জমে ওঠার আগেই পার্থ ফিরে এসেছে। ধপাস করে সিটে বসে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "পেট থেকে কথা আমিও বের করতে পারি।"

মিতিন চোখ দিয়ে ইশারা করতেই টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী-কী জানলে গো পার্থমেসো?"

"এভরিথিং। ভদ্রলোকের নাম, সুজিত দত্ত। থাকেন সোদপুরে। এইচ-বি টাউনে। পগেয়াপট্টির দোকানটা ওঁর ঠাকুরদার আমলের। দোকান ছাড়াও সুজিতবাবুর আর-একটা ব্যাবসা আছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের। সেই কাজেই বছরে বেশ কয়েকবার সিঙ্গাপুরে যেতে হয় ওঁকে। বিয়ে-থা করেননি। অত্যন্ত মাতৃভক্ত। বাবা হঠাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা যাওয়ার পর মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু বোঝেন না।" পার্থ তেরচা চোখে মিতিনকে দেখল, "কী, আর কিছু জানতে চাও?"

"না। তবে ইনফরমেশনগুলো সত্যি না মিথ্যে, তা তো বোঝার উপায় নেই।"

"মানে? তুমি বলতে চাও, ভদ্রলোক মিথ্যে বললেন?"

"হতেও পারে। যাচাই করার তো কোনও উপায় নেই।"

"খামোকা উনি বানিয়ে-বানিয়ে বলবেন কেন?"

"সে আমি কী করে বলব! জাস্ট মনে হল, তাই..."

পার্থ গোমড়া মুখে বলল, "টুপুর, তোর মাসির স্বভাবটা বেজায় কুচুটে হয়ে গিয়েছে। সব ব্যাপারে টিকটিকিপনা করা চাই। ভাল্লাগে না।"

মিতিন হেসে ফেলল, "রাগ করছ কেন? ঠেকেছি তো দু'-একবার, তাই ভয় হয়। হঠাৎ কোনও উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে বেড়ানোর অর্ধেকটাই তো মাটি।"

টুপুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "ভদ্রলোককে কি তোমার উটকো ঝামেলা মনে হচ্ছে?"

"বলতে পারছি না রে, না হলেই তো মঙ্গল!"

॥ ৩ ॥

কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর অনেকটাই পুবে। সময়ের হিসেবে আড়াই ঘণ্টা এগিয়ে। অর্থাৎ কলকাতায় যখন রাত বারোটা, সিঙ্গাপুরে রাত আড়াইটে। অতএব প্রায় চার ঘণ্টা আকাশপথে পাড়ি দিয়ে প্লেন যখন সিঙ্গাপুরের চাংগি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামল, সেখানে তখন সকাল ছ'টা কুড়ি।

এয়ারব্রিজ থেকে বেরিয়ে, ইমিগ্রেশন কাউন্টার অবধি যেতে গিয়ে টুপুর বেজায় মুগ্ধ। ম্যাপে সিঙ্গাপুর একটা ফুটকির মতো দেশ, তার কী পেল্লাই এয়ারপোর্ট! ভিতরে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য, চলমান রাস্তা। কাচ ঘেরা অজস্র লাউঞ্জ। অগুনতি বোর্ডিং গেট। কাচের ওপারে, গুমটিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের মতো

সার-সার এরোপ্লেন দেখা যায়। ডিউটি ফ্রি শপের এলাকাও কী বিশাল! কত কিসিমের যে ঝলমলে দোকান সেখানে। সব মিলিয়ে কার্পেট মোড়া বিমানবন্দরের অন্দরটি রীতিমতো চোখ ধাঁধানো।

পাসপোর্ট ভিসা পরীক্ষার জায়গাটা নীচে। চলন্ত সিঁড়ি ধরে নামতে হয়। ছোট-ছোট লাইন পড়েছে সেখানে। কাউন্টারের কর্মীরা বেশ চটপটে, কাজ হচ্ছে দ্রুত। লাইন থেকেই টুপুর দেখতে পেল তাদের আগে বেরিয়ে গেলেন সুজিত দত্ত। টুপুরদের দিকে সেভাবে ফিরেও তাকালেন না। লাগেজ সংগ্রহের সময়ে তাঁকে এদিক-ওদিক খুঁজল টুপুর। চোখে পড়ল না। এবারও আগেই চলে গিয়েছেন।

টুপুর মনে-মনে হাসল একটু। প্লেনে পার্থমেসো কীভাবে জেরা করেছেন কে জানে, তারপর থেকে ভদ্রলোক আর তাদের দিকে ঘেঁষছেনই না। বুঝি টের পেয়েছেন, তাঁর গায়েপড়ে ভাব জমানোটা টুপুরদের পছন্দ হয়নি। ভদ্রলোককে মিছিমিছি সন্দেহ করারও বোধ হয় কোনও মানে হয় না। পার্থমেসোই ঠিক। ডিটেকটিভরা দড়িকে সাপ বলে ধরে নেয়।

কাস্টম্‌সের গণ্ডি পেরোতেও সময় লাগল না বিশেষ। ব্যাগ-সুটকেস ট্রলিতে বসিয়ে ঝাঁ-চকচকে এয়ারপোর্টটার বাইরের দিকে এল টুপুররা। পার্থমেসোর পিছু-পিছু। অনেক মানুষ অপেক্ষা করছে এখানে। কারও হাতে নাম লেখা প্ল্যাকার্ড, কেউ বা সন্ধানী চোখে তাকাচ্ছে ইতিউতি। কিন্তু পেঙ্গুইনের লোক কোথায়?

এতক্ষণ পার্থ দারুণ সপ্রতিভ ছিল, এবার যেন ফাঁপরে পড়েছে। ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো টুপুরকে বলল, "কী রে, আমার নাম লেখা কোনও বোর্ড দেখছি না যে?"

"তাই তো। যদি কেউ নিতে না আসে কী হবে?"

"ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমরা কি জলে পড়ে গিয়েছি?" বুমবুমের হাত শক্ত করে ধরে থাকা মিতিন অভয়বাক্য শোনাল, "একেবারে

AIRPORT

খালি হাতে তো আসিনি। সিঙ্গাপুরের ট্যাক্সি সার্ভিসের খুব সুনাম। টুরিস্টদের সচরাচর ঠকায় না। তেমন বুঝলে ট্যাক্সি পাকড়াও করে ভাল কোনও হোটেলে চলে যাব।"

তার অবশ্য দরকার হল না। হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেন এক ভদ্রলোক। বয়স বছর পঞ্চাশ। কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। গায়ের রং আবলুশ কাঠের মতো কালো। মুখখানা যেন শুকনো লিচুর আঁটি। পরনে কালো সুট, কটকটে লাল রঙের টাই।

ব্যস্তসমস্তভাবে ভদ্রলোক বললেন, "আই হোপ ইউ আর মিস্টার পি পি মুখার্জি? ফ্রম ক্যালকাটা?"

পার্থ গম্ভীরস্বরে বলল, "ইয়েস।"

"আয়্যাম ফ্রম পেঙ্গুইন রিসর্ট্‌স ইন্টারন্যাশনাল," ভদ্রলোক ঝুঁকলেন সামান্য। দক্ষিণ ভারতীয় টানে ইংরেজিতে বললেন, "অনুগ্রহ করে আমাদের সংস্থার আমন্ত্রণপত্রটি দেখাবেন কি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," পার্থ কাঁধের ব্যাগ থেকে খাম বের করে দিল। মুখটা খুলে ভদ্রলোক আলগা চোখ বোলালেন চিঠিতে। তারপর চিঠিসুদ্ধ খাম চালান করলেন কোটের পকেটে। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে গদগদ মুখে বললেন, "ওয়েলকাম স্যার, পেঙ্গুইন রিসর্ট্‌স ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সিঙ্গাপুরে সুস্বাগতম। আমি কি আপনাদের অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি?"

"খুব বেশি নয়, মিনিটদশেক।"

"সরি স্যার। দেরি হওয়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ... আসুন, আপনাদের গাড়ি রেডি আছে।"

গাড়িটা জাপানি। চেহারাটি নয়নলোভন। গাড়িতে ওঠার আগে মোবাইল ক্যামেরায় টুক করে গাড়িটার একটা ছবি তুলে নিল পার্থ। তারপর বসল সামনের সিটে। দরজা খুলে ভদ্রলোকও উঠেছেন।

পার্থর পাশে। চালকের আসনে। পিছনে টুপুর, মিতিন, বুমবুম। আকাশে বুমবুমের ঘুম তেমন জুতসই হয়নি, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে ওঠামাত্র সে চোখ বুজে ফেলল।

এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এল গাড়ি। প্রথমটা ভদ্রলোক চুপচাপই ছিলেন, পার্থর কৌতূহলের তোড়ে মুখ খুললেন ধীরে-ধীরে। দিব্যি জমে গেল আলাপ। ভদ্রলোক তামিল। নামটি বিশাল। কুম্ভকনম শ্রীনিবাসরাঘবন সৌম্যনারায়ণ। বারবার আউড়েও নামটা গুলিয়ে ফেলছিল পার্থ। অবশেষে ভদ্রলোকই সরল করে দিলেন। বললেন, তাঁকে কে এস এস বলেও ডাকা যেতে পারে। কিংবা শুধু নারায়ণ।

কথায়-কথায় জানা গেল চাকরিসূত্রে ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন ভদ্রলোক। আপাতত কর্মসূত্রে সিঙ্গাপুরে আছেন বছরপাঁচেক। কলকাতাতেও নাকি ছিলেন কিছুদিন। সেই সূত্রেই ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলতে পারেন। বোঝেনও মোটামুটি।

জানলার বাইরে চোখ মেলে, অচেনা শহরটাকে দেখতে-দেখতে নারায়ণের কথা শুনছিল টুপুর। কী চমৎকার চওড়া-চওড়া মসৃণ রাস্তাঘাট। দু' ধারে একের পর এক আকাশছোঁয়া অট্টালিকা। তবে শুধু ইটকাঠের জঙ্গল নয়, মাঝে-মাঝেই ঘন সবুজেরও দর্শন মিলছে। কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই। সবে সওয়া সাতটা, এর মধ্যেই অসংখ্য গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। মাপা গতিতে ছুটছে তারা। নিঃশব্দে। হর্ন না বাজিয়ে। চমৎকার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। কোথাও কোনও পথচারী যেমন-তেমনভাবে রাস্তা পার হচ্ছে না। ফুলে ভরা বোগেনভেলিয়ার লতায় সাজানো ফুটব্রিজ রয়েছে কিছু দূর অন্তর-অন্তর, ওই সেতু ধরেই পথ পারাপার করছে মানুষ। এমন ছবির মতো শহর দেখলে মনটা এমনিই কেমন ভাল হয়ে যায়!

টুপুর আপন মনে বলে উঠল, "সিঙ্গাপুর তো সত্যিই ভারী সুন্দর!"

প্রশংসাটা নারায়ণের পছন্দ হয়েছে। খুশি-খুশি মুখে বললেন, "অবশ্যই সুন্দর। তবে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে এমনটি ছিল না। এখন সিঙ্গাপুর নিজ গুণে সারা দুনিয়ার নজর কেড়েছে।"

"সত্যি, কী ছিল সিঙ্গাপুর আর কী হয়েছে!" ঘুমন্ত বুমবুমের মাথা কাঁধে টেনে নিয়ে মিতিন বলে উঠল, "এক সময় তো এখানে চুরি-ছিনতাই খুনখারাপি লেগেই থাকত। ঠগ জোচ্চোরের ভয়ে লোকে সিঙ্গাপুরে আসতেই চাইত না।"

পার্থ বলল, "আহা, অতটা বদনাম কোরো না। হাল খারাপ হয়েছিল ঠিকই, তবে সে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। যখন জাপানিরা ব্রিটিশদের হারিয়ে সিঙ্গাপুরের দখল নিয়েছিল। তার আগে এই রকম ঠাটবাট না থাকলেও শহরটার কিন্তু নাম ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বন্দরগুলোর একটা বলে কথা। সিঙ্গাপুর থেকে কোথায় না জাহাজ ছাড়ত তখন!"

"সে তো এখনও যায়। শুধু জাহাজ নয়, উড়োজাহাজও।"

"তবে বন্দরটা আরও বড় হয়েছে ম্যাডাম," নারায়ণ মিটিমিটি হাসছেন, "পৃথিবীর খুব কম মালবাহী জাহাজই বলতে পারবে, সে কখনও সিঙ্গাপুর ছোঁয়নি। প্লাস, এখানে এখন কত ইন্ডাস্ট্রি। জাহাজ তৈরির কারখানা, অয়েল রিফাইনারি, ইস্পাত... এ ছাড়া বিশাল-বিশাল শপিং সেন্টার... ইলেকট্রনিক গুড্স তো এখানে অনেক সস্তায় পেয়ে যাবেন।"

পার্থ টুপুরের দিকে ঘুরে বলল, "মাইন্ড ইট, সিঙ্গাপুরের এত উন্নতি কিন্তু হয়েছে গত তিরিশ-চল্লিশ বছরেই।"

"ঠিক বলেছেন," নারায়ণ সায় দিলেন, "জাপানিরা শহরটাকে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছিল। শুধু একজন মানুষ দেশটাকে নতুন করে গড়ে তুললেন।"

মিতিন বলল, "আপনি নিশ্চয়ই লি-কোয়ান-ইউয়ের কথা বলছেন?"

"ইয়েস ম্যাডাম। প্রচুর ঝড়ঝাপটা গিয়েছে সিঙ্গাপুরের উপর দিয়ে। জাপানিরা হটে যাওয়ার পর আবার এল ব্রিটিশ শাসন। তারপর বেশ কিছুদিন খিচুড়ি অবস্থা। এক সময় সিঙ্গাপুর ঢুকে গেল মালয়েশিয়ার মধ্যে। সেখান থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা এল ১৯৬৫-তে। আর তখন থেকেই লি-কোয়ান-ইউ শক্ত হাতে হাল ধরলেন সিঙ্গাপুরের। এখানকার স্থানীয় মানুষদের মুখে তো গল্প শুনি, তিনিই নাকি সিঙ্গাপুরের বাসিন্দাদের স্বভাবচরিত্র পুরো বদলে দিয়েছেন।"

"কী রকম? কী রকম?" টুপুর কৌতূহলী হল।

"বলে শেষ করা যাবে না," নারায়ণ নিপুণ হাতে গাড়ি বাঁয়ে ঘোরালেন, "ছোট একটা উদাহরণ দিই। সিঙ্গাপুরে চিনারাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। প্রায় সত্তর ভাগ। তাদের একটা অভ্যেস ছিল যত্রতত্র থুতু ফেলার। এখন এই দ্বীপে একটা চিনাকেও তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না, যে রাস্তায় থুতু ফেলছে।"

"জানি," মিতিন মাথা নাড়ল, "এককালে নিয়ম না মানার জন্যই সিঙ্গাপুর কুখ্যাত ছিল। এখন সর্বত্রই এখানে নিয়মের শাসন। কেউ পথঘাট নোংরা করে না, ট্রাফিক আইন অমান্য করে না, কোথাও কোনও বেচালপনা নেই, রাত দুপুরেও যেখানে ইচ্ছে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়..."

"তাই নাকি?" পার্থ ঠাট্টা জুড়ল, "সিঙ্গাপুরকে কি তা হলে স্বর্গরাজ্য বলতে পারি?"

"প্রায়। তবে এমনই এমনই হয়নি। এখানে ঠেলার নাম বাবাজি। এ দেশে আইন এমনই কঠোর যে, ভয়ে আইন মানে লোকে। অন্যায় করলে শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। সে তুমি যত শাহেনশা লোকই

হও না কেন," মিতিন বুমবুমের চুলে বিলি কাটছে, "একটা ঘটনার কথা বলি শোনো। মাইকেল ফে নামে এক আমেরিকান ছেলে জাস্ট মজা করে একটা দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির গায়ে আঁচড় কেটেছিল। এখানে রাস্তায়-রাস্তায় লুকনো ক্যামেরা থাকে, ছেলেটি ওই ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। শাস্তি হয়, কুড়ি ঘা বেত মারা হবে তাকে। খবর রটে যেতেই চারদিকে হইহই, আমেরিকারও মাথায় হাত। একজন আমেরিকান সিঙ্গাপুরের মতো এক পুঁচকে দেশের বিচারে প্রকাশ্যে বেত খাবে? স্বয়ং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট লি-কোয়ান-ইউকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, মাইকেল ফে-কে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। লি-কোয়ান-ইউয়ের সাফ জবাব, 'অসম্ভব। আমাদের দেশে আইন ইজ আইন। তবে হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট যখন অনুরোধ করছেন, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে বেতটা আস্তে মারা হবে।'"

"তুমি এই গপ্পো জানলে কোত্থেকে?" পার্থর ভুরুতে ভাঁজ, "আগে বলোনি তো?"

"মন দিয়ে নিউজ় পেপার পড়তে হয়, স্যার। শুধু শব্দজব্দ আর সুডোকুর জন্য তো কাগজ কেনা হয় না।"

"কবে বেরিয়েছিল কাগজে?"

"বিল ক্লিন্টন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।"

"ধুৎ, গুল মারছ," পার্থর তবু অবিশ্বাস যায় না, "কী মিস্টার নারায়ণ, আপনি শুনেছেন গল্পটা?"

"মনে করতে পারছি না। তবে ম্যাডাম যখন বলছেন, হতেও পারে," নারায়ণ এবার ডান দিকে গাড়ি ঘোরালেন। অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় ঢুকেছেন। ভিড়-ভিড় এলাকা। গাড়ির গতি কমিয়ে বললেন, "ম্যাডাম দেখছি খবরটবর রাখেন খুব? সাংবাদিকতার পেশায় আছেন নাকি?"

"না না, ও তো প্রফেশনাল..."

পার্থ পরিচয়টা দেওয়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই মিতিনের প্রশ্ন, "আসল খবরটাই তো এখনও জানা হয়নি মিস্টার নারায়ণ। আমরা উঠছি কোথায়?"

"কার্লটন হোটেল।"

"সেটা কোথায়?"

"লিটল ইন্ডিয়ায়," নারায়ণের স্বরে পেশাদারি ভদ্রতা, "আমাদের ভারতীয় অতিথিরা লিটল ইন্ডিয়ায় থাকাই পছন্দ করেন।"

"অভারতীয় অতিথিও আসেন বুঝি?"

"অবশ্যই। সুডোকুর প্রতিযোগিতা পৃথিবীর অনেক শহরেই চলে। নিউ ইয়র্ক, সিডনি, টোকিও, লন্ডন... পেঙ্গুইন রিসর্টস্ ইন্টারন্যাশনাল শুধু নামেই নয় ম্যাডাম, কাজেও আন্তর্জাতিক। এই তো, আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আমি এক জাপানি দম্পতিকে রিসিভ করতে যাব।"

বলতে-বলতে গাড়ির গতি আরও কমিয়েছেন নারায়ণ। বাঁয়ে হোটেল কার্লটনের সাইনবোর্ড। বড়সড় কম্পাউন্ডটায় ঢুকে গাড়ি হোটেলের দোরগোড়ায় থামল। নারায়ণ নেমে নিজের হাতে দরজা খুলে ধরেছেন, "আসুন আপনারা, প্লিজ।"

প্রথম দর্শনেই হোটেলটা বেশ মনে ধরে গেল টুপুরের। সামনে অর্ধবৃত্তাকার লন, আর ফুলের বাগান দিব্যি শোভা এনে দিয়েছে বহিরঙ্গে। চারতলা বিল্ডিংটাও বেশ নতুন-নতুন। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, শ্বেত পাথরের মেঝে... নাঃ, পেঙ্গুইন ইন্টারন্যাশনাল খুব-একটা আজেবাজে জায়গায় রাখছে না।"

একতলার ১০৪ নম্বর রুমে টুপুরদের ঢুকিয়ে দিয়ে নারায়ণ বিদায় নিলেন। নিজের মোবাইল নম্বরও দিয়ে গেলেন যাওয়ার আগে। পরশু সন্ধে অবধি এই হোটেলই এখন টুপুরদের আস্তানা।

ঘরে এসে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে বুমবুমকে। টুপুরও পাশে গড়িয়ে পড়ল। মিতিন ঘুরে ঘুরে দেখে নিচ্ছে টয়লেট, অ্যান্টি রুম। কাঠের দেওয়াল-আলমারিতে ব্যাগ সুটকেস রেখে দিয়ে বড় করে আড়মোড়া ভাঙল পার্থ। চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল, "কী রে টুপুর, ঘরটা কেমন?"

"সবই ভাল। শুধু..."

"কী শুধু?"

"দোতলা-তিনতলা হলে বেটার হত। ব্যালকনি পাওয়া যেত একখানা।"

"এই তো বিপদে ফেললি," পার্থ আঙুলে চুল পাকাচ্ছে, "দাঁড়া, রিসেপশনে একবার বলে দেখি। যদি পটিয়ে-পাটিয়ে ম্যানেজ করতে পারি... এক্সট্রা কিছু লাগে তো দিয়ে দেব।"

বলেই পার্থ দুম করে ধাঁ। ফিরল প্রায় মিনিট কুড়ি পর। চোখ-মুখে টগবগ করছে উত্তেজনা।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী গো, ব্যবস্থা হল?"

"আজ নয়, কাল সকালে পেয়ে যাব। টপ ফ্লোরে। খুশি?"

"ভীষণ।"

"এবার তার চেয়েও বড় খবরটা দিই? শুনে তোর মাসি বুদ্ধিতে শান দিতে থাকুক?"

"কী খবর গো?"

লাগোয়া বাথরুম থেকে জল ছিটিয়ে এসে মুখ মুছছিল মিতিন। তোয়ালে কাঁধে ফেলে বলল, "সুজিত দত্ত এই হোটেলে উঠেছেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ, এই মাত্র চেক ইন করলেন," বলতে বলতে পার্থ তোতলাচ্ছে, "তু-তু-তুমি কী করে জানলে?"

মিতিন হেসে বলল, "আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির নাম কী মনে

আছে তো? থার্ড আই। তৃতীয় নয়ন। এটা আমার ওই তৃতীয় চক্ষুর নমুনা।"

টুপুর আর পার্থ চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। নাঃ, কারওরই মাথায় ঢুকছে না।

॥ ৪ ॥

সাড়ে ন'টা বাজে। বুমবুম এখনও ঘুমে কাদা। সে না জাগা পর্যন্ত বেড়াতে বেরনোর কোনও সুযোগই নেই। অগত্যা টুপুর আর মিতিন স্নান সেরে নিল একে-একে। রাতে প্লেনে কারওরই ঠিকঠাক ঘুম হয়নি, ফলে গা-টা ম্যাজম্যাজ করছিল। শাওয়ারের ঠান্ডা জলে বেশ তরতাজা হল শরীর। এবার পার্থ ঢুকেছে বাথরুমে।

সুজিত দত্তর কেসটা এখনও টুপুরের মাথায় চেপে আছে। চুলটুল আঁচড়ে, জিন্‌স, টি-শার্ট পরে ঘরের বাইরে একবার পাক খেয়ে এল টুপুর। টানা লম্বা প্যাসেজ একেবারে শুনশান, দু'ধারে সব ক'টা রুমেরই দরজা বন্ধ। উঁহু, বোঝার জো নেই সুজিত দত্ত ধারেকাছে আছে কিনা।

ঘুরে এসে টুপুর ফের মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "সুজিত দত্ত কি সত্যিই আমাদের ফলো করে এখানে এসে উঠল?"

সুটকেস খুলে বুমবুমের জামাপ্যান্ট বের করছিল মিতিন। হালকা গলায় বলল, "আমি তো কোনও কারণ দেখি না।"

"আমিও। ভদ্রলোক আমাদের অযথা ধাওয়া করবেনই বা কেন? এখানে ওঠা হয়তো নিছক কাকতলীয়।"

"সেরকমই কিছু ধরে নে। অনর্থক টেনশন করছিস কেন?"

মিতিন সুটকেসের ডালা বন্ধ করল, "শুধু একটা কথাই বলব, চোখ-কানটা খোলা রাখবি।"

সে তো টুপুর রাখবেই। কথা না বাড়িয়ে টুপুর টিভির রিমোটখানা হাতে তুলে নিল। বিছানায় বসে চ্যানেল ঘোরাচ্ছে। বেশিরভাগই স্থানীয় চ্যানেল। কোথাও সিঙ্গাপুরি মেয়েদের ফ্যাশন প্যারেড চলছে, তো কোথাও ইংরেজিতে নীরস বকরবকর। মালয়ী আর চিনা ভাষাতেও অনুষ্ঠান চলছে কোনও-কোনও চ্যানেলে। হঠাৎ একখানা ভারতীয় চ্যানেলও এসে গেল। খবর পড়ছেন এক মহিলা। মায়ানমার থেকে ভারতে বার্ড ফ্লু-র ভাইরাস ঢোকা বন্ধ করতে সতর্কবার্তা জারি করেছে মণিপুর সরকার ... শুটিংয়ের জন্য ঐশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গে অভিষেক বচ্চনের বিয়ে পিছিয়ে গেল ... আগ্রায় গত কাল গ্রেপ্তার হয়েছে এক বিদেশি। ভারতীয় বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরের সামনে ফোটো তোলার অপরাধে..."

শেষ খবরটা শুনেই টুপুর ঝট করে ঘাড় ঘোরাল, "লোকটা নিশ্চয়ই স্পাই। তাই না মিতিনমাসি?"

মিতিনও খবরটা শুনছিল। বলল, "হতেও পারে। তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"

"কেন? লোকটা তো ক্যামেরা সমেত হাতেনাতে পাকড়াও হয়েছে!"

"দুর, গুপ্তচররা কি অত বোকা হয় নাকি? সবাইকে দেখিয়ে-দেখিয়ে শাটার মারবে? তা ছাড়া আজকাল আর স্পাইদের দিয়ে ফোটো তোলানোর দরকার হয় না। এখন আকাশে ছেড়ে রাখা উপগ্রহের কল্যাণে মিলিটারিদের প্রায় প্রতিটি খুঁটিনাটি খবরই জোগাড় করে ফেলা যায়। কোথায় কোন যুদ্ধজাহাজ ঘুরছে, কোন এয়ারবেসে ক'টা যুদ্ধবিমান রাখা আছে, অবিরাম তার ফোটো তুলছে স্যাটেলাইটের ক্যামেরা। আর সেই ক্যামেরা এত শক্তিশালী

যে, যুদ্ধজাহাজের স্ক্রুগুলো পর্যন্ত তার নজর এড়ায় না।"

"ও। তার মানে এখন উপগ্রহগুলোই স্পাই? মানুষ-গুপ্তচরের দিন শেষ?"

"পুরোপুরি নয়, তাদেরও কাজ আছে। কোথায় কোন ফ্রন্টে কত মিলিটারি পাঠানো হবে, কবে কখন কোন ব্যাটেলিয়ান কোথায় সরবে, কিংবা কোনও দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করার মতলব ভাঁজছে কিনা... এ সব খবর তো মানুষকেই জোগাড় করতে হয়।"

"কীভাবে পায় খবরগুলো?"

"হাজারও উপায় আছে। গুপ্ত ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন বসানো থাকে কোথাও-কোথাও। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও গোপন খবর পাচার করার লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়," মিতিন মুচকি হাসল, "জানিস তো, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের যিনি দু' নম্বর বড়কর্তা ছিলেন, সেই কিম ফিলবি কিন্তু আদতে ছিলেন এক রাশিয়ান গুপ্তচর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি কত খবর যে রাশিয়াকে সাপ্লাই করে গিয়েছেন..."

"বলো কী? কেউ ধরতে পারেনি?"

"ওস্তাদ স্পাইদের ধরে ফেলা খুব সহজ কাজ নয় রে। তারা খবর পাচারের নিত্যনতুন টেকনিক বের করে। হয়তো সকলের চোখের সামনে দিয়েই খবর পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু কায়দার গুণে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। কত ধরনের সাংকেতিক ব্যাপারস্যাপার যে থাকে, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই।"

মাসি-বোনঝির বাক্যালাপের মাঝেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল পার্থ। দাড়িটাড়ি কামিয়ে। স্নানটান সেরে। আচমকা সেও নাক গলাল আলোচনায়। বিজ্ঞের সুরে বলল, "ক্লস ফুকসের নাম শুনেছিস, টুপুর? বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আবার গুপ্তচরও বটে। তিনি তো অ্যাটম বোমের আস্ত ফর্মুলাটাই আমেরিকা থেকে রাশিয়ায় চালান

করে দিয়েছিলেন। কীভাবে করেছিলেন জানিস?"

"সে গপ্পো পরে হবে," মিতিন বাধা দিল, "এখন ছোটসাহেবকে তোলো। সারা সকাল ঘরেই কাটাব নাকি, অ্যাঁ?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে পটাং চোখ খুলে গিয়েছে বুমবুমের। ফিক করে হেসে বলল, "আমি তো জেগেই আছি।"

"তা হলে এবার দয়া করে গাত্রোত্থান করো। দশ মিনিটের মধ্যে রেডি না হলে তোমাকে রেখেই কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাব।"

"আর ফাইভ মিনিট্‌স বেশি দাও মা, প্লিজ।"

পনেরো মিনিট নয়, বুমবুমের তৈরি হতে সময় লাগল পাক্কা পঁচিশ মিনিট। তার মধ্যে অবশ্য পার্থ টুকটাক কিছু কাজ সেরে নিল। হ্যান্ডিক্যামে নতুন ক্যাসেট ভরা, ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়া। চাংগি এয়ারপোর্টের টুরিস্ট কাউন্টার থেকে সিঙ্গাপুরের দর্শনীয় স্থান সংক্রান্ত বেশ কিছু লিফলেট জোগাড় করেছিল, সেগুলোও পুরল পকেটে। ব্যস, এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়।

রুমে চাবি লাগিয়ে ডাইনিং হলে এল সকলে। সামনের টেবিলটাতেই বসেছে। মেনুকার্ড দেখতে-দেখতে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী রে টুপুর, কী খাবি?"

টুপুর কাঁধ ঝাঁকাল, "এনিথিং।"

"হেভি? না লাইট?"

মিতিন বলল, "প্লেনে অনেক রাত্তিরে ডিনার হয়েছে, এখন হালকাই ভাল।"

"তাই হোক তবে," পার্থ মুখভঙ্গি করল, "সেই সঙ্গে লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট, ডিনারের ব্যাপারে একটা প্রিন্সিপলও তৈরি হয়ে যাক। এখন থেকে খাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাঁধাধরা টাইম থাকবে না। যখনই জাগিবে জঠর, তখনই আহার।"

মিতিন হেসে বলল, "জঠর নয়, বলো তোমার রসনা।"

"বটেই তো। রসনাকে তো তৃপ্ত করতেই হবে। মালয়েশিয়ান খাবার খাব, ইন্দোনেশিয়ান চাখব, থাই ফুড, চাইনিজ কোরিয়ানও টেস্ট করতে পারি..."

"সব হবে। তবে এখন সাহেবি ব্রেকফাস্টটাই বলো।"

সেই মতোই অর্ডার দেওয়া হল। বাটার টোস্ট, টার্কি সসেজ, স্ক্র্যাম্বল্‌ড এগ আর কফি। বুমবুমের জন্য মিল্কশেকও বলা হল এক গ্লাস।

বিলিতি নাস্তা টেবিলে পৌঁছনোর আগেই ছোট্ট ঝটকা। সুজিত দত্ত ঢুকছেন ডাইনিং হলে। পার্থদের দেখে পলকের জন্য থমকালেন যেন। পরক্ষণে নিজেই এগিয়ে এসেছেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, "সাহেব দেখছি ক্যামেরা কাঁধে রেডি। তা চললেন কোথায়?"

মিতিনকে এক ঝলক দেখে নিয়ে পার্থ বলল, "এখনও ডিসাইড করিনি। শুনেছি এখানে সেন্টোসা আইল্যান্ড খুব বিখ্যাত?"

"অবশ্যই। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা ছোট্ট একটা দ্বীপকে কত সুন্দর করে তোলা যায়, সেন্টোসা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ওখানকার আন্ডার ওয়াটার অ্যাকোয়ারিয়াম তো রীতিমতো তাকলাগানো। এ ছাড়া আমার সাজেশন, জুরং বার্ড পার্কেও একবার যাবেন। ওটা না দেখলে সিঙ্গাপুর আসাই বৃথা।"

"দর্শনীয় জায়গার লিস্টে তো বোটানিক্যাল গার্ডেন আর চিড়িয়াখানার নামও দেখছিলাম।"

"হ্যাঁ। ওগুলোও দ্রষ্টব্য। চিড়িয়াখানায় নাইট সাফারি তো দারুণ ইন্টারেস্টিং," সুজিত দত্ত একগাল হাসলেন, "আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? সিঙ্গাপুর সরকার পর্যটন ব্যাবসাটা খুব ভাল বোঝে। অতি সাধারণ কিছুকেও এমন মনোহারী মোড়কে আপনার সামনে পেশ করবে, আপনি চোখ ফেরাতে পারবেন না। সন্ধেবেলা সিটি সেন্টারের দিকে যান, সিঙ্গাপুর নদীর ধারে বসে থাকলেই আপনার

প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। চারদিকে আলো দিয়ে, ফোয়ারাটোয়ারা বসিয়ে জায়গাটা এমন ভাবে সাজিয়ে রেখেছে! ওদিকে নদীতেও নৌকোবিহারের এলাহি আয়োজন... অথচ লোকে বলে, ওটা নাকি আদতে নদীই নয়। সমুদ্র থেকে ঢুকে আসা আঁকাবাঁকা খাঁড়ি।"

"বুঝেছি। বাছাবাছির দরকার নেই। সিঙ্গাপুরে যা দেখব, তাই ভাল লাগবে।"

"ঠিক। একদম ঠিক। এখানকার জমকালো শপিং মলগুলোও দেখতে ভুলবেন না। চৌষট্টি তলা একটা বাড়ি জুড়ে শুধুই ঝলমলে দোকানপাট, ভাবতে পারেন? আর হ্যাঁ, পারলে পুরনো শহরটাকেও একবার দেখে আসবেন। সেই ব্রিটিশ আমলের ঘরবাড়ি, চার্চ ... সেই র‍্যাফ্‌লসাহেব যেভাবে সিঙ্গাপুর শহরটার পত্তন করেছিলেন..."

একটানা বকেই চলেছেন সুজিত দত্ত। এয়ারপোর্টে যে মানুষটা ফিরেও তাকালেন না, তিনি হঠাৎ আবার ওপরপড়া হয়ে এত কথা বলছেনই বা কেন? বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে কি? টুপুরের কেমন যেন সন্দেহজনক ঠেকছিল। মিতিনমাসিই বা এমন মুগ্ধ শ্রোতা কেন হয়ে গেল হঠাৎ? জরিপ করতে চাইছে সুজিত দত্তকে?

টেবিলে খাবার এসে গিয়েছে। সুজিত দত্ত বোধ হয় সরেই যাচ্ছিলেন এবার, কিন্তু টুপুরকে অবাক করে দিয়ে মিতিনই সহসা বলে উঠল, "বসুন না মিস্টার দত্ত। আমাদের সঙ্গেই ব্রেকফাস্ট করুন।"

"থ্যাঙ্কস। আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে।"

"তা হলে এক কাপ কফিই চলুক। আমরা কফি খেতে-খেতে গল্প করি।"

এবার আর সেভাবে না করলেন না সুজিত দত্ত। চেয়ার টেনে বসেছেন। ফিলিপিনো বেয়ারাটিকে ডেকে আর-এক কাপ কফির অর্ডার দিল মিতিন। সহজ সুরে বলল, "সিঙ্গাপুর শহরটাকে আপনি দেখছি খুবই ভাল চেনেন?"

মৃদু হেসে সুজিত দত্ত বললেন, "বহুবার এসেছি তো, চষা হয়ে গিয়েছে।"

"তা হলে আপনিও আজ আমাদের সঙ্গে চলুন না! একসঙ্গে সেন্টোসা ঘুরে আসি।"

এবার বুঝি একটু থতমত খেলেন সুজিত দত্ত। একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "বেড়ানোর আমার উপায় নেই, ম্যাডাম। একটা বিজ়নেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এখনই বেরোতে হবে।"

"ও। তা সেন্টোসা আমরা যাব কী করে যদি একটু বলে দেন..."

"ট্যাক্সি ধরে নিন। সেন্টোসার ভিতরে গিয়েও গাড়ি ছাড়তে পারেন। আবার রোপওয়ে স্টেশনেও নামতে পারেন। রোপওয়েতে চড়ে সেন্টোসা যাওয়াটা বেশ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কেব্‌লকারগুলো যায় অনেক উঁচু দিয়ে। নীচে সমুদ্রের খাঁড়ি, সিঙ্গাপুরের কেপেল ডক, বিউটিফুল দৃশ্য।"

পার্থ ফস করে বলে উঠল, "কেবল্‌কারগুলো মাউন্ট ফেবার থেকে ছাড়ে না?"

"মাউন্ট না আরও কিছু!" সুজিতের গলায় শ্লেষ, "এখানে ছোট-ছোট টিলাগুলোও সব মাউন্টেন! আমার কাছে জেনে রাখুন মশাই, এই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে ৫০০ ফিটের বেশি উঁচু কোনও পাহাড় নেই। সিঙ্গাপুরের বহু বাড়ি ওই পাহাড়গুলোর চেয়ে উঁচু।"

"অর্থাৎ মাউন্ট বলাটাও সিঙ্গাপুর সরকারের প্যাকেজিংয়ের মধ্যে পড়ে?" পার্থ ফিক করে হাসল।

"সম্ভবত," বড়-বড় চুমুকে কফির কাপ শেষ করলেন সুজিত দত্ত। ঘড়ি দেখছেন। চোখ তুলে বললেন, "আজ তবে সেন্টোসাটাই ঘুরে আসুন। পরে আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনা যাবে। আপনাদের রুম নম্বর যেন কত?"

"১০৪।"

"আমি আছি ২১৭-এ। আসি তা হলে?"

একটু যেন বেশি তাড়াহুড়ো করেই উঠে গেলেন সুজিত দত্ত। ভদ্রলোক দৃষ্টির আড়াল হতেই পার্থ বলে উঠল, "তোর মাসির তো এখন মুশকিল হয়ে গেল রে টুপুর।"

"কেন?"

"সুজিত দত্তকে সন্দেহ করার আর তো কোনও উপায় রইল না রে। যে লোকটা যেচে এসে এত আড্ডা দিয়ে গেল, তাকে কি খুব পাজি বলে মনে হয়?"

টুপুর বলল, "খারাপ ভাল জানি না। তবে ভদ্রলোক কিন্তু বেশ অদ্ভুত রকমের। আমার তো ধারণা, কায়দা করে উনি জেনে গেলেন আমরা কোথায় যাচ্ছি।"

"বলছিস? পার্থ চোখ পিটপিট করল, "আমরা কি তা হলে ডেস্টিনেশন বদলে ফেলব?"

বুমবুমের মিল্কশেক শেষ। চেটোর উলটো পিঠে ঠোঁট মুছতে-মুছতে সে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। চলো আমরা বার্ড পার্ক যাই কিংবা চিড়িয়াখানায়।"

"উঁহু, ওসব কাল হবে," শেষ সসেজটা মুখে পুরল মিতিন। মাথা দুলিয়ে বলল, "আজ এ বেলা সেন্টোসা।"

॥ ৫ ॥

সকালে দিব্যি ঝকঝকে ছিল দিনটা। টুপুররা যখন হোটেল থেকে বেরোল, লিট্‌ল ইন্ডিয়ার রাস্তায় তখনও ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। অথচ ট্যাক্সি যেই না ব্রিজ পেরিয়ে সেন্টোসা দ্বীপে ঢুকেছে, অমনই ঝুপঝুপ বৃষ্টি। একটানা নয়, এই ঝরছে, এই থামছে। বৃষ্টি হয়ে গরম কিন্তু কমার

লক্ষণ নেই। বরং বিশ্রী এক আর্দ্রতায় চিটপিট করছে গা-হাত-পা। সিঙ্গাপুর নিরক্ষরেখার খুব কাছে বলেই নাকি এখানকার আবহাওয়া এরকম বিটকেল। এখানে নাকি তিনটে ঋতু। গরম, আরও গরম, আরও আরও গরম। সঙ্গে যখন-তখন বারিধারা। বারো মাস। শীত শব্দটার নাকি অস্তিত্বই নেই সিঙ্গাপুরে।

তা বৃষ্টি হোক, কি রোদ্দুর, টুপুরদের বেড়ানোর উৎসাহে কিন্তু ভাটা পড়েনি। গাছপালায় ছাওয়া সবুজ দ্বীপটায় পা রাখার পর থেকেই চলছে ছোটাছুটি। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ দাগটানা দেখনবাহার বাস ঘুরপাক খাচ্ছে দ্বীপময়, টিকিট-ফিকিটের বালাই নেই, চেপে বসলেই হল। তারপর পছন্দমতো জায়গায় নেমে, খানিক ঘুরেফিরে, আবার ওঠো আর-এক বাসে। চলো, যেখানে প্রাণ চায়। চারদিক খোলা ছোট-ছোট ট্রামও চলছে দিব্যি। তাতে চড়ে ঘোরার মজাও নেহাত কম নয়।

প্রথমে যাওয়া হল আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ডে। সমুদ্রের তলার দুনিয়াটা কী নিপুণ দক্ষতায় প্রকাণ্ড এক অ্যাকোয়ারিয়ামে বন্দি। চলন্ত পাটাতনে দাঁড়িয়ে অ্যাকোয়ারিয়াম পরিক্রমা করতে-করতে টুপুরের তো মনে হচ্ছিল তারা যেন সত্যি-সত্যি সমুদ্রের নীচে চলে গিয়েছে। পথের দু' ধারে, মাথার উপর, অজস্র সামুদ্রিক প্রাণী। নানান জাতের নাম না জানা মাছ, শুঁড় কিলবিল অক্টোপাস, স্কুয়িড, কাঁকড়া, স্টারফিশ, জেলিফিশ, ঈল...ভয়ংকর চেহারার হাঙরও রয়েছে অনেক। কী শীতল তাদের দৃষ্টি, দেখলেই গা ছমছম করে। মাথায় লম্বা বেয়নেট নিয়ে একটা বিশাল মাছ সাঁইসাঁই ধেয়ে এল বুমবুমের দিকে। মোটা কাচের এপারে দাঁড়িয়েও ভয়ে কেঁপে উঠল বুমবুম।

পার্থ মন দিয়ে হ্যান্ডিক্যামে ছবি তুলছিল। খোলা মনিটরে চোখ রেখে বলল, "মাছটাকে চিনে রাখ টুপুর। এ হচ্ছে স্টিং রে। ওই শক্ত

হুল পেটে ঢুকিয়ে ওরা মানুষের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বের করে আনে।”

টুপুর বলল, “কিছুদিন আগে এই স্টিং রে-র আক্রমণেই স্টিভ আরউইন মারা গেলেন না?”

“হ্যাঁ, কী মর্মান্তিক মৃত্যু! হাঙর, কুমির কত কী নিয়ে উনি খেলা করেছেন, কিন্তু স্টিং রে-র কাছে হেরে গেলেন। আর ওই ঝাঁকটা দ্যাখ। ওগুলো হল পিরান্‌হা। ওদের মতো নিষ্ঠুর প্রাণী বোধ হয় আর দুটো নেই। দল বেঁধে যখন অ্যাটাক করে, তিমিমাছও রক্ষা পায় না।”

বুমবুম বলল, “আমি পিরান্‌হা দেখেছি।" অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে। শার্কও।”

পার্থ হেসে বলল, “হাঙর দেখার জন্য অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট খোলার কী দরকার। তোকে একদিন মাছের বাজারে নিয়ে যাব। দেখবি, ঢেলে হাঙর বিক্রি হচ্ছে।”

বুমবুম অবাক মুখে বলল, “সত্যি?”

“একটা নয়, তিনটে সত্যি। আজকাল বেশিরভাগ বিয়েবাড়িতে তো হাঙরেরই ফিশফ্রাই খাওয়ায়। একটু আঁশটে-আঁশটে গন্ধ থাকে, তবে টেস্ট মন্দ নয়।”

মজা করতে-করতেই মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এল সকলে। বাইরে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টুপুর। ইস, আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ডে তিমিমাছটা থাকলেই ষোলো কলা পূর্ণ হত।

এর পর সিলোসো বিচ। ঢেউবিহীন সমুদ্রের ধারে ঝলমলে বালুকাবেলা। বেড়াতে আসা লোকজন মহা আনন্দে ভলিবল খেলছে। কেউ বা মেতেছে জলক্রীড়ায়। জোরকদমে স্কিয়িং চলছে। ওয়াটার স্কুটারও। বিচে হোটেল রেস্টুরেন্টও আছে খানকতক, সেখানেও জমজমাট ভিড়।

সুখাদ্যের গন্ধ পেয়েই পার্থর পেট চুঁইচুঁই। এক ইতালিয়ান

রেস্তরাঁয় ঢুকে আস্ত একখানা পিৎজা সাঁটিয়ে ফেলল বাপ-ছেলে। টুপুর মিতিনমাসির দলে, তারা খেল পাস্তা।

খেতে-খেতে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "এই সমুদ্রটার নাম কী গো, মিতিনমাসি?"

"সিঙ্গাপুর প্রণালী। দক্ষিণ চিন সাগর আর জাভা উপসাগরকে জয়েন করেছে এই স্ট্রেট অফ সিঙ্গাপুর।"

"ও। সমুদ্র নয় বলেই বুঝি ঢেউ কম?"

"হুঁ। কিন্তু যথেষ্ট গভীর। সেই জন্যই তো এখানে এত বড় বন্দর গড়ে উঠেছে।"

পার্থ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "গড়ে উঠেছে নয়, বলো, গড়ে তোলা হয়েছে। দুশো বছর আগেও সিঙ্গাপুরে কিস্‌সু ছিল না। এখানে থাকত মাত্র হাজারখানেক লোক। বেশিরভাগই মালয়ী। ভারতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মালয়ের সুলতান হুসেন শা'র সঙ্গে চুক্তি করে সিঙ্গাপুরের দখল পায়। এখান থেকে জাভা, বোর্নিও, সুমাত্রা, চিন, থাইল্যান্ড, সর্বত্র যাওয়ার সুবিধে আছে বলে ব্রিটিশরা এখানেই বন্দর বানায়। বন্দরটাকে রক্ষা করার জন্য একটা দুর্গও বানিয়েছিল। ফোর্ট সিলোসো। এখানেই আছে দুর্গটা। ওওওই টঙে! যাবে দেখতে?"

টিলায় উঠে ফোর্ট সিলোসো দেখার ব্যাপারে কারওরই বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। একে ফের ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে, তার উপর গত বছর মহারাষ্ট্রে এককাঁড়ি দুর্গ দেখে-দেখে চোখ হেজে গিয়েছে। অতএব এককথায় প্রস্তাব বাতিল। তার চেয়ে বরং আবার একখানা বাস ধরে মেরলিয়ন চলে যাওয়াই ভাল।

মেরলিয়ন এক বিশাল উঁচু মূর্তি। নীচের দিকটা তার জলকন্যার মতো, মুখ সিংহের। এই মূর্তি সিঙ্গাপুরের প্রতীকও বটে। মূর্তির পেটের ভিতর লিফ্‌ট চলছে। লিফ্‌টে চড়ে সিংহের মুখ পর্যন্ত চলে

গেল টুপুররা। ন' তলায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, থুড়ি সিংহের মুখগহ্বরে দাঁড়িয়ে, গোটা সেন্টোসা দ্বীপটাকে দেখল ভাল করে। দূরে, সিঙ্গাপুরের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোও চোখে পড়ল আবছা-আবছা।

নেমে ফের ব্লু লাইন বাস। সোজা ডলফিন লেগুন। সেখানে তখন শুরু হচ্ছে বৈকালিক ডলফিন শো। টিকিট আগেই কাটা ছিল, সুশৃঙ্খল লাইন দিয়ে একে-একে ঢুকে পড়ল সকলে। ভিতরে বেজায় ভিড়। নীল জলের হ্রদখানা ঘিরে সারি দিয়ে পাতা চেয়ারগুলো ভর্তি, দাঁড়িয়ে আছে থরে-থরে মানুষ। ঠেলেঠুলে সামনে গেল টুপুর বুমবুমের হাত ধরে।

মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই শুরু হল খেলা। বাজনার তালে-তালে হ্রদের জলে নাচছে দুটো ডলফিন। তড়াং-তড়াং লাফাচ্ছে, ট্রেনারের নির্দেশে রিংয়ের ভিতর দিয়ে গলে যাচ্ছে অবলীলায়। একজোড়া উদবিড়ালও খেলা দেখাল ডাঙায়। দর্শকদের শেখাল, কীভাবে প্লাস্টিকের খালি বোতল আর এঁটো কাগজের কাপপ্লেট যত্রতত্র না ছড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হয়। বুমবুম তো দেখে মহা খুশি। দর্শকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চটাস চটাস তালি বাজাচ্ছে।

শো যখন ভাঙল, বিকেল প্রায় শেষ। ঘেরা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে টুপুররা এসে বসল পাশের পালাওয়ান বিচে। এখানে সমুদ্রতট অনেকটাই চওড়া। ছোট-ছোট ঢেউ পারে পৌঁছে ভাঙছে ছলাৎ-ছলাৎ। এই বিকেলেও স্নান করতে সমুদ্রে নেমেছে এক দল চিনা ছেলেমেয়ে, উল্লসিত হয়ে এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছে। অদূরে এক সেতু দেখা যায়। পর্যটকরা অনেকেই সেতু পার হয়ে চলেছে আর-একটা ছোট্ট দ্বীপে।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ওই দ্বীপটায় কী আছে গো?"

পার্থ লিফলেট খুলে জায়গাটা সম্পর্কে পড়ে নিচ্ছিল। ঝট করে চোখ তুলে বলল, "ওই ছোট্ট দ্বীপটা হচ্ছে এশিয়ার দক্ষিণতম বিন্দু।"

মিতিন মুখ কুঁচকে বলল, "তা কী করে হয়? সিঙ্গাপুরের নীচে তো জাভা সুমাত্রা আছে, বোর্নিও আছে..."

"আহাহা, ওগুলো তো আলাদা-আলাদা দ্বীপ। আসলে এশিয়া মহাদেশের স্থলভূমি এখানকার এই দ্বীপটাতেই শেষ হয়েছে। দ্যাখো না, লেখাটা পড়ো।"

পড়ল মিতিন, তবে খুব একটা অভিভূত হল না। বলল, "যাও, তোমরা ঘুরে এসো। আমি এখানেই আছি।"

বুমবুম বলল, "আমিও যাব না। টায়ার্ড লাগছে।"

শেষ পর্যন্ত যাওয়াই হল না। প্রত্যেকেই খুব ক্লান্ত, এবার মানে-মানে হোটেলে ফিরতে চায়। ত্যানজং বিচ, প্রজাপতি উদ্যান, মশলার বাগান, মিউজ়িক্যাল ফাউন্টেন সবই বাকি রয়ে গেল। যাক গে, কাল প্রায় সারা রাত জেগে আজই কি এত ধকল নেওয়া সম্ভব?

ট্যাক্সি ছেড়ে হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকতে না-ঢুকতেই সামনে নারায়ণ। টুপুরদের দেখেই হাঁকপাঁক করে দৌড়ে এসেছেন ভদ্রলোক। হাত কচলে পার্থকে বললেন, "একটা সমস্যা হয়েছে স্যার।"

পার্থ হতভম্ব মুখে বলল, "কী সমস্যা?"

"আপনি পেঙ্গুইন ইন্টারন্যাশনালের যে চিঠিটা আমায় দিয়েছিলেন, সেটা তো আসল নয়।"

"মানে?"

"ওটা ডুপ্লিকেট স্যার। অরিজিনালটা বোধ হয় আপনার কাছে রয়ে গিয়েছে।"

"তাই কি?"

"হ্যাঁ স্যার। আমাদের অফিসে অরিজিনালটা দিতে হয়।"

"ওহো, ওটা তা হলে বোধ হয় সুটকেসে। গোছগাছের সময় ভুল

করে ঢুকিয়ে ফেলেছি। আর আপনার কাছে স্ক্যান করা কপিটা চলে গিয়েছে। পার্থ দু'-এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন। তারপর বলল, "কিন্তু এতে অসুবিধের কী আছে? স্ক্যান করা কপি তো আসলেরই সমতুল।"

"জানি স্যার। তবে আমাদের অরিজিনালটাই দরকার।"

"ঠিক আছে, রুমে গিয়ে খুঁজে দেখছি।"

"আমি কি এখানে অপেক্ষা করব?"

"না না, আপনি কেন মিছিমিছি... পেলে ফোন করে দেব। সকালে এসে নিয়ে যাবেন।"

"এখনই পেলে ভাল হত স্যার।"

"সারাদিন ঘুরে এইমাত্র ফিরলাম... বড্ড টায়ার্ড। কালই আসুন, প্লিজ়।"

"কাল কখন আসব? আপনারা তো নিশ্চয়ই সকালে আবার বেরোবেন..."

"বলছি তো, বেরনোর আগে পেয়ে যাবেন। রাতে আপনাকে ফোন করে দেব।"

"অরিজিনালটা না পেলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে স্যার।"

"কীসের প্রবলেম?" এতক্ষণে পার্থর ভুরুতে ভাঁজ, "আপনাদের কি সন্দেহ, আমরা আসল লোক নই?"

"ছি ছি স্যার, এ কথা কখন বললাম?" নারায়ণ জিভ কাটলেন, "আমাদের অফিসে অরিজিনালটাই জমা দেওয়ার নিয়ম। তাই আপনাদের..."

"বোর করছেন। তাই তো?" পার্থ এবার একটু তেরিয়া হয়েছে, "ধরুন, আসল চিঠিটা সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি। যদিও তার আশঙ্কা কম। আমার ধারণা, ব্যাগ সুটকেসেই কোথাও আছে। তবু যদি খুঁজে দিতে না পারি, আপনার অফিস কী করবে? আমাদের

তাড়িয়ে দেবে? হোটেলের বিল মেটাবে না?"

"সে তো অনেক কিছুই করতে পারে। আপনাদের ফেরার টিকিট ক্যানসেল করাও তো খুব কঠিন কাজ নয়," পলকের জন্য নারায়ণের চোয়াল যেন একটু শক্ত হল। পরক্ষণে গলায় মোলায়েম সুর, "কিন্তু পেঙ্গুইন রিসর্টস্ ইন্টারন্যাশনাল অতিথিদের সম্মান করে। আমাদের একটা গুডউইল আছে। আশা করব, আমাদের মাননীয় অতিথিরাও সেই গুডউইলটা বজায় রাখতে সাহায্য করবেন।"

"ঠিক আছে," পার্থ আরও গম্ভীর, "আমি এখনই খুঁজে দেখছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি আপনার ফোনের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

রুমে ফিরেই ঝপাঝপ ব্যাগ সুটকেস টেনে নামাল পার্থ। শুরু হয়ে গিয়েছে অনুসন্ধান পর্ব। প্রথমে ব্যাগ সুটকেসের পকেটগুলো হাতড়াল। নেই। একটা একটা করে জামাকাপড় বের করে রাখছে বিছানায়। আঙুল চালিয়ে দেখছে চিঠিটা কোনও ভাঁজে ঢুকে আছে কিনা।

পার্থর কাণ্ডকারখানা দেখছিল মিতিন। নারায়ণের সঙ্গে কথোপকথনের সময় সে টুঁ শব্দটি করেনি। ঘরে এসেও চুপচাপ ছিল। জামাকাপড় ঘাঁটাঘাঁটি দেখে মুখ খুলেছে। চোখ পাকিয়ে বলল, "করছটা কী, অ্যাঁ? সুটকেসটা কী সুন্দর গোছগাছ করে এনেছিলাম, পুরো ছত্রখান করে দিলে তো?"

"নিকুচি করেছে গোছানোর," পার্থ গজগজ করে উঠল, "ওই চিঠি না পেলে কী হবে ভেবে দেখেছ?"

"কী হবে? হবেটা কী?"

"সাড়ে সব্বোনাশ। শুনলে না, লোকটা কেমন মিষ্টি করে ভয় দেখিয়ে গেল? সত্যি যদি প্লেনের টিকিট ক্যানসেল করে দেয়?"

"ইল্লি রে," টুপুর ফোঁস করে উঠল, "টিকিট তো তোমার কাছে।"

"তাতে কী? টিকিটের নম্বর নিশ্চয়ই পেঙ্গুইনের কাছে আছে। ইন্টারনেট থেকে যদি বাতিল করে দেয়, এয়ারপোর্টে আমাদের কী ঝামেলায় পড়তে হবে বুঝতে পারছিস?"

"মনে হয় না অতটা করবে," মিতিন মাথা দোলাল, "আর তেমন কিছু যদি ঘটেও, আমাদের তো ক্রেডিট কার্ড আছে। দরকার হলে থাকার মেয়াদ এক-দু' দিন বাড়িয়ে আমরাই টিকিট কেটে ফিরব।

"হোটেলের বিলও তো গুনতে হবে।"

"হলে হবে। এত নার্ভাস হচ্ছ কেন?" মিতিনের কোনও কিছুতেই হেলদোল নেই। উলটে ঠোঁটে এক মুচকি হাসি ঝুলছে, "তোমাকে একটা ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। চিঠিটা তুমি ব্যাগ কিংবা সুটকেসে ঢোকাওনি।"

"তা হলে?" পার্থ ঢোক গিলল, "তা হলে কি কলকাতাতেই ফেলে এলাম?"

"হতে পারে। তুমি যা কেয়ারলেস!"

পার্থ গুম হয়ে গেল। সুটকেস ফেলে উঠে দাঁড়াল। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ঘরে। হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে বলল, "নারায়ণকে তা হলে কী জবাব দেব?"

"কিচ্ছু বলতে হবে না। স্রেফ চেপে যাও।"

"কিন্তু কাল তো আবার হানা দেবে!"

"তখন আমি ফেস করব। বুঝিয়ে দেব, বেড়ানোর সুযোগ দিয়ে ওরা আমাদের মাথা কিনে নেয়নি।"

এতক্ষণে পার্থর মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "বটেই তো। ফালতু-ফালতু লোকটাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছিলাম।"

"লোকটা কিন্তু বেশ ট্যাঁটা আছে।" টুপুর না বলে পারল না, "সকালে দেখে একদম বোঝা যায়নি।"

"ট্যাঁটা তো ট্যাঁটা," মিতিন বুড়ো আঙুল দেখাল, "তাতে আমাদের ঘেঁচু। যা যা, আর-এক দফা স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে নে। একটু জিরিয়ে আবার বেরোতে হবে তো, নাকি?

॥ ৬ ॥

প্ল্যান তো অনেকই ছিল। তবে রাতের সিঙ্গাপুরদর্শন যেন জমল না সেভাবে। গায়ে জল ঢালার পরই বুমবুমের এমন তেড়ে ঘুম এল, কোনওক্রমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে সে ঢলে পড়ল বিছানায়। শত ঠেলাঠেলিতেও চোখ খুলল না। অগত্যা কাউকে না কাউকে তো হোটেলে থাকতেই হয়। পার্থ আয়েশি মানুষ, হুড়ুদ্দুম ছোটাছুটি তার বেশিক্ষণ পোষায় না। মাসি বোনঝিকে বেরোতে বলে সে রয়ে গেল হোটেলে। তা বেড়াতে এসে দলের অর্ধেক লোকই যদি সঙ্গে না থাকে, ভ্রমণটা কেমন ছানা কেটে যায় না?

তবু মিতিনমাসির সঙ্গে শহরের অনেকটাই ঘুরল টুপুর। আলোয়-আলোয় দারুণ সেজে আছে রাতের সিঙ্গাপুর। উঁচু-উঁচু বাড়িগুলো থেকে দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে যেন। পার্কের উজ্জ্বল আলো, দোকানপাটের আলো, ব্রিজের আলো, বিজ্ঞাপনের আলো, বাহারি পথবাতির আলো... এত আলোর ঝলকানিতে কেমন যেন দিশেহারা লাগে।

মাসি বোনঝি প্রথমে গেল শহরের দক্ষিণে। সিঙ্গাপুর নদীর দিকটায়। নদীর পারে মেরলিয়ন পার্কে বসে রইল একটুক্ষণ।

এখানেও মেরলিয়নের মূর্তি আছে একখানা। ছোটখাটো। মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো জল বেরোচ্ছে। এই নদীর ধারেই নাকি দুশো বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির র‍্যাফল সাহেব পত্তন করেছিলেন শহরটার। এখন এ জায়গা সিঙ্গাপুরের ডালহৌসি পাড়া। এসপ্ল্যানেডও বটে। কাছেই পাঁচ-পাঁচখানা গগনচুম্বী অট্টালিকা নিয়ে সানটেক সিটি। অফিসের আড়ত। সেদিকে যাব-যাব করেও যাওয়া হল না শেষ পর্যন্ত। লম্বা ব্রিজ পেরিয়ে উলটো দিকের ভিক্টোরিয়া কনসার্ট হলে এল মিতিন আর টুপুর। সেখানে সবুজ লনে উদ্দাম নাচগানের আসর বসেছে। দু'-পাঁচ মিনিট বাজনার ঝংকার শুনেই টুপুরের মাথা ঝিমঝিম। কনসার্ট হলের সামনে থেকে ফের ট্যাক্সি। রংচঙে চায়না টাউনে চরকি মেরে সোজা অর্চাড রোডে। এ পাড়াটা যেন আরও ঝলমলে। রয়েছে নানান দেশের দূতাবাস, চক্ষু চড়কগাছ করে দেওয়া পেল্লায় সব জমকালো দোকান। গাছে ছাওয়া বুলেভার্ডটিও ভারী মনোরম। গাছতলায় এক বৃদ্ধ আইসক্রিম-স্যান্ডউইচ বিক্রি করছিল, মিতিনমাসি সাধাসাধি করলেও টুপুরের মোটেই খেতে ইচ্ছে হল না। বুমবুমকে বাদ দিয়ে সে একা-একা খাবে? তাই কি হয়?

কাছেই একটা ফুডকোর্টে রাতের খাওয়া সেরে ফের ট্যাক্সি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির আরামে গল্প করতে করতে ফিরছে মাসি বোনঝি।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কী রে, জায়গাটা কেমন লাগছে?"

"ভাল। খুব ভাল। আমাদের কলকাতাকেও যদি এমন বানিয়ে ফেলা যেত।"

"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বলছিস? না রাস্তাঘাটের প্রশংসা করছিস? নাকি উঁচু-উঁচু বাড়ি আর আলোর বাহারে মন ভরেছে?"

"ডিসিপ্লিনের কথাও বলো।"

"আমার তো বাপু বড্ড বেশি কৃত্রিম লাগছে। বড় বেশি সাজানো। মাপা-মাপা। এমনকী মানুষগুলোও।"

"তবু... সাজানোটাকেও তো বাহবা দিতে হয়।"

"তাও... কেমন যেন প্রাণের অভাব রে। এই যে সেন্টোসায় আজ দু'-দু'খানা সি-বিচে গেলাম, ওখানকার বালিগুলো হাতে নিয়ে দেখেছিলি কি?"

"হ্যাঁ। মোটা-মোটা দানা।"

"প্রায় সরষের সাইজ়। বাজি রেখে বলতে পারি, ওই বিচগুলো মোটেই ন্যাচারাল নয়। পর্যটক টানার জন্য বালি ফেলে তৈরি করা হয়েছে," বলতে-বলতে হেসে ফেলল মিতিন, "অবশ্য শহরের নামটাই তো একটা বড়সড় ফাঁকি।"

"কীরকম?"

"ওমা, গল্পটা জানিস না? অনেক-অনেক বছর আগে প্যালেমবাং... মানে এখন যার নাম ইন্দোনেশিয়া... সেখানকার রাজা জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড় আসে, রাজা আশ্রয় নেন এই দ্বীপে। তখন এখানকার এক জন্তুকে দেখে তাঁর সিংহ মনে হয়েছিল। ব্যস, অমনই দ্বীপটার নাম দিয়ে ফেললেন সিঙ্গাপুরা। লায়নস সিটি। অথচ এই দ্বীপের হাজার মাইলের মধ্যে কোনও সিংহ নেই।"

"ভারী অদ্ভুত তো!"

কথায়-কথায় হোটেল এসে গিয়েছে। মধ্যবয়সি চিনা চালককে ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল মিতিন আর টুপুর। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা, হোটেলের লাউঞ্জ শুনশান। শুধু শ্যামলা রং এক মালয়ী কন্যা বসে আছে রিসেপশন কাউন্টারে। মন দিয়ে ফ্যাশন শো দেখছে টিভিতে। সকালে বা সন্ধ্যায় এই মেয়েটি ছিল না। আজ বোধ হয় ওর নাইট ডিউটি।

মেয়েটির সঙ্গে মধুর হাসি বিনিময় করে মিতিন-টুপুর পায়ে পায়ে ১০৪-এর দরজায় পৌঁছে গেল। একবার টোকা দিতেই ভিতর থেকে পার্থর গলা, "খোলা আছে। চলে এসো।"

"আশ্চর্য, দরজাটা লাগিয়ে রাখোনি কেন?" ঘরে ঢুকে বিরক্ত স্বরে বলল মিতিন।

পার্থর হেলদোল নেই। টিভি চালিয়ে এক ইংরেজি সিনেমায় মগ্ন। পরদা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, "এই তো, একটু আগে উনি গেলেন।"

"কে?"

"সুজিত দত্ত।"

"তাই নাকি?"

"অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক ছিলেন প্রায়।"

"অ। তা কী গপ্পো হল?"

"ওই কুম্ভকর্ণ নারায়ণ...উনিই তো অর্ধেক টাইম খেয়ে নিলেন।"

"কুম্ভকর্ণ নয়, কুম্ভকনম। ড্রেসিংটেবিলে ভ্যানিটিব্যাগ রাখতে-রাখতে মিতিন বলল, "কুম্ভকনম একটা জায়গার নাম।"

"জানি রে বাবা, জানি। কলকাতায় আমার গুচ্ছের তামিল বন্ধু আছে। ওরা নামের আগে বাবার নাম আর আদি বাসস্থানের নাম জুড়ে রাখে। প্র্যাকটিসটা ইন্ডিয়ার অনেক স্টেটেই চালু। কারও শুধু বাবার নাম থাকে, কারও দেশের নাম। যেমন ধরো..."

"লেকচার স্টপ," মিতিন ঘুরে তাকাল, "হঠাৎ মিস্টার নারায়ণের প্রসঙ্গ এল কেন?"

"আমি তুলিনি। সুজিতবাবু থাকাকালীনই নারায়ণ ফোন করলেন..."

"আবার ফোন করেছিলেন?"

"তা হলে আর বলছি কী," ঘুমন্ত বুমবুমের পাশে আধশোওয়া

ছিল পার্থ, উঠে সোজা হয়ে বসল, "এবার অবশ্য আর রেয়াত করিনি। দুমদাম পাঞ্চ ঝেড়েছি।"

"কী রকম?"

"স্ট্রেট বলে দিয়েছি, এভাবে বারবার জ্বালাতন করার জন্য চিঠিটা আর খুঁজবই না। স্ক্যান কপি দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন, নইলে গোল্লায় যান। সকালে আসতেও বারণ করে দিয়েছি।"

"শুনে নারায়ণের কী রিঅ্যাকশান?"

"খুব হাউমাউ করছিল। বোধ হয় বার চল্লিশ প্লিজ়-প্লিজ় বলল," পার্থ চোখ টিপল, "আমি আর ওই মক্কেলকে কেন পাত্তা দেব, বলো? ওর আর আমাদের হ্যারাস করার ক্ষমতাই নেই। অন্তত এই হোটেলে। রিসেপশন থেকে জেনে নিয়েছি, রুমভাড়া আগাম দেওয়া আছে। ইন ফ্যাক্ট, পেঙ্গুইন এখানে একটা রুম পার্মানেন্টলি বুক করে রাখে। রেগুলার ক্লায়েন্ট আসে ওদের। তিন দিন, দু' রাতের প্যাকেজ এনজয় করে যায়।"

"অর্থাৎ কোম্পানিটা জেনুইন।" টুপুর ফুট কাটল, "প্রতি সপ্তাহেই সুডোকুর জন্য কাউকে না-কাউকে প্রাইজ় দেয়।"

"থাম তো! টুপুরকে মৃদু ধমক দিয়ে মিতিন ফের জেরা শুরু করল, "তোমার ওই চোটপাট শুনে সুজিত দত্ত কী বললেন?"

"কী আর বলবেন। জানতে চাইলেন ঘটনাটা কী।"

"তুমিও ব্যাকব্যাক করে সব উগরে দিলে?"

"আমার মনে কোনও প্যাঁচ নেই। তোমার মতো ঢাকঢাক গুড়গুড় আমার আসে না," পার্থ ঈষৎ অপ্রসন্ন। গজগজ করতে-করতে বলল, "ওরা যেচে বেড়াতে নিয়ে এল, আবার ওরাই অযথা ঝামেলা করছে... এমন বিদঘুটে খবরটা গোপন রাখতে যাবই বা কেন?"

"হুম।" টুল টেনে বসল মিতিন, বলল, "তা সুজিতবাবুর সঙ্গে আর কী কী গপ্পো হল?"

"বললাম তো, ওই নারায়ণকে নিয়েই... উনি তো চিঠি এপিসোড শুনে স্তম্ভিত। বললেন, 'এরকম আবার হয় নাকি? এমন কী মহামূল্যবান চিঠি, যার অরিজিনাল না হলে চলবে না?'"

"সুজিতবাবু চিঠিটা দেখার বাসনা প্রকাশ করেননি?"

"একবার ক্যাজুয়ালি বলেছিলেন। আমি খোঁজাখুঁজিতে যাইনি। বলেছি, ছাড়ুন তো মশাই, ওই চিঠি নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাবই না। থাকলে আছে, না থাকলে নেই। ব্যস।"

"হুম!" মিতিন চুপ করে রইল একটুক্ষণ। তারপর আবার জেরা শুরু, "আর কী কথা হল সুজিত দত্তর সঙ্গে?"

"এমনিই, এতাল-বেতাল। আমার প্রেস, ওঁর ব্যাবসা..."

"আমার প্রফেশনের গল্পও নিশ্চয়ই করেছ?"

"ওটা আমি ইচ্ছে করেই চেপে গিয়েছি। ভাবলাম, তুমি পছন্দ করবে কি করবে না..."

"যাক, একটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ তা হলে।"

বলেই মিতিন উঠে গেছে। বাথরুম থেকে জিনস-টি শার্ট বদলে নাইটি পরে এল। দেখাদেখি টুপুরও। এবার শোওয়ার আয়োজন করার পালা। টুপুরের জন্য বিকেলেই একটা নেয়ারের খাট দিয়ে গিয়েছে হোটেলের কর্মচারী। ভাঁজ করে রাখা ছিল খাটটা, খুলে বিছানা পাতল টুপুর। মিতিনও ভাল করে বিছানা ঝেড়ে নিল।

টিভি বন্ধ করল পার্থ। সোফায় গিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলেও রেখে দিল। এখানে এসে ভারী জব্দ হয়েছে সে। রুমে সিগারেট ধরাতে পারছে না। স্মোক অ্যালার্ম লাগানো আছে যে! ছোট্ট একখানা আড়মোড়া ভেঙে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "তোরা বাইরে কী খেলি রে?"

"হাফ মালয়েশিয়ান, হাফ জাপানি। নাসি গোরেং, আর সুশি।"

"ওগুলো কী দ্রব্য?"

"নাসি গোরেং নুডলের মতোই। সঙ্গে সবজি, মাংসটাংস মেশানো থাকে। তবে টেস্ট চাইনিজ়ের মতো নয়, অন্যরকম। আর শুশি তোমার ভাল লাগত না, একটু কাঁচা মাছের গন্ধ আছে।"

"ভালই হয়েছে তোদের সঙ্গে বেরোইনি। আমি বাবা এখানে পাতি ইন্ডিয়ান ডিশ খেয়েছি। পরোটা মাংস উইথ স্যালাড।

"আর বুমবুম?"

"ও ব্যাটা তো জাগলই না। সেন্টোসায় যা হাঁটাহাঁটি করেছে!"

মিতিন বিছানায় বাবু হয়ে বসেছে। আপন মনেই বলল, "সেন্টোসার ছবিগুলো একবার দেখলে হয়।"

"এত রাত্তিরে?" পার্থ চোখ কুঁচকোল, "পুরো একটা ক্যাসেট আছে কিন্তু। এক ঘণ্টার।"

"আহা, চলুক না খানিকক্ষণ। তোমার ব্যাটারিটাও মোটামুটি চার্জ্‌ড হয়ে যাবে।"

প্লাগ গুঁজে টিভির সঙ্গে যুক্ত হল হ্যান্ডিক্যাম। পরদায় ফুটে উঠল ছবি। গোড়ার দিকে নেহাতই হাবিজাবি। সেন্টোসা যাওয়ার পথে বড্ড উলটোপালটা ক্যামেরা চালিয়েছে পার্থ। অকারণে। ফার্স্ট ফরোয়াড করে ঢোকা হল সেন্টোসা পর্বে। প্রথমেই আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড। হাঙর, অক্টোপাস, স্টিং রে, পিরান্‌হা, রাক্ষুসে কাঁকড়া। বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সিলোসো বিচ। ইতালিয়ান রেস্তরাঁর অভ্যন্তর, বুমবুমের বৃষ্টিতে ছোটাছুটি, জলে গিয়ে পা ডোবানো, টুপুরের সঙ্গে খুনসুটি। ব্লু-লাইন, না রেডলাইন, কোনও একটা ভিড়-ভিড় বাসের অন্দরেও ঘোরানো হয়েছে হ্যান্ডিক্যাম। বাইরে থেকে মেরলিয়ন, সিংহের মুখে দাঁড়িয়ে সেন্টোসার নিসর্গ, দূরে সিঙ্গাপুরের উঁচু-উঁচু বাড়ি, জাহাজ, সবই ধরা আছে লেন্সে। আছে সেন্টোসার ট্রাম, রঙিন ডাস্টবিন, সাইনবোর্ড, ছবির মতো পাকখাওয়া পথঘাট, গাছপালা। ডলফিন শো তো প্রায় পুরোটাই

তুলেছে পার্থ। বাজনার তালে নাচ, উদবিড়ালের কেরামতি...

আচমকাই ডলফিননৃত্য স্থির করে দিয়েছে মিতিন। কী যেন দেখছে এক দৃষ্টে।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"ওই লোকটাকে মার্ক করো," টিভির পরদায় ফুটে থাকা ছবির বাঁ কোণটায় আঙুল দেখাল মিতিন, "ওই যে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় টুপি, চোখে চশমা!"

টুপুর চোখ কুঁচকে বলল, "স্টিল কালারের সুট?"

"হ্যাঁ। লোকটাকে মেরলিয়নেও দেখলাম না?"

"ছিল নাকি?"

"মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, রিওয়াইন্ড করি।"

ভুল বলেনি মিতিন। মেরলিয়নেও দেখা গেল লোকটাকে। আট-দশ জন টুরিস্টের মধ্যে মিশে রয়েছে। আরও পিছনো হল ক্যাসেট। কী কাণ্ড, সিলোসোতেও ফ্রেঞ্চকাট! এক জাপানি দলের পাশে দাঁড়িয়ে! আবার পিছোল ছবি। আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ডে ঢোকার মুখে, স্ন্যাক বারে বসে আছে লোকটা। ক্যামেরার দিকে পিঠ, তবে সুট আর টুপি দেখে চেনা যায়।

মিতিন টানটান হল, "ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে না?"

পার্থ হাই তুলে বলল, "অমনই রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেলে তো? আরে বাবা, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা তো ঘুরতেই পারে।"

"এবং আমরা যেখানে যতক্ষণ কাটিয়েছি, লোকটাও ঠিক ততক্ষণই সেখানে কাটাতে পারে?"

"তাতেই বা কী আসে যায়?"

"যায়। যায়। আমার স্মৃতি যদি বিট্রে না করে, আমরা যখন যে বাসে উঠেছি, লোকটাও ঠিক সেই বাসই ধরেছে।"

"স্বাভাবিক। একই জায়গায়, একই সময়ে যেতে গেলে এক বাস তো ধরতেই হবে।"

"কিন্তু ওরকম দ্বিতীয় একটা লোককে পাচ্ছি না কেন? ...তোমার বাসের সিনটা দ্যাখো। টুপিওয়ালা লাস্ট সিটে বসে, খোলা ম্যাপে মুখের অনেকটাই ঢাকা। শুধু টুপি দেখা যাচ্ছে।"

"আশ্চর্য, বাসে তোমার কোনও সন্দেহ হল না? এখন বলছ?"

"শোনো, বাসে আমরা উঠেছি এক-দেড় ঘণ্টা পর পর। মাত্র তিনবার। লোকটাকে তখন খেয়াল করলেও আলাদা ভাবে চিহ্নিত করার মতো কোনও পরিস্থিতি হয়নি। তবু মনে একটা খচখচানি ছিল বলেই না রাতদুপুরে ক্যামেরা চালিয়ে বসলাম!"

"অর্থাৎ তোমার ধারণা, লোকটা আমাদের ফলো করছিল?"

"একটু একটু ধারণা তখন জন্মেছিল বটে। এখন ছবি দেখে নিশ্চিত হলাম। আড়ালে থাকার চেষ্টা করেও ঠিক কোনও না কোনও ভাবে ক্যামেরায় এসে গিয়েছে লোকটা।"

"কিন্তু ফলো করার একটা কারণ থাকবে তো? একটা অচেনা লোক কেন হঠাৎ...?"

"সেটা তো আমিও ভাবছি। যাক গে, মরুক গে, কাল সকালে আবার ঘর বদলানো আছে। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। এখন চলো, শুয়ে পড়া যাক।"

শোওয়াই সার। টুপুরের ঘুম আসছিল না। মস্তিষ্কে এক আজব উত্তেজনা। সিঙ্গাপুরেও একটা রহস্য এসে গেল তা হলে? কিন্তু সারা সন্ধে সে মিতিনমাসির সঙ্গে ছিল, তখন মিতিনমাসি কোনও আলোচনাই করল না কেন?

তবে কি রহস্য এখনও যথেষ্ট পাকেনি? হবেও বা।

॥ ৭ ॥

ঠিক যেন এক ঘন জঙ্গল। ছায়া ছায়া। জঙ্গল বেয়ে চলে গিয়েছে আঁকাবাঁকা পথ। কখনও সে পথ চড়াই ভাঙছে, কখনও উতরাই। গাছে-গাছে, ঝোপেঝাড়ে অসংখ্য পাখির ডাক। এমন পরিবেশে হঠাৎ এসে পড়লে চোখে যেন কেমন ঘোর লেগে যায়।

হ্যাঁ, বার্ড পার্কের ভিতরে পৌঁছে টুপুরের সেরকমই ঘোর লাগছিল। এত বিরাট এলাকা জুড়ে, এমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুধু পাখির বাগান তৈরি করা যায়? ঢোকার মুখে পেঙ্গুইনদের আস্তানাটাই তো জোর চমক। কাচের বরফঠান্ডা খাঁচায় কত রকম যে পেঙ্গুইন সেখানে। রাজা পেঙ্গুইন, বাদশা পেঙ্গুইন, পরি পেঙ্গুইন... ছোট্ট ছানা থেকে ইয়া-ইয়া ধাড়ি। কালো-কোটপরা উকিলবাবুদের জন্য পাহাড়, গুহা, নদীটদি বানিয়ে কী তোফা বন্দোবস্ত করা হয়েছে! প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ তুলে গল্পগুজব করছে কেউ-কেউ। সাঁতার প্র্যাকটিসও চলছে জলে। কেউ বা উদাস নয়নে বসে। দুটো কিং পেঙ্গুইন তো জোর মারপিট শুরু করে দিল। দেখে বুমবুমের সে কী উল্লাস! দুই পালোয়ানের মধ্যে কে জেতে না জেনে সে নড়বে না। তাকে কোনওক্রমে টেনেটুনে সরিয়ে আনা গেল।

এখন অবশ্য বুমবুমের অন্য উত্তেজনা। জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে টয়ট্রেনে যাচ্ছে যে! ছোট্ট কামরায়। শুধু চারজনে। দু' ধারে, গাছগাছালির ফাঁকে-ফাঁকে খাঁচায় নানান দেশের পাখি। হর্নবিল, ম্যাকাও, কিংফিশার... বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে বুমবুম তাদের

দেখছে, আর লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে, "ওখানে যাব। ওখানে চলো।"

পিচের রাস্তা দিয়ে অনেকেই ঘুরছে পায়ে হেঁটে। সেদিকে ক্যামেরা তাক করে পার্থ বলল, "ঠিক বলেছিস। আমাদের পা-গাড়ি ধরাটাই উচিত ছিল।"

টুপুর বলল, "তা হলে কিন্তু টয়ট্রেনের আনন্দটা মিস হত।"

"তা-ও তো বটে," বলেই পার্থ মিতিনের দিকে ফিরল, "কী গো, তুমি এত চুপচাপ কেন? কালকের কথাই ভেবে যাচ্ছ নাকি?"

মিতিন অস্ফুটে বলল, "নাঃ, আজকের কথা ভাবছি।"

"আজকেও কেউ ঘুরছে নাকি পিছন-পিছন?"

"এখনও পর্যন্ত তো মনে হচ্ছে, না।"

"পরেও দেখবে কেউ নেই। কালও ছিল না। সবটাই তোমার মনগড়া। কে এক অজানা অচেনা টুরিস্ট...অকারণে তাকে সন্দেহ করে নিজের ভিতর ভুলভাল টেনশন তৈরি করছ।"

"অকারণ হলেই ভাল। তবে আমার মন বলছে..."

"মনকে ঘুম পাড়িয়ে দাও," পার্থ হ্যা-হ্যা হাসল, "সিঙ্গাপুরে তো আছ আর মাত্র দেড়টা দিন। টিকটিকিপনা ছেড়ে বেড়ানোটাকে ভালভাবে এনজয় করো দেখি!"

খেলনা-ট্রেন এক পুঁচকে স্টেশনে থেমেছে। লাফাতে-লাফাতে নেমে পড়ল বুমবুম। সঙ্গে টুপুর-মিতিন-পার্থও। খুদে প্ল্যাটফর্ম টপকে সোজা টিয়া, রোজেলার আড়তে। গাছে-গাছে পাখিদের কিচিরমিচির। গায়ে তাদের কত রকম যে রং। মনে হয় লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-কমলা, সব ক'টা রঙে কেউ ছাপিয়ে দিয়েছে তাদের। রবিবার বলেই বোধ হয় আজ দর্শক অনেক। ছোট-ছোট বাটিতে তারা দানাপানি ধরছে, অমনই পাখির ঝাঁক নেমে এসে বসছে তাদের কাঁধে, হাতে, মাথায়। ধারালো ঠোঁটে টপাটপ

সাবাড় করছে খাবার। হালকা করে ঠুকরেও দিচ্ছে মাঝে-মাঝে।

টুপুর উচ্ছ্বসিত মুখে বলল,"মার্ভেলাস! কলকাতায় এমন একটা পার্ক বানানো যায় না? যেখানে পাখিগুলো ছাড়া থাকবে? খোলা আকাশে উড়ে-উড়ে বেড়াবে?"

"এখানেও মোটেই খোলা আকাশে উড়ছে না, টুপুর।" পার্থ আঙুল তুলে দেখাল, "ওই দ্যাখ, উপরে সরু-সরু জাল। জালটা একটু বেশি উঁচুতে, এই যা।"

"তা হোক। স্বাধীনভাবে তো ওড়াওড়ি করতে পারছে। গাছে বাসা বেঁধে থাকছে..."

বলতে-বলতে হঠাৎই টুপুরের কথা আটকে গেছে। সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য। মিতিনমাসি বাটি ধরে বহুরঙা রোজেলাদের খাওয়াচ্ছিল। তাদের মধ্যেই একজন বুমবুমের মাথায় এখন। আতঙ্কে বুমবুম পাথরের মতো স্থির। আড়ষ্ট স্বরে শুধু বলে চলেছে, "ভাল হবে না বলছি। যা, উড়ে যা।"

টুপুরের পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল। তাই দেখে বুমবুম আরও কাঠ, "দিদি, ওকে এখনই তাড়িয়ে দে।"

"আহা, থাক না। কিছু তো করছে না।"

"করবে। এখনই মাথায় পটি করে দেবে।"

লাল-ঠোঁট রোজেলা বুঝতে পারল কিনা কে জানে, বুমবুমকে রেহাই দিয়ে এক সাহেবশিশুর মাথায় গিয়ে বসেছে। সম্ভবত পটি করার জন্য কালো চুলের চেয়ে সোনালি চুল তার বেশি পছন্দ হল।

বুমবুমের পক্ষীপ্রেম উবে গেছে। এ তল্লাটে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নয়। অগত্যা রোজেলাপট্টি ফেলে শুরু হল হাঁটা। খাঁচার পাখিগুলোকে দেখে তেমন একটা আহ্লাদ হল না টুপুরের। এমন তো কলকাতায় চিড়িয়াখানাতেও দেখা যায়। এখানে শুধু সবুজের আধিক্য, এই যা।

ঘুরতে-ঘুরতে শেষে এক কৃত্রিম জলপ্রপাতের সামনে। চতুর্দিকে লম্বা-লম্বা গাছপালা লাগিয়ে এমন একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া অরণ্য বানানো হয়েছে, সত্যিই রেনফরেস্ট বলে ভুল হয়। জলপ্রপাতটিকেও মনে হয় না মেকি। বেশ লাগে দেখতে।

পার্থও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারিফের সুরে বলল, "আইডিয়াটা গ্র্যান্ড। কোন হাইট থেকে জল ফেলা হচ্ছে লক্ষ করেছিস?"

টুপুর বলল, "মিনিমাম একশো ফিট তো হবেই।"

"আরও বেশি। এটাই মানুষের তৈরি সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত। পার্কটার গ্ল্যামারই বাড়িয়ে দিয়েছে এই ওয়াটারফল।"

"পাখিরাও বোধ হয় এই রেনফরেস্ট এরিয়াটা বেশি পছন্দ করে।"

"হুম। প্রচুর কাকাতুয়া উড়ছে। জাম্বো সাইজের পায়রাও।"

"কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, পার্থমেসো?"

"কী রে?"

"পাখিদের রাজ্যে একটাও কাক নেই।"

"কাক কি তুই সিঙ্গাপুর শহরেও দেখতে পেয়েছিস?"

"এখনও তো নজরে পড়েনি।"

"পাবি না। নেই। একসময় যা-ও ছিল, এখন ঝাড়েবংশে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। কাক শহর নোংরা করে বলে সিঙ্গাপুরে তাদের নো এন্ট্রি।"

"অদ্ভুত তো! আমি তো জানতাম কাক ঝাড়ুদার পাখি। নোংরা খেয়ে সাফ করে।"

"সিঙ্গাপুরিরা হয়তো সেটা মানে না।"

জবাবটা মনঃপূত হল না টুপুরের। এখানকার কাকদের জন্য একটু যেন মনখারাপই হল। পায়ে-পায়ে পার্থমেসোর সঙ্গে এল ছাউনি ঢাকা এক চাতালে। পার্থ তিনটে কফির অর্ডার দিল স্ন্যাক বারে। আর বুমবুমের জন্য চিপ্‌স।

মিতিন বুমবুমকে নিয়ে টয়লেটে গিয়েছিল। ফিরে বলল, "এখন কফি? চিপ্‌স? সাড়ে বারোটা বাজে, দুপুরের খাওয়া হবে কখন?"

পার্থ কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "লাঞ্চ করব লিট্‌ল ইন্ডিয়াতে গিয়ে। ওখানে অনেক বাংলাদেশি হোটেল দেখেছি। গরম-গরম মাছভাত খাব। কাল সুজিতবাবু বলছিলেন, ওখানে নাকি দারুণ শুঁটকি পাওয়া যায়।"

সুজিত দত্তর নাম উঠতেই মিতিনের চোখ তেরচা, "তোমার সুজিত দত্ত সকালে হঠাৎ হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন যে বড়?"

পার্থ হাত উলটে বলল, "হয়তো কাজকর্ম মিটে গিয়েছে, তাই।"

"চলে যাবেন, এটা তোমায় কাল বলেছিলেন?"

"নাঃ। সেরকম কোনও প্রসঙ্গ তো ওঠেনি। আমিও জানাইনি, আজ আমরা রুম চেঞ্জ করছি।" পার্থর চোখ সরু, "আচ্ছা, তুমি সুজিতবাবুকে নিয়ে পড়েছ কেন বলো তো? ভদ্রলোক গায়েপড়ে আলাপ করেছিলেন বলেই তাঁকে বাঁকা চোখে দেখতে হবে?"

"আমি সোজা বাঁকা কোনও চোখেই দেখছি না। জাস্ট জানতে চাইছি।"

"বললেই মানব? তুমি মগজ থেকে কিছুতেই পোকাটাকে তাড়াতে পারছ না। ওই পোকাই ভোঁ-ভোঁ করে বলছে, তোমার পিছনে কেউ ফেউ লাগিয়েছে! অমুক লোক তমুক প্রশ্ন করল কেন... নারায়ণের চিঠি চাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও গভীর মানে আছে... এমনকী একটা নর্মাল টেলিফোন... সুজিতবাবু থাকাকালীন সেটা আসতেই পারে... তাও তুমি সোজা মনে নিতে পারনি। অথচ সাদা চোখে দেখলে গোটা ব্যাপারটাই জলবৎ তরলং।"

"তাই বুঝি?"

"আমার সুডোকু মেলানো ব্রেন তো সেরকমই বলে ... শোনো, মিস্টার নারায়ণ নেহাতই তাঁর কোম্পানির এক জো-হুজুর কর্মচারী।

যেহেতু তাঁকে বলা আছে অরিজিনাল আমন্ত্রণপত্র কালেক্ট করতে হবে, উনি বাধ্য দাসানুদাসের মতো ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছিলেন। ওঁকে একটা ধাতানি দেওয়ার দরকার ছিল। দিয়েওছি। ফল নিজের চোখেই দেখলে। সকালে উনি আর হোটেলের ছায়া মাড়াননি। সুজিতবাবুও কাজ চুকে গেলে চলে যাবেন, এটাও একদম স্বাভাবিক। অতএব বুঝতে পারছ তো, তোমার কেতাবি সন্দেহগুলো নিছকই হাস্যকর?"

মিতিন কোনও জবাব দিল না। চিলতে হাসল শুধু। ওই হাসি দেখে টুপুর বেশ আন্দাজ করতে পারল, পার্থমেসোর একটা যুক্তিও হজম করেনি মিতিনমাসি। বোঝাই যায়, এখন থট প্রসেস চলছে। শত খোঁচালেও মাসি এই মুহূর্তে রা কাড়বে না।

কিন্তু কেসটা কী? রহস্যটা কোথায়?

বাংলাদেশি হোটেলে খ্যাটন মন্দ হল না। ভাত, ডাল, আলুভরতা, সর্ষেইলিশ, পাঁঠার মাংস। খুব চেকনাদার রেস্টুরেন্ট অবশ্য নয়, তবে রান্না দিব্যি সুস্বাদু। লিটল ইন্ডিয়ার এদিকটায় পর পর এরকম খাওয়ার জায়গা রয়েছে কয়েকটা। বাংলাদেশিদের দোকানবাজারও। বাংলা ভাষা ভাসছে বাতাসে। সামনেই মুস্তাফা সেন্টার। ভারতীয় ব্যবসায়ীর তৈরি প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। বহুতল ওই বাড়িতে কী না পাওয়া যায়। বহুমূল্য গয়নাগাটি থেকে ব্যথাবেদনার মলম পর্যন্ত।

টুপুরের ইচ্ছে ছিল মুস্তাফায় একবার ঢুঁ মারার। পার্থর ঘোরতর আপত্তি। ভরপেট আহারের পর হোটেলে ফিরে সে একটু গড়াতে চায়। মুস্তাফা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা, যে-কোনও সময় এলেই হবে।

বাঙালি-বাঙালি এলাকাটা থেকে কার্লটন হোটেল খুব দূরে নয়। হাঁটাপথে মিনিটপাঁচেক। হোটেলে পৌঁছে জোর ঘাবড়ে গেল টুপুর।

বেজায় হল্লাগুল্লা চলছে লাউঞ্জে। এক মধ্যবয়সি গুজরাতি দম্পতি আঙুল নেড়ে-নেড়ে শাসাচ্ছেন হোটেলের কর্মচারীদের। সুট-টাইপরা ম্যানেজার প্রাণপণে শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁদের।

ব্যাপারটা কী শুনে টুপুর তো আরও থ। সকালে তারা যে ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানেই উঠেছেন ওই দম্পতি। স্নানটান সেরে কাছেই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। ফিরে দ্যাখেন, ঘরের লণ্ডভণ্ড দশা। কোনও এক বদমাইশ ব্যাগ সুটকেস খুলে যাবতীয় জিনিসপত্র ছত্রাকার করে দিয়ে গিয়েছে। কপাল ভাল, কিছু খোয়া যায়নি। সম্ভবত সময় পায়নি চোর। স্বামী-স্ত্রীর রাগ অবশ্য তাতে পড়ছে না। এই যদি কার্লটন হোটেলের নিরাপত্তার ছিরি হয়, এখানে তাঁরা দুটো দিন কাটাবেন কোন ভরসায়?

উপরে নিজেদের নতুন রুমে এসে পার্থ বলল, "জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছি রে টুপুর। ভাগ্যিস তোর কথামতো ঘর বদলেছিলাম। নইলে হয়তো ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার বদলে আমাদেরই এখন ওখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে হত।"

টুপুর বলল, "কী আশ্চর্য কাণ্ড! সিঙ্গাপুরে এত কড়াকড়ি, এখানেও তবে চুরিবাটপাড়ি হয়?"

"তাই তো দেখছি। আমি তো আবার ডলারের অর্ধেকটাই সুটকেসে রেখে গিয়েছিলাম। নির্ঘাত আজ হাপিশ হয়ে যেত।"

মিতিন গুম হয়ে বসে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "না। আর যাই হোক, ডলার খোয়া যেত না।"

"কী করে বুঝলে?"

"তোমাদের মাথায় কি গোবর পোরা? এ-ও বুঝলে না, চোর ডলার হাতাতে আসেনি। ঘড়ি, ক্যামেরা বা আর কিছুও নয়? এসেছিল অন্য কিছুর সন্ধানে?"

"কী সেটা?"

"এমন কিছু, যা ওসবের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। এবং জিনিসটা সে খুঁজতে এসেছিল ওই গুজরাতি স্বামী-স্ত্রীর ব্যাগে নয়। আমাদেরই ব্যাগে।"

একসঙ্গে পার্থ আর টুপুর বলে উঠল, "মানে?"

"কারণ, জিনিসটা আমাদের কাছেই থাকার কথা। আমরা যে রুম পালটেছি, সেটা চোর তো আর জানত না।"

"ও," পার্থ থমকে গিয়েছে। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি বলতে চাইছ, ওই চিঠিটা...?"

"মনে তো হচ্ছে, তাই।"

"তা হলে কি মিস্টার নারায়ণই...?"

"স্বয়ং না-ও আসতে পারেন। হয়তো কাউকে পাঠিয়ে..। কিংবা এখানকারই কোনও কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজস করে... কিংবা হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কেউ..."

টুপুর বলে উঠল, "তুমি কি সুজিত দত্তর দিকে ইঙ্গিত করছ?"

"ইঙ্গিত করছি না। শুধু মাথায় রাখতে বলছি, রুম চেঞ্জের খবরটা তিনিও জানতেন না," মিতিন ভুরু বেঁকিয়ে পার্থকে বলল, "কী, তাই তো?"

পার্থ জোরে-জোরে ঘাড় নাড়ল, "অবশ্যই। আমি ওঁকে মোটেই বলিনি। তা ছাড়া উনি তো কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন!"

"সেটা তুমি হলপ করে বলতে পার না। উনি হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন, এটুকুই সত্যি। মনে রেখো, সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার ফ্লাইট একটাই। রাত ন'টায়। ওই প্লেনে ওঠার জন্য কেউ ভোরবেলা হোটেল ছাড়ে না।"

"কিন্তু সুজিত দত্তর সঙ্গে ওই চিঠির কী সম্পর্ক? বরং মিস্টার নারায়ণের ইন্টারেস্ট থাকলেও থাকতে পারে। যদিও তাঁর পক্ষে দিনদুপুরে লাগেজ হাতড়ানো যথেষ্ট অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।"

"বা রে, মিতিনমাসি তো বলছে চিঠিটা হয়তো খুব মূল্যবান," টুপুর মন্তব্য জুড়ল, "তাই যদি হয়, ওটা মিস্টার নারায়ণেরই কাজ। আমি শিওর।"

"ধুত্তোর ছাই," পার্থ মাথা ঝাঁকাল, "চিঠিটা কেন মূল্যবান, তার তো একটা যুক্তি দেখাবে! প্রত্যেক সপ্তাহেই আমার মতো কেউ না-কেউ সুডোকু মিলিয়ে সিঙ্গাপুর টুর প্রাইজ় পাচ্ছে। প্রত্যেকের কাছেই অবিকল এরকম চিঠি থাকে। এর মধ্যে আমাদেরটা ফর নাথিং হঠাৎ মূল্যবান হয়ে উঠবে কেন?"

মিতিন থমথমে মুখে বলল, "এটাই তো একটা সুডোকু।"

॥ ৮ ॥

বিকেল প্রায় শেষ। চা-টা খেয়ে পার্থ তৈরি। বুমবুমকে নিয়ে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানায়। নাইট সাফারিতে। কবজিতে ঘড়ি বাঁধতে-বাঁধতে টুপুরকে বলল, "কী রে, তোরা তা হলে যাচ্ছিস না? ফাইনাল?"

টুপুর অসহায় মুখে মিতিনমাসিকে দেখল। সেই যে দুপুর থেকে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে মাসি, এখনও ওঠার কোনও লক্ষণ নেই। কাচুমাচু মুখে টুপুর বলল, "কী করব, মিতিনমাসি আমাকে থেকে যেতে বলছে যে।"

"তা হলে আর কী, মাসি-বোনঝি ঘরে বসে ভ্যারেন্ডা ভাজ। থুড়ি, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালা," পার্থ মুখভঙ্গি করল, "অবশ্য তোর দুধের স্বাদ আমি ঘোল খাইয়ে পূর্ণ করে দেব। রাত্তিরে নাইট সাফারির ছবি দেখে নিস।"

তখনই হঠাৎ মিতিনের গলা শোনা গেল, "টুপুর, তোর মেসোকে বল হ্যান্ডিক্যাম যেন না নিয়ে যায়। ক্যামেরা মোবাইলটাও থাকুক।"

পার্থ আকাশ থেকে পড়ল, "কেন?"

"দরকার আছে।"

"তোমার এই পাগলামির কিন্তু আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না। পার্থ বিরক্ত স্বরে বলল, "শুধু শুধু তিলকে তাল করছ।"

"তিল যদি নিজেই তাল হতে চায়, আমি কী করতে পারি?"

"করো যা খুশি। সিঙ্গাপুরে বসে তালের বড়া ভেজে খাও।"

বলেই বুমবুমের হাত ধরে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেছে পার্থ। টুপুর হতবুদ্ধির মতো বসেই আছে বিছানায়। নাইট সাফারিতে যাওয়া হল না বলে একটু-একটু দুঃখ হচ্ছে বটে। আবার তাকে দরকারে লাগবে বলে মিতিনমাসি আটকে রাখল ভেবে, পুলকও জাগছে অল্প-অল্প। কিন্তু মিতিনমাসি ওঠে না কেন? কতক্ষণ শুয়ে থাকবে?

পায়ে-পায়ে ব্যালকনিতে এল টুপুর। লাগোয়া ব্যালকনিখানা ছোট হলেও ভারী সুন্দর। দূরে একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে। এ শহরের অজস্র পার্কের মতোই গাঢ় সবুজ। চওড়া রাস্তাও চোখে পড়ে। দেখা যায় গাড়িঘোড়া, মানুষজন। এই অঞ্চলের বাড়িগুলো সিঙ্গাপুরের আর পাঁচটা জায়গার মতো নয়। বহুতল তো প্রায় নেইই। বেশির ভাগই একতলা, কী দোতলা। একটু যেন ঘিঞ্জি। কোথায় যেন কলকাতার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এদিককার হোটেলে উঠে একটা ব্যাপার অন্তত বোঝা গেল, সিঙ্গাপুরের সর্বাঙ্গই খুব ঝকমকে নয়।

মিতিন ডাকছে ভিতর থেকে। ঘরে ফিরে টুপুর অবাক। বিছানা ছেড়ে কখন যেন উঠে পড়েছে মিতিনমাসি। টিভিতে ক্যামেরা লাগিয়ে আবার দেখছে সেন্টোসার ক্যাসেটখানা।

টুপুর বসে পড়ল পাশে, "কী খুঁজছ গো? কালকের সেই লোকটাকে?"

"হুম।"

টুপিওয়ালা ফ্রেঞ্চকাট অনেকবারই ধরা পড়ছে পরদায়। কিন্তু কিছুতেই মুখটা জুতসইভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। কখনও সাইড-ফেস। কখনও পিছন ফেরা। বাসে তো টুপি আর ম্যাপে মুখ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। অবশেষে ডলফিন লেগুনের ছবিটাই কাজে লাগল। ঝলকের জন্য হলেও স্পষ্ট হয়েছে মুখমণ্ডল। সঙ্গে-সঙ্গে ছবিটাকে দাঁড় করিয়ে জুম টিপল মিতিন। অনেকটা বড় হয়েছে ছবি। তবে সামান্য ফেটে-ফেটে গেল।

পরদায় দৃষ্টি গেঁথে মিতিন বলল, "দ্যাখ তো ভাল করে, চেনা-চেনা লাগে কিনা?"

টিভির খুব কাছে মুখ নিয়ে গেল টুপুর। চোখ পিটপিট করে বলল, "নাঃ, লোকটার নাক যা প্রকাণ্ড..."

"নাক তো বানানো যায়। নাকটাকে ছেঁটেকেটে দ্যাখ। দাড়ি আর টুপিও বাদ দে।"

"উঁহু, বুঝতে পারছি না। মিস্টার দত্তর সঙ্গে মিল আছে কি?"

আরও দু'-চার সেকেন্ড ছবিটাকে পর্যবেক্ষণ করে ক্যামেরা অফ করল মিতিন। বিড়বিড় করে বলল, "ভদ্রলোক ছদ্মবেশ ধরাতে খুব পটু। ফলো করাতেও। যদি ভদ্রলোক সুজিত দত্তই হন, আমাদের পিছন-পিছন ঘুরছিলেন কেন?"

"চিঠিটার জন্য কি?"

"অথচ একবারও তো আমাদের কাছাকাছি এলেন না? যদি ধরেও নেন বস্তুটি আমাদের সঙ্গে আছে, তা হলে তো উনি কাড়ার চেষ্টা করতেন?"

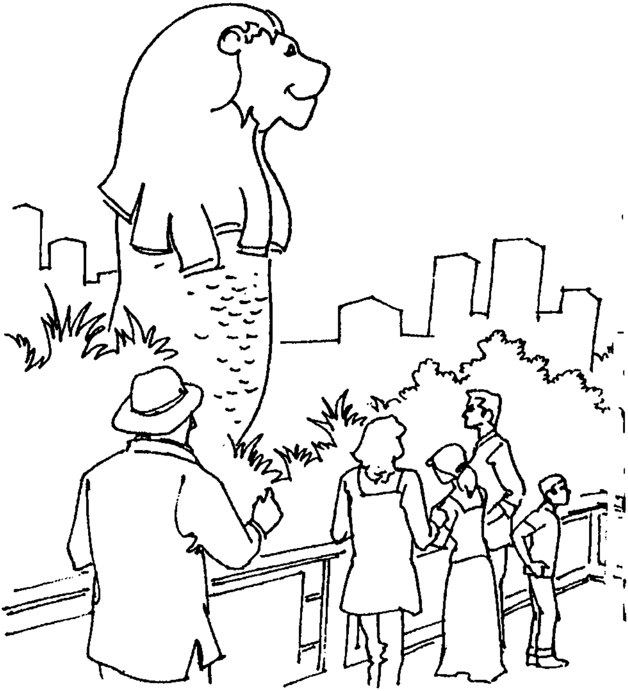

"তা হলে বোধ হয় উনি মিস্টার নারায়ণ।"

"দুর বোকা। সে লোকটাই বা হামলাটামলা না করে স্রেফ ঘুরে বেড়াবে কেন? তা ছাড়া মিস্টার নারায়ণের হোটেলে বসে থাকাটাই বলে দিচ্ছে..."

"উনি নিজেও যাননি। এবং কোনও লোকও পাঠাননি," টুপুর কথা মাঝপথ থেকে কেড়ে নিল। হতভম্ব মুখে বলল, "তা হলে লোকটা কে?"

"উঁহু। প্রশ্নটা 'কে' নয়। প্রশ্নটা হল 'কেন'?"

"মানে?"

মিতিন উত্তর দিল না। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তিন মিনিটে রেডি হয়ে নে। বেরোব।"

"কোথায় যাবে?"

"প্রশ্ন নয়। যা বলছি, কর।"

নিজেও চটপট চুলে চিরুনি চালাল মিতিন। সালোয়ার-কামিজের ওপর ওড়না বিছিয়ে দ্রুত নেমে এল নীচে। রিসেপশনে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, "১০৪ নম্বর রুমের কেসটার কোনও ফয়সালা হল?"

কাউন্টারে এখন এক মিষ্টিমুখ চিনা মেয়ে। সে ভারী লজ্জিত

মুখে বলল, "নো ম্যাম। তবে ঘটনাটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, এ হোটেলে আগে কখনও এমনটা হয়নি।"

"আপনি কি জানেন, আমরা ওই রুমেই ছিলাম? ইনফ্যাক্ট, আজও ওখানে থাকার কথা ছিল? সকালেই আমরা রুম চেঞ্জ করে তিনতলায় গিয়েছি? ৩২২-এ?"

"জানি ম্যাডাম। ডিউটিতে এসে শুনেছি।"

"ঘটনাটায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আপনারা কি পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"পুলিশকে এখনই জানালে হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে, ম্যাডাম। আমাদের মালিক আর ম্যানেজার নিজেরাই থরো এনকোয়ারি করে দেখছেন। তেমন হলে নিশ্চয়ই পুলিশকে..."

"আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"বলুন।"

"একজন থার্ড পার্সন রুম খুলল কী করে?"

"সেটাই তো পরিষ্কার হচ্ছে না, ম্যাডাম। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পটেল তো চাবি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন।"

"চাবির ডুপ্লিকেট আছে না?"

"তা আছে।"

"রিসেপশনেই থাকে?"

"হ্যাঁ, ম্যাম," চিনা মেয়েটি অধোবদন।

"অর্থাৎ আপনাদের লোকও ইচ্ছে করলে রুমে ঢুকতে পারে?"

"না ম্যাডাম। নেভার। বোর্ডারের অনুমতি ছাড়া রুম আমরা খুলতে পারি না।"

"ও। তার মানে লক ভেঙে কেউ ঢুকেছিল?"

"লক ভাঙা হয়নি ম্যাডাম। আমরা চেক করেছি।"

"তা হলে তো সন্দেহ আপনাদের কর্মচারীদের দিকেই যায়!"

"সব কর্মচারীকেই ক্রস করা হচ্ছে। যদি কাউকে দোষী মনে হয়, তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ম্যাডাম, পুলিশের হাতে পড়লে তারা পেট থেকে কথা টেনে বের করবেই।"

"দ্যাট্স গুড...যাক গে, আপনাকে বিব্রত করার জন্য দুঃখিত।"

"আমাদেরই তো দুঃখিত হওয়ার কথা ম্যাডাম। এবং এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, সেটা দেখাও আমাদের কর্তব্য।"

"শুনে ভাল লাগল। আর একটা-দুটো প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে। বলুন?"

"ঘটনাটা ঠিক কখন ঘটেছিল?"

"সঠিক টাইম বলতে পারব না ম্যাডাম। তবে মিস্টার পটেলরা বেরিয়েছিলেন এগারোটা নাগাদ। ফিরে আসেন দেড়টার সময়..."

"আপনি নিশ্চয়ই তখন ডিউটিতে ছিলেন না?"

"না। আমার আজ ইভনিং শিফ্‌ট। দুটোয় এসেছি। আজ মর্নিং ছিল রোজির।" বলেই চিনা মেয়েটি যেন কেঁপে গেল, "রোজি খুব ভাল মেয়ে ম্যাডাম। ও সত্যিই কিছু জানে না।"

"রোজি কি কাউকে ১০৪-এর দিকে যেতে দেখেছিলেন?"

"না ম্যাডাম। সেভাবে বোধ হয় বলা সম্ভবও নয়। সারাক্ষণই কাস্টমাররা আসা-যাওয়া করছেন..."

"রোজির কাছে কেউ ১০৪-এর বোর্ডারদের সম্পর্কে খোঁজও করেননি?"

"বোধ হয় না। তা হলে তো রোজি বলত।"

"আচ্ছা, আর-একটা খবর দিতে পারেন?" মিতিন সামান্য ঝুঁকল এবার, "আমার কাছে একটা গাড়ির নম্বর আছে। গাড়ির মালিকের নাম জানতে চাই..."

"সিঙ্গাপুরে এটা কোনও সমস্যাই নয় ম্যাডাম। ইন্টারনেটে মোটর ভেহিকল্‌সের ওয়েবসাইটে চলে যান।"

"থ্যাঙ্ক্‌স। এখানে কাছাকাছি সাইবার কাফে কোথায় আছে?"

"এই সার্ভিসটুকু আমরাই প্রোভাইড করতে পারি। অনুগ্রহ করে আমায় যদি নম্বরটা দেন..."

"এস-জি-কে টু ফাইভ এইট নাইন। সাদা রঙের মিৎসুবিশি।"

"দু' মিনিট, ম্যাডাম।"

ডেস্কের কম্পিউটারে মনোযোগী হয়েছে চিনা মেয়েটি। টকাটক কী টিপছে। দু' মিনিট নয়, সময় নিল মিনিটপাঁচেক। মনিটরে চোখ রেখে বলল, "এটা তো একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির গাড়ি ম্যাডাম।"

মিতিন উৎসুক স্বরে বলল, "এজেন্সির নাম?"

"ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট। ঠিকানা, ইস্ট-এন্ড মল, গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নম্বর থ্রি সি।"

"লোকেশনটা জানতে পারি?"

"অবশ্যই। সিমেই।"

"ট্র্যাভেল এজেন্সির প্রোপ্রাইটারের নাম পাওয়া যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, ম্যাম। টি পি শঙ্করন।"

"অনেক-অনেক ধন্যবাদ," মিতিন কাউন্টার থেকে সরতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল, "আচ্ছা, সিমেই যাওয়া যায় কী করে?"

"ট্যাক্সিতে যেতে পারেন। কিংবা এম-আর-টি। সিঙ্গাপুরের এই ট্রেন সার্ভিস কিন্তু অতুলনীয় ম্যাডাম। ট্রেনে করে শহরের যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, লিটল ইন্ডিয়া থেকে সিমেই যেতে গেলে আউটরাম পার্ক স্টেশনে ট্রেন বদলাতে হবে। ওখান থেকে ধরবেন পূর্ব-পশ্চিম লাইনের ট্রেন। আশা করি, বোঝাতে পেরেছি?"

"একদম," মিতিন এবার একটা চওড়া হাসি উপহার দিল

মেয়েটিকে। টুপুরকে বলল, "চল, সিমেই ঘুরে আসি।"

রাস্তায় বেরিয়ে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে গিয়ে কী হবে মিতিনমাসি?"

"দেখা যাক। সূত্র কিছু তো মিলতেও পারে।"

"রিসেপশনের মেয়েটিকে জেরা করে কিছু লাভ হল?"

"না। হওয়ার কথাও নয়।"

"কেন?"

"জানাই ছিল, রুম খোলাখুলিতে হোটেলের স্টাফ যুক্ত থাকতে পারে না।"

"কীভাবে শিওর হলে?"

"সোজা বুদ্ধিতে। ঘর বদলানো তো হোটেলের লোকদের অগোচরে হয়নি। তারা কেউ জড়িত থাকলে ১০৪-এ নয়, ৩২২-এ ঢুকত।"

"তা হলে ফালতু-ফালতু মেয়েটাকে অত জেরা করছিলে কেন?"

"দুটো কারণে। এক, আমাদের ৩২২ এখন থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে। দুই, প্রশ্নের ধাক্কায় মেয়েটাকে নার্ভাস করে দিয়ে গাড়ি সংক্রান্ত খবরটাও বের করে নেওয়া গেল। আমার সময়ও বাঁচল, পরিশ্রমও বাঁচল..."

"বুঝলাম।"

কথা বলতে-বলতে হাঁটছে দু'জনে। লিটল ইন্ডিয়ার এম-আর-টি স্টেশন টুপুর চেনে মোটামুটি। ট্যাক্সিতে যাতায়াতের সময় নজরে পড়েছে। তাদের হোটেল থেকে পঞ্চাশ-ষাট পা গেলে সেরাংগুন রোড। চওড়া রাস্তাটা টপকে বাফেলো স্ট্রিট ধরে পৌঁছতে হয়।

স্টেশনে নেমে টুপুর দেখল, টিকিট-কাউন্টারের কোনও বালাই নেই, তার জায়গায় শোভা পাচ্ছে সার দিয়ে বসানো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। টিকিট কাটার ওই যন্ত্রের গায়ে ট্রেন রুটের ম্যাপ। গোটা শহরে

টিকিট সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও ভারী সরল। যেখান থেকে যেখানে যাবে মানচিত্রে শুধু আঙুল ছুঁইয়ে দাও, পরদায় ফুটে উঠবে ভাড়া কত। সেইমতো ডলার ঢুকিয়ে দাও নির্দিষ্ট ফোকরে, তলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে ফেরত খুচরোসহ একটা শক্তপোক্ত কার্ড। অনেকটা কলকাতার মেট্রোরেলের স্মার্টকার্ডের মতো।

প্ল্যাটফর্মের গেটে কার্ড ছুঁইয়ে ভিতরে ঢুকতে না-ঢুকতেই ট্রেন। থামার সঙ্গে-সঙ্গে খুলে গেল বন্ধ দরজা, যাত্রীরা উঠতেই আটকে গেল নিঃশব্দে। কামরাটি বেশ প্রশস্ত এবং সিঙ্গাপুরের আর পাঁচটা যানবাহনের মতোই দিব্যি দর্শনধারী। মোলায়েম ঠান্ডা বিরাজ করছে কামরায়। চিটপিটে গরম এই শহরটায় এ যেন বাড়তি পাওনা। আউটরাম পার্কে ট্রেন বদলাতেও সমস্যা হল না। প্ল্যাটফর্মে নিখুঁতভাবে দিক নির্দেশ করা আছে।

লিটল ইন্ডিয়া থেকে আউটরাম পার্ক আসার সময় কামরায় বেশ ভিড় ছিল। সিমেইগামী ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা।ভূগর্ভ ছেড়ে মাঝে-মাঝে উপরে উঠে আসছে ট্রেন, একটা-দুটো স্টেশন পরে আবার নেমে যাচ্ছে নীচে। ওঠানামার খেলাটা দেখতে বেশ মজাই লাগছিল টুপুরের। নাইট সাফারিতে না যেতে পারার আক্ষেপ যেন পুষিয়ে যাচ্ছিল। বেচারা বুমবুমটার বোধ হয় এম-আর-টি চড়া হল না।

সিমেই পৌঁছে ছোট্ট একটা ম্যাজিক দেখাল মিতিনমাসি। এসকালেটর বেয়ে নামতেই আবার স্বয়ংক্রিয় টিকিটযন্ত্র। তার ভিতরে কার্ড ঢোকাতেই ঠং করে বেরিয়ে এল একখানা এক ডলারের কয়েন। টুপুরের কার্ডে আবার আর-একটা কয়েন।

টুপুর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বলল, "এটা কী করে হল গো?"

"সিঙ্গাপুরকা জাদু," মিতিন ফিকফিক করে হাসছে, "এখানকার এম-আর-টি ভারী মজাদার রে। যতটা নেয়, তার খানিকটা ফিরিয়েও দেয়। আমি লিটল ইন্ডিয়া স্টেশনেই ওয়াচ করেছি।"

"খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু।"

"মোহিত হোস না টুপুর। একটু পরে হয়তো দেখবি অন্য ধরনের কোনও 'ইন্টারেস্টিং' আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

॥ ৯ ॥

ইস্ট-এন্ড শপিং মল একেবারে সিমেই স্টেশনের গায়ে। মাঝে শুধু একটা চাতালের ব্যবধান। রীতিমতো মেলা বসে গিয়েছে সেখানে। রঙিন ছাউনি টাঙিয়ে বিক্রি হচ্ছে বাচ্চাদের জামা-কাপড়, খেলনা...আর চাতালের ওপারে যথারীতি সুসজ্জিত পাঁচতলা বাজার।

বিল্ডিংয়ে ঢোকার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মিতিন। কোণের ছোট্ট এক রেস্টুরেন্টের সামনে। কাচের ওপর লেখা খাদ্যতালিকা পড়ছে। ঘুরে টুপুরকে বলল, "নতুন খাবার টেস্ট করবি?"

"কী গো?"

"স্কুয়িড খাবি? কিংবা বেবি অক্টোপাস?"

সেন্টোসা দ্বীপের সামুদ্রিক অ্যাকোয়ারিয়ামটা পলকের জন্য টুপুরের চোখে ভেসে উঠল। ঢোক গিলে বলল, "তুমি যদি খাও, তো খাব।"

এক বৃদ্ধা, সম্ভবত ভিয়েতনামি, দোকান চালাচ্ছেন। কথা বলছেন দুর্বোধ্য ইংরিজিতে। ভাষাটা বোধ হয় বোঝেনও না। তাঁকে স্কুয়িড ভাজা আর কোল্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিতে গিয়ে মিতিনমাসির গলদঘর্ম দশা। স্রেফ বোঝানো গেল না বলেই বেবি অক্টোপাস চাখার ইচ্ছেটা পরিত্যাগ করতে হল।

চাতালের এদিকটায় ছড়িয়েছিটিয়ে চেয়ার-টেবিল। একখানা দু' চেয়ারের টেবিলে টুপুর আর মিতিন বসল মুখোমুখি। একটু আগেও মিতিন বেশ হাসিখুশি ছিল, হঠাৎই কেমন গম্ভীর। পার্থর ক্যামেরা-মোবাইলখানা ব্যাগ থেকে বের করল। দেখছে কী যেন! ভাবছে।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "দুম করে তোমার মুড চেঞ্জ হয়ে গেল যে?"

মিতিন ঘড়ি দেখে বলল, "তাড়াতাড়ি স্কুয়িড ভাজাটা খেয়েই উঠতে হবে। সময় নষ্ট করা যাবে না।"

"আহা, খেতে তো তুমিই চাইলে। আমি নাকি?"

"হুঁ, ভুল হয়ে গেল। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট এজেন্সি বন্ধ না হয়ে যায়!"

কথার মাঝেই এসে গিয়েছে প্লেট। সঙ্গে সসের বোতল। মিতিনমাসির দেখাদেখি স্কুয়িড ভাজায় কামড় বসাল টুপুর। যতটা বিটকেল হবে বলে সে ধরে নিয়েছিল, মোটেই সেরকম নয়। ঝালমশলা দিয়ে মুচমুচে করে ভাজা দ্রব্যটি মাংসর পেঁয়াজির মতো। খুব একটা উৎকট গন্ধ নেই। মন্দ লাগে না খেতে। মাঝে-মাঝে কোল্ড ড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে নিলে আরও যেন জমে যায়।

ঝটিতি প্লেট গ্লাস সাফ করে মাসি-বোনঝি ইস্ট-এন্ড মলের অন্দরে। মধ্যিখানের গোল জায়গাটায় মঞ্চ বানিয়ে রবিবারের নাচাগানা চলছে। জাপানি চেহারার একটি মেয়ে দারুণ সেজেগুজে খুব আবেগ দিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ গলা চড়িয়েছে সোপ্রানোয়। তুমুল হাততালি দিচ্ছে শ্রোতারা।

গান শুনতে-শুনতে ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট খোঁজা চলছিল। মিলেও গেল অবিলম্বে। এসকালেটরকে পাক খেয়ে ঢুকে গিয়েছে প্যাসেজ, তারই শেষ প্রান্তে।

কাচের দরজা ঠেলে মিতিন আর টুপুর ভিতরে ঢুকে দ্রুত চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দেওয়ালে নানা শহরের ছবি। জাকর্তা, ব্যাঙ্কক, কোয়ালালামপুর, টোকিও, মেলবোর্ন, সিডনি... কাউন্টারের ওপারে এক তামিল যুবক। পরনে সাদা শার্ট, কালো-স্ট্রাইপ্‌ড সুট, নেভি-ব্লু টাই। সামনে কম্পিউটার।

উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে যুবকটি বলল, "আপনাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি ম্যাডাম?"

"এখান থেকে কি গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে?" মিতিন কায়দা করে ইংরেজিতে কথা শুরু করল, "সিঙ্গাপুর ঘোরার জন্য?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমি একটা মিৎসুবিশি গাড়ি চাইছি। সাদা।"

লোকটা পলকের জন্য থমকে থেকে বলল, "দেখতে হবে ফ্রি আছে কিনা।"

"তার মানে আপনাদের একটা সাদা মিৎসুবিশি আছে?

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"আপনাদের এখান থেকেই ভাড়া করা সাদা মিৎসুবিশি নিয়ে এক ভদ্রলোক চাংগি এয়ারপোর্টে আমাদের রিসিভ করতে গিয়েছিলেন..." মিতিন সহসা স্বর পালটে ফেলল, "আমি সেই ভদ্রলোককে খুঁজছি।"

যুবকটির চোখমুখ কুঁচকে গেল। ঈষৎ রুক্ষ গলায় বলল, "আপনারা ঠিক কী জন্যে এসেছেন, বলুন তো? গাড়ি ভাড়া করতে? না সেই ভদ্রলোকের সন্ধানে?"

"ধরে নিন, দুটোই। তবে ভদ্রলোককে আগে দরকার।"

"আপনার কাছে ভদ্রলোকের সেলফোন নম্বর নেই?"

"আছে। তবে রেসপন্স পাচ্ছি না। সুইচড অফ।"

"তা হলে তো কিছু করার নেই। এনি ওয়ে, আপনার কবে গাড়ি চাই?"

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে মিতিন বলল, "আচ্ছা, যিনি গাড়িটা নিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে?"

"সরি ম্যাডাম। কাস্টমারদের অ্যাড্রেস জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"উনি কিন্তু পেটি কাস্টমার নন। একটা কোম্পানির প্রতিনিধি। পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল। ওঁদের এখানকার অফিসের অ্যাড্রেসটা দিলেও চলবে।"

"সরি ম্যাডাম। নিয়ম নেই।"

"তা হলে আর কী উপায়ে ভদ্রলোককে ট্রেস করা যায়, বলুন তো?" মিতিন ঝট করে মোবাইলের একটা ছবি মনিটরে এনে সেটটা বাড়িয়ে দিল। ভারী গলায় বলল, "দেখুন তো, এই ভদ্রলোকই গাড়ি নিয়েছিলেন কি না?"

খুদে পরদায় মিস্টার নারায়ণ। সাদা মিৎসুবিশির বনেটের সামনে। মুখ সামান্য ফেরানো, তবে চিনতে অসুবিধে নেই।

ছবিটা দেখে যুবকের চোখের মণি যেন পলকের জন্য চঞ্চল। পরক্ষণে স্বাভাবিক। মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, চিনতে পারছি না।"

"সে কী? উনি রেগুলার এখান থেকে গাড়ি নেন!"

"তাই বলেছেন নাকি?"

"নইলে জানব কোত্থেকে?"

দু'-এক সেকেন্ড থেমে থেকে যুবকটি বলল, "শুনুন, একটা কথা বলি। আমাদের বেশিরভাগ কাস্টমারই ইন্টারনেটের মাধ্যমে গাড়ির দরকারের কথা জানান। নেটেই পেমেন্ট আসে। আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দিই।"

"তার মানে আপনি ভদ্রলোককে কখনওই দেখেননি?"

"মনে করতে পারছি না।"

"ও। ফোটোগ্রাফটা সিঙ্গাপুর পুলিশকে দিলে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া যাবে?"

"আপনার সমস্যাটা মনে হচ্ছে খুব গভীর? কেন ভদ্রলোককে এত খুঁজছেন, জানতে পারি?"

"উনি আমাদের পরিবারকে যথেষ্ট উত্ত্যক্ত করেছেন। ওঁকে একটু সহবত শেখাতে চাই।"

"আমার একটা পরামর্শ শুনবেন? মিছিমিছি ঝামেলায় যাবেন না।" যুবক প্রায় বিনয়ের অবতার বনে গেল, "দেখুন না, এক সময় না এক সময় মোবাইলে পেয়ে যাবেন। তখন যা বলার বলে দেবেন। ... মনে তো হচ্ছে আপনারা টুরিস্ট। বেড়াতে এসে খামোকা পুলিশের হাঙ্গামায় কেন জড়াবেন? মাঝখান থেকে ফেরাটাও হয়তো আটকে যাবে।"

"বলছেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম," টুরিস্টরা এখানে এসে অশান্তিতে পড়ুক, এটা মোটেই কাম্য নয়। পুলিশ-টুলিশের ভাবনা বরং মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।"

"দেখি...আপনি তো পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনালের অ্যাড্রেসটাও দিচ্ছেন না। পেলে ওখানেই ভদ্রলোকের নামে কমপ্লেন ঠুকতাম..."

"বললাম তো, সরি। আমরা হেল্পলেস। ...একটা কাজ করুন না ম্যাডাম। আপনার অভিযোগ লিখিতভাবে এখানে দিয়ে যান। আমরা ওদের লোকাল অফিসে পাঠিয়ে দেব।"

"পেঙ্গুইনের সিঙ্গাপুর অফিসটা যে লোকাল অফিস, এটা আপনি জানেন?"

আবার একটু থমকাল স্ট্রাইপ্ড সুট। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে

বলল, "না মানে...অফিসটা তো এখানে, তাই লোকাল শব্দটা ব্যবহার করেছি।"

"ও," মিতিন মাথা দোলাল, "আপনাদের মালিক তো মিস্টার টি পি শঙ্করন। তাই না?"

যুবকের চোখের মণি এবার স্থির। যেন মিতিনমাসির ভিতরটা পর্যন্ত পড়তে চাইছে। চাউনিটা একদমই ভাল লাগল না টুপুরের। কী ভীষণ শীতল! ঠিক যেন সেন্টোসায় দেখা হাঙরটার মতো।

স্বরে এতটুকু উত্তেজনা না এনে অসম্ভব ঠান্ডা গলায় যুবকটি বলল, "মালিকের নাম জেনে আপনার কী হবে?"

"আমি তাঁকে একটু মিট করতে চাই।"

"উনি এখন সিঙ্গাপুরে নেই। ব্যাঙ্কক গিয়েছেন। সাতদিন পরে ফিরবেন।"

"উনি...মানে মিস্টার শঙ্করন তো?"

দৃষ্টি আবার স্থির। আবার সেই একই রকম হিমেল গলা, "আপনি প্লিজ় এখন আসুন ম্যাডাম। আমার হাতে কাজ আছে। অফিস বন্ধ করারও টাইম হয়ে এল।"

তাও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল মিতিন। টুপুরকে নিয়ে হাঁটছে সিমেই স্টেশনের দিকে। যেতে-যেতে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝলে গো মিতিনমাসি?"

"ছোকরা মহা ধড়িবাজ। পাঁকাল মাছ। পিছলে-পিছলে যায়।"

"ওকে অত প্রশ্ন করছিলেই বা কেন? মিস্টার নারায়ণ কিংবা পেঙ্গুইনের ঠিকানা জেনে তুমি কী করবে?"

"জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করব।"

"তুমি কি সত্যি-সত্যি মিস্টার নারায়ণকে ফোন করেছিলে?"

"হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। আমি সব সময় গুল মারি নাকি?"

"লাইন পাওনি?"

"রিং হচ্ছে বারচারেক, তারপর ভয়েস রেকর্ডারে চলে যাচ্ছে।"

"স্ট্রেঞ্জ! কাল হোটেলে এসে বসে রইলেন, পরে আবার ফোন করলেন...অথচ আজ যোগাযোগ রাখতে চাইলেন না? টুপুর বিস্মিত, এসব কাণ্ড কেন ঘটছে, মিতিনমাসি? কেন উনি এরকম করছেন?"

"ধূম্রজাল। কুজ্ঝটিকা," মিতিন হালকা হাসল, "চল চল, ট্রেন ধরি।"

টিকিটমেশিন থেকে কার্ড নিয়ে দু'জনে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। এবার সঙ্গে-সঙ্গে ট্রেন নেই, মিনিটপাঁচেক দাঁড়াতে হল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল টুপুর। হঠাৎই এক জায়গায় চোখ আটকেছে। ফিসফিস করে বলল, "মিতিনমাসি, ওই ছেলেটাকে দ্যাখো।"

কালো টি-শার্ট আর জিন্স পরা তাগড়াই চেহারার মালয়ী যুবকটার দিকে মিতিন তাকালই না। নিচু গলায় বলল, "চোখ সরিয়ে নে। ও ইস্ট-এন্ড মল থেকে আমাদের ফলো করে আসছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ রে ভেবলু। সম্ভবত তোর মেসোর মোবাইলটা হাতাতে চায়।ওর ডান হাত যেভাবে পকেটে গোঁজা, আর্মস থাকাটাও বিচিত্র নয়।"

"সর্বনাশ! কী হবে তা হলে?"

উত্তর দেওয়ার আগেই স্টেশনে ট্রেন। দরজা খুলতেই উঠে পড়ল মিতিন আর টুপুর। ছেলেটা এখনও প্ল্যাটফর্মে। গেট বন্ধ হওয়ার ঘোষণা হচ্ছে। হঠাৎই ত্বরিত পায়ে এগিয়ে এল।

টুপুর দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। কামরায় সবে একটা পা রেখেছে ছেলেটা, আচমকা এক আজব ঘটনা ঘটে গেল। কোত্থেকে অন্য একটা লোক প্রায় ছুটে এসে ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে সুড়ুৎ করে গলে এল দরজা দিয়ে। ছেলেটা ছিটকে পড়ে রইল প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন ছেড়ে দিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে গিয়েও টুপুরের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। এক ঝটকায় ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে কামরায় ওঠা লোকটা আর কেউ নয়, সেন্টোসার সেই ফ্রেঞ্চকাট স্বয়ং! টুপুর প্রমাদ গুনল। তাকাল মিতিনমাসির দিকে। না জানি কী ভয়ংকর মতলবে ফের পিছু নিচ্ছে লোকটা!

মিতিন নির্বিকার। টুপুরকে স্তম্ভিত করে হঠাৎই এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। সপ্রতিভ স্বরে শুদ্ধ বাংলায় বলল, "অনেক ধন্যবাদ মিস্টার দত্ত। ছেলেটা যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল।"

"জানি তো। কিন্তু আপনি আমায় চিনে ফেললেন?"

"ছদ্মবেশ ধরাটা যেমন আপনার কাজ, ছদ্মবেশের আড়ালের মানুষটাকে খুঁজে বের করাটা আমার কাজ," মিতিন ব্যাগ খুলে নিজের পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড বের করে দিল। গলা নামিয়ে বলল, "আপনি কিন্তু নাকখানা আনইউজুয়ালি লম্বা করে ফেলেছেন।"

সুজিত দত্ত শেষ বাক্যটি যেন শুনেও শুনলেন না। কার্ডে চোখ রেখে বললেন, "ও। আপনি তা হলে...?"

"সোজা বাংলায় টিকটিকি," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "আপনি কি কার্লটন হোটেল ছেড়ে এখন সিমেইতে আছেন?"

"বাধ্য হয়েছি উঠতে। বেশিক্ষণ সিমেই-এর বাইরে থাকা চলবে না। পয়া লেবর স্টেশনে নেমে ফিরে যাব।"

"আপনার ফোন নম্বরটা পেতে পারি কি?"

"আপনার মোবাইলে আমি মিস্‌ড কল দিয়ে দেব।"

পয়া লেবর এসে গিয়েছে। নেমে গেলেন সুজিত দত্ত। টুপুর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। এদিকে কৌতূহলে পেট ফুলছে। চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করল, "সুজিত দত্ত আসলে কে?"

মিতিন হাসি-হাসি মুখে বলল, "গিরগিটি।"

॥ ১০ ॥

টুপুর শুয়ে ছিল। রুমে ফেরার পর থেকেই মিতিন ঠায় বসে আছে ব্যালকনিতে। একেবারে ধ্যানস্থ যেন। তার কাছে বারকয়েক গিয়েছিল টুপুর। প্রশ্নও করেছে একের পর এক। কিন্তু হুঁ, হ্যাঁ-এর বেশি জবাব পায়নি। কিংবা, 'কষছি তো অঙ্কটা, মিললে বলব' ধরনের উত্তর। টুপুরের নিজের মাথাতেও ঘুরপাক খাচ্ছে ধাঁধা। টিভিতেও তাই মন বসছিল না। অগত্যা বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়া ছাড়া উপায় কী!

বুমবুম আর পার্থ ফিরল রাত দশটা বাজিয়ে। রাতের চিড়িয়াখানা দেখে বুমবুমের প্রাণে উচ্ছ্বাসের বান ডেকেছে। ঘরে ঢুকেই গলায় উদ্ভট শব্দ করতে-করতে লাফাল খানিকক্ষণ। ওটা নাকি আফ্রিকান নাচ। লাঠি বল্লম নিয়ে, আফ্রিকার আদিবাসী সেজে, মাদল গোছের বাজনা বাজিয়ে, কিছু সিঙ্গাপুরি যুবক নাকি এরকমই লম্ফঝম্ফ করছিল চিড়িয়াখানায়। আগুন খাওয়া, আর মুখ দিয়ে আগুন উগরে দেওয়া...এটা অবশ্য দেখাতে পারল না বুমবুম। হোটেলের ঘরে আগুন জ্বালানো নিষেধ কিনা!

বর্ণনাও চলছে সবিস্তার, "বুঝলি দিদি, সে এক অন্ধকার ফরেস্ট। আমরা ট্রামে চেপে যাচ্ছি, আর হঠাৎ-হঠাৎ দেখছি টাইগার দাঁড়িয়ে আছে, লায়ন হাই তুলছে...! রাইনো, ভল্লুক, হিপো, হাতি, বাইসন, হরিণ, বাঁদর, সব দেখতে পেলাম।

টুপুর চোখ ঘুরিয়ে বলল, "অন্ধকারে এত জন্তু দেখতে পেলি?"

"অ্যানিম্যালদের ওখানে আলো ছিল তো। দেখা যাচ্ছিল তো। সব অ্যানিম্যাল ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

"কাছ থেকে দেখলি? না দূর থেকে?"

"একদম কাছ থেকে। ওনলি টেন ফিট।"

বুমবুমের একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যেস আছে। টুপুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। পার্থকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি নাকি গো মেসো?"

পার্থ বলল, "আধা সত্যি। হরিণটরিনগুলো কাছাকাছি ছিল। তবে বাঘ-সিংহ অনেকটাই তফাতে। মাঝে পরিখা। এমনভাবে ফোকাস মেরে রেখেছে, জন্তুগুলোকে দেখা যাবেই। তবে জঙ্গলটা স্রেফ চালাকি। এমনভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ওরা নিয়ে যায়, মনে হবে তুই বোধ হয় আমাজ়নের জঙ্গলে ঢুকে পড়লি। অথচ পাঁচ-সাত মিনিট পর যেখানে থামছে, সেখানে দিব্যি স্ন্যাক বার, টয়লেট... তবে সব মিলিয়ে বেশ একটা নাইট সাফারির গা ছমছম করা এফেক্ট আছে কিন্তু।"

"আর ওই শো'-টার কথা বলো," বুমবুম ঝাঁপিয়ে পড়ল, "একটা প্রকাণ্ড কাঠবেড়ালি কেমন সুড়সুড় করে দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে গেল! আর দুটো লোক গায়ে পাইথন জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা বেজি তো কানে-কানে কথা বলছিল ট্রেনারের সঙ্গে।"

"তার মানে তোরা খুব এনজয় করেছিস?"

পার্থ বলল, "এনজয় করার মতোই জায়গা রে। ঢোকার মুখে মশালটশাল জ্বলছে, ভুরভুর করে খাবারের গন্ধ বেরোচ্ছে, অথচ কয়েক পা গেলেই অরণ্যের হাতছানি... একটাই যা চোখে লাগে, জন্তুগুলো বড্ড আড়ষ্ট। দেখে মনে হয়, ওই ভাবে শো না দিলে ওদের গর্দান যাবে।"

আপনমনে বলেই চলেছে পার্থ। কী রকম ভিড় ছিল আজ নাইট সাফারিতে, কত দেশের কত ধরনের মানুষ এসেছিল, সরু-সরু

রহস্যময় পথে সে আর বুমবুম অন্ধকারে কেমন হেঁটে বেড়িয়েছে, ওখানকার কর্মচারীদের ব্যবহার কত মধুর, এই সব। বলতে-বলতে হঠাৎই তার মনে হল মিতিন যেন বড় বেশি ভাবলেশহীন।

থমকে গিয়ে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, তুমি এত চুপচাপ কেন? এখনও সেই কিছু না চুরি হওয়ার রহস্য নিয়ে ভেবে চলেছ?"

পার্থ বুমবুম ফেরার পর ঘরে এসেছে মিতিন। বসেছিল টুলে। আলগাভাবে বলল, "না তো, শুনছি তো।"

"সন্ধেটা হোটেলেই কাটালে?"

"বেরিয়েছিলাম একটু। সিঙ্গাপুরের এম-আর-টি চড়ে এলাম।"

"যাক। টুপুরের সন্ধেটা তা হলে একেবারে শুখা যায়নি।"

টুপুর হাসল মৃদু। তাদের সান্ধ্য অভিযান আর সুজিত দত্তর প্রসঙ্গ তো এখনই তোলার জো নেই। মিতিনমাসি পইপই করে বারণ করেছে বলতে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমরাও কাল সকালে চড়ে নিতে পার। বুমবুমের খুব ভাল লাগবে।"

পার্থ বলল, "দেখি, যদি সময় পাই। ওদিকে তো আবার তোদের শপিংটপিংও আছে।"

"ঠিক বলেছ। দু'খানা পারফিউম আমায় কিনতেই হবে। মা কাকে যেন দেবেন।"

"আমিও তো একটা ডিজিটাল ক্যামেরা দেখব।"

বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "আর আমার ভিডিয়ো গেম্স?"

"হবে, হবে। সব হবে," পার্থ পেটে হাত বোলাল, "কিন্তু এখন যে একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে। পেটে একটু দানাপানি ফেলতে হয়।"

মিতিন নিজের মোবাইলটা টেপাটেপি করছিল। চোখ তুলে বলল, "কেন, তোমরা খেয়ে আসোনি?"

"নাইট সাফারিতে ঢোকার সময় খেয়েছিলাম। বার্গার আর চিকেন নাগেট্স।"

"আর ভিতরেও যে খেলে?" বুমবুম ফুট কাটল, "শিক কাবাব, স্যান্ডউইচ..."

"সে তো জঙ্গলে হেঁটে কখন হজম হয়ে গিয়েছে।"

মিতিন বলল, "তা হলে চলো, আমাদের সঙ্গে আর-একপ্রস্থ সাঁটাবে।"

মুখে খাইখাই করল বটে, ডাইনিং হলে গিয়ে পার্থ অবশ্য বিশেষ কিছু নিল না। একবাটি থাই সুপ আর টুপুরের প্লেট থেকে একটুখানি ফ্রায়েড রাইস, ব্যস। বুমবুম শুধু আইসক্রিম।

খাওয়া শেষ করে মিতিন উঠে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখতে-দেখতে বলল, "তোমরা বিল মিটিয়ে রুমে যাও। আমি একটু আসছি।"

পার্থ বিস্মিত স্বরে বলল, "এত রাতে কোথায় যাবে?"

একটা অর্থপূর্ণ হাসি ছুড়ে দিয়ে ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে গেল মিতিন।

বুমবুমের দৌড় শেষ, রুমে এসেই শয্যা নিয়েছে। পার্থ ঢুকল স্নানে। কাল দু'বার স্নান করেছিল সে, আজ এই নিয়ে তৃতীয় বার। এখানকার গরমে তার নাকি সারাক্ষণ চিড়িয়াখানার জলহস্তীদের মতো জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে।

বেশ খোশমেজাজে বাথরুম থেকে বেরোল পার্থ। গুনগুন গান গাইছে। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে টুপুরকে বলল, দুটো-তিনটে ইন্টারেস্টিং সাইট কিন্তু আমাদের দেখা বাকি, বুঝলি। তোর মাসির মুড ঠিকঠাক থাকলে কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়া যায়।

টিভির রিমোট টিপে-টিপে এ চ্যানেল-ও চ্যানেল ঘুরে বেড়াচ্ছিল টুপুর। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"যেমন ধর, নেতাজির যদি কোনও মেমোরিয়াল থাকে, সেখানে তো একবার যাওয়া উচিত।"

"তেমন আছে নাকি কিছু?"

"এদের টুরিং-লিফলেটগুলোতে তো সেভাবে দেখছি না। তবে

আমি যদ্দুর জানি, একটা ওয়ার-মেমোরিয়াল এখানে আছে। আজ়াদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিতে।"

"রাসবিহারী বসু এই সিঙ্গাপুরেই তো নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার তুলে দিয়েছিলেন। তাই না?"

"হুঁ... তারপর ধর, এখানকার পোর্টের দিকে যেতে পারি। কিংবা বোটানিকাল গার্ডেন।"

"ওসব বোধ হয় এবার আর হল না গো। কাল কেনাকাটা আছে, গোছগাছ আছে, সন্ধের মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হবে..."

"সত্যি, টুরটা খুবই ছোট হল। ব্যাটারা যদি ফাইভ ডেজ় ফোর নাইট্‌স দিত, দিব্যি ধীরেসুস্থে ঘোরা যেত। বলতে-বলতে পার্থর যেন একটা দরকারি কথা মনে পড়ে গিয়েছে। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ রে, তোর মাসি যে আমার হ্যান্ডিক্যাম আর মোবাইল ফোনটা আটকে রাখল... কী করল রে ও দুটো নিয়ে?"

"সেন্টোসার ক্যাসেটটাই আবার দেখছিল।"

"সেই অনুসরণকারীর ভূত এখনও ঘাড় থেকে নামেনি?... তা দেখে লাভ হল কিছু?"

টুপুর ফাঁপরে পড়ল। কী বলবে, কতটুকু বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। পার্থমেসোর প্রশ্ন কোত্থেকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যায় তার ঠিক কী।

সাজিয়েগুছিয়ে অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ ধরনের একটা জবাব খাড়া করছিল টুপুর, মিতিন ফিরেছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে টুপুর বলে উঠল, "এতক্ষণ কোথায় ঘুরছিলে?"

খাটে বসে মিতিন বলল, "হাঁটতে-হাঁটতে একটু মুস্তাফা সেন্টারে গিয়েছিলাম।"

পার্থর চোখ গোল-গোল, "মাঝরাতে মুস্তাফা?"

"বা রে, তুমি তো বলছিলে সারা রাত খোলা থাকে। সেটাই একবার পরখ করে এলাম।"

টুপুর আহত মুখে বলল, "একাই গেলে? আমাদের ফেলে?"

"তোরা কাল যাস। তখন নয় আমি ঘরে থাকব।"

"শুধুই দেখতে গিয়েছিলে?" পার্থর তেরচা প্রশ্ন, "নাকি কিছু কিনলেটিনলে?"

"সামান্য কিছু। আমার গয়নাগাটি।"

"দেখাও।"

"দেখবে?" ব্যাগ খুলে একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করল মিতিন। হেসে বলল, "ডিটেকটিভের কাছে এটাই গয়না।"

পার্থ মুখ বাঁকাল, "বাড়িতে তো খানচারেক আছে। আবার আর-একটা?"

"থাক। সিঙ্গাপুরের স্মৃতিচিহ্ন," মিতিন কোলে বালিশ টানল, "যাক গে, জরুরি কথা শোনো। কাল সকালে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।"

"ক'টার সময়?"

"সাতটার মধ্যে। বাবুর ঘুম ভাঙবে তো?"

"হুকুম করলে বান্দা সারারাত জেগে থাকবে। লেকিন কাম কেয়া হ্যায়?"

"একটা ই-মেল পাঠাবে। পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনালে।"

"তাদের আবার কী লিখব?"

"বয়ান মোটামুটি বলে দিচ্ছি। তুমি ইংরেজি করে নিয়ো। একটা চমৎকার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে আমাদের পক্ষ থেকে একটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটে গিয়েছে। আপনাদের প্রতিনিধি মিস্টার কে এস এস নারায়ণকে মূল আমন্ত্রণপত্রটির বদলে ভুল করে তার একটা কপি দিয়েছিলাম। মিস্টার নারায়ণ বারবার মূল চিঠিটি চাওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁকে সেটা দিতে পারিনি। কারণ চিঠিটা তখন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে, কাল

দুপুরে, আমার স্ত্রীর হাতব্যাগের খাঁজে সেটি হঠাৎই আবিষ্কৃত হয়। তারপর থেকে...”

“অ্যাই, দাঁড়াও দাঁড়াও,” পার্থ হাত তুলে মিতিনকে থামাল, “তুমি সত্যি চিঠিটা পেয়েছ নাকি?”

“নয় তো কি বানিয়ে বলছি?”

“তোমার ভ্যানিটিব্যাগেই ছিল?”

“তাই তো দেখছি।”

“কিন্তু..তোমার ব্যাগে গেল কী করে?”

“নিশ্চয়ই তুমিই রাখতে দিয়েছিলে। তারপর তোমারও স্মরণে আমারও না,” অম্লানবদনে মিতিন ফের খেই ধরল, “যাক গে, রপর লিখবে, চিঠিটা পেয়েই তুমি মিস্টার নারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েছ। কিন্তু মিস্টার নারায়ণ সম্ভবত তোমার কোনও আচরণে আহত হয়েছিলেন, এবং হয়তো সেই কারণেই কাল সারা দিনে একটিবারও তিনি তোমার ফোন ধরেননি।”

“এ কী? আমি তো মিস্টার নারায়ণকে ফোন করিনি!”

“করেছ। ভুলে গিয়েছ।”

“বুঝলাম...তারপর?”

“তারপর লিখবে, যেহেতু মূল আমন্ত্রণপত্রটি জমা দিতে তুমি দায়বদ্ধ, তাই তোমার স্ত্রী দায়িত্বটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। মিস্টার নারায়ণ যে গাড়িটি চাংগি বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার নম্বরটি তোমার স্ত্রীর স্মরণে ছিল, সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গাড়ির মালিক ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্র্যাভেল এজেন্সির নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে ফ্যালে। এবং মিস্টার নারায়ণের সন্ধানে তাদের সিমেই অফিসে সোজা চলে যায়।”

“তো-তো-তোমরা সিমেই গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ। সন্ধেটা নষ্ট করিনি।”

"সিমেই জায়গাটা কোথায়?"

"শহরের পূর্ব প্রান্তে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি," মিতিন এবার মৃদু ধমক দিল, "কথার মাঝে বারবার ব্যাগড়া দিয়ো না তো! আমাকে তা হলে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।"

"না না, আমার মনে আছে। সুডোকু করা ব্রেন তো, একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যায়। তুমি শেষ করো।"

"হ্যাঁ...এবার লিখবে...দুর্ভাগ্যবশত, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টের কর্মচারীটি, মিস্টার নারায়ণ কিংবা আপনাদের ঠিকানা দিতে অস্বীকার করে। মিস্টার নারায়ণের একটি ছবি আমার মোবাইলে ছিল, সেটি দেখেও মিস্টার নারায়ণকে সে চিনতে পারে না। উপায়ান্তর না দেখে আমি স্থির করেছি, কলকাতায় ফিরে চিঠিটি আপনাদের কোনও প্রতিনিধির হাতে প্রত্যর্পণ করব। সিঙ্গাপুরেই চিঠিটি আপনাদের দিয়ে দিতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু আজ আর মিস্টার নারায়ণকে খুঁজে বেড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সকালে কিছু কেনাকাটা করার আছে, তারপর দুপুরবেলাটা আমরা বিশ্রাম আর গোছগাছের কাজে ব্যস্ত থাকব। আশা করি, কলকাতায় গিয়ে চিঠিটা দিলে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না। শেষে ওঁদের অসুবিধে ঘটানোর জন্য আর একবার দুঃখ প্রকাশ করবে। ঠিক আছে?"

"তা আছে," পার্থ নাক কুঁচকোল, "কিন্তু তুমি চিঠিটা দেওয়ার জন্য হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?"

"ইনভিটেশন লেটারে সেরকমই কিন্তু লেখা ছিল।"

"জানি তো। তবে ব্যাপারটা তো চুকেই গিয়েছে।"

"তা হোক। পেয়ে যখন গিয়েছি, দেব না কেন?" মিতিনের ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি, "মিছিমিছি একটা অনুচিত কাজ করা তো ঠিক নয়।"

"তার জন্য এত বড় একটা ই-মেল লেখার দরকার কী? নারায়ণকে একটা এস-এম-এস ঝেড়ে দিলেই তো হয়। গট অরিজিনাল। কাম অ্যান্ড টেক। ব্যাটা রাগটাগ ভুলে সুড়সুড়িয়ে এসে নিয়ে যাবে।"

"না। ই-মেলই কোরো," মিতিনের হাসি চওড়া হয়েছে, "মিস্টার নারায়ণের ওই শুঁটকো মুখ আর দেখতে ইচ্ছে করছে না।"

"কী জানি বাবা, তোমার মনে কী প্যাঁচ!" পার্থ হাই তুলল, "সকালে ডেকে দিয়ো। কাজ হয়ে যাবে।"

"চিঠির বয়ানে যেন গড়বড় না হয়। যা-যা বলেছি, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যেন লেখা হয়।"

"হবে।"

টুপুর চুপটি করে মাসি-মেসোর কথোপকথন শুনছিল। ছেঁড়া-ছেঁড়া কয়েকটা সুতো দেখতে পাচ্ছিল শুধু, কিন্তু কিছুতেই সেগুলো জুড়তে পারছিল না। টের পাচ্ছে, একটা কোনও বড়সড় পরিকল্পনা আছে মিতিনমাসির। অথচ তার চেহারা এখনও ঝাপসা।

নাঃ, মিতিনমাসির চিন্তার গতিপ্রকৃতি আন্দাজ করা টুপুরের কম্মো নয়।

॥ ১১ ॥

সদ্য কেনা ডিজিটাল ক্যামেরায় পটাপট ছবি তুলছিল পার্থ। ব্যালকনিতে বুমবুম আর টুপুরকে দাঁড় করিয়ে শাটার টিপল বারকয়েক। হোটেলরুমে বুমবুমকে নানা ভঙ্গিমায় বসিয়ে পরীক্ষা করল ফ্ল্যাশগান। টুপুর ড্রেসিংটেবিলের সামনে চুল আঁচড়াচ্ছে,

বুমবুম ভেংচাচ্ছে টুপুরকে, চিরুনি উঁচিয়ে ভাইকে মার দেখাল টুপুর ...একের পর এক দৃশ্য বন্দি হচ্ছে ক্যামেরায়। সঙ্গে-সঙ্গে খুদে মনিটরে ছবিগুলো দেখেও নিচ্ছে তিনজনে। মন্তব্য চলছে টুকটাক।

পার্থ প্রসন্ন মেজাজে বলল, "ছবির কোয়ালিটি তো ভালই মনে হচ্ছে।"

টুপুর বলল, "প্রিন্টারটাও একবার টেস্ট করে নাও।"

ক্যামেরার সঙ্গে আস্ত একটা ছবিছাপাই যন্ত্র মুফতে পাওয়া গিয়েছে। সত্যি বলতে কী, প্রিন্টারের লোভেই ক্যামেরার এই মডেলখানা পছন্দ করেছে পার্থ। চকচকে মুখে সে বলল, "এখনই প্যাকিং খুলব? না কলকাতায় গিয়ে?"

"কেমন প্রিন্ট হয় একবার দেখে নেবে না?"

মহা উৎসাহে বাক্সটা সবে হাতে নিয়েছিল পার্থ, মিতিন স্নান সেরে বেরিয়েছে। চোখ পাকিয়ে বলল, "কী ছেলেমানুষি করছ? কোথায় এখন মালপত্র সুটকেসে ভরবে, তা নয়..."

"তুমি বড্ড বেরসিক তো।"

"বেশি রসিক হয়ে কাজ নেই। সাড়ে বারোটা বাজে, চলো, আগে খেয়ে আসি। দুপুরে বুমবুমকে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে কত রাত হয় কে জানে!"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "আমরা দমদমে নামছি ক'টায়?"

"সাড়ে দশটা।"

"সে কী গো? মাত্র দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে যাব? আসার সময় চার ঘণ্টা লেগেছিল না?" বলেই টুপুর জিভ কাটল, "সরি, সরি। কলকাতার ঘড়ি তো সিঙ্গাপুরের চেয়ে পিছিয়ে।"

"কারেক্ট। দ্রাঘিমারেখা পরিবর্তনের জন্য হারিয়ে যাওয়া আড়াই ঘণ্টা সময়টাকে ফেরত পেতে হবে তো।"

পার্থ নীচে যাওয়ার জন্য তৈরি। বুমবুমও। মা'র দেওয়া লম্বা

তালিকা ধরে সকালে গাদাখানেক কেনাকাটা করেছে টুপুর, মালবোঝাই প্লাস্টিকব্যাগ নিজের সুটকেসের পাশে রেখে সে-ও বেরিয়ে পড়ল রুম ছেড়ে। সব শেষে দরজা বন্ধ করল মিতিন।

বুমবুম লিফ্‌ট চড়তে বেজায় ভালবাসে। তাকে পার্থর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে মিতিন আর টুপুর সিঁড়ি ধরল। লাউঞ্জ পেরোতে গিয়ে টুপুরের পা আটকে গিয়েছে সহসা। সুজিত দত্ত সোফায় বসে! সেই একই ছদ্মবেশ! তবে নাকের সাইজ় আজ একটু ছোট। সেদিকে মিতিনমাসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই চাপা ধমক, "তাকাস না। সোজা হাঁট। খেয়ে তাড়াতাড়ি রুমে ফিরতে হবে।"

"কেন গো? গোছগাছ তো মোটামুটি কমপ্লিট। শুধু যা দু'-চারটে...

"প্রশ্ন নয় মাই ডিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখন শুধু দেখে যাওয়া।"

বিদায়ী মধ্যাহ্নভোজনের এলাহি ব্যবস্থা করেছে পার্থ। চিনা আর ভারতীয় পদ মিলিয়েমিশিয়ে। ইন্ডিয়ান পোলাও আছে, চাইনিজ ফ্রায়েড রাইসও। চিকেন আর চিংড়ির সঙ্গে আছে এক অতিকায় কাঁকড়ার তন্দুর। শেষ পাতে ঢালাও আইসক্রিম। গলা অবধি টইটুম্বুর করে পার্থ যখন টেবিল ছাড়ল, সে রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে। টুপুরেরও পেট আইঢাই।

অগত্যা এবার চারজনেই ফিরল লিফ্‌টে। ঘরে এসে পার্থ বলল, "বুমবুমের সঙ্গে আমিও একটু গড়িয়ে নিই?"

"সে সুযোগ পাবে কি?"

"কেন?"

"মন বলছে, এখনই কোনও অতিথি আসবেন।"

"মনকে চুপ করিয়ে রাখো।"

হয়েছে কি হয়নি, অমনি মিতিনের বাক্যকে সত্যি করে দিয়ে দরজায় টকটক।

মিতিনই গিয়ে দরজা খুলেছে। একগাল হেসে বলল, "আরে, মিস্টার নারায়ণ যে! আসুন, আসুন।"

নামটা কানে যেতেই টুপুরের চক্ষুস্থির। পার্থও তড়াক উঠে বসেছে। তার মুখ দিয়ে প্রশ্ন ছিটকে এল, "আপনি? আপনি কোত্থেকে?"

নারায়ণ ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন। স্বভাবসুলভ বিনয়ী সুরে বললেন, "আসতে বাধ্য হলাম স্যার।"

"মানে?"

"আমাদের হেড অফিসে আপনি মেল করেছিলেন... ওরাই আমায় নির্দেশ পাঠাল। বলল, মিস্টার মুখার্জিরা সিঙ্গাপুর ছাড়ার আগে তাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য মিটিয়ে নাও।"

পার্থ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না না, মনোমালিন্যের কী আছে! জাস্ট একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল মাত্র।"

"একদম ঠিক কথা স্যার। আমিও আপনার কথায় কিছুই মনে করিনি। কাল আর কনট্যাক্ট করতে পারিনি, কারণ এক জাপানি কাপলকে নিয়ে বিশ্রীভাবে ব্যস্ত ছিলাম। মর্নিং টু নাইট ওদের গাইড হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। আপনারা মেল না করলেও হোটেল ছাড়ার আগে আমি তো একবার আসতামই।"

মিতিন স্মিতমুখে নারায়ণের কথা শুনছিল। হাত বাড়িয়ে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।"

"থ্যাঙ্কস। সোফায় বসে সুটের পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন নারায়ণ। রুমাল যথাস্থানে রেখে বললেন, "হেড অফিস বলল, অরিজিনাল লেটারটা কলকাতা অবধি আপনাদের ক্যারি করার দরকার নেই। স্বচ্ছন্দে ওটা আমাকে দিয়ে দিতে পারেন।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী মিতিন, ওঁকে দেওয়া যাবে তো?"

"অবশ্যই। উনি কষ্ট করে এসেছেন..." মিতিন ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পেঙ্গুইন রিসর্ট্সের প্যাডে লেখা চিঠিটা বের করল। নারায়ণকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দেখে নিন, এটাই আসল তো?"

নারায়ণ চোখ বোলালেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

"না না, ভাল করে দেখুন। যদি চান, তো আমার ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটাও দিতে পারি। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিন, যা চাইছেন তাই পেলেন কিনা।"

"ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে আমার কী হবে?" নারায়ণের মুখে ফ্যাকাশে হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অল রাইট, চলি তা হলে?"

"কিন্তু আপনাকে যে এখনই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না মিস্টার নারায়ণ," মিতিনের স্বর সহসা কঠিন, "তা ছাড়া চাইলেও বোধ হয় এখন আর যেতে পারবেন না।"

"মানে?"

"বাইরে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা অপেক্ষা করছে যে! সঙ্গীসাথী নিয়ে," বলতে-বলতে মিতিন গিয়ে দরজা খুলেছে, "আপনারা এবার আসতে পারেন স্যার।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুজিত দত্ত ঢুকেছেন ঘরে। সঙ্গে জনাচারেক সিঙ্গাপুরি পুলিশ। বিনা বাক্যব্যয়ে তারা হাতকড়া পরিয়ে দিল নারায়ণকে।

ক্ষণিকের জন্য নারায়ণ হতভম্ব। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এটা কী হল? এটা কী হল?"

"বুঝতে পারছেন না, মিস্টার নারায়ণ? সরি, মিস্টার শঙ্করন? ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাচার করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। আপনার সিঙ্গাপুরের সহকারীরাও এখন পুলিশের জিম্মায়। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্র্যাভেল এজেন্সি সিল করে দেওয়া হয়েছে।"

"এটা একেবারেই মিথ্যে অভিযোগ। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র," নারায়ণ আরও গলা চড়ালেন, "আমি একজন নিতান্ত নিরীহ মানুষ। সিঙ্গাপুরে খেটে খেতে এসেছি।"

"আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনের ঢের সুযোগ পাবেন, মিস্টার নারায়ণ," এতক্ষণ পর সুজিত দত্ত মুখ খুললেন, "তবে তার আগে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করি। হয়তো জেনে আহ্লাদিত হবেন, আজ একই সঙ্গে দিল্লিতেও আপনার দু'জন কর্মচারী ধরা পড়েছেন। রাজেশ শ্রীবাস্তব। এবং অরুণ মাত্রে। আশা রাখি, তাঁরা আপনার কীর্তিকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারবেন।"

যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। পলকে মিইয়ে গেলেন নারায়ণ। অথবা শঙ্করন। ল্যাগব্যাগে লোকটা প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, পুলিশ অফিসার তাঁকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এখনও নারায়ণের হাতে ধরা আছে পেঙ্গুইনের সুদৃশ্য চিঠিখানা।

ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে নিল মিতিন। নারায়ণ কটমট চোখে ঘুরে দেখলেন তাকে। মিতিন গ্রাহ্য করল না।

বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পার্থ এতক্ষণ দেখছিল জমজমাট নাটকখানা। নারায়ণকে বগলদাবা করে পুলিশ রওনা দেওয়ার পর সুজিত দত্ত ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেললেন। দেখে পার্থ বিমোহিত। কোনওক্রমে তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "ও। আ-আমি তা হলে ভুল করিনি। আপনি ক্রিমিনাল নন। পুলিশের লোক।"

"উঁহু। এক ডিগ্রি উপরে," মিতিন শুধরে দিল, "উনি মিলিটারি।"

"ইয়েস, আমি লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল সুজিত দত্ত," পার্থর সঙ্গে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন সুজিত, "এখন আমি

মিলিটারির সিক্রেট সার্ভিসে আছি। একটা অর্গানাইজ়ড গ্যাং বেশ কিছুদিন যাবৎ আমাদের অনেক গোপন খবর বিদেশে পাচার করছিল। খবরগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়মিত কেনাবেচা হয়। আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল, ওই গ্যাং এখন সিঙ্গাপুর থেকেই অপারেশন চালাচ্ছে। কিন্তু তাদের কাজের পদ্ধতি এত সরল এবং এমনই নিখুঁত যে, কিছুতেই আমরা তাদের হাতেনাতে ধরতে পারছিলাম না। আপনার মিসেসের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে, কেসটার আজ সমাধান হল।"

কুণ্ঠিত স্বরে মিতিন বলল, "না না, আমার তেমন কৃতিত্ব নেই। নারায়ণ, ওরফে শঙ্করন, যদি কয়েকটা বেসিক ভুল না করতেন, তা হলে হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবতামই না।"

"কী রকম?"

"প্রথমেই আমার খটকা লেগেছিল প্রাইজের ব্যাপারটায়। সাধারণত এ ধরনের বিদেশ ভ্রমণের অফার যারা দেয়, তারা ট্র্যাভেল ভাউচার পাঠায়। তাদের প্রতিনিধি সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে ওয়েট করবে, এটাও যেন কেমন অস্বাভাবিক লেগেছিল আমার। তারপর যখন এয়ারপোর্টে নামলাম, লোকটা তখন আগে থেকেই হাজির ছিল। আমি তাকে নোটিশও করেছি। কিন্তু লোকটা আমাদের নেহাতই বুরবক ভেবে দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। আসলে ও তখন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এই লুকোচুরিটা আমার খটকাটাকে আর-একটু উসকে দেয়," মিতিন গলা ঝেড়ে নিল, "এর পর তো চিঠি-এপিসোড। নারায়ণ অরিজিনাল চিঠির জন্য ছটফট করতে লাগল। আর আমিও শিওর হয়ে গেলাম, ইনভিটেশন লেটারেই কোনও গণ্ডগোল আছে। কিন্তু গড়বড়ের নেচারটা কী বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই মনে হল, পেঙ্গুইন রিসর্ট্স

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তো কোনও না-কোনও ফ্যামিলিকে সিঙ্গাপুরে পাঠায়। এবং নারায়ণ মেটিকুলাসলি তাদের কাছ থেকে একটি চিঠি কালেক্ট করে। তা হলে কি সব চিঠিতেই গণ্ডগোল থাকে? নাকি শুধু আমাদেরটাতেই? ভাবছি... ভাবছি... হঠাৎই মিস্টার দত্ত আমায় খানিকটা সাহায্য করে দিলেন।"

পার্থ অবাক মুখে বলল, "কীভাবে?"

"সেন্টোসায় মিস্টার দত্ত আমাদের ফলো করছিলেন। যদিও তখন আমি মিস্টার দত্তকে ছদ্মবেশে দেখে ঠিক চিনতে পারিনি। এও বুঝিনি, আমি ঠিক যতটা ওঁকে সন্দেহ করছি, উনিও ঠিক ততটাই আমাদের সন্দেহ করছিলেন।"

"হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট, ম্যাডাম," সুজিত দত্ত হাসলেন, "কারণ আমাদের সোর্স খবর দিয়েছিল, পেঙ্গুইন রিসর্টস ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি ভুয়ো কোম্পানি ক্যারিয়ারের মাধ্যমে সিক্রেট ইনফরমেশন চালান করছে। কিন্তু ওই চালান করার পদ্ধতিটা আমরা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। আপনাদের আগে যাঁরা পেঙ্গুইনের সৌজন্যে সিঙ্গাপুর সফর করে গিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে ডিটেলে খবর নিয়েছি। তাঁরা সকলেই একেবারে সাদামাটা নিরীহ ফ্যামিলি। বেআইনি কাজকারবার থেকে তাঁরা শত হস্ত দূরে থাকেন। তাই এবার ঠিক করি, যে পরিবারকেই সিঙ্গাপুরে পাঠানো হোক, আমরা খোদ সিঙ্গাপুরেই তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখব। কার্লটন হোটেলেও আমি সেই উদ্দেশ্যেই উঠেছিলাম।"

"বুঝেছি," পার্থ বলল, "আমার সঙ্গে সারা সন্ধে আড্ডা দিয়ে যখন বুঝলেন আমরা বদ লোক নই, তখন আপনি আমাদের ছাড়ান দিলেন।"

"কিছুটা তাই। বিশেষ করে নারায়ণ চিঠির জন্য ঝুলোঝুলি করার সময় আপনি ফোনে যেভাবে রিঅ্যাক্ট করলেন, তাতে বোঝাই যায় আপনাদের ওই দলের সঙ্গে কোনও যোগ নেই।"

গোমড়া গলায় মিতিন বলল, "এটাই তো নারায়ণের ট্রিক মিস্টার দত্ত। ওরা এমন পরিবারকে বেছে নিয়ে পাঠায়, যারা নিজেদের অজ্ঞাতেই দুষ্কর্মের সহযোগী হয়ে যায়। চিঠিটা পার্থর ব্যাগ থেকে মিসপ্লেস্‌ড না হলে আমরাও তাই হতাম। কিন্তু আমাদের মতো ভুল আগে কেউ করেনি। নারায়ণের কাজও তাই স্মুথলি চলছিল। প্রথম এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়ে নারায়ণ মারাত্মক এক ভুল করে ফ্যালে। কোনও এক অনুচরকে পাঠিয়ে ১০৪ নম্বর ঘরে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায়। কার্লটন হোটেলের নিরাপত্তা বেশ ঢিলেঢালা। পেশাদার বজ্জাতদের পক্ষে হোটেলের ঘর খুলে ফেলা আদৌ কোনও সমস্যা নয়। রিসেপশনের মেয়েগুলো তো খেয়ালই করে না, কে আসছে, কে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিন আর-একটা ঠোক্কর খেল নারায়ণ। আমরা যে স্রেফ একটু প্রকৃতি দর্শনের জন্য রুম পালটে ফেলব, এটা ওর হিসেবেই ছিল না। ফলে লোকটা আরও খানিকটা এক্সপোজড হয়ে গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে, হয়তো কিছুটা নার্ভাস হয়েই, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগটা ছিঁড়ে ফেলল। এত পাকা মাথা, অথচ এটুকু ওর মগজে আসেনি, এতে মানুষের সন্দেহ আরও গাঢ় হয়।"

"আহা, এর জন্য আপনি নারায়ণকে দোষ দিতে পারেন না," সুজিত দত্ত হাসতে-হাসতে বললেন, "ও বেচারার কারবার একেবারে সাধারণ লোকদের নিয়ে। হঠাৎ তার মধ্যে আস্ত একটা গোয়েন্দা ঢুকে পড়বে, এটা ও আন্দাজ করবে কী করে? তাও মিস্টার মুখার্জি যদি ডিটেকটিভ হতেন... নারায়ণ আগেই সাবধান হয়ে যেত। এবং এই বেড়ানোর অফারটা আপনারা পেতেনই না।"

"বটেই তো। বটেই তো," পার্থ গাল ছড়িয়ে হাসল, "বায়োডেটা পাঠানোর সময় আমার মিসেসের অকুপেশন তো 'গৃহবধূ' লিখেছিলাম। রোজগার-টোজগার করে জানালে যদি ব্যাটারা

অফারটাকে কমিয়ে দেয়! হয়তো হোটেল ভাড়া মাইনাস করে দিল। কিংবা এক পিঠের প্লেনফেয়ার...”

“অজান্তেই মোক্ষম চালটা দিয়েছিলেন মশাই। ওই চালেই নারায়ণের ঘটিবাটি চাঁটি হয়ে গেল,” সুজিত হো-হো হাসছেন। হাসতে হাসতে বললেন, “আপনার ই-মেলের প্ল্যানটাও কিন্তু জব্বর ম্যাডাম। নারায়ণ যে এত সহজে টোপ গিলবে, এটা সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন।”

“লোভ। লোভ। এই চিঠিটার আশা যদি ছেড়ে দিত, তা হলে হয়তো ও বেঁচে যেত। একসময় তো দিয়েওছিল। কিন্তু ই-মেলটা পেতেই আবার লোভটা চাগিয়ে উঠল। একটা চিঠি বেচে ও হয়তো লক্ষ ডলার কামায়। তাই না গুটিগুটি ফের পা বাড়াল।”

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে কথার পিঠে কথা শুনছিল টুপুর। এবার প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, “কিন্তু একটা সিম্পল চিঠির কী এমন মহিমা? যার থেকে লক্ষ ডলার ইনকাম হয়?”

মিতিন চিঠিটা বাড়িয়ে দিল, “পড়। পড়ে দ্যাখ।”

আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ল টুপুর, “তুৎ, এ তো সাধারণ এক আমন্ত্রণলিপি। এর মধ্যে রহস্য কোথায়?”

পার্থও ঝুঁকে দেখছিল চিঠিটা। জিজ্ঞেস করল, “ভাষাতেই কোনও সংকেত আছে, তাই না? উই মানে হয়তো হান্ড্রেড! প্লিজ্‌ড মানে হয়তো ব্যাটেলিয়ান। কিংবা সাবমেরিন।”

“ঘোড়ার মাথা। সাংকেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধারের জন্য মিলিটারিতে আলাদা একটা বিভাগ আছে। ঠিক কি না, মিস্টার দত্ত?”

“আছে বইকী। তবে এদের সংকেত পাঠানোর পদ্ধতি একেবারেই নতুন। এই ধরনের কেস আমরা এই প্রথম পেলাম।”

মিতিন বলল, “অথচ ভেবে দেখলে পদ্ধতিটা অতি সিম্পল।

চিঠির ভাষা আপনারা নানানভাবে খতিয়ে দেখবেন। কিন্তু সেখানে কিস্‌সু নেই। চিঠির মাথায়, কোম্পানির প্রতীক পেঙ্গুইনের গায়ে, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লেখা বসিয়ে নারায়ণ যে সবাইকে বুদ্ধু বানাচ্ছিল, কে-ই বা ধারণা করবে? এভাবে খবর পাচার করাটাকে বলে স্টেগানোগ্রাফি।"

"জানি," সুজিত দত্ত মাথা নাড়লেন, "তবে এভাবে কারিকুরি করে প্রতি সপ্তাহেই যে দেশের বাইরে গোপন খবর চলে যাচ্ছে, এটা অনুমান করা কি সম্ভব? বিশেষ করে সংবাদবাহকরা যেখানে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে একেবারেই অন্ধকারে?"

"তা ঠিক," মিতিন চিঠিটা নিয়ে সুজিত দত্তর হাতে দিল, "এই চিঠি আপনাদেরই সম্পত্তি। আপনিই রাখুন। তবে নারায়ণের লোকজনের এলেম আছে। চালের উপর আস্ত রামায়ণ লেখার মতো খুদি-খুদি অক্ষরে দিব্যি কেমন লিখে দিয়েছে। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়েও পরিষ্কার পড়তে পারলাম না। সম্ভবত সিয়াচেন-টিয়াচেন গোছের কিছু লেখা আছে। সঙ্গে কিছু সংখ্যাও। আপনাদের শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের নীচে নিশ্চয়ই পুরোটা পড়া যাবে।"

মৃদু হাসলেন সুজিত দত্ত। চিঠিটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, "আপনাকে আবার একবার ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" মিতিনও মাথা নোওয়াল, "আপনি কি আজকের ফ্লাইটে ফিরছেন?"

"না ম্যাডাম। নারায়ণ আর তার শাগরেদদের দেশে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রচুর ফর্মালিটি আছে। সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে জানাবে, সেখান থেকে সিঙ্গাপুর সরকারের কাছে অনুরোধ আসবে ...এ এক লম্বা প্রসেস। শেষ পর্যন্ত হয়তো

আমি থাকব না। তবে শুরুটা তো করে যেতে হবে।"

সুজিত দত্ত বেরিয়ে গেলেন। এতক্ষণ গমগম করছিল ঘরটা, হঠাৎই নিশ্চুপ। তখনই টুপুরের নজরে পড়ল, এত কিছু ঘটে গেল, অথচ তার মধ্যেও কী নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে বুমবুম!

টুপুর ঝুঁকে ধাক্কা দিল ভাইকে, "অ্যাই কুম্ভকর্ণ, ওঠ। জাগ।"

পার্থ ফোড়ন কাটল, "উঁহু, কুম্ভকর্ণ নয়। কুম্ভকনম। ঘুমের জালে ধরা পড়েছে।"

॥ ১২ ॥

আবার আকাশে উড়ল বিমান। চলেছে কলকাতা অভিমুখে। এবারও মাঝের সিটে মিতিন, পার্থ, বুমবুম আর টুপুর। সিটবেল্ট খোলার পরেই আচমকা খিদে পেয়ে গেল পার্থর। জুলজুল চোখে দেখছে কখন স্ন্যাক্স-ট্যাক্স আসে। নৈশাহারের এখনও একটু দেরি, বেত যতক্ষণ না আসে কানমলা তো চলুক।

টুপুরের এখনও সিঙ্গাপুরের ঘোর কাটেনি। আপন মনে বলল, "জীবনে প্রথম বিদেশ বেড়াতে এসে জোর একটা অভিজ্ঞতা হল যা হোক।"

পার্থ ঠাট্টার সুরে বলল, "হ্যাঁ। একে বলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ।"

মিতিন বসেছে বুমবুমের ওপারে। ঘাড় হেলিয়ে বলল, "কী কী শিক্ষা পেলে শুনি?"

"অনেক। অনেক। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি! এক নম্বর, সুডোকু একটি বিপজ্জনক খেলা। নয় বাই নয় ঘরের ছক মিলিয়ে যে প্রাইজ মেলে, সেটি গ্রহণ করলে হাতে হাতকড়া পরা অসম্ভব নয়।

দু' নম্বর, বিনি পয়সায় বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেলে নাচতে-নাচতে রাজি হতে নেই। কে যে কীভাবে গাড্ডায় ফেলে দেবে, টেরও পাওয়া যাবে না। তিন নম্বর, অজানা অচেনা কোম্পানির চিঠি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা উচিত। চার নম্বর, যারা শুধু ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে, তারা লোক মোটেই সুবিধের নয়।"

টুপুর হিহি হেসে উঠল, "তুমি তো বেশ লম্বা তালিকা বানিয়ে ফেলেছ!"

"এ তো গেল শিক্ষার ফর্দ। এর পর যদি কৌতূহলের লিস্টটা পেশ করি, তোর মাসি আঁতকে উঠবে।"

"কেন?"

"দুপুরে অপরাধীকে ধরার পর যা সুচারু যুক্তিজাল বিস্তার করে দিল, তারপর আর কি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবে?"

মিতিন হেসে ফেলল, "আহা, শোনাই যাক।"

"হয়তো খুবই বোকার মতো প্রশ্ন ...তবু," পার্থ টেরিয়ে তাকাল, "নারায়ণ আর শঙ্করন যে একই লোক, তুমি বুঝলে কী করে?"

"শাস্ত্রে পড়োনি, সব দেবতাই তো এক। যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু। যিনি নারায়ণ, তিনিই দেবাদিদেব শঙ্কর।"

"মগজে সেঁধোল না। মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাংলা করে বলবে কি?"

"ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে ভাড়া করা গাড়ি কি কেউ নিজে চালায়?"

"দ্যাখো কাণ্ড। এই সরল ব্যাপারটা মাথায় আসেনি!"

"আর কী জিজ্ঞাস্য আছে?"

"অরিজিনাল চিঠিখানা তুমি ঠিক কখন খুঁজে পেয়েছিলে?"

"এই জবাবটা দেওয়া যাবে না।"

"অর্থাৎ সিঙ্গাপুর রওনা হওয়ার আগেই অরিজিনালটা আমার

ব্যাগ থেকে হাতিয়ে তার জায়গায় স্ক্যান করা কপিটা পুরে দিয়েছিলে?”

“মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।”

মা আর বাবার প্রশ্নোত্তরের খেলা মন দিয়ে শুনছিল বুমবুম। হঠাৎই সে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছে, “আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি?”

“কাকে জিজ্ঞেস করবি? মাকে? না আমাকে?”

“তোমাদের তিনজনকেই।”

“বলে ফ্যালো।’

“সিঙ্গাপুরে একটাও সিঙ্গাপুরি কলা দেখলাম না কেন?”

টুপুর, মিতিন আর পার্থ শব্দ করে হেসে উঠল। সত্যি, এও এক রহস্য বটে। হয়তো এই রহস্যের সন্ধানেই হয়তো তাদের আসতে হবে সিঙ্গাপুর। আরও একবার।

---

9 788177 567090